নিম্নবর্গের ইতিহাস

নিম্নবর্গের ইতিহাস

সম্পাদনা

গৌতম ভদ্র



প্রতিভাস □ কলকাতা

প্রথম প্রকাশ
ফেব্রুয়ারি ১৯৯৮

প্রকাশক
বীজেশ সাহা
প্রতিভাস
১৮/এ, গোবিন্দ মণ্ডল রোড
কলকাতা- ৭০০০০২
দূরভাষ : ২৫৫৭-৮৬৫৯

মুদ্রক
বইপাড়া পাবলিকেশনস্ (প্রিন্টিং বিভাগ)
১৮/এ, গোবিন্দ মণ্ডল রোড
কলকাতা- ৭০০০০২
দূরভাষ : ৬৫৪৪-৪৮৯৮

প্রচ্ছদ
দেবাশিস সাহা

মুখবন্ধ

'নিম্নবর্গের ইতিহাস'-এর প্রথম সংকলন প্রস্তুত করার ভার আমাদের দু-জনের ওপর ন্যস্ত হয়েছিল কয়েক বছর আগে। প্রধানত আমাদের গাফিলতিতেই প্রকাশনায় এত দেরি হল। তা হলেও, বিলম্বের একটা কারণ এখানে বুঝিয়ে বললে ক্ষতি হবে না। *সাবলটার্ন স্টাডিজ* প্রকাশিত হওয়ার পর থেকেই বাংলা পত্রপত্রিকায় এ-বিষয়ে আলোচনা হয়ে এসেছে। সেই সঙ্গে *সাবলটার্ন স্টাডিজ*-এর সঙ্গে যুক্ত লেখকেরা অনেকে তাঁদের গবেষণা নিয়ে মৌলিক বাংলা প্রবন্ধও লিখেছেন। বাংলা সংকলন প্রকাশের পরিকল্পনা যখন প্রথম নেওয়া হয়, তখন তা ইংরেজি *সাবলটার্ন স্টাডিজ*-এর প্রবন্ধের অনুবাদ সংকলন হিসেবে ভাবা হয়েছিল। সেই অনুযায়ী কাজও শুরু হয়। কিন্তু ক্রমে দেখা গেল, বাংলায় নিম্নবর্গের ইতিহাস নিয়ে আলোচনা খানিকটা নিজের পথে এগিয়ে গিয়েছে। তার গুরুত্ব স্বীকার করতে গিয়ে পুরনো পরিকল্পনা বদলাতে হল। ইতিমধ্যে *সাবলটার্ন স্টাডিজ*-এর মূল প্রকল্পেও নানা বিবর্তন ঘটতে থাকে। এইভাবে গত সাত-আট বছরে এই সংকলনের সূচি বেশ কয়েকবার পালটাতে হয়েছে। আশা করছি বর্তমান সংকলনটি থেকে নিম্নবর্গের ইতিহাস নিয়ে আলোচনার ধারা কীভাবে পরিবর্তিত হয়ে এসেছে, তার কিছুটা আন্দাজ পাওয়া যাবে।

আমাদের কাজে অনেকের সাহায্য পেয়েছি। সংকলনে অন্তর্ভুক্তির জন্য বিভিন্ন সময়ে অনেকগুলি প্রবন্ধ বাংলায় অনুবাদ করানো হয়েছিল। পরিকল্পনা বদলে যাওয়ায় অধিকাংশই এখানে নেওয়া হল না। অনুবাদের কাজ কষ্টসাধ্য। তাই অনুবাদকদের কাছে আমাদের কৃতজ্ঞতা জানানোর সঙ্গে সঙ্গে মার্জনাও চাইতে হচ্ছে তাঁদের সকলের অনুবাদ আমরা ব্যবহার করতে পারলাম না বলে। সম্পাদনার কাজে অমূল্য সাহায্য পেয়েছি অরুণ নাগ-এর কাছে। তাঁর সযত্ন পরামর্শ সত্ত্বেও যে-সব ভুলত্রুটি থেকে গেল তার জন্য দোষী আমরা। *এক্ষণ, বারোমাস, যোগসূত্র* ও *অনুষ্টুপ* পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধ পুনর্মুদ্রণের অনুমতি দেওয়ার জন্য ওই পত্রিকার সম্পাদকদের ধন্যবাদ।

কলকাতা, ১ জানুয়ারি ১৯৯৮

সূচিপত্র

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

বারোমাস ● শাহিদ আমিন, 'গান্ধী যখন মহাত্মা', অনুবাদক: রুদ্রাংশু মুখোপাধ্যায় ও রুশতী সেন; রণজিৎ গুহ, 'একটি অসুরের কাহিনী', অনুবাদক: রুদ্রাংশু মুখোপাধ্যায় ও রুশতী সেন; পার্থ চট্টোপাধ্যায়, 'ইতিহাসের উত্তরাধিকার', বীণা দাস, 'হিংসা, দেশান্তর ও ব্যক্তিগত কণ্ঠস্বর', অনুবাদক: পার্থ চট্টোপাধ্যায়।

যোগসূত্র ● গৌতম ভদ্র, 'কথকতার নানা কথা' (আংশিক উদ্ধৃতি)।

এক্ষণ ● রণজিৎ গুহ, 'নিম্নবর্গের ইতিহাস'; পার্থ চট্টোপাধ্যায়, 'পরিভাষা পরিচয়' (প্রাসঙ্গিক উদ্ধৃতি)।

ইকনমিক অ্যান্ড পলিটিকাল উইকলি ● জ্ঞানেন্দ্র পাণ্ডে, 'ভগ্নাংশের সমর্থনে: দাঙ্গা নিয়ে কী লেখা যায়?', অনুবাদক: গৌতম ভদ্র ও পার্থ চট্টোপাধ্যায়।

অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস ● ডেভিড হার্ডিম্যান, 'দেবীর আবির্ভাব' (*সাবলটার্ন স্টাডিজ*, ৩য় খণ্ড থেকে আংশিক উদ্ধৃতি), অনুবাদক: জয়ন্ত সেনগুপ্ত।

নিম্নবর্গের ইতিহাস

ভূমিকা: নিম্নবর্গের ইতিহাস চর্চার ইতিহাস

পার্থ চট্টোপাধ্যায়

১

সাবলটার্ন স্টাডিজ প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯৮২ সালে। প্রথম সাবলটার্ন স্টাডিজ সম্মিলন হয় ১৯৮৩-তে। এরপর বারো বছরের মধ্যে আট খণ্ড *সাবলটার্ন স্টাডিজ* সংকলন প্রকাশিত হয়েছে। অন্যদিকে ষষ্ঠ সাবলটার্ন স্টাডিজ সম্মিলন অনুষ্ঠিত হয়ে গেল ১৯৯৮-এর জানুয়ারি মাসে লখনৌতে।

গত পনেরো বছরে সাবলটার্ন স্টাডিজ-এর লেখাপত্রকে কেন্দ্র করে ভারতবর্ষের ইতিহাসচর্চার মহল বেশ কিছুটা আলোড়িত হয়েছে। তার ঢেউ অন্যান্য সমাজবিজ্ঞান, এমন কি ভাষা-সাহিত্য-শিল্পচর্চার এলাকাতেও গিয়ে পৌঁছেছে। শুধু তাই নয়, ভারতবর্ষ বা দক্ষিণ এশিয়ার সমাজ-ইতিহাস চর্চার গণ্ডি ছাড়িয়ে *সাবলটার্ন স্টাডিজ* নিয়ে আলোচনা এখন বিশ্বের প্রায় সমস্ত আঞ্চলিক ইতিহাসরচনার ক্ষেত্রেই শুনতে পাওয়া যায়। লাতিন আমেরিকা, আফ্রিকা, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার ঐতিহাসিক-সমাজবিজ্ঞানীরা অনেকে স্বতন্ত্রভাবে তাঁদের নিজস্ব সাবলটার্ন স্টাডিজ গোষ্ঠী তৈরি করেছেন। *সাবলটার্ন স্টাডিজ*-এর মূল লেখাগুলো সকলে পড়ে থাকুন আর না-ই থাকুন, বিশ্বের প্রায় সর্বত্রই ইতিহাস-সমাজবিজ্ঞান চর্চার মহলে 'সাবলটার্ন স্টাডিজ' এখন খুবই পরিচিত একটি নাম।

প্রথম সংকলনটি প্রকাশিত হওয়ার পর বিরূপ সমালোচনাই শোনা গিয়েছিল বেশি। ভারতবর্ষের ইতিহাস নিয়ে গবেষণার প্রধান কেন্দ্রগুলির কর্তাব্যক্তিরা—ভারতবর্ষে, ইংল্যান্ডে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে—এবং প্রতিষ্ঠিত ঐতিহাসিকেরা অনেকেই *সাবলটার্ন স্টাডিজ*-এর বিরোধিতায় মুখর হয়েছিলেন। বলে রাখা দরকার, *সাবলটার্ন স্টাডিজ*-এর সঙ্গে যাঁরা ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন এবং প্রথম সংকলনে যাঁদের লেখা ছাপা হয়েছিল, একমাত্র রণজিৎ গুহ ছাড়া অন্য সকলেই তখন নিতান্ত তরুণ এবং অপরিচিত লেখক। অনেকেরই প্রথম গবেষণার কাজ প্রকাশিত হয় *সাবলটার্ন স্টাডিজ*-এ। সেদিক দিয়ে দেখলে, বিরূপ হলেও যে-পরিমাণ সমালোচনা এই সংকলনটি উদ্রেক করতে পেরেছিল, তা খানিকটা বিস্ময়করই বলতে হয়। বোঝাই যাচ্ছিল, পাঠককে তুষ্ট করতে না পারলেও, তার অভ্যস্ত ধ্যানধারণাকে কোথাও একটা নাড়িয়ে দিতে সক্ষম হয়েছে *সাবলটার্ন স্টাডিজ*।

পর-পর তিন বছরে প্রথম তিনটি খণ্ড বেরিয়ে যায়। তার পাশাপাশি প্রকাশিত হয় 'সাবলটার্ন স্টাডিজ' গোষ্ঠীর লেখকদের নিজস্ব গবেষণাগ্রন্থ—জ্ঞানেন্দ্র পাণ্ডে-র *দি*

অ্যাসেন্ডেন্সি অফ দি কংগ্রেস ইন উত্তর প্রদেশ (১৯৭৮), গৌতম ভদ্র-র *মুঘল যুগে কৃষি অর্থনীতি ও কৃষক বিদ্রোহ* (১৯৮১), ডেভিড হার্ডিম্যান-এর *পেজান্ট ন্যাশনালিস্টস্ অফ গুজরাট* (১৯৮১), শাহিদ আমিন-এর *সুগারকেন অ্যান্ড সুগার ইন গোরখপুর* (১৯৮৪), পার্থ চট্টোপাধ্যায়-এর *বেঙ্গল ১৯২০-১৯৪৭: দি ল্যান্ড কোয়েশ্চেন* (১৯৮৪) এবং ডেভিড আর্নল্ড-এর *পুলিশ পাওয়ার অ্যান্ড কলোনিয়াল রুল* (১৯৮৬)। এই পর্যায়ের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বই রণজিৎ গুহ-র *এলিমেন্টারি আসপেক্টস অফ পেজান্ট ইনসার্জেন্সি ইন কলোনিয়াল ইন্ডিয়া* (১৯৮৩)। ভারতবর্ষের ইতিহাসের লেখক-পাঠকদের সামনে প্রথম যে দুটি বিষয় উপস্থিত করে 'সাবলটার্ন স্টাডিজ'—(১) ঔপনিবেশিক ভারতে উচ্চবর্গ এবং নিম্নবর্গের রাজনৈতিক ক্ষেত্রের স্বাতন্ত্র্য এবং (২) কৃষক চৈতন্যের স্বকীয় বৈশিষ্ট্য—সেই দুটি বিষয় নিয়ে সবচেয়ে বিশদ এবং তথ্যপূর্ণ আলোচনা করা হয় রণজিৎ গুহ-র বইতে। প্রথম পর্যায়ের *সাবলটার্ন স্টাডিজ* নিয়ে প্রবল বিতর্কের ঝড় ওঠে এই দুটি বিষয়কে কেন্দ্র করে।

গৌতম ভদ্র-র বইটি বাদ দিলে এইসব লেখাপত্র সবই ছিল ইংরেজিতে। কিন্তু প্রথম খণ্ড *সাবলটার্ন স্টাডিজ* প্রকাশিত হওয়ার প্রায় সঙ্গে সঙ্গে বাংলা পত্রপত্রিকাতেও এই বিষয়ে আলোচনা শুরু হয়ে যায়। ১৯৮২-তে রণজিৎ গুহ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগে বাংলায় দুটি বক্তৃতা করেন যা *এক্ষণ* পত্রিকায় 'নিম্নবর্গের ইতিহাস' শিরোনামে ছাপা হয়।[১] হয়তো স্বাভাবিক কারণেই, বাংলা পত্রপত্রিকায় এ সময়কার বিতর্কে একটা প্রধান আলোচ্য বিষয় ছিল সাবলটার্ন স্টাডিজ-এর বিশ্লেষণপদ্ধতির সঙ্গে মার্কসীয় বিশ্লেষণপদ্ধতির সামঞ্জস্য অথবা অসঙ্গতি। ১৯৮৫-তে *এক্ষণ* পত্রিকায় 'নিম্নবর্গ' শব্দটির পারিভাষিক পরিচয় দিতে গিয়ে আমি এই প্রসঙ্গে খানিকটা বিশদ আলোচনা করি। প্রথম পর্যায়ের *সাবলটার্ন স্টাডিজ*-এর তাত্ত্বিক অবস্থান সম্বন্ধে একটা ধারণা এই আলোচনা থেকে পাওয়া যাবে, তাই সংক্ষিপ্ত প্রবন্ধটি নীচে উদ্ধৃত করলাম।[২]

২

Subaltern (নিম্নবর্গ): ইংরেজি ভাষায় শব্দটি বিশেষভাবে ব্যবহৃত হয় সামরিক সংগঠনের ক্ষেত্রে। ক্যাপ্টেনের অধস্তন অফিসারদের 'সাবলটার্ন' বলা হয়। তবে শব্দটির সাধারণ অর্থ হল অধস্তন বা নিম্নস্থিত। আরিস্ততেলীয় ন্যায়শাস্ত্রে এর অর্থ এমন একটি প্রতিজ্ঞা যা অন্য কোনও প্রতিজ্ঞার অধীন, যা বিশিষ্ট, মূর্ত, সার্বিক নয়। সাধারণ অর্থে ইংরেজিতে এর সমার্থক শব্দ হল 'সাবর্ডিনেট'।

মার্কসীয় আলোচনায় এই শব্দটির ব্যবহার পাওয়া যায় ইতালির কমিউনিস্ট নেতা ও দার্শনিক আন্তোনিও গ্রামশির (১৮৯১-১৯৩৭) বিখ্যাত *কারাগারের নোটবই*-তে। এই নোটবইতে বিভিন্ন শব্দের প্রয়োগ সম্পর্কে কিছু জটিলতা আছে। এটি রচিত হয়েছিল ১৯২৯ থেকে ১৯৩৫-এর মধ্যে, গ্রামশি যখন মুসোলিনির কারাগারে বন্দি। সেন্সরের শ্যেনদৃষ্টি এড়ানোর জন্য বহুক্ষেত্রে প্রচলিত মার্কসীয় পরিভাষা বর্জন করে অন্য শব্দ ব্যবহার করেন গ্রামশি। যেমন 'মার্কসবাদ' কথাটা তিনি কোথাও ব্যবহার করেননি, বলেছেন 'প্রাক্সিসের দর্শন'। মার্কসের নামও ব্যবহার করেননি, বলেছেন, 'প্রাক্সিসের

দর্শনের প্রতিষ্ঠাতা'। কিন্তু উল্লেখযোগ্য, এই ধরনের প্রতিশব্দ উদ্ভাবন করার মধ্য দিয়ে প্রচলিত মার্কসীয় ধারণাগুলি সম্পর্কে গ্রামশির নিজস্ব চিন্তা, তাদের তাৎপর্য সম্পর্কে তাঁর নিজস্ব বোধ, প্রায় অনিবার্যভাবেই প্রকাশ পেয়েছে। 'মার্কসবাদ'-এর প্রতিশব্দ খুঁজতে গিয়ে তিনি যখন বেছে নেন 'প্রাক্সিসের দর্শন', তখন মার্কসবাদের তত্ত্বজগতের বিশেষ একটা দিক বেশি প্রাধান্য পেয়ে যায় তাঁর লেখায়। পরিভাষায় প্রচলিত অর্থের সঙ্গে যুক্ত হয় নতুন ব্যঞ্জনা। কারাবাসের পর্যায়ের রচনাগুলি পড়ার সময় আমরা এই রূপকসমৃদ্ধ ভাষার জায়গায় প্রচলিত পরিভাষাগুলি বসিয়ে নিয়ে পড়তে পারি নিশ্চয়। কিন্তু তাতে গ্রামশির চিন্তার জটিলতা, তার অভিনবত্ব, বহুলাংশেই হারিয়ে যাবে।

সাবলটার্ন (ইতালীয়তে *সুবলতের্নো*) শব্দটি গ্রামশি ব্যবহার করেছেন অন্তত দুটি অর্থে। একটি অর্থে এটি সরাসরিভাবে 'প্রলেটারিয়াট'-এর প্রতিশব্দ। পুঁজিবাদী সমাজব্যবস্থায় 'সাবলটার্ন শ্রেণী' হল শ্রমিকশ্রেণী। সামাজিক ক্ষমতার এক বিশেষ ধরনের বিন্যাস ও প্রক্রিয়ার মধ্যে শ্রমিকশ্রেণী শোষিত ও শাসিত হয়। এই বিন্যাসে 'সাবলটার্ন' শ্রমিকশ্রেণী বিপরীত মেরুতে অবস্থিত 'হেগেমনিক' শ্রেণী অর্থাৎ পুঁজিমালিক, 'বুর্জোয়াসি'। শ্রমিকশ্রেণী/বুর্জোয়াশ্রেণী, এই বিশেষ অর্থে সাবলটার্ন/হেগেমনিক শ্রেণীর সামাজিক সম্পর্কের বিষয়ে গ্রামশির বিশ্লেষণ আধুনিক মার্কসবাদী আলোচনায় এক বিশিষ্ট অবদান। এই বিশ্লেষণে গ্রামশি গুরুত্ব দিয়েছেন সেই ঐতিহাসিক প্রক্রিয়াটির উপর যার মাধ্যমে বুর্জোয়াশ্রেণী কেবল শাসনযন্ত্রে তার প্রভুত্বই প্রতিষ্ঠা করে না, সৃষ্টি করে এক সার্বিক সামাজিক কর্তৃত্ব বা 'হেগেমনি'। কেবল রাষ্ট্রীয় শক্তিকে অবলম্বন করে এই সার্বিক কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয় না। সংস্কৃতি ও ভাবাদর্শের জগতে এক আমূল পরিবর্তন ঘটিয়ে 'হেগেমনিক' বুর্জোয়াশ্রেণী তার শাসনের নৈতিক ভিত্তি হিসেবে 'সাবলটার্ন' শ্রমিকশ্রেণীর কাছ থেকে সামাজিক সম্মতিও আদায় করে নেয়। গ্রামশির বিশ্লেষণে তাই গুরুত্ব পায় রাষ্ট্রের সঙ্গে বৃহত্তর নাগরিক সমাজের সম্পর্ক, জাতি, জনগণ, বুর্জোয়াশ্রেণী ও অন্যান্য শাসকগোষ্ঠীর পারস্পরিক সম্পর্ক, জাতীয় জীবনের একচ্ছত্র প্রতিনিধি হিসেবে জাতীয় রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা, বুর্জোয়াশ্রেণীর সার্বিক কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠায় বুদ্ধিজীবীদের ভূমিকা, ইত্যাদি প্রশ্ন।

কিন্তু আরও সাধারণ অর্থেও 'সাবলটার্ন' কথাটি ব্যবহৃত হয়েছে গ্রামশির লেখায়। কেবল পুঁজিবাদী সমাজব্যবস্থায় নয়, শ্রেণীবিভক্ত সমাজের অন্যান্য ঐতিহাসিক পর্বেও 'সাবলটার্ন' শ্রেণীর কথা বলেছেন গ্রামশি। স্পষ্টতই এখানে 'সাবলটার্ন-এর অর্থ শিল্পশ্রমিক শ্রেণী নয়। বরং যে-কোনও শ্রেণীবিভক্ত সমাজে ক্ষমতাবিন্যাসের কয়েকটি সাধারণ বৈশিষ্ট্যের কথা উঠছে এখানে। এই বিন্যাসকে গ্রামশি দেখেছেন একটি সামাজিক সম্পর্কের প্রক্রিয়ার মধ্যে, যার এক মেরুতে অবস্থিত প্রভুত্বের অধিকারী 'ডমিন্যান্ট' শ্রেণী, অপর মেরুতে যারা অধীন সেই 'সাবলটার্ন' শ্রেণী। বহুক্ষেত্রেই অবশ্য গ্রামশি বিশেষ বিশেষ ঐতিহাসিক পরিস্থিতিতে কর্তত্ব, প্রভুত্ব, শাসন এই শব্দগুলিকে সমার্থক হিসেবে ব্যবহার করেছেন। ফলে কর্তৃত্বের অধিকার, প্রভুত্বের অধিকার, শাসনের অধিকার, এই ধারণাগুলির মধ্যে কোনও পার্থক্য আছে কি না, গ্রামশির আলোচনা থেকে তা বোঝা কষ্টকর হয়ে দাঁড়ায়।

শুধু তাই নয়, যে-কোনও শ্রেণীবিভক্ত সমাজে প্রভুত্ব/অধীনতার এই সম্পর্কের সাধারণ চরিত্র নির্ধারণ করতে গিয়ে অত্যন্ত মূল্যবান কিছু মন্তব্য করা সত্ত্বেও গ্রামশি এমন কয়েকটি তাত্ত্বিক সমস্যার মধ্যে পড়েছেন যার নির্দিষ্ট সমাধান তাঁর লেখায় পাওয়া যায় না। উৎপাদন-সম্পর্কের দিক দিয়ে বিচার করলে এই প্রভুত্ব/অধীনতা সম্পর্ক স্বভাবতই নানা প্রকারের উৎপাদন-সম্পর্কের মধ্যে গ্রথিত থাকতে পারে। তবে বিংশ শতাব্দীর গোড়ায় ইতালীয় সমাজে পুঁজিবাদী বিকাশের অসম্পূর্ণতার পটভূমিতে সামন্তশ্রেণীর প্রভুত্ব ও কৃষকশ্রেণীর অধীনতার চরিত্রই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন হিসেবে এসেছে গ্রামশির লেখায়। প্রভুত্ব/অধীনতা সম্পর্কের সাধারণ চরিত্রটির সন্ধান করেছেন তিনি প্রধানত সংস্কৃতি ও ভাবাদর্শের ক্ষেত্রগুলিতে। দুটি মূল ঝোঁক কাজ করেছে তাঁর মধ্যে। একদিকে ইউরোপীয় মার্কসবাদের আদিপর্বে কৃষকের সংস্কৃতি, ধ্যানধারণা, আচার-আচারণ ও রাজনৈতিক সম্ভাবনা সম্পর্কে যে তাচ্ছিল্য আর অবজ্ঞার ভাব ছিল, তার বিরুদ্ধে গ্রামশি বলে গেছেন 'সাবলটার্ন' কৃষকদের প্রাত্যহিক জীবনযাপন, ধর্মবিশ্বাস, রাজনৈতিক ধ্যানধারণার বিশিষ্ট লক্ষণগুলির কথা এবং বিপ্লবী নেতৃত্ব তথা বুদ্ধিজীবীদের পক্ষে এই লক্ষণগুলিকে গভীরভাবে অনুসন্ধান করা ও বোঝার প্রয়োজনের কথা। অথচ একই সঙ্গে তিনি ক্রমাগত জোর দিয়েছেন কৃষকশ্রেণীর চেতনার সীমাবদ্ধতার উপর। শ্রেণীবিভক্ত সমাজে প্রভুত্বের অধিকারী যে শ্রেণী, তার চেতনার সমগ্রতা, মৌলিকতা, সক্রিয় ইতিহাসবোধের তুলনায় কৃষকচেতনা একান্তভাবেই খণ্ডিত, নির্জীব, পরাধীন। এমন কি বিদ্রোহের মুহূর্তেও তার চেতনা বহুলাংশেই আচ্ছন্ন থাকে শাসকশ্রেণীর মতাদর্শের আবরণে। কৃষকের ইতিহাসবোধ, ধর্মবিশ্বাস ও লোকসংস্কৃতির যে বিবরণ গ্রামশির লেখায় পাওয়া যায় তা থেকে এটা মনে হওয়া কিছু অস্বাভাবিক নয় যে বৈপ্লবিক রাজনীতির পরিপ্রেক্ষিতে তাঁর মতে কৃষকচেতনার মূল চরিত্র মোটামুটিভাবে নেতিবাচক।

তা হলে গ্রামশি এত জোরের সঙ্গে কৃষকের প্রাত্যহিক জীবনযাত্রা ও ভাবাদর্শের জগতটিকে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে অনুসন্ধান করার প্রয়োজনীয়তার কথা বলেছেন কেন? খুঁটিয়ে দেখলে দেখা যাবে, ঘটনাটা অত সরল নয়। গ্রামশি কৃষকচেতনার সীমাবদ্ধতা এবং পরনির্ভরতার কথা বলেছেন নিশ্চয়ই, কিন্তু একই সঙ্গে এ-কথাও বলেছেন যে যে-কোনও শ্রেণীবিভক্ত সমাজে প্রভুত্ব/অধীনতা সম্পর্কটা হল বিরোধিতার সম্পর্ক। ফলে তার পরনির্ভরতার মধ্যেও কৃষকচেতনা সামন্তশ্রেণীর চেতনার বিপরীত বিন্দুতে অবস্থিত থাকে। এই বিরুদ্ধতার জন্য কৃষকচেতনার বাস্তব প্রকাশ সময় সময় ইতিবাচক ভূমিকাও গ্রহণ করতে পারে। লোকমানসের কিছু কিছু উপাদান যেমন আশ্চর্য রকমের শক্তিশালী—বিশেষ করে এক ধরনের স্বাভাবিক নীতিবোধ কাজ করে তার মধ্যে যা প্রাতিষ্ঠানিক ধর্ম, ন্যায়শাস্ত্র বা আইনের তুলনায় অনেক সহজ অথচ গভীর এবং দীর্ঘস্থায়ী। দৈনিক জীবনযাত্রার রীতিতে নানা পরিবর্তন ঘটলেও এই স্বাভাবিক ন্যায়-অন্যায় বোধ অক্ষুণ্ণ থাকে। এমন কি নতুন নতুন পরিস্থিতিতে অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিরোধের নানা অভিনব পন্থার জন্ম দিতেও তা সক্ষম। সংস্কৃতি বা ধর্মবিশ্বাসের ক্ষেত্রে সাধারণভাবে লোকসংস্কৃতি যদিও প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মের চাপে ভারাক্রান্ত থাকে, তা সত্ত্বেও

'সাবলটার্ন' শ্রেণীগুলি তাদের নিজেদের বাস্তব অভিজ্ঞতা ও প্রয়োজন অনুযায়ী সেই প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কৃতির কিছু কিছু উপাদানকেই মাত্র বেছে নেয়, সবটুকু নেয় না। ফলে ধর্মীয় জীবনের সার্বিক প্রাতিষ্ঠানিক চেহারার মধ্যেও এক ধরনের স্তরবিন্যাস দেখা দেয়। শাসকশ্রেণীর ধর্মবিশ্বাস আর তাদের অধীন শ্রেণীগুলির ধর্মবিশ্বাস প্রাতিষ্ঠানিক দিক থেকে এক হলেও তাদের আকার ও চরিত্র পৃথক, এমন কী বিরোধী রূপও ধারণ করতে পারে। এই বিরুদ্ধতা থেকেই জন্ম নেয় 'সাবলটার্ন' শ্রেণীর প্রতিরোধ, যা বহুসময়ই ক্ষমতাশীল শ্রেণীগুলিকে বিপদে ফেলতে সক্ষম হয়।

সুতরাং 'সাবলটার্ন' চেতনার সীমাবদ্ধতার কথাই যদিও গ্রামশির লেখায় প্রাধান্য পেয়েছে, তা সত্ত্বেও এই চেতনার স্বতন্ত্র অভিব্যক্তির সম্ভাবনার ইঙ্গিতও তাতে যথেষ্ট পরিমাণেই আছে। মার্কসীয় তত্ত্বের কাঠামোর মধ্যে এই ইঙ্গিতগুলোর সঠিক তাৎপর্য কী, তার উত্তর কিন্তু গ্রামশির আলোচনায় খুব স্পষ্টভাবে পাওয়া যাবে না। এমন কি এই সম্ভাবনাগুলোকে তাত্ত্বিক সমস্যা হিসেবেও গ্রামশি নির্দিষ্টভাবে উপস্থিত করতে পারেননি।

সম্প্রতিকালে ভারতবর্ষের সমাজ ও ইতিহাস নিয়ে আলোচনার ক্ষেত্রে 'সাবলটার্ন' শ্রেণীর ধারণাটিকে নতুনভাবে উপস্থিত করা হয়েছে। রণজিৎ গুহ এর বাংলা প্রতিশব্দ করেছেন 'নিম্নবর্গ'। *সাবলটার্ন স্টাডিজ* নামক প্রবন্ধসংকলনগুলিতে এবং জ্ঞানেন্দ্র পাণ্ডে, ডেভিড হার্ডিম্যান, রণজিৎ গুহ, শাহিদ আমিন প্রমুখ ঐতিহাসিকদের গ্রন্থে এই ধারণাটি ব্যবহৃত হয়েছে। গ্রামশির ইঙ্গিতগুলিকে অনুসরণ করেই 'নিম্নবর্গ' ধারণাটির উদ্ভব। কিন্তু তার প্রয়োগ ও বিস্তার করা হয়েছে ভারতবর্ষের সমাজ-ইতিহাসের ক্ষেত্রে। এর ফলে মার্কসীয় তত্ত্ব ও বিশ্লেষণপদ্ধতিতেও কয়েকটি নতুন সম্ভাবনার সৃষ্টি হয়েছে। সেই সঙ্গে আবার দেখা দিয়েছে কিছু নতুন সমস্যাও।

ভারতবর্ষের ইতিহাসে যাকে 'আধুনিক' পর্ব বলে অভিহিত করা হয়, মার্কসীয় পদ্ধতি অনুযায়ী তার মূল চরিত্রটির অনুসন্ধান করা প্রয়োজন প্রাক্‌ধনতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা থেকে পুঁজিবাদে উত্তরণের ঐতিহাসিক প্রক্রিয়ার মধ্যে। ইউরোপের ক্ষেত্রে পুঁজিবাদের উদ্ভব সম্পর্কে কিছু ধারণা মার্কসবাদী আলোচনায় প্রচলিত আছে। সামন্তশ্রেণীর আধিপত্য ও কৃষকের অধীনতাকে কেন্দ্র করে যে উৎপাদনব্যবস্থা, তার ভঙ্গুর অবস্থা; পুঁজিবাদী পদ্ধতিতে কৃষি উৎপাদনের সূত্রপাত; কৃষকদের মধ্যে পৃথকীকরণের প্রক্রিয়া; জমি ও উৎপাদনের উপকরণ থেকে বিচ্ছিন্ন এক সর্বহারা শ্রেণীর সৃষ্টি; একই সঙ্গে শহরাঞ্চলে পুঁজিবাদী প্রক্রিয়ায় শিল্পোৎপাদনের প্রসার—মোটামুটি এইভাবেই সামাজিক উৎপাদনের সামগ্রিক ব্যবস্থা হিসেবে পুঁজিবাদের উদ্ভবকে দেখা হয়ে এসেছে। এরই সমান্তরাল প্রক্রিয়া হিসেবে যুক্ত হয়েছে বুর্জোয়াশ্রেণীর সামাজিক কর্তৃত্ব বিস্তার—ব্যক্তিকেন্দ্রিক ও যুক্তিবাদী সমাজদর্শন, সাম্য-মৈত্রী-স্বাধীনতার গণতান্ত্রিক আদর্শ, প্রতিনিধিত্বমূলক রাষ্ট্রব্যবস্থা ইত্যাদি। এই ঐতিহাসিক প্রক্রিয়ার যে প্রতিকল্পটি মার্কসীয় তত্ত্বে নির্মিত হয়েছিল, বলা বাহুল্য তার অবলম্বন ছিল পশ্চিম ইউরোপের অভিজ্ঞতা। উৎপাদন সম্পর্ক, রাষ্ট্রক্ষমতার বিন্যাস, সাংস্কৃতিক জীবন—প্রত্যেকটি ক্ষেত্রেই পুঁজিবাদের উদ্ভব ও বুর্জোয়া শ্রেণীর প্রাধান্য বিস্তারের একটা সঙ্গতিপূর্ণ চেহারা তুলে

ধরা হয়েছিল এই প্রতিকল্পে। অর্থাৎ তত্ত্বের দিক দিয়ে এটাই ছিল বিশুদ্ধ রূপ—সুবিন্যস্ত, সুসমঞ্জস ও নির্দিষ্ট।

কিন্তু বিশ্বের যে-সমস্ত অঞ্চলে পুঁজিবাদের উদ্ভব ঘটেছে দেরিতে, অর্থাৎ মধ্য, পূর্ব কিংবা দক্ষিণ ইউরোপে অথবা ঔপনিবেশিক তত্ত্বাবধানে—যেমন এশিয়া, আফ্রিকা বা দক্ষিণ আমেরিকায়—সেখানে ঐতিহাসিক বিবর্তনের এই সুসমঞ্জস রূপটি আদৌ দেখতে পাওয়া যায় না। একদিকে তাত্ত্বিক প্রতিকল্পের নির্দিষ্ট রূপ, অন্যদিকে বিভিন্ন দেশে ঐতিহাসিক বিবর্তনের বিভিন্নতা- এই সমস্যাটির তাৎপর্য নিয়ে আলোচনা শুরু হয় মার্কসের শেষজীবনের লেখাগুলিতে। তারপর লেনিনের রচনাতে পাওয়া গেল এই তাৎপর্যগুলির তাত্ত্বিক বিশ্লেষণের কয়েকটি ইঙ্গিত। এই প্রসঙ্গে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য যে ধারণাটি, সেটি হল সামাজিক সম্পর্কের পুনরাবর্তনের প্রক্রিয়ায় দ্বন্দ্বের অসম বিকাশের সম্ভাবনা।

দ্বন্দ্বের অসম বিকাশ তখনই দেখা দেয় যখন সমাজকাঠামোর বিভিন্ন অংশে পুনরাবর্তনের প্রক্রিয়া সমান্তরালভাবে এগোয় না। অর্থাৎ অর্থনীতির ক্ষেত্রে শ্রেণীদ্বন্দ্বের প্রক্রিয়ায় কোনও বিশেষ শ্রেণীর প্রাধান্য সমান্তরালভাবে রাষ্ট্রক্ষমতা বা সাংস্কৃতিক জগতে প্রাধান্যে পরিণত নাও হতে পারে। তেমনি আবার এই শ্রেণীদ্বন্দ্বের বিকাশ ভৌগোলিক ক্ষেত্রেও ভিন্ন ভিন্ন অঞ্চলে ভিন্ন ভিন্ন রূপ ধারণ করতে পারে। ফলে শ্রেণীদ্বন্দ্বের মৌলিকতা, বৈরিতা, প্রাধান্য ইত্যাদি গুণগুলি এক জটিল ও পরিবর্তনশীল কাঠামোয় বিন্যস্ত হয়ে থাকে। এবং পশ্চিম ইউরোপের অভিজ্ঞতা থেকে আহৃত প্রতিকল্পের সাহায্যে এই দ্বন্দ্বের ঐতিহাসিক উত্তরণের পথ নির্দেশ করা অসম্ভব হয়ে পড়ে।

এই অনির্দিষ্টতার জন্যই ইতিহাসের আলোচনায় উচ্চবর্গ/নিম্নবর্গের ধারণাটি তার তাৎপর্য লাভ করেছে। শুধু পূর্ব ইউরোপ, কিংবা এশিয়া-আফ্রিকা-লাতিন আমেরিকায় নয়, সাম্প্রতিক গবেষণায় দেখা গেছে, পশ্চিম ইউরোপের ক্ষেত্রেও পুঁজিবাদের উদ্ভব অথবা বুর্জোয়াশ্রেণীর সামাজিক কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা কোনও একটি সুনির্দিষ্ট উপায়ে ঘটেনি। বরং পুঁজিবাদে উত্তরণের ঐতিহাসিক প্রক্রিয়াটির অন্তর্গত যে শ্রেণীসংগ্রাম, তার বিশিষ্ট রূপ, শ্রেণীতে শ্রেণীতে বৈরিতা, মৈত্রী, সমঝোতার বিশিষ্ট রাজনৈতিক চেহারা, এক-এক দেশে এক-একভাবে প্রকাশ পেয়েছে। এবং সম্ভাবনার এই বিভিন্নতার কারণ সমাজকাঠামোর বিভিন্ন অংশে দ্বন্দ্বের অসম বিকাশ। সুতরাং উৎপাদন-রীতির বিন্যাসমূলক ও বিমূর্ত বিশ্লেষণ শুরু করামাত্রই প্রয়োজন হয়ে পড়ে উৎপাদন-সম্পর্কের সঙ্গে সঙ্গে রাষ্ট্রক্ষমতা, ধর্মীয় জীবন, সংস্কৃতি ও ভাবাদর্শের জগতে শ্রেণীদ্বন্দ্বের চরিত্রটিকে চিহ্নিত করা। যদি ধরে নিই, সমাজকাঠামোর প্রত্যেকটি অংশে এই দ্বন্দ্বের বিকাশ সমান্তরালভাবে এগোয়নি, তাহলে উৎপাদন-রীতির চরিত্র অনুযায়ী উৎপাদন-সম্পর্কের ধারণাটি ছাড়াও আরও কতকগুলি ধারণার প্রয়োজন দেখা দেয় যার সাহায্যে রাষ্ট্র কিংবা সংস্কৃতি-ভাবাদর্শের ক্ষেত্রে দ্বন্দ্বের বিকাশকে বিশ্লেষণ করা যেতে পারে।

এই প্রয়োজনেই 'উচ্চবগ'/নিম্নবর্গ' ধারণাটির উদ্ভব। এর সংজ্ঞা নির্ণয় করা হয়েছে সামাজিক সম্পর্কের সেই সমতলে যেখানে ক্ষমতাই হল মূল কথা। অর্থাৎ যেখানে

প্রভুত্ব/অধীনতার এক বিশিষ্ট কাঠামোর মধ্যে সামাজিক সম্পর্কটি বাঁধা থাকে। সুতরাং উচ্চবর্গ/নিম্নবর্গ ধারণাটির অবস্থান উৎপাদন-সম্পর্কের সমতলে নয়, কিংবা সেটি সামাজিক শ্রেণীর কোনও বিকল্প সংজ্ঞা নয়। বরং বলা যায়, ঐতিহাসিক বিবর্তন বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে শ্রেণীদ্বন্দ্বের অসম বিকাশকে চিত্রিত করার প্রয়োজনে উৎপাদন-সম্পর্কের সম্পূরক একটি ধারণা এটি। ফলে উচ্চবর্গ/নিম্নবর্গের বিশ্লেষণ পদ্ধতি উৎপাদন-রীতির ধারণাটিকে বাদ দিয়ে চলতে পারে না। ঐতিহাসিক বিবর্তনের কোনও বিশেষ পর্ব বা পরিস্থিতিতে এই রীতির জটিল বিন্যাস, অসমতা ও উত্তরণের সম্ভবনার বিভিন্নতাকে বোধগম্য করে তুলতে সাহায্য করে মাত্র।

উচ্চবর্গ/নিম্নবর্গ শব্দ দুটিকে শাসক শ্রেণী/শাসিত শ্রেণীর প্রতিশব্দ হিসেবেও সব ক্ষেত্রে ব্যবহার করা চলে না। কারণ অসম বিকাশের অবস্থায় সামাজিক ক্ষমতা সবসময় আইনবদ্ধ রাষ্ট্রীয় শাসনক্ষমতা হিসেবে প্রতিপন্ন নাও হতে পারে। ফলে অনেক সময় সামাজিক ক্ষমতার এমন সম্পর্কেরও হদিশ পাওয়া যাবে যেখানে উচ্চবর্গ/নিম্নবর্গের সম্পর্ক রাষ্ট্রক্ষমতার বিন্যাসের তুলনায় সম্পূর্ণ পৃথক।

সমাজকাঠামোর বিভিন্ন ক্ষেত্রে সামাজিক ক্ষমতার বিন্যাস ও পুনরাবর্তনের প্রক্রিয়াগুলিকে তাদের মৌলিক উপাদানে বিভক্ত করে দেখাই উচ্চবর্গ/নিম্নবর্গের বিশ্লেষণের লক্ষ্য। এই বিশ্লেষণ পদ্ধতির যেটি মূল অবলম্বন সেই ধারণাটি আমরা গ্রামশির রচনাতেও পাই। সেটি হল, শ্রেণী বিভক্ত সমাজে প্রভুত্ব/অধীনতার সম্পর্কের অন্তর্নিহিত বিরোধিতা। এই বিরোধিতার তাৎপর্য কী, সে-বিষয়ে গ্রামশির লেখাতে কিছু কিছু ইঙ্গিত পাওয়া যায় বটে, কিন্তু কোনও স্পষ্ট তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা পাওয়া যায় না। ভারতবর্ষ নিয়ে সাম্প্রতিক আলোচনায় এই সমস্যাটিকে আরও নির্দিষ্ট তাত্ত্বিক ভিত্তি দেওয়ার চেষ্টা হয়েছে।

বলা হয়েছে, সমাজবিন্যাসের দিক থেকে প্রভুত্ব/অধীনতা সম্পর্কটি প্রতিষ্ঠিত উৎপাদন-সম্পর্কের কাঠামোর মধ্যে। কিন্তু তার অন্তর্নিহিত রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব, অর্থাৎ ঐতিহাসিক বিবর্তনের সম্ভাবনাগুলি প্রকাশ পায় দুটি পরস্পরবিরোধী চেতনার বৈপরীত্যে। যেমন, সামন্ততান্ত্রিক সমাজে সামন্তপ্রভু/ভূমিদাস কৃষকের সম্পর্কটির রাজনৈতিক চরিত্র নিহিত রয়েছে উচ্চবর্গীয় সামন্তচেতনা ও নিম্নবর্গীয় কৃষকচেতনার বৈপরীত্যে। এই সম্পর্কের বিন্যাসগত রূপটি স্বভাবতই প্রকাশ পায় উচ্চবর্গের প্রভুত্ব ও নিম্নবর্গের অধীনতায়। সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থা যতদিন টিঁকে থাকে, উৎপাদন-প্রক্রিয়ার গতিতে এই প্রভুত্ব/অধীনতা সম্পর্কটাই পুনরাবর্তিত হয়। কিন্তু ইতিহাসের বিবর্তনের ক্ষেত্রে আমরা দেখি, প্রভুত্ব/অধীনতার সম্পর্ক সামন্ততান্ত্রিক সমাজেও সম্পূর্ণ স্থিতিশীল, সমান্তরাল, সুবিন্যস্ত রূপ ধরে এগোয় না। তাতে দেখা দেয় রাজনৈতিক বিরোধ, বিদ্রোহ, বিদ্রোহ দমন, শ্রেণীদ্বন্দ্বের নানা অসম অভিব্যক্তি। এই শ্রেণীদ্বন্দ্বের জন্য সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থার সামগ্রিক স্থায়িত্বের মধ্যেও ইতিহাসের গতি স্তব্ধ হয়ে থাকে না। সামন্তপ্রভু ও কৃষকের পারস্পরিক সম্পর্কের রাজনৈতিক, আইনগত, ধর্মীয়, সাংস্কৃতিক, সবদিক থেকেই ঘটে নানা পরিবর্তন। এবং এই শ্রেণীদ্বন্দ্বের মধ্যেই নিহিত থাকে সামন্ততান্ত্রিক সমাজের সামগ্রিক বিবর্তনের সম্ভাবনা।

ফলে সামন্ততন্ত্রের ইতিহাস আলোচনার ক্ষেত্রে প্রয়োজন হয়ে পড়ে উচ্চবর্গ/নিম্নবর্গের চেতনার বৈপরীত্যকে সঠিকভাবে চিহ্নিত করা। যেহেতু প্রভুত্ব/অধীনতা সম্পর্কটির বিপরীত মেরুতে অবস্থিত দুটি পরস্পরবিরোধী শ্রেণী, এবং যেহেতু এই শ্রেণীদ্বন্দ্বের রাজনৈতিক প্রকাশের ক্ষেত্রে দুটি শ্রেণীই সক্রিয়, কেবল উচ্চবর্গই সক্রিয় আর নিম্নবর্গ সম্পূর্ণ নিষ্ক্রিয় এমন নয়, সুতরাং ধরে নিতে হয় উচ্চবর্গের চেতনার বিপরীত অবস্থানে নিম্নবর্গের চেতনাও কোনও না কোনওভাবে তার স্বকীয়তা, তার স্বতন্ত্র অস্তিত্ব, অক্ষুণ্ণ রাখতে সক্ষম হয়। তা যদি না হত, তাহলে শ্রেণীদ্বন্দ্বের কোনও রাজনৈতিক প্রকাশ ঘটা সম্ভব হত না। বস্তুত তাহলে কোনও দ্বন্দ্বই থাকত না, নিম্নবর্গের অস্তিত্ব উচ্চবর্গের চেতনার সার্বিকতায় সম্পূর্ণ বিলীন হয়ে যেত।

কিন্তু উচ্চবর্গ/নিম্নবর্গ সম্পর্কের মধ্যে দুটি চেতনার স্বাতন্ত্র্যও যেমন সত্য, উচ্চবর্গের প্রভুত্ব ও নিম্নবর্গের অধীনতাও তেমনি সমানভাবেই সত্য। অর্থাৎ নিম্নবর্গের চেতনা স্বতন্ত্র হওয়া সত্ত্বেও পরাধীন। এই দ্বান্দ্বিক রূপটিকে অবলম্বন করেই নিম্নবর্গের ইতিহাস বিশ্লেষণ করা সম্ভব হয়ে ওঠে। শ্রেণীবিভক্ত সমাজের ঐতিহাসিক মালমশলা স্বভাবতই রচিত ও রক্ষিত হয় উচ্চবর্গের স্বার্থসিদ্ধির প্রয়োজনে। এই মালমশলার মধ্যে নিম্নবর্গের চেতনার স্বতন্ত্র রূপটির আবির্ভাব ঘটে কদাচিৎ। অধিকাংশ সময়ই নিম্নবর্গকে দেখা যায় নিষ্ক্রিয়, ভীরু, একান্ত অনুগত একটি জীব হিসেবে। অন্যে চালিত করলে তবেই যেন সে চলে। একমাত্র প্রকাশ্য রাজনৈতিক বিরোধ, বিশেষ করে বিদ্রোহের সময়ই শাসকগোষ্ঠী তাকে সক্রিয় প্রতিপক্ষ হিসেবে গ্রাহ্য করে। এই ধরনের ঐতিহাসিক বিবরণগুলির মধ্য থেকে নিম্নবর্গের চেতনার আপেক্ষিক স্বাতন্ত্র্য, অর্থাৎ স্বাতন্ত্র্য/পরাধীনতার দ্বৈত চরিত্রটি উদ্‌ঘাটন করাটা নিম্নবর্গের ইতিহাস রচনার একটা বিশেষ দিক হিসেবে গৃহীত হয়েছে। রণজিৎ গুহ-র *এলিমেন্টারি আসপেক্টস অফ পেজান্ট ইনসার্জেন্সি ইন কলোনিয়াল ইন্ডিয়া* গ্রন্থটি প্রধানত এই সমস্যা নিয়ে। এতে তিনি দেখিয়েছেন, কৃষকবিদ্রোহকে কতকগুলি অর্থনৈতিক শর্ত দিয়ে সরাসরি ব্যাখ্যা করা সম্ভব নয়। আপাতদৃষ্টিতে যে বিদ্রোহকে মনে হয় আকস্মিক, কিছু অবাস্তব কল্পনার দ্বারা চালিত, আসলে তা কিন্তু এই অর্থে 'স্বতঃস্ফূর্ত' নয়। তার পিছনে থাকে প্রস্তুতি, সংগঠন, রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপের নির্দিষ্ট একটা ছক। এই ছক নিহিত রয়েছে কৃষকচেতনায়। বিদ্রোহের উদ্দেশ্য, তার অলীক চরিত্র, এবং রাজনৈতিক পরিণতি হিসেবে তার অনিবার্য ব্যর্থতা, এ-সবেরই যুক্তি খুঁজে পাওয়া যাবে কৃষকচেতনার আপেক্ষিক স্বাতন্ত্র্যের মধ্যে, অর্থাৎ স্বাতন্ত্র্য/বৈপরীত্যের দ্বান্দ্বিক রূপটিতে।

নিম্নবর্গের ইতিহাসের অপর আলোচ্য বিষয় হল ঐতিহাসিক উত্তরণের সমস্যা। এর অন্তত দুটি দিক আছে। একটি হল, উচ্চবর্গ/নিম্নবর্গের রাজনৈতিক সংগ্রামের ফলস্বরূপ সমাজকাঠামোয় মৌলিক পরিবর্তনের সম্ভাবনা কতদূর? অন্যটি হল, নিম্নবর্গের চেতনার পৃথক ও স্বতন্ত্র রূপটিতে পরিবর্তনের সম্ভাবনা আছে কি? পরিবর্তন ঘটলে তা কীভাবে ঘটে? প্রথম প্রশ্নটির বলা বাহুল্য কোনও সরল কিংবা সাধারণভাবে প্রযোজ্য উত্তর নেই। কারণ এই সম্ভাবনাগুলো একান্তই নির্ভর করে বিশেষ ঐতিহাসিক দ্বন্দ্বের অসম বিকাশের ফলে সৃষ্ট বিরোধগুলির ক্ষেত্রে বিভিন্ন শ্রেণী, গোষ্ঠী বা জনসমষ্টির রাজনৈতিক

ভূমিকা ও পারস্পরিক শক্তির উপর। উত্তরণ-প্রক্রিয়ার কোনও সাধারণ নিয়ম এখনও পর্যন্ত আবিষ্কার করা যায়নি। তবে উচ্চবর্গ/নিম্নবর্গ বিশ্লেষণ পদ্ধতি যাঁরা অনুসরণ করেন, তাঁদের বিশ্বাস উত্তরণ-প্রক্রিয়ার কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত শ্রেণীসংগ্রামের রাজনৈতিক প্রকাশ ও শ্রেণীচেতনার বৈপরীত্য গভীরভাবে অনুসন্ধান করলে এই সাধারণ নিয়মগুলি নির্ধারণ করা অপেক্ষাকৃত সহজ হবে। বিশেষ করে, শ্রেণীসম্পর্কের জটিল বিন্যাস এবং সমাজকাঠামোর বিভিন্ন স্তরে ও ভৌগোলিক ব্যাপ্তিতে শ্রেণীদ্বন্দ্বের অসম বিকাশকে আরও স্পষ্টভাবে বোধগম্য করে তোলা যাবে।

দ্বিতীয় প্রশ্নটিও সমস্যাকণ্টকিত। উচ্চবর্গের চেতনার স্বরূপ ও তার নিজস্ব বিবর্তনের ধারা ঐতিহাসিকদের কাছে অনেক বেশি সহজবোধ্য। নিম্নবর্গের চেতনার সন্ধান জানা যায় নানা জটিল বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যার মাধ্যমে। এই মুহূর্তে এই বিশ্লেষণপদ্ধতিগুলি যে অভিনব এবং অপেক্ষাকৃত অনির্দিষ্ট, তাতে কোনও সন্দেহ নেই। বিশেষ দেশ-কালের সীমানার মধ্যে এই বিশ্লেষণ নিম্নবর্গের চেতনার স্বরূপ উদ্‌ঘাটন করতে সাহায্য করছে কি না, তা বিচার করার একমাত্র মানদণ্ড হল সমাজ পরিবর্তনের বৈপ্লবিক রাজনীতির মানদণ্ড। পুঁজিবাদী উৎপাদন-প্রক্রিয়া ও রাষ্ট্রের অধীন যে আধুনিক সমাজব্যবস্থা, তার ঐতিহাসিক উত্তরণের ক্ষেত্রে কৃষকচেতনার একক, এমন কি প্রধান ভূমিকাও থাকা সম্ভব নয়। বুর্জোয়া চেতনার সমগ্রতা, তার ঐতিহাসিক নিশ্চয়তা, ক্ষমতা ব্যবহারের নানা জটিল প্রক্রিয়ার সঙ্গে পাল্লা দিতে পারে, এমন কোনও শ্রেণীচেতনার নেতৃত্বে বৈপ্লবিক রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করা ছাড়া কৃষকশ্রেণীর ঐতিহাসিক পরাধীনতার অবসান সম্ভব নয়। মার্কসবাদের আদিযুগ থেকেই এ সত্য সর্বজনস্বীকৃত। কিন্তু পুঁজিবাদী উৎপাদনের বিশ্বব্যাপী প্রসারের পরেও যে বহু দেশে এক বিশাল কৃষকশ্রেণী তার স্বতন্ত্র অস্তিত্ব দীর্ঘদিন বজায় রেখে চলবে, এমন সম্ভাবনার কথা উনিশ শতকের ইউরোপীয় মার্কসবাদীরা ভাবেননি। তখন মনে করা হত, কৃষকশ্রেণীর অবলুপ্তি পুঁজিবাদী উৎপাদনের অবশ্যম্ভাবী পরিণতি—নির্মম, রক্তক্ষয়ী, কিন্তু অনিবার্য। অথচ ১৯১৭-র রুশ বিপ্লব থেকেই দেখা গেছে, তথাকথিত অনুন্নত দেশগুলিতে ঐতিহাসিক উত্তরণ সম্ভব হয়েছে ব্যাপক কৃষক জনসমষ্টির প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণের মাধ্যমে। এক বৃহত্তর সর্বহারা শ্রমিকশ্রেণীর অঙ্গীভূত হয়ে নয়, তাদের জীবিকা, জীবনধারণ ও চেতনার আপেক্ষিক স্বাতন্ত্র্য বজায় রেখে শ্রমিকশ্রেণীর সঙ্গে বৈপ্লবিক ঐক্যের মধ্য দিয়ে।

সুতরাং ভারতবর্ষের মতো কৃষিজীবীবহুল দেশে কৃষকচেতনার পরিবর্তনের সমস্যা কোনও ঐতিহাসিক অনিবার্যতার ধারণা দিয়ে সমাধান করা যাবে না। আধুনিক পুঁজিবাদের ক্ষমতার বিরুদ্ধে লড়তে সক্ষম এমন শ্রেণীচেতনার সঙ্গে বৈপ্লবিক ঐক্যের সম্ভাবনার মধ্যেই এর সমাধান খুঁজে পাওয়া যাবে। এইজন্যই আন্তোনিও গ্রামশি বলেছিলেন, সাবলটার্ন শ্রেণীর জীবনযাত্রা, আচার-আচরণ, ভাবাদর্শ গভীরভাবে অনুসন্ধান করা প্রয়োজন। আজকের ভারতবর্ষের ক্ষেত্রেও সেই কারণে বৈপ্লবিক নেতৃত্ব তথা বুদ্ধিজীবীদের পক্ষে প্রয়োজন হয়ে পড়েছে, উচ্চবর্গ/নিম্নবর্গ দ্বন্দ্বের জটিল বিন্যাস ও অসমতা, বিভিন্ন জনগোষ্ঠী ও অঞ্চলে সেই দ্বন্দ্বের নানা ধরনের বহিঃপ্রকাশ, এবং এই অসমতার মধ্যে বৈপ্লবিক ঐক্যের সন্ধান করা।

৩

১৯৭০-এর দশকে ভারতের মার্কসবাদী রাজনীতিক-বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে যে উত্তপ্ত বাদানুবাদ ঘটে যায়, 'সাবলটার্ন স্টাডিজ'-এর শিকড় খুঁজে পাওয়া যাবে সেই অসম্পূর্ণ বিতর্কে। ওপরে উদ্ধৃত প্রবন্ধটিতেও তার চিহ্ন দেখা যাচ্ছে। দুটি বিষয়কে কেন্দ্র করে বিতর্ক জমে উঠেছিল ওই সময়। একটিতে অংশ নেন প্রধানত অর্থনীতিবিদেরা, যাঁদের আলোচ্য ছিল ভারতবর্ষের কৃষি-অর্থনীতিতে পুঁজিবাদী উৎপাদনরীতির উদ্ভব। এক পক্ষের বক্তব্য ছিল, ঔপনিবেশিক আমলের শেষ পর্ব থেকেই ভারতের কৃষি-উৎপাদন ব্যবস্থায় এক আমূল পরিবর্তন ঘটে গিয়েছে। কৃষিপণ্যের বিশ্বব্যাপী বাজার এবং বড়মাপের সংগঠিত অর্থলগ্নী ব্যবস্থার সঙ্গে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে গিয়ে বড়-মাঝারি-ছোট সবরকম উৎপাদনই এখন পুঁজীবাদী উৎপাদন-রীতির নিয়ম মেনে চলতে শুরু করেছে। অন্য পক্ষ দেখাবার চেষ্টা করে যে কোনও কোনও এলাকায় সীমিত কিছু পরিবর্তন সত্ত্বেও ভারতের বিস্তীর্ণ অঞ্চলে আধা-সামন্ততান্ত্রিক কৃষি-উৎপাদন ব্যবস্থা এখনো অটুট রয়েছে। বৃহত্তর বাজার বা লগ্নীব্যবস্থার সঙ্গে যুক্ত হয়েও প্রাক-ধনতান্ত্রিক সমাজের মৌলিক রূপান্তরের কোনও চিহ্ন দেখা যায়নি। অন্য বিতর্কটি হয় প্রধানত ঐতিহাসিকদের মধ্যে। সেখানে আলোচ্য ছিল উনিশ শতকের বাংলায় তথাকথিত নবজাগরণ। জাতীয়তাবাদী, এমন কি মার্কসবাদী ইতিহাসেও দীর্ঘদিন ধরে 'নবজাগরণ'-এর মণীষীদের 'প্রগতিশীল' ভূমিকা একটা গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় অধিকার করে ছিল। সত্তর দশকে অশোক সেন, রণজিৎ গুহ, সুমিত সরকার ইত্যাদি ঐতিহাসিক প্রশ্ন তুললেন, রামমোহন-বিদ্যাসাগর প্রমুখ মণীষীদের ঐতিহাসিক ভূমিকা প্রগতিশীল কোন অর্থে? তাঁদের সংস্কার-চিন্তা তো ঔপনিবেশিক অর্থনীতি-রাজনীতির সীমানা ছাড়িয়ে এগোতে চেষ্টা করেনি। বস্তুত ব্রিটিশ শাসনের প্রগতিশীলতার ওপর আস্থা রেখেই তো তাঁদের সমাজ-সংস্কার প্রচেষ্টার শুরু, আর সেই শাসনক্ষমতার সীমাবদ্ধতাই তাঁদের সংস্কার-প্রচেষ্টার সীমা। ঔপনিবেশিক ভারতে ক্ষমতার বিন্যাস নিয়ে কোনও মৌলিক প্রশ্ন 'নবজাগরণ'-এর নায়কেরা তোলেননি, বরং সেই ক্ষমতাবিন্যাসকে অবলম্বন করেই তাঁরা সামাজিক প্রগতি আনার চেষ্টা করেছেন। সে চেষ্টা ব্যর্থ হওয়া অনিবার্য ছিল।

সমাজবিজ্ঞান-ইতিহাস নিয়ে লেখাপড়ার জগতে এই দুটি বিতর্ক যে-সময় ওঠে, তার অল্প কদিন আগেই ভারতের বামপন্থী রাজনীতি আর-একটি বিতর্কে আন্দোলিত হয়েছিল। ১৯৬৭ সালের নকশালবাড়ি কৃষক-সংগ্রামের ঘাত-প্রতিঘাত শুধুমাত্র কিছুটা ক্ষণস্থায়ী চাঞ্চল্য, রক্তক্ষয় আর রাজনৈতিক ব্যর্থতাতেই নিঃশেষ হয়ে যায়নি। স্বাধীন ভারতের রাষ্ট্রব্যবস্থায় ক্ষমতাবিন্যাসের প্রশ্নটি জাতীয় রাজনীতির মঞ্চে এমনই নাটকীয়ভাবে উপস্থিত করতে পেরেছিল সেই আন্দোলন, যে সেই প্রশ্নটিকে উপেক্ষা করা ছিল অসম্ভব। রাজনৈতিক সংগ্রাম পর্যুদস্ত হয়ে যাওয়ার অনেক পরেও তাই সে-প্রশ্নটি সমাজবিজ্ঞানে, ইতিহাসে, শিল্পকলায়, সাহিত্যে, নাটকে, সিনেমায় নানাভাবে প্রতিফলিত হতে থাকে। যে-দুটি পণ্ডিতি বিতণ্ডার কথা ওপরে বললাম, তাতেও যে বিভিন্ন দিক থেকে সেই প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার চেষ্টা চলেছিল তাতে কোনও সন্দেহ নেই। সেই অসম্পূর্ণ বিতর্কের পটভূমিতে 'সাবলটার্ন স্টাডিজ' আবার ওই

ক্ষমতাবিন্যাসের প্রশ্নটিকে নতুনভাবে তুলতে সক্ষম হয়।

সাবলটার্ন স্টাডিজ প্রথম খণ্ডের গোড়ায় রণজিৎ গুহ রচিত একটি ক্ষুদ্র প্রবন্ধ প্রকাশিত হয় যাকে পরবর্তীকালে অনেকে নিম্নবর্গের ইতিহাস-চর্চার 'ম্যানিফেস্টো' বলে অভিহিত করেছেন। এই প্রবন্ধের প্রথম লাইনেই বলা হয়, 'ভারতীয় জাতীয়তাবাদের ইতিহাস-রচনায় দীর্ঘদিন ধরে ঔপনিবেশিক উচ্চবর্গ আর বুর্জোয়া-জাতীয়তাবাদী উচ্চবর্গের আধিপত্য চলে আসছে।' নিম্নবর্গের ইতিহাস-চর্চার উদ্দেশ্য হল এই দুই ধরনের উচ্চবর্গীয় আধিপত্যের বিরোধিতা করা। স্মরণ করা যেতে পারে, ভারতে জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের ইতিহাস নিয়ে দুটি বিবদমান গোষ্ঠীর ঝগড়া এই সময় তুঙ্গে। এক দিকে কিছু ব্রিটিশ ও মার্কিন ঐতিহাসিক দেখাবার চেষ্টা করছিলেন, ভারতীয় জাতীয়তাবাদ আসলে মুষ্টিমেয় কিছু উচ্চবর্গের নীতিহীন আদর্শহীন ক্ষমতা দখলের কৌশল মাত্র। চিরাচরিত জাতি-ধর্ম-সাম্প্রদায়িক আনুগত্যের বন্ধনকে কাজে লাগিয়ে বৃহত্তর জনগোষ্ঠীকে সেখানে শুধুমাত্র ব্যবহার করা হয়েছিল। অন্যদিকে জাতীয়তাবাদী ঐতিহাসিকেরা এর তুমুল প্রতিবাদ করে বলছিলেন জাতীয়তাবাদী আদর্শের কথা, জাতীয়তাবাদী নেতাদের নিঃস্বার্থ আত্মত্যাগের কথা, জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে ব্যাপক জনসাধারণের অংশগ্রহণের কথা। রণজিৎ গুহ-র প্রবন্ধে ঘোষণা করা হল, এই দুটি ইতিহাস আসলে উচ্চবর্গীয় দৃষ্টিভঙ্গি-প্রসূত, কারণ দুটি ইতিহাসই ধরে নিয়েছে যে জাতীয়তাবাদ হল উচ্চবর্গের ক্রিয়াকলাপের ফসল। বিবাদ শুধু সেই ক্রিয়াকলাপের নৈতিক চরিত্র নিয়ে—তা সংকীর্ণ ব্যক্তি বা শ্রেণীস্বার্থের সাময়িক যোগফল, নাকি আদর্শ আর স্বার্থত্যাগের জাদুকাঠির স্পর্শে ব্যাপক জনসাধারণের চেতনার উন্মেষ। এই দুটি ইতিহাসের কোনওটাতেই জনগণের নিজস্ব রাজনীতির কোনও স্থান নেই।

সাম্রাজ্যবাদী আর জাতীয়তাবাদী ইতিহাসের বিরোধিতার পথ ধরেই নিম্নবর্গের ইতিহাসের প্রথম কর্মসূচি নির্দিষ্ট হল। আগেই বলেছি, দুটি বিষয় এখানে প্রধান হয়ে দেখা দিয়েছিল। এক, ঔপনিবেশিক আর দেশীয়, দু-ধরনের উচ্চবর্গের রাজনৈতিক উদ্দেশ্য আর পদ্ধতির সঙ্গে নিম্নবর্গের রাজনীতির পার্থক্য। দুই, নিম্নবর্গীয় চেতনার নিজস্বতা। প্রথম বিষয়টি অনুসরণ করতে গিয়ে 'সাবলটার্ন স্টাডিজ'-এর ঐতিহাসিকেরা দেখালেন যে শুধুমাত্র দেশীয় উচ্চবর্গের অঙ্গুলিহেলনে নিম্নবর্গের দল জাতীয়তাবাদী রাজনীতির ময়দানে নেমে পড়েছিল, সাম্রাজ্যবাদী ইতিহাসের এই অভিযোগ যেমন সত্য নয়, তেমনি জাতীয়তাবাদী নেতাদের আদর্শ আর অনুপ্রেরণার স্পর্শ পেয়ে তবে নিম্নবর্গের রাজনৈতিক চেতনা জেগে উঠল, এই দাবিও সত্য নয়। উচ্চবর্গ পরিচালিত জাতীয়তাবাদী রাজনীতির মঞ্চে নিম্নবর্গ প্রবেশ করেছিল ঠিকই। আবার বহুক্ষেত্রে নানা অনুরোধ-উপরোধ সত্ত্বেও তারা সেখানে প্রবেশ করতে আদৌ রাজি হয়নি, অথবা একবার প্রবেশ করে পরে সরে এসেছিল। কিন্তু প্রতিটি ক্ষেত্রেই তাদের রাজনৈতিক উদ্দেশ্য, পরিকল্পনা, পদ্ধতি ছিল উচ্চবর্গের তুলনায় পৃথক। অর্থাৎ জাতীয়তাবাদী রাজনীতির ক্ষেত্রেও নিম্নবর্গের জাতীয়তাবাদ ছিল উচ্চবর্গের জাতীয়তাবাদের তুলনায় ভিন্ন।

দ্বিতীয় প্রসঙ্গটি এসেছে প্রথমটির সঙ্গে যুক্ত হয়ে। নিম্নবর্গের রাজনীতির ধরনধারণ

যদি স্বতন্ত্র হয়, সেই স্বাতন্ত্র্যের সূত্র কোথায়? তা নির্ধারিত হচ্ছে কোন নিয়মে? উত্তর হল, নিম্নবর্গের রাজনীতির চরিত্র নির্ধারিত হচ্ছে নিম্নবর্গের নিজস্ব চেতনার রূপরেখা অনুসারে। সেই চেতনা গড়ে উঠেছে অধীনতার অভিজ্ঞতা থেকে। দৈনন্দিন দাসত্ব, শোষণ আর বঞ্চনার মধ্যেও নিজের অস্তিত্বটুকু বজায় রাখার সংগ্রামের ভেতর দিয়ে। সে চেতনার পরিচয় পাওয়া যাবে কোথায়? ঐতিহাসিক নথিপত্রে নিম্নবর্গের চেতনার সরাসরি সাক্ষ্য প্রায় কোথাওই পাওয়া যায় না। কারণ সেই নথি তৈরি করেছে উচ্চবর্গেরা। সাধারণ অবস্থায় নিম্নবর্গকে সেখানে কেবল প্রভুর আদেশপালন করতেই দেখা যায়। একমাত্র একটি মুহূর্তেই শাসককুলের মানসপটে নিম্নবর্গ আবির্ভূত হয় স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্বের অধিকারী হয়ে। সেই মুহূর্তটি হল বিদ্রোহের মুহূর্ত। নিম্নবর্গ যখন বিদ্রোহী, তখনই হঠাৎ শাসকবর্গের মনে হয়, দাসেরও একটা চেতনা আছে, তার নিজস্ব স্বার্থ আর উদ্দেশ্য আছে, কর্মপদ্ধতি আছে, সংগঠন আছে। উচ্চবর্গের তৈরি করা সাক্ষ্যপ্রমাণের মহাফেজখানায় যদি নিম্নবর্গের চেতনার খোঁজ করতে হয়, তবে তা সবচেয়ে স্পষ্টভাবে পাওয়া যাবে বিদ্রোহ আর বিদ্রোহদমনের ঐতিহাসিক দলিলে।

এই কারণেই প্রথম পর্বের সাবলটার্ন স্টাডিজ-এর গবেষণায় একটা বড় অংশ জুড়ে রয়েছে কৃষক বিদ্রোহের ইতিহাস। রণজিৎ গুহ-র *এলিমেন্টারি আসপেক্টস্* গ্রন্থের কথা আগেই উল্লেখ করেছি। কিন্তু এ-ছাড়াও *সাবলটার্ন স্টাডিজ* সংকলনে এবং তার বাইরে অন্যান্য জায়গায় নানা প্রবন্ধে নিম্নবর্গের ঐতিহাসিকেরা কৃষক বিদ্রোহের ইতিহাস অনুসন্ধান করে বিদ্রোহী কৃষকচেতনার পরিচয় দেবার চেষ্টা করলেন। এই চেষ্টার ফলে অল্প কিছু নতুন সূত্র আবিষ্কার হল, বিদ্রোহী কৃষক যেখানে তার নিজের কথা বলে গেছে। কিন্তু জানাই ছিল, এমন সূত্র খুব বেশি পাওয়া যাবে না। ইতিহাস-রচনার প্রকরণ হিসেবে অনেক বেশি ফলপ্রসূ হয়ে দেখা দিল কৃষকবিদ্রোহের পরিচিত নথিপত্রগুলোকেই নতুনভাবে পড়ার কৌশল। শাসকবর্গের প্রতিনিধিরা যেখানে কৃষকবিদ্রোহের রিপোর্ট দিচ্ছে রাষ্ট্রশক্তির দৃষ্টিভঙ্গি থেকে, সেই সরকারি রিপোর্টের বর্ণনাকেই বিরোধী দৃষ্টিভঙ্গি থেকে উল্টো করে পড়লে বিদ্রোহী কৃষকচেতনার পরিচয় পাওয়া যায়—নিম্নবর্গের ঐতিহাসিকেরা এর অনেক উদাহরণ এনে হাজির করলেন। তাঁরা আরও দেখালেন উচ্চবর্গের ঐতিহাসিকেরা, এমন কি প্রগতিশীল এবং শোষিত শ্রেণীর প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন ঐতিহাসিকেরাও যখন তাঁদের যুক্তিবাদী ধ্যানধারণার বশবর্তী হয়ে কৃষকচেতনায় উপস্থিত ধর্মবিশ্বাস, অলৌকিকতা, মিথ, দৈবশক্তিতে আস্থা, অলীক কল্পনা প্রকৃতিকে অযৌক্তিক মনে করে উপেক্ষা করেন বা সে-সবের যুক্তিসম্মত ব্যাখ্যা খাড়া করে একরাশ মিথ্যার ভেতর থেকে সঠিক ইতিহাসটুকু বের করে আনার চেষ্টা করেন, তখন তাঁরা কৃষকচেতনার বিশিষ্ট উপাদানগুলোকেই আসলে হারিয়ে ফেলেন। হয়তো নিজেদের অগোচরেই তাঁরা নিম্নবর্গের রাজনীতিকে উচ্চবর্গের চেতনার ছকে ফেলে বোধগম্য করার চেষ্টা করেন। নিম্নবর্গের নিজস্ব ইতিহাস, অথবা অন্যভাবে বললে, ইতিহাসে নিম্নবর্গের কীর্তির স্বাক্ষর কিন্তু সেখানে হারিয়ে যায়।[২৩]

৪

'সাবলটার্ন স্টাডিজ' নিয়ে গোড়ার দিকে সমালোচনাতে দুধরনের আপত্তি উঠেছিল। একটি আপত্তির লক্ষ ছিল উচ্চবর্গ আর নিম্নবর্গের রাজনৈতিক ক্ষেত্রের পৃথকীকরণ। দুটি ক্ষেত্র কি সত্যিই ততটা পৃথক? অথবা, কোনও এক প্রাক-জাতীয়তাবাদী বা প্রাক-ধনতান্ত্রিক ঐতিহাসিক অবস্থায় তা পৃথক হয়ে থাকলেও, জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের গণতান্ত্রিক প্রভাবে দুটি ক্ষেত্র কি ক্রমশ একে অপরের সঙ্গে মিলেমিশে যায়নি? বিশ্লেষণের লক্ষ্য হিসেবে উচ্চবর্গের আর নিম্নবর্গের রাজনীতির পার্থক্যের ওপর অতটা জোর দেওয়ার তাৎপর্য কী? তাতে কি নানা ধরনের বিভেদকামী, বিচ্ছিন্নতাবাদী রাজনীতিকেই পরোক্ষে সমর্থন জানানো হচ্ছে না?

দ্বিতীয় আপত্তি নিম্নবর্গীয় চেতনা নিয়ে। প্রগতিশীল ইতিহাস চিন্তার প্রথম উপপাদ্য হল, মানবচেতনার বিকাশ, চেতনার অনুন্নত বা আদিম অবস্থা থেকে ক্রমান্বয়ে উন্নত চেতনার দিকে অগ্রসর হওয়া। এই প্রগতির তত্ত্ব যেমন একটা গোটা সমাজ বা সভ্যতার বেলায় খাটে, তেমনি সমাজের আভ্যন্তরীণ বিভাজনের ক্ষেত্রেও খাটে। অর্থাৎ শ্রেণীবিভক্ত সমাজে আর্থিক-রাজনৈতিক-সাংস্কৃতিক দিক দিয়ে ক্ষমতাভোগী শ্রেণীর চেতনার স্তরও অপেক্ষাকৃত উন্নত হয়। সামাজিক আদানপ্রদানের ক্ষেত্রে সেই শ্রেণী বা তার কোনও অংশ যদি অগ্রগামী ভূমিকা নেয়, তাহলে তার চেষ্টায় অন্যান্য শ্রেণীর চেতনার মানও ক্রমশ উন্নত হয়ে উঠতে পারে। নিম্নবর্গের চেতনার স্বাতন্ত্র্যের কথা তুলে নিম্নবর্গের ঐতিহাসিকেরা কি চৈতন্যের স্তরভেদ, তার ঐতিহাসিক ক্রমবিকাশ, এবং সামাজিক প্রগতির ক্ষেত্রে উন্নত চেতনার অধিকারী অগ্রগামী শ্রেণীর ভূমিকাকে অস্বীকার করছেন? তাঁরা কি উচ্চবর্গ-নিম্নবর্গের চেতনার বিচারে উন্নত/পশ্চাৎপদ, এই তুলনাটাই মানতে চাইছেন না? তাঁরা কি বলছেন, ওই দুটি চেতনা ভিন্ন, স্বতন্ত্র নিয়ম অনুযায়ী গঠিত, অতএব তাদের মধ্যে তুলনার কোনও সাধারণ মাপকাঠি নেই?

জাতীয়তাবাদী এবং মার্কসবাদী, দুটি দৃষ্টিভঙ্গি থেকেই এই প্রশ্নগুলি তোলা হয়েছিল। এবং দুটি দৃষ্টিভঙ্গি থেকেই প্রশ্নগুলি অত্যন্ত ন্যায্য-প্রশ্ন ছিল। জাতীয়তাবাদী অবস্থান থেকে নিম্নবর্গের ইতিহাস লেখার প্রস্তাবকে ঐক্যবদ্ধ জাতি-রাষ্ট্রের জীবনবৃত্তান্তের পরিপন্থী বলে মনে হওয়াই স্বাভাবিক। আর প্রগতিবাদী-বামপন্থী অবস্থান থেকেও নিম্নবর্গের চৈতন্যের নিজস্ব গড়ন আর তার স্বতন্ত্র রাজনৈতিক উদ্যমের ওপর জোর দেওয়ার মানে অগ্রগামী বুর্জোয়া-বুদ্ধিজীবী গোষ্ঠী এবং বৈপ্লবিক পার্টি সংগঠনের প্রগতিশীল ভূমিকা একরকম অস্বীকার করা। দুটি ক্ষেত্রেই নিম্নবর্গের ঐতিহাসিকের উত্তর ছিল, নিম্নবর্গের অবস্থান থেকে দেখলে জাতীয়তাবাদী আর প্রগতিবাদী-বামপন্থী ইতিহাসের কর্মসূচীর ভেতরে যে নিম্নবর্গের কোনও স্বতন্ত্র ঐতিহাসিক ভূমিকা থাকছে না, এটা প্রমাণ করাই নিম্নবর্গের ইতিহাসের উদ্দেশ্য। নিম্নবর্গের ঐতিহাসিকের কাজ হল প্রতিষ্ঠিত ইতিহাস-রচনার সমালোচনা করা। নিম্নবর্গের ইতিহাস তাই সবসময়ই বিরোধী ইতিহাস। বিকল্প ইতিহাসরচনা-পদ্ধতির কোনও পরিপূর্ণ কর্মসূচী নিম্নবর্গের ঐতিহাসিক দিতে পারেন না। *সাবলটার্ন স্টাডিজ*-এর তৃতীয় খণ্ডের ভূমিকা লিখতে গিয়ে রণজিৎ

গুহ তাই লিখলেন, 'একজন সমালোচক আমাদের তিরস্কার করে বলেছেন, আমরা নাকি সব প্রতিষ্ঠিত ইতিহাস রচনা-পদ্ধতিরই বিরোধী। এ অভিযোগ সত্যি। নিম্নবর্গ যে তার নিজের ভাগ্যনিয়ন্তা হতে পারে, এ-কথা স্বীকার করে না বলে ইতিহাস আর সমাজবিজ্ঞান চর্চার অধিকাংশ রীতি-নীতি-পদ্ধতিরই আমরা বিরোধিতা করি। এই বিরোধিতাই আমাদের প্রকল্পের চালিকাশক্তি।'

বিরোধী বা ক্রিটিকাল ইতিহাসরচনা। প্রতিষ্ঠিত ইতিহাসরচনার পদ্ধতি আছে, থাকবে। উচ্চবর্গের আধিপত্যও আছে, থাকবে। অন্তত ইতিহাস লিখে সে-আধিপত্যের অবসান ঘটানো যাবে না। নিম্নবর্গের ঐতিহাসিক তাহলে কী করতে পারেন? তিনি বিরোধী ইতিহাস লিখতে পারেন, যেখানে উচ্চবর্গের আধিপত্য অস্বীকার করে নিম্নবর্গ তার নিজের ঐতিহাসিক উদ্যমের কথা বলতে পারে। নিজের ক্রিয়াকলাপের কর্তা হিসেবে নিজেকে উপস্থিত করতে পারে। সে ইতিহাস কখনওই পূর্ণাঙ্গ জাতীয় ইতিহাসের সামগ্রিকতা অর্জন করতে পারবে না। নিম্নবর্গ কখনওই গোটা সমাজের হয়ে কথা বলতে পারবে না। নিম্নবর্গের ইতিহাস তাই অনিবার্যভাবে আংশিক, অসংলগ্ন, অসম্পূর্ণ।

বলা বাহুল্য, এইরকম খণ্ডিত, প্রায়শই অসংলগ্ন, ইতিহাসরচনার পদ্ধতি ক্রমান্বয়ে অনুসরণ করে যাওয়া সহজ নয়। পেশাদার গবেষণার জগতে, বিশ্ববিদ্যালয়ের পঠনপাঠনের জগতে, রাজনৈতিক বাদানুবাদের জগতে নতুন লেখকগোষ্ঠীর কাছে স্বভাবতই একটা প্রত্যাশা থাকে যে তাদের মৌলিক গবেষণার কাজ প্রচলিত ভাবনাচিন্তাকে একটা নতুন দিকে ঘুরিয়ে নিয়ে যাবে। যে সব সমস্যার সমাধান প্রচলিত বাকবিতণ্ডার ভেতর খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না, তার একটা নতুন সমাধানের ইঙ্গিত দেবে। তারা যদি প্রতিষ্ঠিত মতবাদের বিরোধিতা করে, তবে বিকল্প কোনও মতবাদকে এখনই উপস্থিত করতে না পারলেও, তেমন এক সামগ্রিক বিকল্প নির্মাণ করার প্রচেষ্টাটুকু অন্তত তারা সমর্থন করবে, এমন আশা করা নিশ্চয় অস্বাভাবিক নয়। কিন্তু 'সাবলটার্ন স্টাডিজ' এই প্রত্যাশা পূরণ করতে রাজি হয়নি।

বিষয়টা নিয়ে অনেক জল ঘোলা হয়েছে, তাই খানিকটা বিশদ আলোচনা করলে হয়তো সুবিধা হয়।

সাবলটার্ন স্টাডিজ-এর প্রথম পর্বের কাজে এমন একটা বিকল্প মতবাদের ইঙ্গিত অনেকে দেখেছিলেন। আগেই বলেছি, *সাবলটার্ন স্টাডিজ*-এর গবেষণা প্রধানত কৃষক বিদ্রোহের ইতিহাসকে কেন্দ্র করে শুরু হয়। রাজনৈতিক চেতনাহীন নিষ্ক্রিয় কৃষকের ধারণার বিরোধিতা করে *সাবলটার্ন স্টাডিজ*-এর ঐতিহাসিকেরা দেখাবার চেষ্টা করেন যে বিদ্রোহী কৃষক আসলে এক স্বকীয়, সৃজনশীল এবং বিশিষ্ট চৈতন্যের অধিকারী। বলা বাহুল্য, ঔপনিবেশিক এবং জাতীয়তাবাদী ইতিহাসের উচ্চবর্গীয় পক্ষপাতিত্বের বিরোধিতায় এই পদ্ধতি খুব উপযোগী ছিল। কিন্তু উলটো এক বিপদের সম্ভাবনাও তাতে নিহিত ছিল। তা হল কৃষকসমাজ নিয়ে এক ধরনের রোমান্টিকতা, যা রাশিয়ার নারদনিক দলগুলি থেকে শুরু করে এ-দেশের সাম্প্রতিক ইতিহাসে কৃষক বিপ্লবের বিভিন্ন প্রচেষ্টায় বহুবার দেখা গিয়েছে। অস্বীকার করে লাভ নেই, ১৯৬০-এর আর ১৯৭০-এর দশক

দুটির রাজনৈতিক বাদানুবাদ এবং নকশালবাড়ি অভ্যুত্থানের আপাত বিপর্যয়ের পটভূমিতে 'সাবলটার্ন স্টাডিজ'-এ কৃষকবিদ্রোহের ইতিহাসচর্চা প্রায় অনিবার্যভাবেই এক ধরনের নকশালি রাজনীতির রোমান্টিক রোমন্থন হিসেবে চিহ্নিত হয়ে গিয়েছিল। এও সত্যি যে প্রতিষ্ঠিত জাতীয়তাবাদী ইতিহাসরচনাকে সমালোচনা করতে গিয়ে *সাবলটার্ন স্টাডিজ*-এর একাধিক লেখক প্রচ্ছন্নভাবে হলেও এ ধরনেরই কোনও বিকল্প রাজনৈতিক অবস্থানকে অবলম্বন করেছিলেন। আর এক সম্ভাবনাও গোড়ার দিকের *সাবলটার্ন স্টাডিজ*-এর লেখায় অনেকে খুঁজে পেয়েছিলেন। তা হল এক ধরনের রোমান্টিক স্বদেশিয়ানা—বিদেশ থেকে আমদানি করা যন্ত্রসভ্যতা আর আধুনিক রাষ্ট্রব্যবস্থার বিধ্বংসী ইতিহাসের হাত থেকে যা আমাদের নিষ্কৃতি দিতে পারে, যার নিরাপদ ছায়ায় বসে মনে হয় দেশজ কৃষকসমাজের জ্ঞানভাণ্ডার এবং ব্যবহারিক জীবনের ঐতিহ্যই আমাদের প্রকৃত আদর্শ সমাজ গঠনের পথ বাতলে দিতে পারে। *সাবলটার্ন স্টাডিজ*-এর কোনও লেখায় ঠিক এইরকম ইঙ্গিত কখনও করা হয়েছিল বলে আমার জানা নেই, কিন্তু পরবর্তী সময়ে একাধিক সমালোচক *সাবলটার্ন স্টাডিজ*-এর মধ্যে এই জঙ্গি স্বদেশিয়ানার গন্ধ পেয়েছেন। তার কারণ তাঁদের ঘ্রাণশক্তির অসাধারণ প্রখরতা না কি ওরকম একটা তকমা এঁটে দিতে পারলে গালাগাল করতে সুবিধে হয়, এর উত্তর নিশ্চিতভাবে জানি না।

আসলে প্রতিষ্ঠিত ইতিহাসচর্চার মহলে যে-ভূমিকায় *সাবলটার্ন স্টাডিজ* সবচেয়ে গ্রহণযোগ্য ছিল, সেটা হয় এক ধরনের র‍্যাডিক্যাল সামাজিক ইতিহাস কিংবা 'হিসট্রি ফ্রম বিলো'—তল থেকে দেখা ইতিহাস। সত্তর-আশির দশকে ইউরোপে এই ধরনের ইতিহাস লেখার খুব চল হয়েছিল। ক্রিস্টোফার হিল, এডোয়ার্ড টমসন, এরিক হব্‌সবম প্রভৃতি ইংরেজ মার্কসবাদী ঐতিহাসিকদের ধারা অনুসরণ করে অনেকেই তখন ইউরোপের পুঁজিবাদ আর যন্ত্রসভ্যতার অগ্রগতির ঢক্কানিনাদে চাপা পড়ে যাওয়া বিস্মৃত, অবহেলিত জনগোষ্ঠী ও তাদের ভিন্নতর জীবনযাত্রার কথা লিখছিলেন। এই 'তল থেকে দেখা ইতিহাস' প্রধানত ইতিহাস রচনায় বাদ পড়ে যাওয়া অনেক ঘটনা, মতাদর্শ, স্মৃতি খুঁজে বের করে আনতে সক্ষম হয়েছিল। বিশেষ করে যে সব ঘটনা বা আন্দোলন ছিল নিতান্তই আঞ্চলিক এবং ক্ষণস্থায়ী, সেই সব ঘটনার পৃথক পৃথক কাহিনী এবং বিশিষ্ট তাৎপর্যকে চিহ্নিত করে বৃহত্তর ঐতিহাসিক প্রক্রিয়ার মূলধারার বর্ণনাটিকে অনেক বেশি জটিল ও বর্ণাঢ্য করে তুলেছিল এই নতুন সামাজিক ইতিহাস। ইতিহাসচর্চার আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে এই ধারাটি তখন প্রচলিত ছিল বলে 'সাবলটার্ন স্টাডিজ'-এর লেখাগুলিতে তার প্রতিফলন দেখতে পাওয়াটা কিছু অস্বাভাবিক ছিল না। 'সাবলটার্ন স্টাডিজ'-এর লেখকেরাও যে ইউরোপের র‍্যাডিক্যাল সামাজিক ইতিহাসের কাজ থেকে অনেক কিছু শিখেছিলেন, তাতেও কোনও সন্দেহ নেই।

কিন্তু এক জায়গায় গুরুত্বপূর্ণ তফাত ছিল। পশ্চিমী দুনিয়ায় আধুনিক ধনতান্ত্রিক সমাজ প্রতিষ্ঠার ইতিহাসের বিশাল ইমারতের তল থেকে খুঁজে খুঁজে এইসব বিস্মৃত কাহিনী বের করে আনার ফলে সেই ইমারত কী করে তৈরি হল, তার বর্ণনাটি আরও বিশদ ও পরিপূর্ণ হল সন্দেহ নেই। কিন্তু সেই ইমারতের অস্তিত্ব, স্থায়িত্ব এবং

ঐতিহাসিক ন্যায্যতা সম্বন্ধে কোনও মৌলিক প্রশ্ন সেখানে ওঠার সম্ভাবনা ছিল না। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই 'তল থেকে দেখা' ইতিহাসের কাহিনী বাঁধা হত ট্র্যাজেডির সুরে। শোষিত অবহেলিত মানুষের বঞ্চনা আর নিপীড়নের গল্প সেখানে মর্মান্তিক, তাদের প্রতিরোধ হয়তো-বা সহনীয়, কিন্তু গল্পের শেষে তাদের পরাজয় অনিবার্য। এ-সব গল্পের প্রভাবে ইতিহাসের মূল গতিপথ এক চুলও এদিক-ওদিক নড়ার সম্ভাবনা ছিল না।

ভারতবর্ষের মতো দেশের ক্ষেত্রে 'তল থেকে দেখা' ইতিহাসকে কিন্তু এরকম কোনও ছকের ভেতরে বেঁধে রাখা কঠিন ছিল। ভারতে পুঁজিবাদী আধুনিকতার বিবর্তনের ইতিহাস লিখতে গিয়ে গল্পের শেষটা অত নিশ্চিতভাবে বলে দেওয়া যায়নি। বিশ্বের অন্যত্র যা ঘটেছে, ভারতে তারই পুনরাবৃত্তি ঘটবে, এই ফর্মূলাটা যদি মাথায় চেপে বসে না থাকে, তাহলে 'তল থেকে দেখা' ভারতীয় ইতিহাসের লেখক সহজেই দেখতে পাচ্ছিলেন যে তাঁর গবেষণার উপাদান থেকে বৃহত্তর ঐতিহাসিক প্রক্রিয়ার গতিপ্রকৃতি সম্বন্ধে অনেক মৌলিক প্রশ্ন তোলার সুযোগ খোলা রয়েছে। আগেই বলেছি, লিবেরাল জাতীয়তাবাদ এবং মার্কসবাদ, দুধরনের ইতিহাসরচনার প্রতিষ্ঠিত ছক সম্বন্ধেই 'সাবলটার্ন স্টাডিজ'-এর লেখকদের মনে সংশয় ছিল। র‍্যাডিকাল সামাজিক ইতিহাসের চর্চায় নেমে তাঁরা তাঁদের বর্ণনাকে কোনও নির্দিষ্ট ছকের মধ্যে বেঁধে রাখতে চাইলেন না। ভারতবর্ষের ইতিহাসের পরিণতি আধুনিক সমাজের কোনও নির্দিষ্ট ও পরিচিত ধারণার বাস্তবায়ন, এই কাহিনীসূত্রটি তাঁরা বারে বারেই অস্বীকার করতে লাগলেন তাঁদের লেখায়। তাই 'তল থেকে দেখা' ইতিহাস হিসেবেও 'সাবলটার্ন স্টাডিজ'-এর লেখা বেশ অস্বস্তির কারণ হয়ে রইল ইতিহাসচর্চার মহলে।

৫

সাবলটার্ন স্টাডিজ-এর প্রথম পর্বের কাজের সবচেয়ে মৌলিক সমালোচনা প্রকাশিত হয়েছিল গায়ত্রী চক্রবর্তী স্পিভ্যাক-এর দুটি প্রবন্ধে।[৪] ঔপনিবেশিক ভারতে কৃষক বিদ্রোহ নিয়ে 'সাবলটার্ন স্টাডিজ'-এর গবেষণার দুটি বৈশিষ্ট্যের দিকে তিনি দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন। প্রথম বৈশিষ্ট্য হল যে, ঔপনিবেশিক শাসনযন্ত্রের যা পরিধি, নিম্নবর্গের রাজনীতি তার বাইরেও বটে, আবার ভেতরেও বটে। যে অর্থে তা বাইরে, সেই অর্থে নিম্নবর্গের রাজনীতি ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রব্যবস্থা অথবা ভাবাদর্শের তুলনায় স্বতন্ত্র। কিন্তু তা আবার ভেতরেও বটে, কারণ বহু ক্ষেত্রেই দেখা যাচ্ছে নিম্নবর্গের রাজনীতি ঔপনিবেশিক ব্যবস্থার সঙ্গে নিজেকে খাপ খাইয়ে নিচ্ছে, তাকে সুবিধেমতো ব্যবহার করছে, হয়তো বা একরকমভাবে আত্মস্থ করছে। এই গবেষণার দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য হল, একদিকে নিম্নবর্গীয় সত্তা বা চৈতন্যের একটা বিশুদ্ধ আকৃতির ধারণা, অন্যদিকে ঐতিহাসিক মালমশলায় বারেবারেই এটা আবিষ্কার করা যে নিম্নবর্গের উপস্থিতি ঘটছে বিভিন্ন আকারে, বিভিন্ন চেহারায়। এমন কি নিজের ভেতরেই বিভাজিত অবস্থায়। গায়ত্রী স্পিভ্যাক প্রশ্ন তুললেন, ইতিহাস রচনার প্রতিটি উপাদানই যখন দেখিয়ে দিচ্ছে যে নিম্নবর্গ মানেই 'কোনও এক আদর্শ থেকে বিচ্যুতি', তখন নিম্নবর্গের ঐতিহাসিককে অত ঘটা করে বিশুদ্ধ কৃষকচৈতন্য অথবা একান্তভাবে স্বতন্ত্র নিম্নবর্গের রাজনীতির স্লোগান আওড়াতে

হচ্ছে কেন? বুর্জোয়া ইতিহাস রচনায় 'মানব' অথবা 'নাগরিক' নামে যে সার্বভৌম কর্তাটি অধিষ্ঠিত হয়েছিল, নিম্নবর্গের ঐতিহাসিক তো দেখিয়েছেন যে সেই কর্তাটির আসল পরিচয় হল সে উচ্চবর্গ। এখন আবার সেই জায়গায় 'নিম্নবর্গ'-কে আর-একটি সার্বভৌম কর্তার পোশাক পরিয়ে ইতিহাসের নায়ক হিসেবে উপস্থিত করার প্রয়োজন কী? আসলে ইতিহাসের কোনও একটি কর্তা আছে, এবং তার একটি বিশুদ্ধ পূর্ণাবয়ব চৈতন্য আছে, এই ধারণাটাকেই তো নিম্নবর্গের ঐতিহাসিক তাঁর গবেষণার মাধ্যমে চ্যালেঞ্জ করেছেন। সেই ধারণাকেই আবার তাঁরা ফেরত আনার চেষ্টা করছেন কেন? ঐতিহাসিকের লেখার ভেতর দিয়ে নিম্নবর্গ তার নিজের কথা বলবে, এটা তো নিতান্তই গল্পকথা। খুব বেশি হলে সেটা ঐতিহাসিকের রাজনৈতিক সদিচ্ছার প্রকাশ। আসলে তো ঐতিহাসিক নিম্নবর্গের প্রতিনিধিত্ব করছেন মাত্র। নিম্নবর্গকে ইতিহাসের পাতায় উপস্থিত করছেন। নিম্নবর্গ তার নিজের কথা কখনওই বলতে পারে না।

১৯৮৫ সালে লেখা প্রবন্ধ দুটিতে গায়ত্রী স্পিভ্যাক প্রস্তাব দিয়েছিলেন, 'সবার ওপরে নিম্নবর্গ সত্য', এরকম মন্ত্র না আউড়ে নিম্নবর্গের ঐতিহাসিকের চেষ্টা করা উচিত উচ্চবর্গের অপর হিসেবে নিম্নবর্গকে কীভাবে নির্মাণ করা হয়, সেই প্রক্রিয়াগুলোকে আরও গভীরভাবে অনুসন্ধান করা। হাজার আওয়াজের ভেতর থেকে নিম্নবর্গের নিজস্ব কণ্ঠস্বর আলাদা করে বের করে আনার চেষ্টা পণ্ডশ্রম মাত্র। ইতিহাসের দলিলে যে-কণ্ঠস্বরই শুনি না কেন, তা নিম্নবর্গের কথা নয়, অন্যের নিমার্ণ। এই নির্মাণের সামাজিক পদ্ধতিগুলি কী, কোন কোন প্রতিষ্ঠানের ভেতর দিয়ে তা তৈরি হয়, কোন প্রতিষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে তা ব্যাপক সামাজিক স্বীকৃতি পায়, সে-সব প্রক্রিয়াগুলো আবিষ্কার করাই নিম্নবর্গের ঐতিহাসিকের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ। তাঁদের কাছে সেটাই সবচেয়ে বাস্তব প্রত্যাশা।

মোটামুটিভাবে পঞ্চম-ষষ্ঠ খণ্ড থেকে *সাবলটার্ন স্টাডিজ*-এ প্রকাশিত গবেষণায় নতুন ঝোঁক দেখা দিতে শুরু করে। আগের সঙ্গে পরের পর্বের প্রধান তফাত এইখানে যে ঐতিহাসিক গবেষণা থেকে নিম্নবর্গের সত্তা বা চৈতন্যের একটা বিশুদ্ধ পরিপূর্ণ চেহারার বর্ণনা দেওয়া সম্ভব, এই অতি সরল ধারণাটি এখন পরিত্যক্ত হল। নিম্নবর্গের ইতিহাস আংশিক, অসংলগ্ন, অসম্পূর্ণ, তার চেতনাও বহুধাবিভক্ত, ক্ষমতাশীল আর ক্ষমতাহীন নানা শ্রেণীচৈতন্যের বিভিন্ন উপাদানের তা সংমিশ্রণ—এই সিদ্ধান্তগুলিকেও এখন অনেক গুরুত্বের সঙ্গে স্বীকার করা হল। ফলে বিদ্রোহের মুহূর্তে কৃষকচৈতন্যের স্বকীয়তার পাশাপাশি দৈনন্দিন অধীনতার জীবনযাপনে কৃষকচৈতন্যের স্বরূপ সন্ধান জরুরি হয়ে পড়ল। এবং এই প্রশ্নগুলো এসে পড়তে দেখা গেল, প্রচলিত সমাজবিজ্ঞান ইতিহাসচর্চার প্রায় প্রতিটি বিষয় নিয়েই 'সাবলটার্ন স্টাডিজ'-এর দৃষ্টিভঙ্গি থেকে একটা নতুন অনুসন্ধানের পথ খুলে যাচ্ছে। কারণ প্রশ্নটা এখন আর এই রইল না যে 'নিম্নবর্গের প্রকৃত স্বরূপ কী?' প্রশ্নটা হয়ে গেল 'নিম্নবর্গকে রিপ্রেসেন্ট করা হয় কীভাবে?' 'রিপ্রেসেন্ট' কথাটা এখানে প্রদর্শন করা আর প্রতিনিধিত্ব করা, উভয় অর্থেই প্রযোজ্য। উচ্চবর্গের অপর হিসেবে নিম্নবর্গের ধারণার নির্মাণ—এই বিষয়টি 'সাবলটার্ন স্টাডিজ'-এর গোড়া থেকে চর্চিত হয়েছিল ঠিকই। কিন্তু তখন অনুমানটি এমন ছিল যে

সঠিকভাবে বিশ্লেষণ করতে পারলে উচ্চবর্গের নির্মাণের খোলশটা খসে পড়বে, প্রকৃত নিম্নবর্গের স্বরূপ চোখের সামনে ভেসে উঠবে। এই অনুমানটি যে ভুল, রিপ্রেসেন্টেশন-এর গণ্ডি অতিক্রম করে কোনও এক প্রত্যক্ষ বাস্তবের উপলব্ধিতে পৌঁছনো যে অসম্ভব, এটা একবার স্বীকার করে নেওয়ার পর খাঁটি আগমার্কা নিম্নবর্গের ইতিহাস লেখার সদিচ্ছাটুকুও আর পোষণ করা সম্ভব ছিল না। নিম্নবর্গের ঐতিহাসিকের চোখের সামনে রোমান্টিকতার মোহজাল থেকে থাকলে তা এবার নিশ্চিতভাবে খসে পড়ল।

রিপ্রেসেন্টেশন-এর প্রক্রিয়াগুলোই যেহেতু এখন বিশ্লেষণের লক্ষ্য, তাই গবেষণার পদ্ধতিও অনেকাংশে বদলে গেল। একদিকে ঝোঁক গিয়ে পড়ল টেক্সট্ বা পাঠ্যবস্তুর খুঁটিনাটি বিশ্লেষণে। ক্ষমতাশীল উচ্চবর্গের দ্বারা নিম্নবর্গের নির্মাণ—এর নিদর্শন আমরা পাই ইতিহাসের দলিলে। হাজার হাজার দলিল, সেই দলিলের ওপর ভিত্তি করে ঐতিহাসিকের বর্ণনা, তার পাশাপাশি অন্য নানাবিধ জ্ঞানচর্চা, ধর্মচর্চা, সমাজবিধি, এ-সবের সংমিশ্রণে তৈরি হয় এক-একটি প্রভাবশালী ডিসকোর্স যার মাধ্যমে ক্ষমতাশীল শ্রেণীর মতাদর্শ সামাজিক আধিপত্য বিস্তার করে। এইসব ডিসকোর্সের ভেতর দিয়ে বিভিন্ন সময়ে নিম্নবর্গকে চিহ্নিত করা হয়েছে বিভিন্নভাবে। 'নিম্নবর্গের নির্মাণ' এই প্রশ্নটিকে সামনে রাখার ফলে এবার ঔপনিবেশিক ভারতে আধুনিক জ্ঞানবিজ্ঞান চর্চা এবং আধুনিক সমাজ-প্রতিষ্ঠান গড়ার জটিল ইতিহাসের দলিল সম্পূর্ণ অন্য দৃষ্টিকোণ থেকে পড়ার প্রয়োজন দেখা দিল। ফলে ঔপনিবেশিক শাসনযন্ত্রের প্রসার, ইংরেজি শিক্ষা, তথাকথিত নবজাগরণ, জাতীয়তাবাদের উন্মেষ—এইসব বহুচর্চিত বিষয় নিয়েও *সাবলটার্ন স্টাডিজ*-এ নতুন করে আলোচনা শুরু হল।[৫] সেই সঙ্গে নজর গিয়ে পড়ল আধুনিক রাষ্ট্র ও সমাজব্যবস্থার বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের ওপর, যার মাধ্যমে নতুন জ্ঞানবিজ্ঞান-সঞ্চারিত মতাদর্শ এবং আধুনিক ক্ষমতাতন্ত্র ঔপনিবেশিক এবং পরবর্তীকালে স্বাধীন ভারতবর্ষে তার জাল বিস্তার করেছে। অর্থাৎ, স্কুল-কলেজ, সংবাদপত্র, প্রকাশনসংস্থা, হাসপাতাল-ডাক্তার-চিকিৎসাব্যবস্থা, জনসংখ্যাগণনা, রেজিস্ট্রেশন, লাইসেন্স, আধুনিক শিল্পউৎপাদনে দৈনন্দিন শ্রমসংগঠন, বিজ্ঞান-সংস্থা, গবেষণাগার—এইসব প্রতিষ্ঠানের বিশদ ইতিহাসও এবার 'সাবলটার্ন স্টাডিজ'-এর বিষয় হয়ে পড়ল।[৬]

এই দিক পরিবর্তনে সব পাঠক সন্তুষ্ট হননি। নিম্নবর্গকে নায়ক হিসেবে দাঁড় করিয়ে এক ধরনের সাদাসাপটা ঐতিহাসিক রোমান্সের বদলে পাঠকের সামনে এবার এসে পড়ল সরকারি দলিল, ইতিহাসের পাঠ্যপুস্তক, জাতীয়তাবাদী নেতার বক্তৃতা, সমাজবিজ্ঞানের প্রবন্ধের খুঁটিনাটি চুলচেরা বিশ্লেষণ। অনেকেই বললেন, নিম্নবর্গের ইতিহাস এবার ভদ্রলোকের ইতিহাস হয়ে যাচ্ছে। আলোচনার লক্ষ্যবস্তু নিম্নবর্গের ক্রিয়াকলাপ থেকে ছড়িয়ে সমাজ-রাষ্ট্রের অন্য সব এলাকাতে পৌঁছে যাওয়ায় একটা অসুবিধা অবশ্য হচ্ছিল। সমাজবিজ্ঞান চর্চার জগতে প্রথম আলোড়নটা কেটে যাওয়ার পর 'সাবলটার্ন স্টাডিজ'-এর জন্য একটা প্রাতিষ্ঠানিক জায়গা যেন নির্দিষ্ট হয়ে গিয়েছিল। অনেক বিশ্ববিদ্যালয়ে আধুনিক ভারতবর্ষের ইতিহাস পড়াতে গিয়ে ঔপনিবেশিক,

জাতীয়তাবাদী, মার্কসবাদী ইতিহাস রচনার পাশাপাশি 'সাবলটার্ন স্কুল' নিয়ে খানিকটা পড়িয়ে দেওয়া শুরু হয়েছিল। এখন দেখা গেল, 'সাবলটার্ন স্টাডিজ'-এর কোনও নির্দিষ্ট বিষয়গত সীমারেখা থাকছে না, সব বিষয় নিয়েই সেখানে লেখাজোকা শুরু হয়ে গিয়েছে। আপত্তিটা অনেকটা এরকম হয়ে দাঁড়াল—'বেশ তো তোমরা চাষাভুষো কুলিকামিন নিয়ে লিখছিলে। এখন হঠাৎ বঙ্কিম-গান্ধী-জওহরলাল বিজ্ঞান-শিল্প-সাহিত্য নিয়ে লিখতে শুরু করলে কেন?' এই আপত্তি এখনো শুনতে পাই।

আসলে 'নিম্নবর্গের নির্মাণ', এই পদ্ধতিগত আবিষ্কারটির পর নিম্নবর্গের ঐতিহাসিকের কাজ আর কেবল নিম্নবর্গের স্বতন্ত্র ক্রিয়াকলাপের বিবরণ দেওয়াতেই সীমাবদ্ধ থাকেনি। সমগ্র সমাজ-প্রতিষ্ঠান-ভাবাদর্শের জগতকেই এখন নিম্নবর্গের ইতিহাসের দৃষ্টিতে দেখা সম্ভব হয়েছে। কিন্তু আবিষ্কারটি একান্তই পদ্ধতিগত। যে-কোনও প্রতিষ্ঠিত সামাজিক বা রাজনৈতিক কর্মসূচী এবং ক্রিয়াকলাপ যা প্রতিষ্ঠিত ক্ষমতাতন্ত্রের অঙ্গ বা তার সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত, তার বিশ্লেষণ এবং সমালোচনা করার সরঞ্জাম এই পদ্ধতি থেকে পাওয়া যাচ্ছে। কিন্তু কোনও বিকল্প রাষ্ট্রক্ষমতা নির্মাণের কর্মসূচি তা থেকে পাওয়া যাবে না। বরং যে কোনও প্রতিষ্ঠিত অথবা প্রতিষ্ঠার অভিলাষী ক্ষমতাতন্ত্রের সমালোচনাই 'সাবলটার্ন স্টাডিজ'-এর ভেতর সম্ভব।

তার মানে কিন্তু এই নয় যে 'সাবলটার্ন স্টাডিজ'-এর লেখক বা পাঠক হিসেবে সমসাময়িক রাজনৈতিক বাদানুবাদে যোগ দেওয়ার পথ বন্ধ হয়ে গিয়েছে। সত্যি কথা বলতে কি, উচ্চবর্গের রাজনীতি বা মতাদর্শের ভেতর নিম্নবর্গের প্রতিকল্পটি কীভাবে নির্মিত হয়েছে, সেই বিষয়টি এখন অনেক স্পষ্টভাবে নজরে আসার ফলে উচ্চবর্গীয় রাজনীতির বিবাদে ভিন্নতর অবস্থান নেওয়াও অনেক ক্ষেত্রে সম্ভব হয়েছে। সাম্প্রতিক পর্যায়ের 'সাবলটার্ন স্টাডিজ'-এর আলোচনায় অন্তত তিনটি সামাজিক-রাজনৈতিক বিষয় নিয়ে উল্লেখযোগ্য আলোচনা হয়েছে বলে আমি মনে করি। তিনটি ক্ষেত্রেই প্রতিষ্ঠিত জাতীয়তাবাদী ও বামপন্থী রাজনৈতিক গোষ্ঠীদের পারস্পরিক বিতর্কে নিম্নবর্গীয় রাজনীতির দৃষ্টিকোণ থেকে নতুন মাত্রা যোগ করা গিয়েছে।[৭]

প্রথম বিষয়টি হল সাম্প্রদায়িকতা। এই নিয়ে অধিকাংশ আলোচনাই দুটি বিবদমান গোষ্ঠীর মধ্যে হয়েছে—একটি হিন্দুত্ববাদী, অন্যটি সেকুলারপন্থী। 'সাবলটার্ন স্টাডিজ'-এর আলোচনা থেকে যে-দিকটা অনেক স্পষ্ট হয়েছে, সেটা হল যে এই সেকুলার কমিউনাল ঝগড়া কোনও অর্থেই আধুনিকতা বনাম পশ্চাৎপদতার ঝগড়া নয়। দুটিই সমানভাবে আধুনিক রাষ্ট্রব্যবস্থার অঙ্গীভূত। দ্বিতীয়ত, দুই পক্ষ আসলে আধুনিক রাষ্ট্রক্ষমতা বিস্তারের দুধরনের কৌশল অবলম্বন করার চেষ্টা করে চলেছে। দুটিই উচ্চবর্গীয়, কিন্তু তাতে নিম্নবর্গের নির্মাণ দুরকমের। তৃতীয়ত, নিম্নবর্গেরাও এই দুধরনের আধিপত্যের সামনে পড়ে নিজেদের মতো, কিন্তু বিভিন্নভাবে, তার মোকাবিলা করার চেষ্টা করছে। দরিদ্র এবং শোষিত হলেই তারা সাম্প্রদায়িক শক্তির বিরোধী এবং সেকুলার রাজনীতির সমর্থক হবে, এই অতিসরল সিদ্ধান্ত নিম্নবর্গের ঐতিহাসিক প্রথমেই খারিজ করে দেবেন।

দ্বিতীয় যে বিষয়টি নিয়ে সাম্প্রতিক 'সাবলটার্ন স্টাডিজ'-এ উল্লেখযোগ্য আলোচনা

হয়েছে, তা হল জাতিভেদ প্রথা। বিশেষ করে মণ্ডল কমিশন বিরোধী আন্দোলনের পর এই নিয়ে তুমুল হট্টগোল হয়ে গেছে। ডিসকোর্স হিসেবে দেখার ফলে জাতপাত নিয়ে সাম্প্রতিক রাজনীতির একটি দিক কিন্তু অনেক স্পষ্ট হয়েছে। তা হল যে জাতিভেদ প্রথার ধর্মীয় ভিত্তি এখন প্রায় সম্পূর্ণ লুপ্ত। কেউ তা নিয়ে আর কথা বলে না। এখন সমস্ত বিরোধেরই কেন্দ্র হল আধুনিক রাষ্ট্রব্যবস্থায় বিভিন্ন গোষ্ঠীর অবস্থান নিয়ে। দ্বিতীয়ত, তথাকথিত সামাজিক ন্যায় প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে জাতিগত পরিচয় গণ্য করা বা না করার মধ্যেও আবার উচ্চবর্গের আধিপত্য বিস্তারের দুধরনের কৌশল কাজ করছে। এবং নিম্নবর্গও তার সামাজিক অধিকার ও মর্যাদা প্রতিষ্ঠার জন্য বিভিন্নভাবে এই ক্ষমতাতন্ত্রের বিরোধিতাও করছে, আবার সুযোগও নিচ্ছে।

তৃতীয় বিষয়টি হল মহিলাদের সামাজিক অবস্থান সংক্রান্ত আলোচনা। পুরুষশাসিত সমাজে সব নারীই এক অর্থে নিম্নবর্গ। কিন্তু তাই বলে নারীর কোনও শ্রেণীগত, জাতিগত, সম্প্রদায়গত পরিচয় নেই, এও সত্য নয়। সুতরাং নিম্নবর্গের নির্মাণ দেখতে হলে পুরুষশাসিত সমাজে নারীর অধীনতাও যেমন বিশ্লেষণের বিষয়, তেমনি অন্যান্য ক্ষমতার সম্পর্ক, যেমন শ্রেণী, জাতি, সম্প্রদায়, ইত্যাদি কীভাবে সেই নিম্নবর্গীয় নারীর নির্মাণটিকে আরও জটিল করে তোলে, তাও বিশেষ গবেষণার বিষয়। সাম্প্রতিক বিতর্কে সমাজসংস্কার এবং বিশেষ করে নারীর অধিকার রক্ষার জন্য আইনের সংস্কার নিয়ে প্রচুর আলোচনা চলেছে। কিন্তু সামগ্রিক অর্থে নারীর অধীনতা আর বিশেষ অর্থে নিম্নবর্গীয় নারীর অধীনতা পরস্পর সম্পর্কিত হলেও যে দুটি ভিন্ন বিষয়, এই সত্যটি তুলে ধরার ফলে সাম্প্রতিক কালে ভারতের নারীবাদী রাজনীতির বিতর্কে নতুন মাত্রা যুক্ত হয়েছে।

এই তিনটি ক্ষেত্রেই নিম্নবর্গের রাজনীতির দৃষ্টিকোণ থেকে প্রতিষ্ঠিত জাতীয়তাবাদী এবং প্রতিষ্ঠিত বামপন্থী রাজনীতির সমালোচনা তৈরি হয়েছে। বিংশ শতাব্দীর সিংহভাগ ধরে যে উচ্চবর্গীয় রাজনীতি ভারতের রাষ্ট্রযন্ত্রকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছিল, আগামীদিনে তার বিরোধী শক্তি হয়তো এইসব সমালোচনাকে অবলম্বন করেই সংগঠিত হবে। বামপন্থী ভাবনাচিন্তার জগতে অন্যদের তুলনায় 'সাবলটার্ন স্টাডিজ' যে সেই সম্ভাবনাকে অপেক্ষাকৃত বেশি তাত্ত্বিক স্বীকৃতি দিতে পেরেছে, তার প্রধান কারণ হয়তো এই যে, পদ্ধতির দিক দিয়ে অত্যন্ত মৌলিক সমালোচনা এবং দিকপরিবর্তনও এখানে নিষিদ্ধ হয়নি। নিম্নবর্গের ইতিহাস যেমন অসম্পূর্ণ, পরিবর্তনশীল, নিম্নবর্গের ইতিহাসচর্চারও ঠিক তেমনই অবদ্ধ আর সচল থাকার চেষ্টা করা প্রয়োজন। এই অর্থে এক পর্যায় থেকে অন্য পর্যায়ে বিবর্তনের মধ্যে দিয়ে এই ইতিহাসচর্চায় নিম্নবর্গের সংগ্রামের যথার্থ প্রতিনিধিত্ব দেওয়ার প্রয়াস চলেছে।

টীকা

১ বর্তমান সংকলনে এটি অন্তর্ভুক্ত করা হল। দ্র পৃ ২২।

২ পার্থ চট্টোপাধ্যায়, 'পরিভাষা পরিচয়. সাবলটার্ন', *এক্ষণ*, গ্রীষ্ম সংখ্যা ১৩৯১ (১৯৮৪-৮৫)।

৩ এই পর্যায়ের বহু প্রবন্ধের মধ্যে থেকে তিনটি প্রবন্ধ বর্তমান সংকলনে দেওয়া হল— রণজিৎ গুহ-র 'একটি অসুরের কাহিনী', শাহিদ আমিন-এর 'গান্ধী যখন মহাত্মা' আর ডেভিড হার্ডিম্যান এর 'দেবীর আবির্ভাব'।

৪ Gayatri Chakravorty Spivak, Subaltern Studies Deconstructing Historiography' in Ranajit Guha ed , *Subaltern Studies* IV (Delhi Oxford University Press, 1985) pp 338 63, 'Can the Subaltern Speak ?' in Cary Nelson and Lawrence Grossberg, eds , *Marxism and the Interpretation of Culture* (Urban University of Illinois Press 1988)

৫ এই পর্যায়ের রচনার নিদর্শন এই সংকলনে অন্তর্ভুক্ত: দ্র পার্থ চট্টোপাধ্যায়-এর প্রবন্ধ 'ইতিহাসের উত্তরাধিকার'।

৬ এর দৃষ্টান্ত এই সংকলনে দীপেশ চক্রবর্তীর প্রবন্ধ।

৭ তিনটি দৃষ্টান্ত এই সংকলনে দেওয়া হল: গৌতম ভদ্র, বীণা দাস ও জ্ঞানেন্দ্র পাণ্ডে-র প্রবন্ধ।

নিম্নবর্গের ইতিহাস

রণজিৎ গুহ

১ ইতিহাসবিদ্যার সংকট ও উচ্চবর্গের ইতিহাস

আমরা ইতিহাসবিদ্যার একটা সংকটের মধ্যে আছি। আমার নিজের পড়াশুনার মূল বিষয় ইংরেজ আমলের ভারতবর্ষ। তাই ইতিহাসবিদ্যা বলতে আমি বোঝাব সেই স্মৃতি বা প্রতীতির কথা যার বিশদ প্রকাশ ওই যুগ প্রসঙ্গে আমাদের মৌখিক বা লিখিত বক্তব্যে। এই ইতিহাসবিদ্যার যে কর্তা তার চৈতন্যের বিশিষ্ট রূপটির নাম হিসেবে ইতিহাসচেতনা শব্দটাও কখনও কখনও ব্যবহার করব। আর সংকট বলতে বোঝাতে চাই সেই বিশেষ অবস্থা যখন যে-কোনও জ্ঞানমার্গে অগ্রগতির তাগিদ—যার উৎস সমাজের প্রয়োজনে বা ব্যক্তির প্রতিভায় বা উভয়ের সমন্বয়ে—যখন সেই তাগিদ ওই জ্ঞানমার্গের তত্ত্ব বা অভ্যাসের পুঁজি দিয়ে আর মেটানো যাচ্ছে না। এই অর্থেই ইতিহাসবিদ্যার একটা সংকটের মধ্যে আমরা আছি।

এই সংকটের একটি প্রধান লক্ষণ আমার আলোচনার বিষয়। কিন্তু সেই বিচারের ভূমিকা হিসেবে এই ইতিহাসবিদ্যার ইতিহাস সম্পর্কে দু-একটি কথা আবার মনে করিয়ে দিতে চাই। আমরা যে ইতিহাস লিখি, পড়ি ও পড়াই, তার উৎপত্তি ইংরেজের ক্ষমতালিপ্সায়। পলাশির যুদ্ধের আগেও আমাদের ইতিহাস লেখা হত। কিন্তু সে ইতিহাসের ধাঁচ ছিল পৌরাণিক, অর্থাৎ যেখানে ঐহিক ঘটনা ও সম্পর্কগুলিকে দেখা হত পারত্রিক ঘটনা ও সম্পর্কের ক্ষণিক ও একান্তই গৌণ প্রতিভাস হিসেবে। যেমন ধরুন, কালকেতু ব্যাধের জীবন একান্ত বাস্তব হওয়া সত্ত্বেও তার স্বাতন্ত্র্য নেই। তার জীবন নীলাম্বরের স্বর্গচ্যুতির ইতিহাসের এবং তাও আবার পার্বতীর অলৌকিক জীবনী এবং তাঁর পূজার ইতিহাসের একটি অধ্যায় মাত্র—যেন বন্ধনীর মধ্যে বন্ধনী, বৃত্তের মধ্যে বৃত্ত। অবশ্য ঐহিক ইতিহাসের একটি ধারাও ব্রিটিশ রাজত্বের আগে চালু ছিল। আরবি-ফারসি ইতিহাসবিদ্যার উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া এবং মুঘল বাদশাহের বা তাঁদেরই সমকালীন ছোট-বড়-মাঝারি নানা সামন্ত ভূস্বামীদের আশ্রিত এই ধারাটির উপজীব্য ছিল, এক কথায় যাকে বলা যায় রাজকাহিনী। কাহিনীর নায়করা কখনও দিল্লীশ্বর, কখনও বা কোনও আঞ্চলিক ক্ষুদে ঈশ্বর— কিন্তু ঐতিহাসিকের কাছে তারা সকলেই জগদীশ্বর। তাদের বংশাবলী, দিগ্বিজয় ইত্যাদি ছাড়াও শাসনব্যবস্থা, রাজস্বের হার, ভৌগোলিক তথ্য এবং ওই ধরনের আরও কিছু সাম্প্রতিকতার ছাপ এই জাতীয় ইতিহাসে বিরল নয়। কিন্তু প্রভুর জীবনই যেহেতু প্রজা ও রাষ্ট্রের জীবনের একমাত্র প্রতিভূ, তাঁর প্রতিভা ও কীর্তির

ছটায় উজ্জ্বল অথচ সংকীর্ণ ক্ষেত্রটির বাইরে সবটাই অন্ধকার ছিল। তা ছাড়া আরও একটা কথা ভাবতে হবে। রাজরাজড়ার নামাংকিত এই রচনাগুলিকে কি সত্যিই ইতিহাস বলা যায়? এগুলি সমসাময়িক ও আঞ্চলিক তথ্যের আকর সন্দেহ নেই। কিন্তু অতীতকাল সম্পর্কে পরিপ্রেক্ষিতের যে গভীরতা ইতিহাসবিদ্যার প্রধান লক্ষণ তার অভাব এ রচনায় তো খুবই স্পষ্ট। আসলে লক্ষ করলেই দেখা যাবে যে এই সব রচনা যখনই নেহাৎ সাম্প্রতিকতা বা বর্তমানেরই একান্ত গা-ঘেঁষা অদূরবর্তী অতীতের আওতা ছাড়িয়ে যায়, তখনই তার মধ্যে হয় পৌরাণিক ধরনের অলৌকিকতা এসে পড়ে কিংবা সেই অতীতের গভীরতা কেবলমাত্র সন-তারিখের দ্বারা চিহ্নিত হয়ে ইতিহাসকে পরিণত করে বর্ষপঞ্জীতে।

কিন্তু যে ইতিহাসচেতনায় অতীতকাল শুধু চক্রাকারে ঘোরে কিংবা যার বহতা শুধু সামন্ত শাসকদের অগভীর জীবনযাত্রার খাতেই সীমাবদ্ধ, তা দিয়ে বাণিজ্য-ধনবাদ থেকে শিল্পাশ্রয়ী ধনতন্ত্রে উত্তরণের যুগে কিংবা আরও পরিণত ধনতন্ত্রের যুগে ঔপনিবেশিক রাজ্য শাসনের কাজ চালানো যায় না। কারণ সেই শাসনের বাস্তব ভিত্তি ভারত ভূখণ্ডের যে পণ্য বা কাঁচামাল রপ্তানি করা ও যন্ত্রস্থ করা তার শর্তই হল আর এক ধরনের সময়—যে-সময় সরল রেখায় চলে, যা দিয়ে সদাগরি হাওয়ার সঙ্গে সামুদ্রিক বাণিজ্যের ছন্দ মেলানো হয় ঔপনিবেশিক যুগের আদিপর্বে, যে-সময়ের কাঁটায় কাঁটায় ল্যাংকাশায়ারের সূতাকলের বাঁশি বাজে, মেশিন চলে, এবং দুনিয়ার প্রথম যন্ত্রসভ্যতায় যে-সময়ের সঙ্গে শিল্প, পুঁজি ও শ্রমের সংগম থেকেই সৃষ্টি হয় এক নতুন ধরনের সময়-কল্পনা যার নাম মেহনতি-সময়।

সময়ের এই নতুন ধারণা যে-ইতিহাসবিদ্যার প্রাণশক্তি, ইংরেজ এদেশে আসার ফলে তা আমাদের চিন্তায় প্রতিষ্ঠিত হল। তবে এই প্রসঙ্গে মনে রাখা দরকার যে ভারতে আধুনিক ইতিহাসবিদ্যার শুরু ইংরেজি শিক্ষার প্রবর্তন থেকে নয়, ইংরেজ শাসনব্যবস্থা থেকে—এবং সেই শাসনব্যবস্থা, বলাই বাহুল্য, ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের চেয়েও পুরনো। কথাটা একটু জোর দিয়ে বলতে চাই, কারণ একটা কুসংস্কার এক সময় চালু ছিল এবং এখনও হয়তো আছে এই মর্মে যে ইংরেজরা পাশ্চাত্য সভ্যতার আদর্শে আমাদের দীক্ষিত করার জন্যে যে-সব বিদ্যায় উৎসাহ দিয়েছিল ইতিহাসবিদ্যাটাও তার অন্যতম। কথাটা যে একেবারেই ভুল তা কোম্পানির আদিপর্বের নথিপত্র ঘাঁটলেই বোঝা যায়। কারণ পলাশির যুদ্ধের কিছু পরেই যখন বণিকের মানদণ্ড রাজদণ্ডে রূপান্তরিত হবার সম্ভাবনা দেখা দিল—সেই ঐতিহাসিক মুহূর্তটা হয়তো ১৭৬৫ সাল যখন কোম্পানি দেওয়ানি হাতে পেল কিংবা তারও কিছু আগে যখন নবাব তিনটে জেলা ('সিডেড ডিস্ট্রিকটস') তাদের দিয়ে দিলেন—তখন থেকেই ভারতবর্ষের ইতিহাস ইংরেজ শাসনের হাতিয়ার হল। কারণ লুঠপাটই যেখানে দেশজয়ের উদ্দেশ্য সেখানে ইতিহাস অবান্তর। গোয়া বা দিল্লির অতীত (বা ভবিষ্যৎ) নিয়ে আলবুকার্ক বা নাদির শার মাথা ঘামানোর দরকার ছিল না। লুঠেরার কাছে বর্তমানটাই একমাত্র সত্য। কিন্তু জয় যখন বিজিত দেশে ক্ষমতা কায়েম করার আকাঙ্ক্ষায় পরিণত হয়, বিজেতাকে তখন ইতিহাসচেতনা ব্যবহার করতে হয় প্রভু সংস্কৃতির একটি প্রধান উপাদান হিসেবে। সব

বিজেতার পক্ষেই একথা খাটে, তবে অবস্থা ভেদে ওই চেতনার বিশিষ্ট রূপটি ধরা পড়ে মৌখিক বা লিখিত বক্তব্যে।

অন্যান্য দেশের মতো ভারতবর্ষেও উপনিবেশের পত্তন হয়েছিল পাশ্চাত্য শক্তির অস্ত্রবলের সাহায্যে। কিন্তু ভূমিষ্ঠ হবার পর থেকেই এদেশের সেই শিশুরাষ্ট্র তার স্বকীয় ভঙ্গিতে বেড়ে ওঠে। এই স্বকীয়তার নানা দিক ও তাদের পারস্পরিক সম্পর্ক নিয়েই সেই ঔপনিবেশিক রাষ্ট্র গঠনের ইতিহাস যার অনেকখানিই এখনও গবেষণার বিষয় বলে গণ্য হতে বাকি। বর্তমান প্রসঙ্গে তার শুধু একটি দিকই লক্ষ করতে বলি। তা হল এই যে কোম্পানি আমলের প্রথম পর্বে তার সেনাবলের কথা বাদ দিলে বলা যায় যে ভূমিরাজস্ব এবং দেওয়ানি বিচার সংক্রান্ত শাসনব্যবস্থা ও আমলাতন্ত্রই এদেশে ঔপনিবেশক রাষ্ট্রের মুখ্য অবয়ব হিসেবে গড়ে উঠেছিল। এই অবয়বটি যেমন ইংরেজ রাজশক্তির বিকাশকে ত্বরান্বিত করে তেমনি আধুনিক ইতিহাসবিদ্যার সূচনা এরই মাধ্যমে। কারণ আগেই বলেছি যে এদেশে পাশ্চাত্য ইতিহাসচেতনাকে প্রথম ব্যবহার করা হয়েছিল 'লিবারল' আদর্শের উৎসাহে নয়, রাজস্ব আদায়ের স্বার্থে ও তাগিদে। দেওয়ানি হাতে নিয়েই ইংরেজ টের পায় যে এ দেশের কৃষিব্যবস্থা অতি প্রাচীন, জমির সঙ্গে রাজা ও প্রজার সম্পর্ক এখানে নানা সনাতন প্রথায় নিয়ন্ত্রিত, এবং জমির মালিকানা, ফসলবোনার কায়দা ইত্যাদি সব কিছুই এক সাবেক সংস্কারের অঙ্গ। অতীতকে উপেক্ষা করে এখানে রাজস্ব সংগ্রহ করা সম্ভব নয়। তাই সে যুগের সরকারি কাগজপত্রে ঐতিহাসিক বিবৃতির অভাব নেই। যাঁরা লালদিঘি ও গোলদিঘি পাড়ায় নথিখানার ধুলো ঘেঁটেছেন তাঁরা সকলেই জানেন এইসব বিবৃতি কত অমূল্য তথ্যে ভরা, কত বিচিত্র বিষয়ে সমৃদ্ধ। প্রাক-ব্রিটিশ, বিশেষ করে মুঘল আমলের রাজ্যশাসন, ভূসম্পত্তির অধিকার, কৃষিব্যবস্থা, বাণিজ্য-ব্যাপার ইত্যাদি, সংক্ষেপে বলতে গেলে, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক জীবনের বহু প্রসঙ্গে বিস্তারিত আলোচনা এইসব সরকারি কাগজপত্রে হামেশাই পাওয়া যায়। কেউ যদি বলেন যে এগুলি ঐতিহাসিক তথ্যের আকরমাত্র কিন্তু সত্যিকারের ইতিহাস নয়, তা হলে অবিচার হবে। কারণ যদিও সদ্য প্রকাশিত সবচেয়ে আনকোরা বইটি বা প্রবন্ধটির তুলনায় হয়তো একটু কম পরিপাটি মনে হতে পারে, তবু একটু লক্ষ করলেই দেখা যাবে যে আঠারো শতকের শেষে বা উনিশ শতকের গোড়ায় লেখা এইসব রচনায় তথ্য ও যুক্তির সমন্বয় এবং কার্যকারণ সূত্রে সাজানো বিশ্লেষণ পদ্ধতির মধ্যে আধুনিক ইতিহাসবিদ্যার প্রধান গুণগুলি সবই বর্তমান। তবে যে বিশেষ অবস্থায় এই ইতিহাসবিদ্যার উৎপত্তি হয়েছিল তার ফলে এর কয়েকটি বৈশিষ্ট্য বা লক্ষণ—বলা যায় জন্মলক্ষণ—প্রথম থেকেই চোখে পড়ে। তার মধ্যে গুটিদুয়েক বর্তমান প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য।

প্রথম লক্ষণটি এই যে, এই ইতিহাসবিদ্যার জন্ম এ দেশে ইংরেজ রাজশক্তির ঔরসে এবং ভূমিষ্ঠ হবার পর থেকেই তা ঔপনিবেশিক শাসনদণ্ডকে আশ্রয় করে বেড়ে ওঠে। যাঁরা এই ধারায় প্রথম ইতিহাস লেখেন তাঁরা সকলেই হয় সরকারি কর্মচারী কিংবা সরকারের প্রসাদপুষ্ট ও ইংরেজ শাসনের সমর্থক বেসরকারি সাহেব মেমসাহেব। তাঁরা যে ইতিহাস লেখেন তার উদ্দেশ্য হয় একেবারে সরাসরি শাসনব্যবস্থার প্রয়োজন সিদ্ধ

করা কিংবা বেসরকারি রচনা হলেও কার্যত তার সাহায্যে ব্রিটিশ প্রভুশক্তি ও প্রভুসংস্কৃতিকে আরও জোরদার করা। এমন কী এইসব লেখকরা যখন অতীত বিষয়ক বক্তব্যগুলি রিপোর্ট, মিনিট বা ওই জাতীয় সরকারি নথি হিসেবে না লিখে নিছক ইতিহাস হিসেবেই লেখেন তখনও বিজেতা ও শাসকের দৃষ্টির কাছে ঐতিহাসিকের পরিপ্রেক্ষিত সংকুচিত হয়। উইলিয়ম হান্টারের মতো প্রতিভাবান এবং উদারচেতা ব্যক্তিও এইরকম সংকীর্ণতার উর্ধ্বে নন।

ইতিহাসচেতনায় ঔপনিবেশিক মানসিকতার এই প্রভাব ইতিহাসবিদ্যার চরিত্রে একটি গুণগত পরিবর্তন ঘটায়। ইউরোপে বুর্জোয়াদের অভ্যুদয়ের সময় এই বিদ্যা তদানীন্তন সমাজে সামন্তশ্রেণীর রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক প্রভুত্বের নির্মম সমালোচনায় ব্যাপৃত ছিল। আঠারো শতকের প্রথমার্ধে আলোকপ্রাপ্তির যুগ থেকে সেই সমালোচনা সামন্তশক্তির তিন প্রধান অর্থাৎ রাজা, জমিদার ও পুরোহিতের আধিপত্যের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে এবং নিরন্তর আক্রমণ চালিয়ে ১৭৮৯ সালের ঐতিহাসিক জয়ের পথ প্রশস্ত করে। অথচ দেখুন, ওই ইতিহাসবিদ্যাই যখন একটি পাশ্চাত্য বুর্জোয়া শক্তির মাধ্যমে এদেশে উপনিবেশ গড়ার কাজে ব্যবহৃত হল তখনই তার ভূমিকা পালটে গেল, এমন কী বলা যায় উলটে গেল। কারণ যদিও তা ফরাসি বিপ্লবের বুর্জোয়া-গণতান্ত্রিক আদর্শ এবং তারই পরিণতি জাতীয় আত্মনিয়ন্ত্রণ ও জাতিভিত্তিক স্বাধীন রাষ্ট্র গঠনের আন্দোলনে প্রেরণা দিয়েছিল পশ্চিম ইউরোপে, ভারতবর্ষের বিশেষ পরিস্থিতিতে তাই হয়ে দাঁড়াল জাতীয় স্বাধীনতার প্রধান অন্তরায় ইংরেজ শাসনের অনুকূল। অর্থাৎ সে আর তখন প্রভুশক্তির সমালোচক নয়, নতুন ভূমিকায় সে প্রভুশক্তির স্তাবক।

এই ইতিহাসবিদ্যার আর-একটি জন্মলক্ষণ হচ্ছে উচ্চবর্গের প্রতি পক্ষপাতিত্ব। এই পক্ষপাতিত্ব শাসকদেরই মনোভাবের প্রতিফলন। কারণ ইংরেজদের রাজত্ব যখন শুরু হয় তখন আমাদের সমাজ রীতিনীতি ভাষা ভূগোল ইত্যাদি বিষয়ে সাড়ে পনেরো আনাই তাদের অজানা ছিল। এরকম একটা অপরিচিত দেশে তার কৃষিব্যবস্থা ও মালিকানার সনাতন ও জটিল রহস্য ভেদ করে সেখান থেকে রাজস্ব সংগ্রহ করাও সেই বিদেশি রাজশক্তির পক্ষে তখন শক্ত কাজ। তবে আঠারো শতকের ব্রিটিশ সমাজের আদর্শ অনুযায়ী কোম্পানির কর্তৃপক্ষের ধারণা হয় যে এদেশেও সমাজের প্রধান স্তম্ভ সেইসব সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি বা গোষ্ঠী যারা বেশ বড় বড় ভূসম্পত্তির মালিক, এবং তাদের সঙ্গে একটা বোঝাপড়া হলেই রাজস্ব আদায় ও প্রশাসনের সমস্যা মিটে যাবে। এইসব তথাকথিত 'ন্যাচারল-লিডার্স' বা স্বভাবনেতাদের খুঁজে বের করা, তাদের স্বত্ব অধিকার ইত্যাদির সংজ্ঞা ও সীমা নির্ণয়, এবং তাদের পাওনাগণ্ডার হিসেব নিয়ে ঐতিহাসিক আলোচনা সরকারি কাগজপত্রে অনেকখানি জায়গা জুড়ে আছে। এরই ফলে এতদ্দেশীয় উচ্চবর্গের স্বার্থ ও সুবিধা একই সঙ্গে স্বীকৃতি পায় ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রনীতিতে এবং ঔপনিবেশিক ইতিহাসবিদ্যায়। ইতিহাসের মুখ্য বিষয় হিসেবে এই উচ্চবর্গের স্থান তখন ইংরেজদের ঠিক পরেই। তাদের মধ্যে অনেকেই ছিল অপেক্ষাকৃত প্রাচীন সামন্তবংশের উত্তরাধিকারী, অনেকে আবার জমিদারি বা অন্য নামে হলেও কার্যত জমিদারি বন্দোবস্তের কল্যাণে কায়েম নয়া-সামন্তশ্রেণীর প্রতিভূ। এরাই স্বভাবনেতার মর্যাদা পেল

ভূসম্পত্তি সংক্রান্ত নতুন আইনকানুনের ফলে। আর ঠিক এইভাবেই পাশ্চাত্যে যে ইতিহাসবিদ্যা সামন্তবাদের বিরোধিতায় সক্রিয় ছিল, ঔপনিবেশিক অবস্থায় সে তার মূল চরিত্র পালটে পরিণত হল পরিশ্রমলব্ধ ফসলের উদ্বৃত্তে পুষ্ট এক নয়া-সামন্তশ্রেণীর অনুকূল জ্ঞানকাণ্ডে। ইতিহাসকে এই শ্রেণীর সপক্ষে ওকালতির ভূমিকায় নামাবার জন্যে কতদূর যাওয়া সম্ভব তা যারা ফ্রান্সিস, শোর ও কর্নওয়ালিসের মিনিটগুলির সঙ্গে পরিচিত তাঁরা সকলেই জানেন।

যে দুটি জন্মলক্ষণ বর্ণনা করা হল তা একসঙ্গে মিলিয়ে দেখলেই স্পষ্ট বোঝা যাবে যে আঠারো শতকের যে ইতিহাসবিদ্যা ইংরেজের ক্ষমতালিপ্সার ফলে একটা ঔপনিবেশিক বিদ্যায় পরিণত হয়েছিল, ভারতের বিশেষ অবস্থায়, ভূমিষ্ঠ হবার পর থেকেই তার ঝোঁক ছিল উচ্চবর্গের সপক্ষে। আমরা যে ইতিহাস লিখি, পড়ি, পড়াই বা অন্যথা চর্চা করে থাকি তার প্রেরণা সবটাই সেই ইতিহাসবিদ্যার আদিকল্প থেকে পাওয়া। টমাস কুন্ দেখিয়েছেন যে এক-একটি ঐতিহাসিক অবস্থায় জীববিদ্যা রসায়নবিদ্যা পদার্থবিদ্যা প্রভৃতি নানা বিষয়ে বিজ্ঞানের অগ্রগতি ঘটে এক-একটি আদিকল্পকে আশ্রয় করে। তারই ভিত্তিতে এক-একটি বৈজ্ঞানিক গোষ্ঠী বা ঘরানা গড়ে ওঠে, তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক চিন্তা ও পরীক্ষা চলে তার আদর্শে রচিত নানা মডেল বা প্রতিকল্পকে কেন্দ্র করে, সেইসব চিন্তা ও পরীক্ষার ফল আবার বৈজ্ঞানিক প্রতিষ্ঠানগুলির (যথা ইনস্টিটিউট, ল্যাবরেটরি, ইউনিভার্সিটি ডিপার্টমেন্ট ইত্যাদির) উদ্যোগে এবং পত্রপত্রিকা, পাঠ্যবই, নানা ধরনের তালিমি-কেতাবের মারফত ওই আদিকল্পটিকেই প্রচার করে বিজ্ঞানের নানা শাখায় বিশেষজ্ঞ ও বিদ্যার্থীদের মধ্যে। তারপর কিন্তু একটা সময় আসে যখন তত্ত্বে ও প্রয়োগে এইসব আন্দোলনের ফলেই সেই একই বিদ্যার ক্ষেত্রে এমন সব নতুন প্রশ্ন ওঠে বা সমস্যা আবিষ্কৃত হয় যার উত্তর বা সমাধান আর প্রতিষ্ঠিত, সর্বসম্মত আদিকল্পটি থেকে পাওয়া সম্ভব নয়। তখনই সেই পুরনো আদিকল্পে সংকট ঘটে; প্রগতির দাবি মেটাতে পারে না বলেই তার প্রভাব ক্রমে-ক্রমে ক্ষীণ হয়ে আসে এবং শেষ পর্যন্ত নতুন প্রশ্নগুলির উত্তর বা উত্তর-খোঁজার পক্ষে অনুকূল আর এক শক্তিশালী নতুন আদিকল্প তার অগ্রজকে হটিয়ে দিয়ে নেতৃত্বের ভূমিকাকে নামে বিজ্ঞানের সেই বিশেষ শাখায়।

বিজ্ঞানে শুধু নয়, যে কোনও জ্ঞানকাণ্ডেরই অগ্রগতির পথ এইভাবে তার আদিকল্পগুলির আয়ুষ্কাল দিয়ে মাপা যায়। ইতিহাসবিদ্যার ক্ষেত্রেও একথা সত্য। যে-ইতিহাসবিদ্যার সাহায্যে আমরা ঔপনিবেশিক যুগের অতীতকে বুঝতে বা বোঝাতে অভ্যস্ত তারও প্রেরণা আঠারো শতকের ইউরোপ থেকে নেওয়া এবং পরাধীন ভারতের বিশেষ অবস্থায় ঢেলে-সাজা একটা প্রৌঢ় আদিকল্প। ইতিহাসবিদ্যার সংকট বলতে আমি সেই আদিকল্পের সংকটের কথাই বোঝাচ্ছি।

আগেই বলেছি যে এই আদিকল্পটি প্রাক-ঔপনিবেশিক আমলে ইতিহাসবিদ্যার চালিকা শক্তি আর এক আদিকল্পকে সরিয়ে দিয়ে তার জায়গা দখল করেছিল, আর তখন থেকেই ইতিহাসচেতনা পৌরাণিক কল্পনার স্বর্গ ছেড়ে মাটির পৃথিবীতে নেমে আসে এবং অলৌকিক সময়ের বেড়াজাল থেকে বেরিয়ে ঐহিক সময়ের সহজ রাস্তায়

পা চালাবার সুযোগ পায়। ফলেই অতীত ভারতের সমাজ, সংস্কৃতি ও বাস্তব জীবনের নানা অজানা দিক তখন উদ্ভাসিত হয়েছিল ইতিহাসের আলোকে। এটা যে একটা মস্ত বড় লাভ তা অস্বীকার করার কোনও মানে হয় না। কিন্তু সেই সঙ্গে একথাও মনে রাখা দরকার যে উচ্চবর্গের ইতিহাস সম্পর্কে যে পক্ষপাতিত্ব প্রাক্তন আদিকল্পটির অন্যতম বৈশিষ্ট্য ছিল, নতুনটিতে তার কোনও ব্যতিক্রম হল না। শুধু আগে যেখানে ঠাকুরদেবতা ও রাজরাজড়ার লীলাকেই ইতিহাসের মূল বিষয়বস্তু বলে মনে করা হত, এখন তারই বদলে ইতিহাসের পাতা জুড়ে বসল ইংরেজের মাহাত্ম্য ও ইংরেজশাসিত সমাজে যাদের টাকা জমি জাত পেশা বা চাকরির জোর বেশি তাদেরই মাহাত্ম্য। এই মুষ্টিমেয়র ইতিহাসকেই চালানো হল এবং এখনও চালানো হচ্ছে ভারতবর্ষের ইতিহাস বলে।

উচ্চবর্গের পক্ষপাতী এই আদিকল্পের প্রভাব ঔপনিবেশিক যুগের ইতিহাস প্রসঙ্গে চিন্তায় ও লেখায় এতই পরিষ্কার যে সে বিষয়ে কিছু বলা বাহুল্য নয় শুধু এই জন্যেই যে ঝোঁকটা প্রায় সর্বব্যাপী, সুতরাং অতিরেকের বশে সচরাচর চোখে পড়ে না বলেই ধরে নেওয়া হয় ওটা যেন অবিসংবাদী সত্য, যেন তা অতীতের সেই ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতাটির ধ্রুবগুণগুলির অন্যতম। অথচ ঝোঁকটা ঠিক এইরকম হবার ফলেই ওই অভিজ্ঞতা তার জোর, জটিলতা ও ঘনত্ব অনেকখানি হারিয়ে ফেলেছে ইতিহাসের পৃষ্ঠায়। ইংরেজ আমলের রাজনৈতিক জীবন, বিশেষ করে জাতীয় আন্দোলন ও জাতীয়তাবাদের সমস্যা নিয়ে যে বিরাট সাহিত্য গড়ে উঠেছে, উদাহরণস্বরূপ তার কথা আলোচনা করলেই আমার বক্তব্য স্পষ্ট হবে।

এই সাহিত্যের প্রায় সবটাই দুটি প্রতিকল্পকে আশ্রয় করে লেখা। দুটিই উচ্চবর্গের দৃষ্টিভঙ্গির বাহন। উভয়েরই প্রতিপাদ্য এই যে সে যুগের রাজনীতি বলতে প্রধানত, এমন কী কেবলমাত্র উচ্চবর্গের রাজনৈতিক আকাঙ্ক্ষা, আদর্শ ও কর্মকাণ্ডকেই বোঝায়, এবং জাতীয়তাবাদ সেই রাজনীতিরই অন্যতম, এমন কী মুখ্য প্রকাশ। তবে মৌলিক সাদৃশ্য সত্ত্বেও এই দুটি দৃষ্টিভঙ্গি একেবারে অভিন্ন নয়। কারণ উচ্চবর্গের যে অগ্রণী শক্তিগুলির তারা প্রবক্তা তাদের অর্থনৈতিক স্বার্থ এবং রাজনৈতিক উদ্দেশ্য ও উপায়ে পার্থক্য, এমন কী অবস্থা বিশেষে দ্বন্দ্বও কখনও কখনও দেখা দিত। এই মৌলিক সাদৃশ্য এবং গৌণার্থে কিছু কিছু বিরোধিতার সমন্বয়ের জন্যেই উচ্চবর্গের পক্ষপাতী চিন্তাধারা দুটি ইতিহাসবিদ্যার ক্ষেত্রে একত্রিত হয়েও তাদের নিজ নিজ বৈশিষ্ট্য নিয়ে কাজ করে।

প্রথম ধারাটির বৈশিষ্ট্য ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রশক্তি এবং তারই সহায় ও ফলগত ঔপনিবেশিক সংস্কৃতির আলোকে ভারতবর্ষের ইতিহাস বিচার করা। এই ধরনের ইতিহাসের চর্চা ও প্রচার হত এবং এখনও হয়ে থাকে ব্রিটিশ লেখক ও বিদ্যাস্থানগুলিরই মাধ্যমে। তবে অন্যান্য দেশে, এমন কী এদেশেও তার অনুকারীর সংখ্যা কম নয়।

এই ধারাটির মূল কথা হচ্ছে এই যে ভারতবাসীর একজাতীয়তা বলতে যা বোঝায় তার বাস্তব সংগঠন ও চৈতন্যরূপ ইংরেজ শাসন, তৎসংক্রান্ত প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা, সাংস্কৃতিক আদর্শ এবং ব্যক্তিগতভাবে কোনও কোনও শাসকের ও সমষ্টিগতভাবে শাসকগোষ্ঠীরই প্রতিভার ফল। এক ধরনের সংকীর্ণ ব্যবহারবাদী চিন্তায় যেমন সব কিছুই ব্যাখ্যা করা হয় প্রেরণা ও প্রতিক্রিয়ার খেলা হিসেবে, ইতিহাসবিদ্যার এই ধারাটিতেও

জাতীয়তাবাদকে ব্যাখ্যা করা হয় এই বলে যে তা শুধু রাজশক্তির প্রয়োজনে সৃষ্ট সুযোগসুবিধা শিক্ষাদীক্ষা আইনকানুন ইস্কুল-আদালত ইত্যাদির প্রেরণায় উৎসাহিত ভারতীয় উচ্চবর্গের আচরণ ও মনোভাবের সমষ্টিমাত্র। এই ব্যাখ্যাটির এক সাবেক সংস্করণে ইংরেজের আমদানি 'লিবারল' সংস্কৃতিকেই জাতীয়তাবাদের প্রধান কারণ বলে গণ্য করা হত। তবে এখন সেই দা-কাটা বক্তব্যকে আরও একটু পালিশ করে দেখানো হচ্ছে যে কজনকে বি এ ডিগ্রি দেওয়া হল শুধু তারই ওপর জাতীয়তার প্রসার নির্ভর করে না, ওটা আর এক রকম শিক্ষাপ্রণালী বা লার্নিং প্রসেস-এর ফল। এই প্রণালীটি সম্পর্কে ব্যবহারবাদীরা পরীক্ষানিরীক্ষার দ্বারা প্রমাণ করেছেন যে খাবারের লোভ দেখালে ইঁদুরের মতো জন্তুকেও শিক্ষিত করে তোলা যায়। একটা খাঁচার মধ্যে জটিল ধাঁধার মতো চলাচলের পথ বানিয়ে তার কোনও দুর্গম অংশে একখণ্ড পনীর রেখে দিন। তারপর একটা শাদা ইঁদুর ছেড়ে দিন খাঁচার মধ্যে। কৃষ্ণের জীবটি অবশ্য দু-একবার রাস্তা হারিয়ে ফেলবে, ভুল করবে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত দেখবেন গোলোকধাঁধার প্যাঁচগুলি বহু চেষ্টায় রপ্ত করে সে ঠিক বুঝে নিয়েছে কেমনভাবে ওই খাদ্যবস্তুর কাছে পৌঁছনো যায়। ইঁদুরের পক্ষে যা সম্ভব তা ভারতবাসীর অসাধ্য হবে কেন? কারণ এই ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী দেখতে গেলে ইংরেজ আসার আগে ক্ষমতা বা রাজশক্তি সম্পর্কে আমাদের ধারণাচিন্তা যা ছিল তার মধ্যে পলিটিকসের লেশমাত্র নেই, এগুলি নেহাৎ সনাতন সংস্কার মাত্র। তারা এসে তাদের শাসনকে রূপায়িত করল নানা ঔপনিবেশিক সংস্থায়, তা পরিচালনার জন্যে নিয়ম বেঁধে দিল। নিয়ম ভাঙলে কী সাজা হবে তাও ঠিক করে দিল আইনকানুন দিয়ে এবং ওইসব কিছু যাতে উচ্চবর্গের বোধগম্য হয় তার জন্যে একটা সংস্কৃতিকেও চালু করে দিল রাষ্ট্রক্ষমতা কায়েম ও বিস্তার করার উদ্দেশ্যে। এইসব সংস্থা ও তৎসংক্রান্ত সংস্কৃতি যে রাষ্ট্রীয় চিন্তা ও কর্মের উপলক্ষ ও বিষয় তারই নাম পলিটিকস এবং আলোচ্য ধারাটি অনুযায়ী সেই পলিটিকসে উচ্চবর্গের দীক্ষিত হওয়ার প্রণালীটির—'লার্নিং প্রসেস'টিরই—নাম জাতীয়তাবাদ। জাতীয়তাবাদের এই ব্যাখ্যায় আদর্শনিষ্ঠা ও নিঃস্বার্থ জনসেবার স্থান নেই, আছে শুধু ঔপনিবেশিকতার বরে পাওয়া অর্থ যশ ও ক্ষমতার লোভ আর সেই লোভের লক্ষ্যগুলিতে পৌঁছনোর জন্যে ইংরেজ ও ভারতীয় উচ্চবর্গের মধ্যে এবং শেষোক্তদের নিজেদের মধ্যে সহযোগিতা ও সংঘাতের কাহিনীই, এই মতে, জাতীয় আন্দোলনের মূল কথা।

অপরপক্ষে দ্বিতীয় প্রতিকল্পটির ছাঁচে সাজানো ইতিহাসবিদ্যায় জাতীয় আন্দোলনকে উচ্চবর্গের নেতৃত্বে উদ্বুদ্ধ ও চালিত নির্ভেজাল আদর্শবাদী সংগ্রামের চেহারা দেওয়া হয়। এই ধরনের ব্যাখ্যা প্রধানত ভারতীয় ঐতিহাসিকদেরই কাজ, তবে বিদেশে 'লিবারল' চিন্তাধারায়ও এর প্রকাশ বিরল নয়। এই ব্যাখ্যায়ও তারতম্য ঘটে। জাতীয় সংগ্রামের নায়ক রূপে উচ্চবর্গের অবদান এতে সর্বস্বীকৃত হলেও সব ব্যক্তি, সংস্থা, নীতি ও তার বিশেষ বিশেষ প্রয়োগ সম্পর্কে মূল্যায়ন সকলের এক রকম নয়। তবে মোদ্দা কথাটা সম্পর্কে দ্বিমত নেই। সে কথাটা হচ্ছে এই যে আমাদের জাতীয় সংগ্রাম উচ্চবর্গের মাহাত্ম্য ও আদর্শনিষ্ঠার কাহিনীমাত্র, এবং এই প্রতিপাদ্যটিকে বিশ্বাসযোগ্য করার জন্যে ইংরেজের সঙ্গে তাদের সহযোগিতার চেয়ে বিরোধিতার দিকটাই বাড়িয়ে

দেখা হয়, শোষক ও উৎপীড়ক হিসেবে তাদের সামাজিক ভূমিকা প্রায় অস্বীকার করেই জনসেবায় তাদের অগ্রণী ভূমিকার কথা বলা হয়, জাতীয় আন্দোলনের রাজনীতি ব্যবহার করে তারা যে রাজদত্ত ক্ষমতা ও সুযোগসুবিধার গৌণ ভাগ নিয়ে কাড়াকাড়ি মারামারিতে লিপ্ত ছিল সেকথা চেপে গিয়ে শোনানো হয় স্বার্থলেশহীন আত্মত্যাগের অলীক রূপকথা। এইভাবেই বুর্জোয়া-জাতীয়তাবাদী ইতিহাসে জনগণের বিশাল আন্দোলনগুলি পরিণত হয়েছে উচ্চবর্গের সংকীর্ণ জীবনবৃত্তান্তে।

এই পক্ষপাতদুষ্ট ইতিহাস থেকে অবশ্য অনেক কিছুই শেখার আছে। দেশি ও বিদেশি উচ্চবর্গের নানা ব্যক্তি ও গোষ্ঠীর কাজকর্ম ও চিন্তাধারা, তাদের ঐক্য অনৈক্য, রাষ্ট্রযন্ত্রের প্রতি তার চালক ও সহায়কদের মনোভাব, গণজীবন ও গণমত সম্পর্কে তাদের ধারণা ইত্যাদি অনেক তথ্যের আকর এই ভাষ্য। তবে এই ইতিহাস থেকে যা সবচেয়ে শেখার কথা তা হচ্ছে এই যে ইতিহাসচেতনা কখনও শ্রেণীচৈতন্যের সীমা অতিক্রম করতে পারে না।

কিন্তু এই ধরনের ঐতিহাসিক চিন্তা ও রচনার মধ্যে যা শিক্ষাপ্রদ তা অস্বীকার না করেও বলা যায় যে তার সাহায্যে জাতীয়তাবাদ ও জাতীয় আন্দোলনের অভিজ্ঞতাকে সমগ্রভাবে বোঝা সম্ভব নয়। কারণ সেই অভিজ্ঞতার অন্যতম এবং মুখ্য উপাদান জনসমাবেশ, যা বলতে আমি বোঝাতে চাই সাধারণ মানুষের রাজনৈতিক চেতনা ও তাদের সমবেত কার্যকলাপের সমন্বয়। এই অর্থে জনসমাবেশ যে কদাচিৎ এবং কোনও কোনও ক্ষেত্রে উচ্চবর্গের প্রতিনিধিস্থানীয় ব্যক্তি ও সংগঠনের মাধ্যমেই সম্ভবপর হয়েছিল তা যেমন সত্যি, তেমনই একথাও সত্যি যে সেই সমাবেশ অনেকবার এবং বহু ক্ষেত্রেই গড়ে উঠেছিল জনসাধারণের নিজস্ব ও স্বতন্ত্র উদ্যোগে, এমন কী সচেতনভাবেই ওইসব ব্যক্তি ও সংগঠনের তোয়াক্কা না রেখে, বরং তাদের বিরোধিতা করেই। সেই উদ্যোগের ফলস্বরূপ যে অজস্র জমায়েতের কথা জানা যায় ভারতীয় রাজনীতির ক্ষেত্রে মহাত্মা গান্ধীর আবির্ভাবের আগেই, তার দৃষ্টান্তগুলি না হয় বাদ দিচ্ছি, কারণ অনেকে হয়তো বলবেন যে তার মধ্যে জাতীয়তাবাদী চেতনা প্রকট ছিল না, যদিও ১৮৫৭-র মহাবিদ্রোহ বা ১৮৯৯-১৯০০ সালের বিরসাপন্থী বিদ্রোহের মধ্যে জাতীয়তার অংকুর বা পূর্বাভাস যাঁদের চোখ পড়ে না অথচ সরকারি চাকরির অধিকার নিয়ে উনিশ শতকে উচ্চশিক্ষিতের বিক্ষোভ বা কংগ্রেসের প্রথম দশ বছরের কার্যকলাপে যাঁরা জাতীয়তাবাদের প্রকাশ দেখতে পান, তাঁদের মনশ্চক্ষুতে চাল্‌শে ধরেছে বলতে হবে। তবু এসব কথা আপাতত বাদ দিয়ে যদি ঔপনিবেশিক আমলের সেই পর্বটির কথাই শুধু ধরা যায় যখন জাতীয়তাবাদের অস্তিত্ব একেবারেই সন্দেহের অতীত, তখনও বহু বিরাট আন্দোলন ঘটেছে যার সবটাই বা অনেকখানিই জনসাধারণের স্বতন্ত্র উদ্যোগের দৃষ্টান্ত, যেমন অসহযোগ যুগের কোনও কোনও সমাবেশ, ১৯৪২-এর অগাস্ট সংগ্রাম, কিংবা দেশভাগের পূর্বাহ্ণে নৌবিদ্রোহকে উপলক্ষ করে শ্রমজীবী জনতার অভ্যুত্থান।

উচ্চবর্গের দৃষ্টিভঙ্গির বাহন ইতিহাসবিদ্যার সাধ্য নেই যে জাতীয়তাবাদের এই গুরুত্বপূর্ণ দিকটা স্বীকার করে কিংবা ব্যাখ্যা করে। কারণ তা হলেই মেনে নিতে হয় যে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম শুধু উচ্চবর্গের কৃতিত্ব নয়, এবং সেই অস্বস্তিকর সত্যটা

তাদের স্বার্থ ও আদর্শের—ইডিয়োলজির—বলগায় বাঁধা ইতিহাসের সঙ্গে খাপ খায় না। অথচ ওই ধরনের সমাবেশের ব্যাপক ও সংগ্রামী ভূমিকা এতই স্বতঃপ্রকাশ যে তা উপেক্ষা করা চলে না। সুতরাং ওই ইতিহাসে সাক্ষ্যপ্রমাণ সব উড়িয়ে দিয়ে জনসাধারণের যা স্বতন্ত্র সৃজনী প্রতিভার ফল, উচ্চবর্গ তাকে আত্মসাৎ করে চালিয়ে দিচ্ছে নিজেরই চিন্তা ও কাজ বলে। এক কথায়, এই বিদ্যা ভারতবাসীর ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতার বিস্তার, গভীরতা ও জটিলতাকে উচ্চবর্গের পক্ষপাতী একটা অপ্রশস্ত, অগভীর, অতি সরল কীর্তিগাথায় পরিণত করেছে।

অথচ যে আদিকল্প থেকে এই ধরনের ব্যাখ্যার উদ্ভব হয়েছে, একদা ইতিহাসবিদ্যার প্রগতি ঘটেছিল তারই জোরে। একথা আমি আগেই বলেছি। তারই জোরে তখন ইতিহাসচেতনায় দেবলীলার পরিবর্তে মানুষের ঐহিকতা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল এবং—জের টেনে—শেষ পর্যন্ত একথাও স্বীকৃতি পেয়েছিল যে ভারতের ইতিহাসে কেবল ইংরেজেরই নয়, ভারতবাসীর (যদিও উচ্চবর্গের অন্তর্ভুক্ত মুষ্টিমেয় ভারতবাসীর) অবদানও আছে। সেই ধাক্কার জোরেই তখন অতীতের কত নতুন দরজা খুলে গিয়েছিল, নতুন তথ্যের খনি আবিষ্কৃত হয়েছিল, রাষ্ট্র সমাজ ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে কত নতুন সম্পর্ক উদ্ভাসিত করেছিল আগলভাঙা হঠাৎ আলো। কিন্তু সেই আদিকল্পটি আজ বৃদ্ধ, সে তার সৃষ্টিশক্তি হারিয়ে ফেলেছে। জ্ঞানবিজ্ঞানের ইতিহাসে এটা মোটেই নতুন ব্যাপার নয়। এক সময় জ্যোতির্বিদ্যার চর্চা হত ভূকেন্দ্রিক আদিকল্পকে আশ্রয় করে। কোপারনিকাস তারই ভিত্তিতে এমন সব প্রশ্ন করে বসলেন যে ওই টলেমীয় বিদ্যার সাহায্যে তার উত্তর মেলে না। এইসব নতুন প্রশ্নের চাপেই শেষ পর্যন্ত সেই পুরনো আদিকল্প ভেঙে পড়ল, তার জায়গা জুড়ে বসল সূর্যকেন্দ্রিক আদিকল্প, এবং জ্যোতির্বিদ্যায় মধ্যযুগীয় চিন্তার রাজত্ব শেষ হল। আলেকজন্দর কোয়ারে, টমাস কুন প্রমুখ ঐতিহাসিকরা দেখিয়েছেন যে এইভাবেই বিজ্ঞানের এক একটি শাখায় সংকট ঘটেছে যখন প্রতিষ্ঠিত আদিকল্পগুলির নিজ প্রতিভাবলেই এমন সব সমস্যা তৈরি হয়েছে যার সমাধান তাদের তত্ত্ব ও অভ্যাসের অধীন নয়, আর তখনই নতুন কোনও আদিকল্প এসে সেই সংকট সমাধান করেছে।

আমরাও ইতিহাসবিদ্যার একটা সংকটের মধ্যে আছি। কারণ তারই অভ্যাস থেকে এমন সব প্রশ্ন উঠেছে যার উত্তর পুরনো আদিকল্পটি থেকে পাওয়া সম্ভব নয়। এই প্রশ্নগুলির একটা সম্পূর্ণ তালিকা তৈরি করে শোনাতে গেলে আপনাদের সময় নষ্ট হবে, কারণ তা অসম্পূর্ণ হতে বাধ্য। গবেষকদের জিজ্ঞাস্যের পার্থক্য এবং বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী নতুন নতুন প্রশ্ন বা পুরনো প্রশ্নই নতুনভাবে উঠছে ও উঠবে। তবে তাদের প্রবণতায় মোটামুটি মিল আছে। সেই মিলের কথা মনে রেখে তাদের বিষয়বস্তুটির একটি সাধারণ বর্ণনা তৈরি করা যায়। প্রশ্নগুলি প্রায় সবই গড়ে উঠেছে একটি গুরুত্বপূর্ণ জিজ্ঞাসাকে ঘিরে। জিজ্ঞাসাটা এই: আমাদের জাতীয়তার আন্দোলনে রাজনৈতিক সমাবেশের চরিত্রটা কী ছিল? বিষয়টা নতুন নয়, কারণ প্রচলিত ইতিহাসবিদ্যার পক্ষেও তা এড়িয়ে যাওয়া সম্ভব হয়নি। যা একেবারেই নতুন তা হচ্ছে প্রচলিত উত্তরগুলি সম্পর্কে সাম্প্রতিক ইতিহাসচেতনার অসন্তোষ এবং সেই অসন্তোষেরই পরিণতি হিসেবে

একদা-অপাংক্তেয় তথ্যকে সম্মানিত করা ঐতিহাসিক বক্তব্যের মধ্যে, ওই কারণেই এতদিন যা বিশ্লেষণের নিঃসংশয়িত পদ্ধতি বলে গণ্য হত তাকে আবার যাচাই করে নেবার চেষ্টা, আর সবচেয়ে বড় কথা—ঔপনিবেশিক যুগের ইতিহাসকে বিচার করা নতুন তাত্ত্বিক দৃষ্টিতে।

দু-একটি দৃষ্টান্ত দিয়ে কথাটা হয়তো আরও পরিষ্কার করে বলা যায়। যেমন একথা যদি সত্যি হয় যে ভারতবাসীর রাজনৈতিক চেতনার উৎপত্তি হয়েছিল ইংরেজের শাসনব্যবস্থা থেকেই এবং তার বিকাশ ঘটে ওইগুলিকে আশ্রয় করেই, তাহলে দেশীয় রাজ্যে প্রজা-আন্দোলন হয়েছিল কোন প্রেরণায়? সেখানে তো অভ্যন্তরীণ, বিশেষ করে গ্রামীণ, শাসনসংস্থায় ইংরেজরা হাত দেয়নি। কিংবা যদি উচ্চবর্গের প্রতিভাই জাতীয়তাবোধ ও জাতীয় আন্দোলনের একমাত্র কারণ হয়ে থাকে তাহলে তাদের প্রতিনিধিস্থানীয় সংগঠন বা ব্যক্তির সর্দারি ছাড়াও, এবং তাদের নেতৃত্ব ও পরামর্শ উপেক্ষা করেই যে সব ঐতিহাসিক গণসমাবেশ ঘটেছিল তার ব্যাখ্যা কেমন করে হয়? উচ্চবর্গের উদ্যোগসিদ্ধ খাড়াখাড়ি সমাবেশই যদি গণ-আন্দোলনের একমাত্র বাহন হয়ে থাকে, তা হলে নিম্নবর্গের মধ্যে ক্ষমতা ও মর্যাদায় সমকক্ষ শ্রেণী গোষ্ঠী জাতি বা সমূহ যে নিজেদেরই উদ্যোগে বারবার সামিল হয়েছে আড়াআড়ি সমাবেশে তার তাৎপর্য বোঝার উপায় কী? এই যে লাখলাখ লোক জেল পুলিশ কালাপানি ফাঁসি নিদেনপক্ষে বেকারি ও অন্নাভাবের অনিবার্য সম্ভাবনা সত্ত্বেও সাড়া দিয়েছিল দেশের ডাকে, আসলে কি তারা সকলেই বা অধিকাংশই নেমিয়ার-বর্ণিত পিঁপড়ের মতো রাজদত্ত সুযোগ-সুবিধার মধুভাণ্ডের দ্বারাই শুধু আকৃষ্ট হয়েছিল? নিঃস্বার্থ আদর্শের কণামাত্রও কি নেই তাদের চৈতন্যে? তাদের সেই চৈতন্য কি নিষ্প্রাণ ও স্থূল জড়পিণ্ড মাত্র যার আলো সবটাই ধার করা উচ্চবর্গের জীবন্ত ও প্রখর চৈতন্য থেকে, পৃথিবীর আলো যেমন ধার করা সূর্য থেকে? যদি তা সত্য না হয়, যদি নিম্নবর্গের চৈতন্যকে একটি স্বতন্ত্র সত্তা বলে স্বীকার করা হয়, তাহলে তার বৈশিষ্ট্য কী এবং উচ্চবর্গের চিন্তাভাবনা, আদর্শ ও মানসিকতার সঙ্গে তার সংঘাত ও সমঝোতা—এক কথায়, তাদের পারস্পরিক সম্পর্ক—বুঝব কোন তত্ত্ব বা বিশ্লেষণ পদ্ধতির সাহায্যে?

এইসব প্রশ্ন উঠছে প্রচলিত আদিকল্পটির অভ্যাস থেকেই, অথচ তার সাধ্য নেই এগুলির উত্তর দেয়। এইটাই সেই আদিকল্পের সংকট। এই সংকটের নানা লক্ষণ দেখা যাচ্ছে ইতিহাসবিদ্যায়। লক্ষণ শুধু এই নয় যে নতুন সমস্যাগুলির মুখোমুখি হয়েও তা সমাধান করতে পারছেন না বলেই উচ্চবর্গের মুখপাত্ররা আগের চেয়েও বেশি তারস্বরে বলার চেষ্টা করেছেন যে ঔপনিবেশিক যুগের রাজনীতি ও জমায়েতের অভিজ্ঞতা সবটাই দেশি বা বিলিতি বুর্জোয়াদের কৃতিত্ব। লক্ষণ আরও এই যে এমন কী যাঁরা জাতীয়তাবাদে ও জাতীয় আন্দোলনে নিম্নবর্গের ভূমিকা সত্যিই বুঝতে ও বর্ণনা করতে চান, সেই সব লেখক ও গবেষকও অনন্যোপায় হয়ে উচ্চবর্গের দৃষ্টিভঙ্গিতেই শরণ নিতে বাধ্য হচ্ছেন এবং সমাজের নীচের তলার স্বতন্ত্র রাজনৈতিক সমাবেশগুলিকেও দলাদলি বা খাড়াখাড়ি জমায়েতের গতানুগতিক ছকে সাজাবার চেষ্টা করছেন। প্রচলিত আদিকল্পটি দেউলে হয়ে গেছে বলেই নিম্নবর্গের চৈতন্যের সুস্থ প্রকাশ বিদ্রোহী

সমাবেশগুলি যেমন ঐতিহাসিক বক্তব্যের মধ্যে তাদের স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে না, তেমনি জাতপাতের ঝগড়া ও সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় তার অসুস্থ প্রকাশকেও গণসমাবেশেরই আর একটি চেহারা বলে স্বীকার না করে চালানো হচ্ছে কেবলমাত্র ইংরেজেরই ভেদনীতির কুফল বলে। অর্থাৎ আবার সেই একই কথা—নিম্নবর্গের মানুষের চেতনায় স্বকীয়তা বলে কিছু নেই: তার মধ্যে যেটুকু ভাল বা মন্দ তার সবটাই যথাক্রমে দেশি ও বিদেশি উচ্চবর্গের কাছ থেকে পাওয়া।

উচ্চবর্গের পক্ষপাতী এই ইতিহাসবিদ্যার সংকট থেকে বেরোতে হলে সমালোচনা দিয়েই শুরু করতে হবে। সমালোচনাই নতুন পথ খোঁজার উপায়। আমি খোঁজার কথাই বলছি, পৌঁছনোর কথা নয়। কারণ পৌঁছে যাব শুধু তখনই যখন একেবারে নতুন কোনও আদিকল্পকে বসানো যাবে পুরনোটির জায়গায়। এই ধরনের পরিবর্তন সময়সাপেক্ষ শুধু নয়, অনেক এগনো-পেছনো, হারিয়ে যাওয়া, হোঁচট খাওয়া তার স্বভাবসিদ্ধ, এবং সেজন্যেই জ্ঞান-বিজ্ঞানের ইতিহাসে আকস্মিকতার অভাব নেই। সুতরাং এই পরিবর্তনের ভবিষ্যৎ একেবারে নির্ভুলভাবে বর্ণনা করার চেষ্টা অবান্তর হবে। তবে যে-সংকটের কথা এতক্ষণ আলোচনা হল তার লক্ষণগুলি মনে রেখে বলা যায় যে ইতিহাসবিদ্যাকে ঢেলে সাজাতে হলে নিম্নবর্গের দিকে চোখ ফেরাতে হবে, ঔপনিবেশিক ভারতের সমাজ সংস্কৃতি অর্থনীতি এবং সব কিছুরই ওপরে রাজনীতিতে তাদের বিশিষ্ট ভূমিকা কী ছিল তা নির্ণয় করতে হবে, সেই উদ্দেশ্যেই নতুন তথ্য খুঁজতে ও পুরনো তথ্যকে নতুনভাবে পড়তে হবে, দরকার হলে বিশ্লেষণের পুরনো কায়দা ছেড়ে নতুন কায়দা তৈরি করে নিতে হবে, আর এই সব কিছুকে সম্ভব করার জন্যেই তথ্যাশ্রিত অভ্যাসের সঙ্গে মেলাতে হবে তাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গি।

২ নিম্নবর্গের রাজনীতি ও ইতিহাসবিদ্যার দায়িত্ব

উচ্চবর্গ ও নিম্নবর্গ বলতে কী বোঝায়, এ-পর্যন্ত তার কোনও বিস্তারিত ব্যাখ্যা করিনি। তবু এই শব্দ দুটি যে ঔপনিবেশিক সমাজের মধ্যে একটা মৌলিক ভেদের স্থূল সংকেত হিসেবেই ব্যবহৃত হয়েছে, সে বিষয়ে কারও ভুল হবার কথা নয়। আমার বাকি বক্তব্যের প্রস্তাবনা করছি ওই দুটি শব্দের সংজ্ঞা দিয়ে।

উচ্চবর্গ বলতে আমি বোঝাতে চাই তাদেরই, ইংরেজ শাসিত ভারতবর্ষে যারা প্রভুশক্তির অধিকারী ছিল। প্রভুস্থানীয়দের দু-ভাগে ভাগ করা যায়—বিদেশি ও দেশি। বিদেশি প্রভুগোষ্ঠীর মধ্যে যারা এই সংজ্ঞাসম্মত তারাও দু-ধরনের—সরকারি ও বেসরকারি। সরকারি বলতে গণ্য ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রের অভারতীয় কর্মচারী ও ভৃত্য সকলেই; আর বেসরকারি বলতে গণ্য বিদেশিদের মধ্যে যারা শিল্পপতি, বণিক, অর্থব্যবসায়ী, খনির মালিক, জমিদার, নীলকুঠি চা-বাগান কফিক্ষেত বা ওই জাতীয় যে সব সম্পত্তি প্ল্যান্টেশন প্রণালীতে চাষ করা হয় তার মালিক ও কর্মচারী, খ্রিস্টান মিশনারি, যাজক, পরিব্রাজক ইত্যাদি।

দেশি প্রভুগোষ্ঠীর মধ্যেও একটা মোটা ভাগ ছিল সর্বভারতীয় ও আঞ্চলিক স্বার্থের পার্থক্য অনুযায়ী। সর্বভারতীয়দের গণ্য বৃহত্তম সামন্ত প্রভুরা, শিল্পে ও বাণিজ্যে লিপ্ত

সবচেয়ে শক্তিমান বুর্জোয়ারা এবং ঔপনিবেশিক আমলাতন্ত্রে বা শাসনযন্ত্রের অন্যত্র যারা ছিল সবচেয়ে উচ্চপদের অধিকারী।

দেশি প্রভুগোষ্ঠীর আঞ্চলিক বা স্থানীয় প্রতিনিধিরাও আবার দু-রকমের। এক রকম হচ্ছে তারাই যারা আসলে সর্বভারতীয় প্রভুগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত হওয়া সত্ত্বেও বিশেষ বিশেষ অবস্থায় ক্ষমতাবিন্যাসের আঞ্চলিক বা স্থানীয় উপাদান হিসেবে সক্রিয় হয়ে ওঠে। আর এক রকম হচ্ছে তারা যাদের প্রভুত্ব ষোলো আনাই আঞ্চলিক বা স্থানীয়, কিংবা যারা অন্য সব অর্থে প্রভুগোষ্ঠীর মধ্যে গণ্য না হলেও আঞ্চলিক বা স্থানীয় অবস্থায় প্রভুগোষ্ঠীর স্বার্থ ও দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী কাজ করে, নিজেদের সামাজিক সত্তার ধর্ম অনুযায়ী কাজ করে না।

এই শেষোক্তদের, অর্থাৎ দেশীয় প্রভুগোষ্ঠীর স্থানীয় বা আঞ্চলিক প্রতিনিধিদের সম্পর্কে একটা কথা কিন্তু খুব স্পষ্টভাবে মনে রাখা দরকার। কথাটা এই যে সামগ্রিক ও শুদ্ধ অর্থে উচ্চবর্গের এই অংশের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য হচ্ছে তার অসমতা, এবং সেই অসমতার কারণ দ্বিবিধ: এক—সামাজিক ও অর্থনৈতিক বিকাশের আঞ্চলিক বৈষম্য; আর দুই—এই অংশটির সামাজিক গড়নের সাংকর্য, অর্থাৎ তার অন্তর্ভুক্ত উপাদানগুলির মধ্যে গুণগত পার্থক্য। এই দ্বিবিধ অসমতার ফলেই যে-শ্রেণী বা সমূহ এক অঞ্চলে প্রভুস্থানীয় বলে গণ্য তারাই আবার অন্যত্র আর এক প্রভুগোষ্ঠীর অধীন। একাধারে প্রভুত্ব ও অধীনতার প্রতীক বলেই তাদের মানসিকতা, রাজনৈতিক আদর্শ ও আচরণ, সখ্য ও শত্রুতার ঝোঁক বা তাৎপর্য সবক্ষেত্রেই এক নয়, বরং অর্থ ও উদ্দেশ্যের নানারকম স্ববিরোধিতায় তা প্রায়শই অস্পষ্ট ও জটিল হয়ে দেখা দেয়। ঔপনিবেশিক যুগে ভূস্বামীদের মধ্যে যারা নিঃস্ব হয়ে পড়ে, গ্রামভদ্রদের মধ্যে যারা আর্থিক বা সামাজিক ক্ষমতায় একটু খাটো, মাঝারি কৃষকদের মধ্যে যারা অপেক্ষাকৃত ওপরের দিকে এবং ধনী কৃষকশ্রেণী—এরা সকলেই আমার সংজ্ঞার শুদ্ধ অর্থে নিম্নবর্গের অন্তর্গত হলেও বহুক্ষেত্রেই অবস্থার চাপে ও চৈতন্যের অন্তর্দ্বন্দ্বে উচ্চবর্গের সপক্ষে কাজ করে। আদর্শের বিশুদ্ধতা থেকে বাস্তবের এই বিচ্যুতি ও তারই পরিণামে যে ঐতিহাসিক জটিলতার সৃষ্টি হয় তার সন্ধান, বিশ্লেষণ ও বর্ণনাই গবেষণার দায়িত্ব।

ঔপনিবেশিক ভারতে যারা এই সংজ্ঞা অনুযায়ী উচ্চবর্গের অন্তর্গত, সমগ্র জনসংখ্যা থেকে তাদের বাদ দিলে যা অবশিষ্ট থাকে তারাই নিম্নবর্গ। এর মধ্যে শহরের শ্রমিক ও গরিব, সর্বোচ্চ পদের আমলাদের বাদ দিয়ে মধ্যবিত্তের বাকি অংশ, গ্রামের ক্ষেতমজুর, গরিব চাষি ও প্রায়-গরিব মাঝারি নিম্নবর্গের মধ্যে গণ্য। তা ছাড়াও এই সংজ্ঞার শুদ্ধ অর্থে গণ্য হবে নির্বিত্ত ভূস্বামী, অপেক্ষাকৃত হীনবল গ্রামভদ্র, অপেক্ষাকৃত সম্পন্ন মাঝারি কৃষক এবং ধনী কৃষকরাও—যদিও, একটু আগেই যেমন বলেছি, এদের ভূমিকা স্পষ্ট নয় বরং দোটানায় জটিল এবং বাস্তবে এরা অনেক ক্ষেত্রেই নিজেদের সামাজিক সত্তার নিয়ম অনুযায়ী কাজ না করে উচ্চবর্গের স্বার্থ অনুযায়ী চলে।

আমার বক্তব্য থেকে একথা হয়তো এতক্ষণে পরিষ্কার হল যে উচ্চবর্গ নিম্নবর্গের বৈপরীত্য ব্যবহার করে ইংরেজশাসিত ভারতবর্ষে ক্ষমতাবিন্যাসের মুল সূত্রটি সম্পর্কে একটি বিশেষ ধারণায় আমি পৌঁছতে চাই। এই বৈপরীত্যের ওপর জোর দিয়ে

ঔপনিবেশিক যুগের ইতিহাস ব্যাখ্যা করার চেষ্টা প্রয়োজন মনে করি এই জন্যে যে প্রচলিত বিশ্লেষণ-পদ্ধতিগুলির সাহায্যে তখনকার রাজনৈতিক অভিজ্ঞতাকে সমগ্রভাবে বর্ণনা করা সম্ভব নয়, এবং সম্ভব নয় বলেই নিম্নবর্গের ভূমিকা উপেক্ষিত হয়ে থাকে। এই পদ্ধতিগুলি দু-ধরনের: তাদের মধ্যে একটিকে বলা যায় মোটা কায়দা, অন্যটিকে মিহি কায়দা।

মোটা কায়দার বিশ্লেষণে শুধু ইংরেজ ও ভারতীয়দের সম্পর্কটাই রাজনীতির বিষয় বলে স্বীকৃত হয়। ফলে ঐতিহাসিক যদি বিদেশি উচ্চবর্গের পক্ষপাতী হন তা হলে ওই যুগের অভিজ্ঞতা শাসকদের অভিজ্ঞতায় আত্তীকৃত হবে, আর তিনি যদি দেশি উচ্চবর্গের পক্ষপাতী হন তা হলে তা আত্তীকৃত হবে জাতীয়তাবাদী বুর্জোয়াদের চিন্তায় ও কাজে। উভয়তই নিম্নবর্গের ঐতিহাসিক চেতনা ও কর্মের কোনও স্বীকৃতি নেই।

মিহি কায়দার বিশ্লেষণের উদ্দেশ্য জাতি ও শ্রেণীগত সম্পর্ক বিচার করা। সমাজের নীচের তলার বাস্তব অবস্থা বোঝার পক্ষে মোটা কায়দার চেয়ে এটি অনেক বেশি কার্যকর। কিন্তু ঔপনিবেশিক যুগের রাজনীতি সম্পর্কে কোনও সামগ্রিক ধারণা তৈরি করা সম্ভব নয় কেবলমাত্র জাতভেদ ও শ্রেণীভেদের ভিত্তিতে। কারণ বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক বৈষম্যের ফলে জাতে-জাতে ও শ্রেণীতে-শ্রেণীতে পারস্পরিক সম্পর্কের চেহারাটা সর্বত্রই এক রকমের নয়। এই অবস্থায় বিশ্লেষণের কাজ যদি ক্ষমতাবিন্যাসের একটি সাধারণ সূত্র আশ্রয় না করে এগোয় তা হলে জাতনির্ণয় ও শ্রেণীনির্ণয় যতই সূক্ষ্ম ও চুলচেরা হবে, ঐতিহাসিক বিবৃতি ততই বিব্রত হবে অনাবশ্যক তথ্যের বহুলতায় এবং শেষ পর্যন্ত তার পরিণতি হবেই একরকম অনেকত্ববাদী বা প্লুরালিস্ট বর্ণনায় যা আসলে অতীতকে সম্যক বোঝার দায়িত্ব এড়াবার নামান্তর মাত্র।

সুতরাং সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গির উপায় হিসেবে এমন একটা মৌলিক ও কেন্দ্রীয় ধারণা তৈরি করে এগোতে হবে যা দিয়ে ক্ষমতাসূচক সব সম্পর্কই বোঝা বা ব্যাখ্যা করা সম্ভব, যা শ্রেণীসম্পর্ক-জাত সম্পর্ক, শাসকশাসিতের সম্পর্ক ইত্যাদি বিশেষ বিশেষ সম্পর্ক থেকে ভিন্ন প্রকৃতির অথচ ওই সম্পর্কগুলি সবই যার অন্তর্নিবিষ্ট। উচ্চবর্গ নিম্নবর্গের বৈপরীত্য এই রকমই একটা কেন্দ্রীয় ধারণা। ঔপনিবেশিক রাষ্ট্র ও সমাজে এমন কোনও অভিব্যক্তি নেই যা এই দ্ব্যণুক সম্বন্ধ দিয়ে বোঝা বা বোঝানো যায় না। জাত শ্রেণী সম্প্রদায় ও অন্যান্য সমূহের নানা অংশের মধ্যে, রাজাপ্রজা স্ত্রীপুরুষ জ্যেষ্ঠকনিষ্ঠ প্রভৃতির মধ্যে, অর্থনৈতিক সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক জীবনের সর্বত্র ক্ষমতাবৈষম্য সেই বৈপরীত্যের বিশেষ বিশেষ প্রকাশ। এবং তা যেমন সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে প্রকট, আঞ্চলিক ক্ষেত্রেও তেমনি। এক কথায়, যুক্তিসিদ্ধ এবং প্রয়োগে নমনীয় বলেই, অভিজ্ঞতার বৈশিষ্ট্য ও সামান্যতা উভয়কেই বোধগম্য করতে পারে বলেই এই ধারণাটি এত শক্তিশালী।

এই বৈপরীত্যের কথা মনে রাখলে ঔপনিবেশিক আমলের রাজনীতি সম্পর্কে একটা প্রচলিত এবং প্রায় স্বতঃসিদ্ধ বলে স্বীকৃত বিশ্বাস সম্পর্কে প্রশ্ন জাগে। বিশ্বাসটা এই যে ভারতের রাজনৈতিক জীবনের সবটাই একটিমাত্র উপাদানে তৈরি, সেই উপাদান ইংরেজ-প্রবর্তিত উদারনৈতিক শিক্ষাসংস্কৃতি থেকে নেওয়া বা তারই প্রত্যক্ষ ফল, এবং

ওই রাজনীতির ক্ষেত্রটি অখণ্ড। ইতিহাসের সব ব্যাখ্যাতেই— তা ঔপনিবেশিকতার পক্ষপাতী হোক কিংবা জাতীয়তাবাদের পক্ষপাতী হোক—সব ব্যাখ্যাতেই এই কথাটা অবিসংবাদী বলে অনুমিত হয় এবং এটাকে সত্য বলে ধরে নিয়েই বক্তব্য সাজানো হয়ে থাকে।

কিন্তু একটু ভাবলেই বোঝা যাবে যে বিশ্বাসটা অমূলক। কারণ ইংরেজ আমলের ইতিহাস উচ্চবর্গের রাজনীতির পাশাপাশি আর একটি রাজনীতির অস্তিত্ব এতই স্পষ্ট যে সে বিষয়ে ভুল হবার উপায় নেই। সেই রাজনীতির ক্ষেত্রে নিম্নবর্গই নায়ক, উচ্চবর্গ নয়; নিম্নবর্গের প্রতিভাই সেই রাজনীতির অন্তর্ভুক্ত সব চিন্তা ও কাজের চালিকা শক্তি। এক কথায়, তা রাজনীতির একটি স্বতন্ত্র ক্ষেত্র। ক্ষেত্রটির বৈশিষ্ট্য, তার ঐতিহাসিক উৎপত্তি, সমাবেশের চরিত্র, আদর্শরূপ ও বাস্তব ভিত্তি অনুযায়ী সংক্ষেপে বর্ণনা করছি।

প্রথম বৈশিষ্ট্য এই যে এই রাজনীতির মূল উপাদানগুলি ইংরেজ রাজত্ব শুরু হবার আগে থেকেই বিদ্যমান ছিল, কিন্তু সেই অর্থে সনাতন হলেও প্রাকব্রিটিশ যুগের উচ্চবর্গীয় রাজনীতির মতো তা ঔপনিবেশিক অবস্থার চাপে নষ্ট বা নিষ্ক্রিয় হয়ে যায়নি। বরং নতুন অবস্থাব সঙ্গে সংগতি রেখে এবং তারই মধ্যে চেতনা ও ব্যবহারের নানা দ্বন্দ্বের ফলে আকারে ও গুণে কিছু নতুনত্ব নিয়ে তা ঔপনিবেশিক আমলের প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত কাজ করে গেছে—এবং এখনও বোধ হয় কাজ করে যাচ্ছে (যদিও স্বাধীন ভারতের কথা আমি বর্তমান আলোচনার বাইরে রাখতে চাই)। মোটামুটি বলা চলে যে, ঐতিহাসিক উৎপত্তি ও বিকাশের দিক থেকে বিচার করলে নিম্নবর্গের রাজনীতির ক্ষেত্রটি পুরনো হয়েও আধুনিক এবং উচ্চবর্গের বাজনীতির তুলনায় তার পরিপ্রেক্ষিতের গভীরতা ও তার সত্তার ঘনত্ব অপেক্ষাকৃত বেশি।

এই রাজনীতির দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য নিম্নবর্গের সমাবেশের কায়দায় ও চরিত্রে। উচ্চবর্গের উদ্যোগজাত সমাবেশকে যদি খাড়াখাড়ি বলে বর্ণনা করা যায় তাহলে নিম্নবর্গের উদ্যোগজাত সমাবেশকে আড়াআড়ি বলে বর্ণনা করা চলে। ঔপনিবেশিক শাসন বজায় রাখার জন্য ইংরেজরা যেসব সংস্থা এদেশে চালু করেছিল এবং প্রাক্-ঔপনিবেশিক আমলে সামন্তশাসনের সহায়ক যেসব সংস্থা তখনও একান্ত অকেজো হয়ে যায়নি, সেগুলিই ছিল খাড়াখাড়ি সমাবেশের উপায়। কিন্তু আড়াআড়ি সমাবেশের প্রধান উপায় নিম্নবর্গের সমাজে কুটুম্বিতা ও আঞ্চলিকতার প্রত্ন বিধিব্যবস্থা কিংবা শ্রেণীসংস্থা বা এই দুই-এর নানারকম সমন্বয়। উচ্চবর্গের জমায়েতের ঝোঁক প্রধানত ছিল আইনের মধ্যে থেকে বরং আইনকে আশ্রয় করেই কাজ চালানো, আইনভঙ্গের মধ্যে যথাসাধ্য লিপ্ত না হওয়া; নিম্নবর্গের জমায়েত যথাসম্ভব আইনসংগত রাস্তা ধরে এগোত ঠিকই, কিন্তু প্রয়োজন হলে তা বেআইনি এমনকি হিংসাত্মক হয়ে উঠত অপেক্ষাকৃত সহজে এবং আরও তাড়াতাড়ি—তাই এই জমায়েত উচ্চবর্গের কাছে অনেক সময়েই খুব অপ্রত্যাশিত ও স্বতঃস্ফূর্ত মনে হত। ঔপনিবেশিক যুগে নিম্নবর্গের এই জমায়েতের সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ ও শক্তিশালী রূপ দেখা যায় তৎকালীন কৃষকবিদ্রোহগুলিতেই। শহুরে মধ্যবিত্ত, শ্রমিক বা অন্যান্য গরিব জনতার সমাবেশেও তখন ওই প্রকার বিদ্রোহী কৃষক জমায়েতের আদিকল্পটির বহু লক্ষণ স্পষ্টই চোখে পড়ে। উচ্চবর্গের পক্ষপাতী

ইতিহাসবিদ্যার পক্ষে নিম্নবর্গের জমায়েতের এই বৈশিষ্ট্যগুলি স্বীকার করা সম্ভব নয়, কারণ করলেই যে-আদিকল্পটি সেই ইতিহাসবিদ্যার ভিত্তি তাকে অস্বীকার করতে হয়।

এই রাজনীতির তৃতীয় বৈশিষ্ট্য আদর্শগত। নিম্নবর্গের সামাজিক সত্তা যে সব উপাদানে তৈরি তাদের বাস্তব অভিজ্ঞতা, চৈতন্যের স্তর ও রাজনৈতিক লক্ষ্য সব ক্ষেত্রে সমান নয়। তাই তাদের আদর্শগুলির মধ্যে অমিল, এমন কি পরস্পরবিরোধিতাও ছিল, এবং তারই ফলে সেই রাজনীতির সামগ্রিক আদর্শের চেহারাটা অবস্থাভেদে এক-এক রকমের হয়ে দেখা দিত। মোটামুটি বলা চলে যে, কোনও পরিস্থিতি বা ঘটনার মধ্যে এই রাজনীতির এক বা একাধিক উপাদান যখন অন্য উপাদানগুলির চেয়ে বড় হয়ে উঠত তখন তারই প্রভাবে অন্তত সাময়িকভাবে সেই রাজনীতির আদর্শগত গুণ ও বৈশিষ্ট্য নির্ধারিত হত। ফলেই অবস্থাভেদে এই আদর্শের নানান ধারার মধ্যে কিছু কিছু প্রকারভেদ ও অসমতা লক্ষ কবা যায়। তবে অসমতা সত্ত্বেও যা সর্বত্র প্রকট তা হচ্ছে উচ্চবর্গের প্রতি আনুগত্য ও বিরোধিতার সমন্বয়। এই দুটির আপেক্ষিক গুরুত্বেও আবার তারতম্য ছিল, কিন্তু বিরোধিতা যখন আনুগত্যকে ছাড়িয়ে যেত তখনই নিম্নবর্গের রাজনীতির মৌলিকতা এবং উচ্চবর্গের রাজনীতি থেকে তার পার্থক্য সবচেয়ে স্পষ্ট হয়ে উঠত।

এই রাজনীতির চতুর্থ বৈশিষ্ট্যটির মূলাধার প্রকৃতির দেওয়া ও মানুষের তৈরি সেই বাস্তব অবস্থা যা দিয়ে নিম্নবর্গের অর্থনৈতিক জীবনযাত্রা, তাদের কায়িক ও মানসিক শ্রমের সংগঠন, এবং সর্বোপরি জীবিকা ও শ্রমের শর্তস্বরূপ শোষকশোষিতের ক্ষমতাগত সম্পর্কগুলি নির্ধারিত হয়। উচ্চবর্গের ইতিহাসবিদ্যায় এই সবকিছুই একটা সংকীর্ণ অর্থনৈতিক অভিজ্ঞতায় পর্যবসিত হয়েছে। তার পক্ষে কিছুতেই স্বীকার করা সম্ভব নয় যে সেই অর্থনৈতিক অভিজ্ঞতা আসলে প্রভুত্ব ও অধীনতার সূত্রে নিয়ন্ত্রিত এবং এই দুটির টানাপোড়েনেই নিম্নবর্গের রাজনীতির অনেক নকশা বোনা হয়ে থাকে।

নিম্নবর্গের রাজনৈতিক বৈশিষ্ট্য প্রসঙ্গে এতক্ষণ যা বলেছি সে বিষয়ে দুটি কথা অবশ্যই মনে রাখা দরকার, নইলে অনেক বাজে তর্কে সময় নষ্ট হবে। প্রথম কথাটি হচ্ছে এই যে বৈশিষ্ট্যগুলি আমি যেভাবে বর্ণনা করলাম তা তাদের শুদ্ধ রূপ। বলাই বাহুল্য যে ঔপনিবেশিক যুগের বাস্তব রাজনীতির অভিজ্ঞতার মধ্যে বৈশিষ্ট্যগুলিকে অবিকল এই রূপেই দেখার চেষ্টা নিরর্থক। স্থান, কাল ও পাত্র ভেদে এই বৈশিষ্ট্যগুলি তাদের সাধারণ চরিত্র অক্ষুণ্ণ রেখেই এক-এক অবস্থায় এক-এক ভঙ্গিতে কাজ করবে। আমি তাদেব শুদ্ধ রূপটিকেই তুলে ধরেছি শুধু এই জন্যেই যে, আমার উদ্দেশ্য একটি তাত্ত্বিক প্রস্তাবের মূলসূত্রগুলি এখানে উল্লেখ করা। কিন্তু আমিই যখন আবার কোনও বিশেষ ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতাকে ব্যাখ্যা করতে বসব তখন আমার কাজ হবে সেই তত্ত্বের আলোকে ওই অভিজ্ঞতার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যগুলির মিশ্ররূপকে পূর্বোক্ত শুদ্ধরূপের সঙ্গে তুলনা করা এবং তুলনার ফলে যে পার্থক্য ধরা পড়বে তা দিয়েই সেই ঐতিহাসিক বিষয়টার অনন্যতা বর্ণনা করা।

এ প্রসঙ্গে আমার দ্বিতীয় কথাটি হচ্ছে এই যে, বৈশিষ্ট্যগুলির একটা পাকা ফর্দ বানিয়ে পেশ করা আমার উদ্দেশ্য নয় এবং তা করাও সম্ভব নয়। ঔপনিবেশিক আমলের

ইতিহাস নিয়ে এখন পর্যন্ত যা কাজ হয়েছে তারই ভিত্তিতে একটা সাধারণ ধারণাকে মোটা কথায় সাজিয়ে বলা গেল। গবেষণা যতই এগোবে এবং নিম্নবর্গের ইতিহাস নিয়ে চিন্তায় ও লেখায় আমাদের চেষ্টা যতই ব্যাপক ও নিপুণ হবে, বৈশিষ্ট্যগুলির চেহারা ততই বিশদ হয়ে উঠবে। তবে একান্ত সঙ্গত কারণেই অসমাপ্ত এই বর্ণনা থেকে একথাটা হয়তো পরিষ্কার হয়ে থাকবে যে প্রচলিত আদিকল্পটিকে আশ্রয় করে ঔপনিবেশিক আমলের রাজনীতি সম্পর্কে যে অদ্বৈতবাদী ধারণা ইতিহাসবিদ্যায় স্বতঃসিদ্ধ বলে মান্য, তা দিয়ে ওই যুগের ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতাকে সমগ্রভাবে বোঝা বা ব্যাখ্যা করা যায় না, বরং সেই অদ্বৈতবাদী ধারণাটিই আসলে ওই অভিজ্ঞতার বর্ণনায় উচ্চবর্গের প্রাধান্য কায়েম রাখার ও নিম্নবর্গের ভূমিকা অস্বীকার করার মূল শর্ত।

এই বৈশিষ্ট্যবিচারের ভিত্তিতে তা হলে নিঃসন্দেহেই বলা চলে যে ঔপনিবেশিক যুগের রাজনীতির ক্ষেত্রটি দ্বিধাবিভক্ত। কিংবা অন্য উপমায় বলা যায় যে, উচ্চবর্গ ও নিম্নবর্গের চৈতন্য ও কর্মের বাহন দুটি স্বতন্ত্র ধারা বয়ে চলেছে ওই রাজনীতির মধ্যে। তবে সেই সঙ্গে একথাও বেশ জোর দিয়েই বলা দরকার যে স্বাতন্ত্র্য সত্ত্বেও ওই ধারা দুটি পরস্পর নিরপেক্ষ নয়। নিরপেক্ষ নয় তাদের বৈপরীত্যের জন্যেই। বিপরীত বলেই যে কোনও দ্ব্যণুক সম্বন্ধের রাশি দুটির মতো তাদের একটি অপরটির অস্তিত্ব সূচনা করে, ঘোষণা করে।

কিন্তু এই সাধারণ অর্থ ছাড়াও একটি বিশেষ অর্থে তারা সম্পৃক্ত। সম্পৃক্ত এই কারণে যে উচ্চবর্গের কোনও কোনও অংশ কখনও কখনও এই দুটি ধারাকে তাদের নিজেদের উদ্যোগে ও নেতৃত্বে মেলাতে চেষ্টা করেছে উভয়বর্গের একত্রিত সমাবেশে। বিশেষ করে বুর্জোয়াদের চেষ্টায় এই ধরনের সমাবেশ কয়েকটি বিরাট সাম্রাজ্যবাদবিরোধী সংগ্রামের উপলক্ষ ও হাতিয়ার হিসেবে কাজ করেছে, যদিও তা সব ক্ষেত্রেই নেতাদের অভিপ্রেত ছিল এমন নয়, বরং তাদের মধ্যে আপসের মনোবৃত্তি, জঙ্গি গণ-আন্দোলনের তেজ সম্পর্কে তাদের ভয় এবং নিম্নবর্গের চৈতন্যের নানা দুর্বলতার ফলে এইসব-লড়াই দীর্ঘস্থায়ী হয়নি, তাদের প্রতিশ্রুতিও পূর্ণ হয়নি। আন্দোলনে ভাঁটা এসেছে যখন, তখনই আবার বেণীবন্ধ শিথিল হয়ে পড়েছে এবং রাজনীতির স্বতন্ত্র ধারা দুটি তাদের নিজ নিজ খাতে ফিরে গেছে। উচ্চবর্গের নেতৃত্বেই এই দুটি ধারা কখনও আবার মিলিত হয়েছে এমন সব জমায়েতে যা সাম্রাজ্যবাদকে আঘাত করা দূরে থাকুক কার্যত তাকেই সাহায্য করেছে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বা সামন্তশ্রেণীর অন্তর্ঘাতী হিংস্রতার অস্ত্র হিসেবে নিম্নবর্গকে ব্যবহার করে। তবে সমাবেশের উদ্দেশ্য প্রগতির অনুকূলেই হোক বা প্রতিক্রিয়ার অনুকূলে, একথা লক্ষ করার মতো যে এই দুটি ধারা বা ক্ষেত্রের প্রতিচ্ছেদে বিস্ফোরণ ঘটেছে বারেবারেই, কারণ ঠিক তখনই উচ্চবর্গের নিয়ন্ত্রণ উপেক্ষা করে তারই উদ্যোগজাত আন্দোলনের মধ্যে নিম্নবর্গের রাজনীতি তার বৈশিষ্ট্যগুলিকে মুদ্রিত করেছে।

এই প্রতিচ্ছেদের বহু দৃষ্টান্ত আছে জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের ইতিহাসে। কিন্তু উচ্চবর্গের অগ্রণী শ্রেণী বুর্জোয়াদের নেতৃত্ব সেই সব আন্দোলনকে চূড়ান্ত পর্যায়ে এগিয়ে নিতে পারেনি, তাকে পরিণত করতে পারেনি জাতির মুক্তিযুদ্ধে এবং বুর্জোয়াশ্রেণীর

সর্বেশ্বরতা প্রতিষ্ঠা করে বুর্জোয়া-গণতান্ত্রিক বিপ্লব ঘটাবার দায়িত্বও পুর্ণ করতে পারেনি।

অপরদিকে নিম্নবর্গের রাজনীতির ক্ষেত্রে নানা স্বতন্ত্র উদ্যোগ গড়ে উঠেছে ঠিকই, তবু তাও জাতীয় আন্দোলনকে মুক্তিযুদ্ধে পরিণত করতে পারেনি। তার প্রধান কারণ হয়তো ইংরেজশাসিত ভারতে শ্রমিকশ্রেণীর অপরিণত অবস্থা তার বাস্তব জীবনে ও চৈতন্যে। ফলে শ্রমিক কৃষকের সংগ্রামী ঐক্য গড়ে ওঠেনি, তাদের সর্বেশ্বরতা প্রতিষ্ঠিত হয়নি, এবং নয়া-গণতান্ত্রিক বিপ্লব ঘটাবার ঐতিহাসিক দায়িত্ব পালন করতে পারেনি নিম্নবর্গের মধ্যে অগ্রণী যারা তারাও।

এই দ্বিবিধ ব্যর্থতাই ঔপনিবেশিক যুগের রাজনৈতিক অভিজ্ঞতার মর্মবস্তু। আমাদের চিন্তায় ও বক্তব্যে এই বিষয়টিকে যদি সম্যক গুরুত্ব দিতে হয় তাহলে ইতিহাসবিদ্যায় উচ্চবর্গের পক্ষপাতী আদিকল্পটির বিরুদ্ধে সচেতনভাবেই বিদ্রোহ করতে হবে, আমাদের সাধনাকে নতুন তাত্ত্বিকতা, নতুন তথ্য ও নতুন পদ্ধতি দিয়ে সমৃদ্ধ করে তুলতে হবে, উচ্চবর্গ ও নিম্নবর্গের রাজনীতির বৈপরীত্য ও তাদের সম্পৃক্তি যথাযথভাবে বিশ্লেষণ ও বর্ণনা করতে হবে, এবং সেজন্যই নিম্নবর্গের ভূমিকাটিকে তার প্রাপ্য সম্মান দিতে হবে।

এই প্রস্তাবসম্মত কাজ অর্থাৎ গবেষণা ও লেখা ঠিক কীভাবে এগোবে তার খুঁটিনাটি আগে থেকে বর্ণনা করার চেষ্টা নিরর্থক। যে কোনও সৃষ্টিশীল প্রয়াসের মতো ইতিহাস রচনার মধ্যেও আকস্মিক ও অপ্রত্যাশিতের চমক হামেশাই দেখা যায়। এই আকস্মিকতা একদিকে যেমন নতুন তথ্য আবিষ্কার ও পুরনো তথ্যকে নতুন ভাবে দেখার অবশ্যম্ভাবী ফল, অপরদিকে অতীত অভিজ্ঞতার সঙ্গে ঐতিহাসিকের ব্যক্তিত্ব ও প্রতিভার লীলাই তার কারণ। সুতরাং নিম্নবর্গের ইতিহাসবিদ্যার প্রগতি কোনও ফতোয়া বা ভবিষ্য-বাণী দিয়ে নির্দিষ্ট করা সম্ভব নয়। তবে তার মূল লক্ষের দিকে চোখ রেখে দু-একটি কথা বলতে চাই যা হয়তো এই অভ্যাসের একেবারেই প্রাথমিক পর্যায়ে কাজে লাগাতে পারে।

এই কাজে যাঁরা নামতে চান তাঁদের প্রথমেই মনে রাখা দরকার যে নিম্নবর্গের ইতিহাস নিছক তথ্য থেকে স্বতঃস্ফূর্তভাবে নির্গলিত হবে না। তথ্য ছাড়া ইতিহাস হয় না ঠিকই, কিন্তু তা নিছক তথ্য নয়। নিছক তথ্য আভিধানিক শব্দের মতো। ওই শব্দগুলিকে অভিধান থেকে বাছাই করে তুলে যদি বাক্যবন্ধে সাজানো যায় তবেই পারস্পরিক সম্পর্কের আলোকে তারা তাদের বিশিষ্ট অর্থে ব্যক্ত হবে। শব্দ বাছাই করা ও সাজানো যেমন বক্তার চৈতন্যের অভিব্যক্তি ভাষায়, তথ্য বাছাই করা ও সাজানো তেমনি ঐতিহাসিকের চৈতন্যের অভিব্যক্তি ইতিহাসবিদ্যায়। তথ্য বাছাই ও সাজানোর জন্যে তাই একান্ত সচেতনভাবে দুটি মূল ধরে এগোলে দিগ্‌ভ্রান্তির সম্ভাবনা কম। সূত্র দুটি সম্পর্কে আগেই বিস্তারিত বলা হয়েছে, তাই এখানে শুধু উল্লেখ করাই যথেষ্ট হবে।

এক নম্বর সূত্র:

ঔপনিবেশিক ভারতে রাজনীতির ক্ষেত্রটি অখণ্ড নয়, দ্বিধাবিভক্ত। তার মধ্যে দুটি স্বতন্ত্র ধারা—উচ্চবর্গের রাজনীতির ধারা ও নিম্নবর্গের রাজনীতির ধারা। স্বতন্ত্র হলেও এই ধারা দুটি পরস্পর নিরপেক্ষ নয়। তারা বৈপরীত্যে বাঁধা এবং বেণীবন্ধের মতো কখনও কখনও তারা ঐতিহাসিক প্রতিচ্ছেদে যুক্ত হয়, কখনও আবার নিজ নিজ খাতে

বয়ে চলে।

দুই নম্বর সূত্র:

নিম্নবর্গের ইতিহাস শুধু ঘটনার পারম্পর্য আশ্রয় কবে বোঝা বা লেখা যাবে না। ঘটনা বা সাধারণভাবে বাস্তব পরিস্থিতির মধ্যে উচ্চবর্গের সঙ্গে নিম্নবর্গের সম্পর্ক পরিষ্কার করে বিশ্লেষণ করতে হবে। এই সম্পর্ক আসলে প্রভুত্ব ও অধীনতার সম্পর্ক, বৈপরীত্যের দ্ব্যণুক সম্পর্ক।

এই দুটি সূত্র ধরে গবেষণা, আলোচনা ও রচনার বিষয়বস্তু এবং বিশ্লেষণপ্রণালী সম্পর্কে একটি সংক্ষিপ্ত প্রস্তাব আমি রাখতে চাই। এই প্রস্তাবটি কোনও পাকা 'প্রোগ্রাম' নয়। এই সবটাই আমার ব্যক্তিগত চিন্তা অভ্যাস অভিজ্ঞতা ও রুচির অপরিণত এবং ইদানীন্তন নিদর্শন মাত্র। কাজ যত এগোবে ততই এই প্রস্তাব আরও পরিশীলিত হবে, এবং আশা করি সকলেই নিজ নিজ চিন্তা ও অভ্যাসের সাহায্যে এটিকে বদলে ও শুধরে নেবেন।

এই প্রসঙ্গে আমার প্রথম মন্তব্য এই যে নিম্নবর্গের অন্তর্ভুক্ত সকল শ্রেণী গোষ্ঠী ব্যক্তি ও সমূহকে ঐতিহাসিক গবেষণা ও বক্তব্যের বিষয় বলে স্বীকার করতে হবে সচেতনভাবে। এদের মধ্যে শ্রমিক, কৃষক, নিম্নমধ্যবিত্ত, গ্রাম ও শহরের গরিব জনতা ইত্যাদি গণ্য তো বটেই। কিন্তু ঔপনিবেশিক সমাজে প্রভু ও অধীনের সম্পর্কটা যাদের জীবনে খুবই প্রকট অথচ যারা আমাদের ইতিহাসচিন্তায় এখনও প্রায় অনুপস্থিত সেই আদিবাসী, নিম্নবর্ণ ও নারীদের ভূমিকা নিয়ে বিশেষ করে ভাবতে ও লিখতে হবে। এইদিকে এগোতে গেলেই পরিষ্কার বোঝা যাবে যে উচ্চবর্গের দৃষ্টিভঙ্গি ও তার বাহন প্রচলিত আদিকল্পটি আমাদের পথ জুড়ে আছে। তাই ১৯১৮ সালের আমেদাবাদ সুতাকলে ধর্মঘটের ইতিহাস যখন লিখতে বসব তখন যেন মনে রাখি যে সেই ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতা মহাত্মা গান্ধী, শংকরলাল ব্যাংকার ও অনসূয়া সারাভাইয়ের জীবনীর অধ্যায় মাত্র নয়, তার মধ্যে ধর্মঘটীদের চৈতন্যের—শ্রেণীচেতনা যার অন্যতম উপাদান—তার একটি মূল্যবান ইতিহাস আছে। সে ইতিহাস মহাদেব দেশাই বা তেন্দুলকরের পক্ষে লেখা সম্ভব হয়নি, তা আমাদেরই লিখতে হবে একেবারে আর-এক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে, আর একটি আদিকল্পের প্রেরণায়। এ কাজে হাত দিলে দেখা যাবে যে উনিশ শতকের কৃষকবিদ্রোহগুলিকে নেহাৎ উদ্দেশ্যবাদী কায়দায় বিংশ শতাব্দীর জাতীয়তা ও সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনে অঙ্গীভূত না করে তাদের স্বমহিমায় দেখতে গেলে বিদ্রোহী চৈতন্যের একটি প্রধান লক্ষণ যে ধর্মচেতনা তাকে উড়িয়ে দেওয়া তো যায়ই না যেমন একজন বামপন্থী লেখক তাঁর বহুল প্রচারিত রচনায় করেছেন, বরং ধর্মবিশ্বাসকে সেই চৈতন্যের একটি ধ্রুবগুণ বলে স্বীকার করতে হয়। এ কাজে হাত দিলেই দেখা যাবে যে রাজনৈতিক জীবনী-সাহিত্য পুরনো ইতিহাসবিদ্যার প্রভাবে শুধু উচ্চবর্গের গুণকীর্তনে মুখর; আমরা চাই যে তার মধ্যে তিতুমীর, সিদো, কানহু, মাদারি পাসীর কীর্তি উচ্চারিত হোক। আমরা এমন ইতিহাস চাই যার মধ্যে মেয়েরা অতীত সমাজের তথ্যকণিকা মাত্র নয়, যার মধ্যে তারা ঐতিহাসিক সত্য বলে স্বীকৃত; যার মধ্যে আদিবাসীরা কৃষকদের জীবন ও আন্দোলনের সাধারণ অভিজ্ঞতা থেকে ব্যতিক্রম বলে

বিবেচিত হবে না, কৃষক সমাজের সবচেয়ে নিঃস্ব ও সংগ্রামী অংশ বলেই বিবেচিত হবে; যার মধ্যে বর্ণানুক্রমে নিম্নতম বলে গণ্য যারা তাদের আন্দোলনগুলিকে উচ্চবর্গের অনুকারী তথাকথিত সংস্কৃতায়নের সিঁড়ি বলেই শুধু বর্ণনা করা হবে না, বরং অনুকরণের পাশাপাশি এমনকী তার চেয়েও বেশি যে আক্রোশ ও তজ্জনিত প্রতিবাদ ওই সব আন্দোলনের স্বভাবসিদ্ধ তাও বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যার বিষয় বলে মানা হবে।

আমার দ্বিতীয় মন্তব্য এই যে নিম্নবর্গের ইতিহাসে গণসমাবেশের প্রসঙ্গটিকে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া দরকার। কারণ প্রচলিত আদিকল্পটির চাপে ইতিহাসবিদ্যার ঠিক এইখানটাতেই অনেক বিকৃতি ও অসত্যকে একেবারে স্বতঃসিদ্ধের আসনে বসানো হয়েছে। গণসমাবেশের প্রত্যেকটি অভিজ্ঞতাকে তাই নতুন করে বিচার করার, নতুনভাবে তার মূল্যায়নের সময় এসেছে। যাঁরা নিম্নবর্গের ইতিহাসের এই দিকটা নিয়ে কাজ করতে চান তাঁদের উদ্দেশ্যে দু-একটি কথা বিশেষ জোর দিয়ে বলতে চাই।

(১) মনে রাখবেন যে পুরনো আদিকল্পটির প্রভাবে ইতিহাসবিদ্যায় সাধারণত সব গণসমাবেশকেই, বিশেষ করে জাতীয়তাবাদী আন্দোলন সংক্রান্ত সমাবেশগুলিকে শুধু খাড়াখাড়ি জমায়েত বলেই ধরে নেওয়া হয়। কারণ, এই দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী উচ্চবর্গের প্রেরণা ছাড়া জনগণ কিছুতেই রাজনীতির ক্ষেত্রে সক্রিয় হতে পারে না। নিম্নবর্গের ইতিহাস লিখতে গেলে এই একদেশদর্শিতা প্রথমেই বর্জন করা দরকার। জমায়েতের মধ্যে খাড়াখাড়ি ও আড়াআড়ি এই দুটো কায়দাই কাজ করছে এই অনুমান আশ্রয় করেই গবেষণার প্রকল্প তৈরি করতে হবে। তা যদি না করেন তাহলে আড়াআড়ি জমায়েতের সাক্ষ্য চোখেই পড়বে না, বা পড়লেও তাকে খাড়াকাড়ি জমায়েতের সাক্ষ্য বলে ভুল হবে নির্ঘাৎ।

(২) উচ্চবর্গের দৃষ্টিতে জনসমাবেশের অন্তর্নিহিত পার্থক্যগুলি সহজে ধরা পড়ে না, পড়লেও তার তাৎপর্য বোঝা বা ব্যাখ্যা সম্ভব নয়। কারণ, ধরে নেওয়া হয় যে সেই সমাবেশ উচ্চবর্গের চৈতন্যের আধার মাত্র, সুতরাং তার নিজস্বতা নেই, আর সেই নিজস্বতার প্রকাশ যে দ্বন্দ্বে ও বৈষম্যে তাও আলোচনার মধ্যে আসে না। নিম্নবর্গের ইতিহাস কিন্তু সেই জমায়েতে রাজনীতির পালটা ও স্বতন্ত্র ধারাটির খোঁজ করবে, আর খোঁজ পেলে—অর্থাৎ তা যদি তথ্যসম্মত হয়—তার মধ্যে নিম্নবর্গের চৈতন্যের অসমতা, স্তরভেদ, উপাদান-ও-অবস্থাভেদে তার বিভিন্ন প্রকাশ ইত্যাদির বিশ্লেষণ করে সেই বিশেষ জমায়েতটির অনন্যতাকে বর্ণনা করবে। এখানে মনে রাখা উচিত যে জমায়েতের পাত্রস্থানীয় শ্রেণী, গোষ্ঠী বা সমূহের বাস্তব জীবন ও সংস্কৃতিগত পার্থক্যই এই অনন্যতার একমাত্র কারণ নয়। একই স্থানে একই পাত্রের চৈতন্যে একই সমাবেশের মধ্যে কালভেদে গুণগত পরিবর্তনের অনেক উদাহরণ আমাদের ইতিহাসে, বস্তুত সব দেশের ইতিহাসেই পাওয়া যায়। ষোড়শ শতাব্দীর জার্মান কৃষকবিদ্রোহে, ফরাসি বিপ্লবের সমকালীন মহাত্রাসের (লা গ্রাঁদ্ প্যার্) মধ্যে, জার্মান ঔপনিবেশিকতার বিরুদ্ধে পূর্ব আফ্রিকার মাজি-মাজি অভ্যুত্থানে, আমাদের নিজস্ব নীলবিদ্রোহে, যুক্তপ্রদেশ ও মধ্যপ্রদেশে ১৮৫৭-৫৮ সালের কৃষকবিদ্রোহগুলিতে, উত্তরবঙ্গে দেবী সিং-এর বিরুদ্ধে লড়াইয়ের মধ্যে—অর্থাৎ যেখানেই জমায়েতের মেজাজ জঙ্গি ও আয়ুষ্কাল অপেক্ষাকৃত

দীর্ঘ, সেখানেই চৈতন্যের এই গুণগত পরিবর্তন দেখা যায়। অন্যত্র আমি এই পরিবর্তনকে ইংরেজিতে 'সেকেন্ড ওয়েভ' বলে বর্ণনা করেছি। উপমাটা একটু বদলে বাংলায় এর নাম দেব 'দ্বিতীয় ধাক্কা', কারণ সত্যিই এই দ্বিতীয় পর্যায়ে সমাবেশের মধ্যে আপসের চেয়ে আঘাতের প্রবণতা হঠাৎ অনেক বেশি তীব্র হয়ে ওঠে, তিক্ততা ও হিংস্রতা ভীষণ বেড়ে যায়, শ্রেণীসংগ্রামে দীর্ণ হয়ে সমাজ গৃহযুদ্ধের কাছাকাছি পৌঁছে যায়। এই ধাক্কা সামলাতে উচ্চবর্গকে হিমশিম খেতে হয়।

(৩) একথা যদিও সত্য যে স্থানকালপাত্র ভেদে এক-একটি সমাবেশে তাদের নিজ নিজ বৈশিষ্ট্য সক্রিয় হয়ে ওঠে, তবুও তাদের মধ্যে, বিশেষ করে অপেক্ষাকৃত জঙ্গি জমায়েতগুলির আকৃতিগত মিল আছে অনেক। গ্রামাঞ্চলে প্রজাবিদ্রোহ, শহরের গরিব জনতার অভ্যুত্থান (যেমন ধরুন, রাওলাট সত্যাগ্রহের সময় দিল্লিতে), গ্রামে ও শহরে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ইত্যাদির মধ্যে আঞ্চলিকতায়, উদ্দেশ্যে এবং সামাজিক পরিচয়ের নানা পার্থক্য সত্ত্বেও দেখা যাবে যে প্রায় একই রকমের কিছু কিছু উপায় ও সংকেতের সাহায্যে নিম্নবর্গের প্রতিনিধিরা তাদের মিত্রপক্ষকে একত্র করতে ও শত্রুপক্ষকে আঘাত করতে চেষ্টা করেছে সব ক্ষেত্রেই। এই সাদৃশ্যের মূল কারণ উচ্চবর্গ ও নিম্নবর্গের মধ্যে প্রভুত্ব ও অধীনতার অতি প্রাচীন সম্পর্ক এবং প্রভুর বিরুদ্ধে অধীনের বহুকালব্যাপী, যদিও ব্যর্থ, প্রতিবাদ। সেই প্রতিবাদের চূড়ান্ত, সর্বাঙ্গীণ, সনাতন ও সার্বত্রিক রূপ কৃষকবিদ্রোহ। তারই ঐতিহ্য নিম্নবর্গের রাজনৈতিক সংস্কৃতির একটি ধ্রুব উপাদান, এবং ঠিক সেই জন্যেই ঔপনিবেশিক যুগে নিম্নবর্গের সব রকম জঙ্গি জমায়েতেই কৃষকবিদ্রোহের কিছু কিছু লক্ষণ আদর্শে না হোক আকারে দেখা যাবেই। তাই আমার মনে হয় নিম্নবর্গের সমাবেশের ইতিহাস নিয়ে যাঁরা কাজ করতে চান, এমন কি যাঁরা গ্রামসমাজের বাইরে অকৃষক জনতার সমাবেশ নিয়ে কাজ করতে চান, তাঁদের পক্ষেও কৃষকবিদ্রোহেব অভিজ্ঞতা থেকে অনেক কিছু শেখার আছে।

এবার আমার প্রস্তাবটি সম্পর্কে তৃতীয় মন্তব্যে আসি। একথা বলাই বাহুল্য যে নিম্নবর্গের ইতিহাসে তাদের অর্থনৈতিক জীবনকে খুবই গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা করতে হবে। ঔপনিবেশিক ভারতের অর্থনীতি নিয়ে কাজ ইংরেজ রাজত্বের মধ্যেই আরম্ভ হয়। দেশ স্বাধীন হবার পর থেকে কাজ পরিমাণে যেমন বেড়েছে, গুণেও তেমনি উন্নত হয়েছে। নিম্নবর্গের ইতিহাস লিখতে হলে এই কাজ থেকে অনেক কিছুই শিখতে হবে। তবে বিষয় নির্বাচন ও দৃষ্টিভঙ্গি সম্পর্কে দুটি কথা মনে রাখা দরকার।

প্রথম কথাটি এই যে ঔপনিবেশিক সমাজের অর্থনৈতিক জীবনে উচ্চবর্গ ও নিম্নবর্গের মধ্যে প্রভু ও অধীনের সম্পর্কটি যে বিশিষ্টরূপে প্রকট হয় তা শোষক শোষিতের সম্পর্ক। তাই অর্থনীতির যে-কাঠামোটা আশ্রয় করে সেই সম্পর্ক প্রধানত গড়ে ওঠে—অর্থাৎ উৎপাদন ব্যবস্থা; অর্থনীতিকে সক্রিয় রাখার জন্য আবশ্যক লেনদেনগুলির মধ্যে যা কিছুই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ শোষক-শাসিতের সম্পর্ক বজায় রাখার পক্ষে—যথা, মজুরি, খাজনা, ঋণ ইত্যাদি; এই সম্পর্কের অবশ্যম্ভাবী যে দারিদ্র্য, বেকারি, দুর্ভিক্ষ, জমি হারানো, ফসলের ন্যায্য ভাগ থেকে বঞ্চিত হওয়া, আবার অপরপক্ষে শোষকদের স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্যে শোষিতের সামান্য একটি অংশের শ্রীবৃদ্ধি

ঘটিয়ে অধিকাংশকেই দরিদ্রতর করে তোলা—এই ধরনের সমস্যাকেই আমার মনে হয় নিম্নবর্গের ইতিহাসে অগ্রাধিকার দেওয়া উচিত। কারণ, এইসব বিষয়ে কাজ করতে গেলেই যে তথ্য আবিষ্কৃত হবে, যে প্রশ্ন উঠবে, সমাধানের জন্য যে নতুন কৌশল ও তত্ত্ব আশ্রয় করে এগোতে হবে, তা থেকে বারবারই একথা পরিষ্কার হয়ে উঠবে যে শোষক-শোষিতের সম্পর্কটি অর্থনৈতিক জীবনে প্রভুত্ব-অধীনতার সম্পর্কের বিশিষ্ট প্রয়োগ মাত্র।

এই প্রসঙ্গেই আমার দ্বিতীয় কথা—দৃষ্টিভঙ্গির কথাটা এসে পড়ে। ঔপনিবেশিক সমাজে নিম্নবর্গের ইতিহাসে নিছক অর্থনৈতিক সম্পর্ক বলে কিছু নেই। ধনতন্ত্রের পূর্ববর্তী অন্য যে কোনও সমাজের মতো সেখানেও অর্থনীতির অন্তর্গত সব সম্পর্কই আসলে ক্ষমতার সম্পর্ক বা আরও স্পষ্ট করে বলতে গেলে, রাজনীতির সম্পর্ক দিয়ে নিয়ন্ত্রিত। মজুরির হার, খাজনার হার, সুদের হার, সেখানে অবাধ কেনাবেচা চাহিদা-জোগানের নিয়ম মেনে চলে না, চলে শেষপর্যন্ত স্থানীয় সমাজে মালিক জমিদার মহাজনের প্রতিপত্তি ও শাসনের নিয়ম অনুযায়ী এবং উচ্চবর্গের এইসব আঞ্চলিক প্রতিনিধিদের উপরওয়ালা, তাদের সকলেরই পোশাক রাজশক্তির শাসন অনুযায়ী। তাই নিম্নবর্গের অর্থনৈতিক জীবনের সব বর্ণনার মধ্যেই ক্ষমতার এই সম্পর্কটিকে, অর্থাৎ প্রভু ও অধীনের সম্পর্কটিকে প্রাধান্য দিতে হবে। এই জন্যেই ঔপনিবেশিক যুগের যন্ত্রশিল্পের ইতিহাস শুধু যদি কলকারখানার বর্ণনা, মজুরি ও মুনাফার হার ও পরিমাণ, এমন কি লভ্যাংশের বখরা নিয়ে মালিক-মজুরের মধ্যে কড়াগণ্ডার লড়াই বলেই দেখা ও লেখা হয়, তা হলে ক্ষমতার সম্পর্কটি তার মধ্যে হয় ধরা পড়বেই না, বা পড়লেও গৌণভাবে। তাই কারখানার মালিকানার সঙ্গে রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক প্রভুত্বের সম্পর্ক, অর্থনৈতিক ও যান্ত্রিক নিয়মের বহির্ভূত শাসনের চাপে উৎপাদন পদ্ধতিকে প্রভাবিত করার জন্য কাজের সময় শ্রমিক ও যন্ত্রের মধ্যে মালিক বা তার প্রতিনিধিদের কর্তৃত্বসূচক হস্তক্ষেপ, কলকারাখানার বিষয়ে সরকারি আইনকানুনের ভূমিকা, কারখানার বাইরে বস্তি, লাইন, চল বা মহল্লায় মালিক মহাজন প্রভৃতির সঙ্গে শ্রমিকের সম্পর্ক, ইউনিয়ন বা ওই জাতীয় সংস্থায় অশ্রমিক নেতা বা কর্মী ও শ্রমিকের মধ্যে ক্ষমতাবৈষম্যের খেলা, কারখানার জন্য শ্রমশক্তি জোগান দেওয়ার ব্যাপারে সর্দারি প্রথা ও সেই সূত্রে গ্রামসমাজের সংস্কৃতি ও রাজনীতির প্রভাব শহরের শ্রমিক জীবনে—এই সব কিছুই যন্ত্রশিল্পের অর্থনৈতিক দিকগুলির সঙ্গে মিলিয়ে বিচার করতে হবে। তেমনিই আবার বলা যায় যে কৃষকের কত জমি আছে, কত খাজনা বা কর তাকে দিতে হয়, সুদে আসলে তার কাছে মহাজনের কত পাওনা, ফসলের দর ও লাভ-লোকসানের হিসেব—এই সব দিয়েই শুধু অর্থনৈতিক ইতিহাস যদি লেখা হয়, তা হলে তা তথ্যসমৃদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও কৃষকজীবনের একপেশে সুতরাং বিকৃত বর্ণনায় পর্যবসিত হবে। কারণ কৃষকজীবনের সত্য ওই তথ্যগুলির মধ্যে বিদ্যমান নয়। প্রভুত্ব ও অধীনতার যে বিশিষ্ট সম্পর্ক ওই সব তথ্যের ধারক তারই মধ্যে কৃষকজীবনের সত্যকে সন্ধান করতে হবে, সেই সত্যের আলোকেই ওই সব তথ্য অর্থময় হয়ে উঠবে। ঔপনিবেশিক ভারতের গ্রামজীবনে সেই সম্পর্কের মূল কথা জমিদার, মহাজন ও সরকার—এই ত্রিশক্তির সঙ্গে

কৃষকের ক্ষমতাগত সম্পর্ক। সেই সম্পর্কই অর্থাৎ রাজনীতিই ঔপনিবেশিক আমলের অর্থনীতির প্রধান ধ্রুবগুণ। নিম্নবর্গের অর্থনৈতিক ইতিহাসকে তাই ব্যাপক অর্থে যা রাজনৈতিক ইতিহাস নামে পরিচিত তারই শাখা বলে ভাবা যায়, যদিও নিঃসন্দেহেই তা সেই জ্ঞানকাণ্ডের একটি প্রৌঢ় ও বহু পল্লবিত শাখা।

নিম্নবর্গের ইতিহাস বিষয়ক প্রস্তাবটি সম্পর্কে আমার চতুর্থ মন্তব্যে চৈতন্যের দুটি লক্ষণের কথা বলতে চাই। এ যাবৎ আমার সব বক্তব্যের মধ্যে আমি প্রভুত্ব-অধীনতার সম্পর্কটিকে রাজনীতির মর্মস্থলে রেখেছি, বলেছি যে এই সম্পর্কটিই একাধারে রাজনীতির মুখ্য উপাদান ও তার নিয়ন্ত্রক। প্রভুত্ব ও অধীনতা যথাক্রমে সেই সম্পর্কের অন্তর্ভুক্ত বর্গদুটির—অর্থাৎ উচ্চের ও নীচের—চৈতন্যের সাধারণ গুণ। নিম্নবর্গের ইতিহাস নিয়ে আলোচনা হচ্ছে, তাই অধীনতার চরিত্রটি পরিষ্কার করে বোঝা দরকার। এই প্রসঙ্গে মনে রাখতে হবে যে প্রভুত্ব ও অধীনতা যেমন দ্ব্যণুক বৈপরীত্যের সূত্রে বাঁধা, অধীনতাও তেমনি একটি দ্ব্যণুক সত্তা যা নিজেই আবার দুটি রাশির বৈপরীত্য দিয়ে গড়া। সেই রাশি দুটি হচ্ছে সহকারিতা ও প্রতিরোধ। নিম্নবর্গের ইতিহাসে দুটি রাশিই সক্রিয়ভাবে উপস্থিত, যদিও অবস্থাভেদে একটি অপরটির চেয়ে জোরদার হয়ে ওঠে এবং অধীনদের চৈতন্যে হয় একটি বা অন্যটি তার প্রাধান্য কায়েম করে সাময়িকভাবে। তাই একথা মনে করা ভুল হবে যে প্রতিরোধই নিম্নবর্গের চৈতন্যের একমাত্র উপাদান। ববং অসাম্য সত্ত্বেও যেহেতু সমাজ সাধারণত স্থিতিশীল তাই অত্যুক্তি না করেই বলা চলে যে সহকারিতাই প্রতিরোধের চেয়ে সাধারণত বেশি শক্তিমান। তবে একথাও সত্যি যে প্রতিরোধ বিদ্রোহের পর্যায়ে না পৌঁছলেও সহকারিতার পাশাপাশি তার একটি ধারা যতই ক্ষীণ হোক তা সব ঐতিহাসিক অবস্থায়, এমন কি দৈনন্দিন জীবনেও, সব সময়েই বয়ে চলেছে। যেমন অপরপক্ষে বলা যায় যে প্রতিরোধের চূড়ান্ত রূপ বিদ্রোহের এমন কোনও নজির ইতিহাসে নেই যার মধ্যে সহকারিতা সম্পূর্ণ অনুপস্থিত।

নিম্নবর্গের চৈতন্যের অপর যে লক্ষণটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য তা হচ্ছে ধর্মভাব। ধর্মভাব বলতে আমি শুধু ধর্মীয় সংস্থার প্রতি আনুগত্য বোঝাচ্ছি না, বোঝাচ্ছি চেতনার সেই ঐতরিক বা 'এলিয়েনেটেড' অবস্থার কথা যার প্রভাবে জড়জগৎ বা জীবজগতের কোনও সত্তাকে, বাস্তবের বা ভাবনার অন্তর্গত কোনও বিষয়কে তা যথার্থভাবে ধারণার মধ্যে আনতে পারে না, এবং এক বিষয়ের উপর আর এক বিষয়ের গুণ আরোপ করে। ফলে যা ঐহিক তাকে অলৌকিক বলে মনে হয়, যা একান্তই মানবিক তাকে দৈব বলে ভুল হয়। ঐতরিকতার আতিশয্যেই কর্তা কখনও কখনও নিজের সৃষ্টিকেই সঠিকভাবে চিনতে পারে না। যা তার নিজের প্রতিভাজাত তাকে সে অন্যের কৃতিত্ব বলে বর্ণনা করে। তাই মঙ্গলকাব্যের কোনও মহৎ কবির পক্ষে বলা সম্ভব যে তাঁর রচনা তাঁর নিজের নয়, আরাধ্যা দেবী তাঁকে দিয়ে লেখাচ্ছেন: কবি যন্ত্র, দেবী যন্ত্রী। তাই সাঁওতাল বিদ্রোহের নেতা সিদো ও কান্‌হুর পক্ষে বলা সম্ভব হয় যে ইংরেজ শাসকরা যদি তাঁদের পরোয়ানা শিরোধার্য করে গঙ্গার ওপারে চলে না যায় তা হলে লড়াই বাধবে, কিন্তু তা ইংরেজের সঙ্গে সাঁওতালের লড়াই নয়, ইংরেজের সঙ্গে ঠাকুরের লড়াই। অর্থাৎ বিদ্রোহের ঠিক পূর্ব মুহূর্তেও বিদ্রোহী নেতারা তাঁদের যত্নসাধ্য বিশাল কর্মকাণ্ডটিকে

নিজেদের সৃষ্টি বলে চিনতে পারছেন না, ঐশ্বরিক বলে কল্পনা করছেন।

এই ধরনের ধর্মভাব নিম্নবর্গের রাজনীতির একটি প্রধান উপাদান। উচ্চবর্গের ইতিহাসবিদ্যায়—ইংরেজ শাসকদের লেখায় বা আমাদের স্বদেশীয়দের মধ্যে অনেক 'লিবারেল' ঐতিহাসিকের লেখায়ও—এই চেতনাকে শুধু ধর্মোন্মাদ বলেই দায় সারা হয়, যেন 'আসল' রাজনীতি বলতে তাঁরা যা বোঝেন তা একেবারেই আলাদা জিনিস। অপরপক্ষে, নিম্নবর্গের প্রতি যাঁদের সহানুভূতি আছে তাঁরাও অনেক সময় এই ধর্মচেতনার সাক্ষ্য নিয়ে একটু বিব্রত বোধ করেন এবং ঐতিহাসিক ব্যাখ্যার মধ্যে সেই সাক্ষ্য হয় একেবারেই চেপে যান কিংবা উড়িয়ে দেন এই বলে যে ওটা আসল কথা নয়, ধর্মনিরপেক্ষ চেতনাটাই আসল কথা, এবং সিদো কানহু বিরসা প্রমুখ বিদ্রোহী নেতারা নিজেরা ধর্মে বিশ্বাস করতেন না, শুধু কুসংস্কারগ্রস্ত কৃষকজনতাকে জমায়েত করার উদ্দেশ্যেই তাঁরা ধর্মের জিগির তুলেছিলেন। এক কথায়, উভয়পক্ষই 'আসল' রাজনীতি বলতে ধর্মভাবরহিত চৈতন্যের একটি বিশেষ রূপকে বোঝেন।

এটা একটা মারাত্মক ভুল এবং এ বিষয়ে সতর্ক না হলে নিম্নবর্গের ইতিহাস লেখা দুষ্কর। ঐতিহাসিককে মনে রাখতে হবে যে প্রত্যেক দেশেই ধনতন্ত্রের পূর্ণ বিকাশের আগে, জাতীয় রাষ্ট্র গড়ে ওঠার আগে, এমন কী তার পরেও বহুদিন পর্যন্ত সাধারণ মানুষের চোখে, বিশেষ করে রাজধানী ও শহর থেকে দূরবর্তী অঞ্চলে গ্রাম ও মফঃস্বলে যারা থাকে তাদের চোখে রাষ্ট্রের সামগ্রিক চেহারাটা সহজে ধরা পড়ে না। তারা রাষ্ট্রশক্তিকে দেখে তার স্থানীয় প্রতিনিধিদের ক্ষমতার গোষ্পদে। আর তাদের ধারণায় রাষ্ট্রের সামগ্রিক ও স্থানীয় রূপের মধ্যে যে ফাঁকা জায়গাটা থাকে তা তারা ভরে দেয় ক্ষমতার প্রকৃতি ও প্রয়োগ সম্পর্কে নানারকম অলৌকিক বিশ্বাস দিয়ে। এইজন্যেই ক্ষমতার পিরামিডের তলায় যারা একেবারেই মাটির কাছাকাছি সেই নিম্নবর্গের কাছে পিরামিডের শীর্ষস্থ রাজশক্তিকে দেবশক্তি বলে মনে হয়। তাই জারের অধীন রাশিয়ায় জারেরই কসাক বাহিনীর হামলায় পর্যুদস্ত জনতা জারের কাছেই সুবিচার প্রার্থনা করে, এমন কী বিদ্রোহ করে জারের নাম নিয়েই। কারণ যে রাষ্ট্রকে তারা জানে দৈনন্দিন অভিজ্ঞতার মারফৎ, কসাক বাহিনীই তার প্রতিভূ তাদের কাছে; কিন্তু স্বয়ং জার আর একটি, আরও শক্তিধর রাষ্ট্রের প্রতিভূ। এই দ্বিতীয় রাষ্ট্রের অস্তিত্ব বাস্তবে নয়, কল্পনায়; তাকে যা চালায় তা মানুষের ইচ্ছাশক্তি নয়, দৈবশক্তি; ক্ষমতার যে নিয়মের দ্বারা তা নিয়ন্ত্রিত হয়ে থাকে তা নাগরিক অধিকার ও দায়িত্বের সংজ্ঞায় সাজানো কোনও সংবিধান নয়, তা নিয়ন্ত্রিত হয় ধর্মচিন্তার দ্বারা। এক কথায় বলা যায় যে সেই রাষ্ট্র একটি অলীক রাষ্ট্র।

এই অলীক রাষ্ট্র নিম্নবর্গের ধর্মাশ্রয়ী রাজনীতিকে যে বারবার প্রভাবিত করেছে এ কথা সকলেই জানেন। উদাহরণগুলি সুপরিচিত: যেমন, আঠারো শতকে দেবী সিং-এর বিরুদ্ধে উদ্যত সশস্ত্র কৃষকজনতা কোম্পানির দোহাই দিয়েই কোম্পানির ফৌজের সঙ্গে সংঘর্ষে লিপ্ত হয়; উনিশ শতকের শেষভাগে বাঙালি ও মারাঠি কৃষক মহারানির নাম করেই মহারানির সাম্রাজ্যের স্থানীয় প্রতিনিধি ও তাদের পোষ্য উচ্চবর্গের বিরুদ্ধে লড়াই করে, ইত্যাদি। জানা কথা: অলমিতিবিস্তরেণ। শুধু এটুকু বলাই যথেষ্ট যে এই ধরনের

দৃষ্টান্তে কোম্পানি ও মহারানি বা একই বিশ্বাসের প্রকারান্তরে লাটসাহেব, মেজিস্টর সাহেব, জজ সাহেব প্রমুখ ধর্মাবতারের স্থান নিম্নবর্গের চেতনায় দেবদেবীর সঙ্গেই।

এই প্রসঙ্গে আরও একটি বিষয় উল্লেখযোগ্য মনে করি। অলীক রাষ্ট্রবাদের ঐতিহাসিক রূপ সম্পর্কে মার্কস বলেছেন যে এই প্রকার চিন্তা সেই সব শ্রেণীরই চৈতন্যের বৈশিষ্ট্য যারা উঠতির মুখে, যাদের মধ্যে ক্ষমতার আকাঙ্ক্ষা দেখা দিয়েছে কিন্তু সেই আকাঙ্ক্ষাকে বাস্তবিক করার জন্য আবশ্যক উপাদান ও অবস্থা সমাজে তখনও তৈরি হয়নি। সেই বাস্তব ভিত্তির অভাবেই ক্ষমতার আকাঙ্ক্ষা রাষ্ট্রশক্তি সম্পর্কে যুক্তিসিদ্ধ ও সুসংগত কোনও ধারণাকে আশ্রয় করে গড়ে উঠতে পারে না, আর সেজন্যেই তা মগ্ন হয়ে থাকে অলীক রাষ্ট্রবাদের দিবাস্বপ্নে।

আমি মার্কসের এই কথাটিকে তাঁর অসামান্য চিন্তার মধ্যেও একটি অসামান্য রত্ন বলে মনে করি। অলীক রাষ্ট্রের ধারণাটি যদিও প্রাচীন এবং তার কাল্পনিক আকৃতি পুরাকাল থেকেই বার-বার চিত্রিত হয়েছে সাহিত্যে ও লোকগাথায়, তবু কেবল প্লেটো ও রুসোর কথা বাদ দিলে মার্কসের পূর্বসূরীদের মধ্যে যাঁদের চিন্তা দিয়ে রাষ্ট্রদর্শনের তাত্ত্বিক বনিয়াদ রচিত হয়েছে তাঁরা প্রায় সকলেই শুধু রাষ্ট্রের সুপরিণত ও সর্বাঙ্গে সম্পূর্ণ আদর্শ রূপটি সামনে রেখে তাঁদের বক্তব্য তৈরি করেছেন। কিন্তু রাষ্ট্র তো সমুদ্রফেন থেকে সদ্যোত্থিতা আফ্রোদিতির মতো হঠাৎ নিখুঁত ইতিহাস নিরপেক্ষ মূর্তিতে আবির্ভূত হয় না। তার জন্মের ইতিহাস এক-একটি শ্রেণীর বা সমূহের সামাজিক সত্তা ও চেতনার উন্মেষ ও বিকাশের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। তাই পরিণত রাষ্ট্রশক্তি সম্পর্কে প্রচলিত ধারণাগুলির সঙ্গে পরিচয় ছাড়া যেমন কোনও সমাজের রাজনৈতিক চেতনাকে বোঝা বা ব্যাখ্যা করা সম্ভব নয়, তেমনি অপরিণত রাষ্ট্রশক্তি সম্পর্কে ধারণা অর্থাৎ সেই সমাজে প্রচলিত অলীক রাষ্ট্রবাদী চিন্তার সঙ্গে পরিচিত না হলে তার রাজনৈতিক ইতিহাসকে সমগ্রভাবে বোঝা বা ব্যাখ্যা করা যায় না। এই জন্যেই টমাস মোর, সাঁ সিমঁ, ফুরিএ, কাবে, ওয়েন প্রভৃতির চিন্তাকে পাশ্চাত্যের বুর্জোয়া ও শ্রমিকশ্রেণীর জন্ম ও বয়ঃপ্রাপ্তির ইতিহাসে উপক্রমণিকার মর্যাদা দেওয়া হয়।

ঔপনিবেশিক যুগে ভারতের ইতিহাসেও নানা শ্রেণী ও সমূহের অপরিণত রাষ্ট্রচিন্তার—অলীক রাষ্ট্রবাদী চিন্তার—নিদর্শন অনেক আছে। অন্যত্র যেমন আমাদের দেশেও তেমনি বিশেষ বিশেষ শ্রেণীর বা সমূহের ক্ষমতার আকাঙ্ক্ষা এই চিন্তার মাধ্যমেই ব্যক্ত হয়েছে। সমাজে ও বাস্তব জীবনে সেই আকাঙ্ক্ষাকে সফল করার জন্য আবশ্যক বনিয়াদ তখনও তৈরি হয়নি। ফলে অলীক রাষ্ট্রবাদের মধ্যে ওই সব শ্রেণীর বা সমূহের রাজনৈতিক উদ্দেশ্য যেমন সূচিত হয়েছে, তেমনি সূচিত হয়েছে সেই উদ্দেশ্য সিদ্ধির অন্তরায় ইংরেজ রাজশক্তিকে হঠিয়ে দিয়ে ক্ষমতার আকাঙ্ক্ষাকে ক্ষমতায় পরিণত করার অক্ষমতা। ওই যুগের উচ্চনীচ উভয়বর্গের অলীক রাষ্ট্রবাদেই আকাঙ্ক্ষা ও অক্ষমতার এই দোটানা বেশ স্পষ্ট। এই জন্যেই উচ্চবর্গের রাজনীতি সম্যক বোঝা সম্ভব নয় বঙ্কিমচন্দ্রের *আনন্দমঠ*, ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের *স্বপ্নলব্ধ ভারতবর্ষের ইতিহাস*, মহাত্মা গান্ধীর *হিন্দ স্বরাজ*-এর সাহায্য ছাড়া। কারণ ভারতীয় উচ্চবর্গের অগ্রণী যে বুর্জোয়াশ্রেণী সর্বেশ্বরতা কামনা করেও তা আয়ত্তে আনতে পারেনি, ওই সাহিত্য আসলে

তাদেরই সেই ব্যর্থতার সাক্ষী। এ বিষয়ে এখানে বিস্তারিত বলার সুযোগ নেই। শুধু এ কথাটাই বলে রাখি যে ভারতবর্ষে বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদী চৈতন্যের মধ্যে একটা অলীকরাষ্ট্রবাদী উপাদানের অস্তিত্ব আমার কাছে খুবই পরিষ্কার। এই উপাদানটি বিশদভাবে বিশ্লেষণ ও বর্ণনা না করলে জাতীয়তাবাদের ব্যাখ্যা অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। আশা করি কোনও কোনও তরুণ ঐতিহাসিক এই জটিল, দ্ব্যর্থময় ও একান্তই গুরুত্বপূর্ণ চিন্তার ক্ষেত্রটি তাঁদের প্রতিভায় উজ্জ্বল করে তুলবেন অদূর ভবিষ্যতে।

নিম্নবর্গের চিন্তায়ও অলীক রাষ্ট্রবাদ ওইরকম দোটানায় এবং পরস্পরবিরোধী অর্থের দ্বন্দ্বে বিদীর্ণ। এক দিকে আকাঙ্ক্ষা, অন্যদিকে বাস্তবে ও চৈতন্যে সেই আকাঙ্ক্ষা সফল করে তোলার জন্য প্রয়োজনীয় উপাদানের অভাব ও তজ্জনিত দুর্বলতা। একদিকে তিতুমীরের বাঁশের কেল্লা, সিদো কানহুর হাতে-গড়া সাঁওতাল ফৌজ, ভারতের নানা স্থানে সারা ঔপনিবেশিক যুগ ধরে হঠাৎ এক একটি জঙ্গি সমাবেশকে উপলক্ষ করে কয়েকদিনের জন্য বিদ্রোহীদের স্বাধীন রাজ্য প্রতিষ্ঠা—এক দিকে ক্ষমতার আকাঙ্ক্ষার এই নির্ভীক আত্মঘোষণা ও অপর দিকে ব্যর্থতা, পরাজয়, পলায়ন, হতাশা। আকাঙ্ক্ষা ও অসাধ্যতার ভাবমূর্তি হিসেবে তাই বিদ্রোহীদের অসম্পূর্ণ রাষ্ট্রদর্শন কখনও কখনও তাঁদের পরোয়ানা, জবানবন্দি, গোয়েন্দা পুলিশ বা মিলিটারি রিপোর্টে তাঁদের কথার টুকরো টুকরো উদ্ধৃতি মারফত আমাদের পক্ষে জানা সম্ভব। তাঁরা নিরক্ষর, কোনও বঙ্কিম ভূদেব গান্ধী তাঁদের হয়ে কলম ধরেননি, সুতরাং তাঁদের বক্তব্য কখনও তাঁদের নিজের ভাষায় শোনা যায় না। কিন্তু তাঁদের শত্রুপক্ষীয় সরকার-সাহুকার-জমিদারদের লেখা নানা বিবরণে ওই রাষ্ট্রচিন্তার রূপটিকে বারে-বারেই বর্ণনা করা হয়েছে, কারণ নিম্নবর্গ যখন ক্ষমতার লড়াই-এ লিপ্ত হয় তখন যারা ক্ষমতাবান তাদের শুনতে হয় নিম্নবর্গ কী বলতে চাইছে, তা লিখে রাখতে হয় সরকারি বেসরকারি কাগজপত্রে।

এই সব সাক্ষ্য থেকে এ কথাটা বেশ পরিষ্কার হয় ওঠে যে নিম্নবর্গের আকাঙ্ক্ষা ও অসাধ্যতার এই দ্বন্দ্বই তাঁদের চিন্তায় ধর্মভাবকে কায়েম করে রেখেছে। তাই সাঁওতাল হুলের একটি বিখ্যাত যুদ্ধের মধ্যেই সিদো কানহু পুজায় বসেন এবং বন্দুকের টোটা ঠাকুরের দয়ায় গলে জল হয়ে যাবে এই বিশ্বাসের ফলে তাঁদের পরাজয় ঘটে। এইভাবেই অলীক রাষ্ট্রবাদের যে দিকটা আকাঙ্ক্ষার তা নিম্নবর্গকে উৎসাহিত করেছে তার রাজনীতির বৈশিষ্ট্য ও মৌলিকতা নিয়ে জমায়েত হতে, আর যে দিকটা অসাধ্যতার তা তাকে বাধ্য করেছে দৈব ও পারলৌকিকতার আশ্রয় নিতে। নিম্নবর্গের চৈতন্যকে যখন আমরা ইতিহাসে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য উদ্যোগী হব তখন যেন তার এই ধর্মাশ্রয়ী দোটানা চরিত্রের গুরুত্ব ও জটিলতা স্বীকৃতি পায় আমাদের গবেষণায়, আমাদের রচনায়।

গান্ধী যখন মহাত্মা

শাহিদ আমিন

১৯২১ সালের ৮ ফেব্রুয়ারি গান্ধী পূর্ব উত্তরপ্রদেশের গোরখপুর জেলায় আসেন। এক বিশাল জনসভায় ভাষণ দিয়ে সেই রাত্রেই বারাণসীতে ফিরে যান। জনসমাবেশে এক থেকে আড়াই লাখ মতো মানুষ তাঁকে আবেগপূর্ণ অভিনন্দন জানিয়েছিল। কিন্তু বিহারের চম্পারনে অথবা গুজরাটের খেড়ায় গান্ধীজি যেমন বেশ কিছুকাল কাটিয়েছিলেন, গোরখপুরকে তিনি তেমন কোনও সময় দেননি, যাতে কৃষক আর জনসাধারণের আন্দোলন সেখানে গড়ে উঠতে পারে। এই অঞ্চলে সশরীরে গান্ধী ছিলেন একদিনেরও কম, কিন্তু মহাত্মার কল্পরূপ পরবর্তী মাসের পর মাস জনমনের চিন্তাভাবনা জুড়ে ছিল। এমন কী ১৯২১-এর এপ্রিল-মে নাগাদ স্থানীয় কিছু কংগ্রেসকর্মীর কাছেও এই দেবত্ব আরোপ (*পায়নিয়র* পত্রিকার ভাষায় 'আনঅফিসিয়াল ক্যাননাইজেশন') বেশ ভয়াবহ *ঠেকে*।

এই কয়েক মাসের সময়সীমায় নেহাতই ছোট সেই জায়গাটিতে মহাত্মার কর্ম এবং জীবনের প্রভাব কীভাবে পড়েছিল, তা এই প্রবন্ধে বিশ্লেষণের চেষ্টা করব। কৃষকের সঙ্গে গান্ধীর সম্পর্ক ঐতিহাসিকদের কাছে বিষয় হিসাবে অসামান্য। এই প্রবন্ধে সেই সম্বন্ধের প্রেক্ষাপট ভিন্ন। গান্ধীর 'ক্যারিসমা'র উপাদানসমূহ নয়, বরং কীভাবে ব্যাখ্যার অতীত তাঁর সেই ক্ষমতা কৃষকচৈতন্যকে স্পর্শ করেছিল, তাই আমাদের বিষয়। এমন কাজে ঐতিহাসিক দলিলপত্রই একটা মূল বাধা। মহাত্মার প্রতাপ নিয়ে যে গুজব গোরখপুরের পত্র-পত্রিকায় বেরিয়েছিল. তার সবগুলিরই প্রকাশ ১৯২১-এর ফেব্রুয়ারি থেকে মে মাসের মধ্যে। যে কাহিনীগুলি আমরা নির্বাচন করেছি, তার প্রতিটিই ওই সময়সীমার অংশ। তাই ১৯২১ সালের গোড়ায় চৌরিচৌরার দাঙ্গা অথবা অসহযোগ আন্দোলন বন্ধ হয়ে যাওয়ায় মহাত্মার কল্পরূপে কী পরিণতি এনেছিল, তা পুরোপুরি জানা যায় না। নির্বাচিত কাহিনীগুলির ভিত্তিতে বুঝতে চেষ্টা করব, গান্ধীকে নিয়ে কী ছিল কৃষকমনের অনুভব, লোকায়ত বিশ্বাসে মহাত্মার অবস্থানই বা কোথায়, কৃষকের প্রতিবাদে কী তার প্রভাব, যে প্রতিবাদ অনেকাংশেই কংগ্রেসী বিশ্বাসের ছকে ঢালা ব্যাখ্যা থেকে আলাদা।

উনিশ শতকের শেষ দশকে গৌ-রক্ষণী সভার প্রসার, পরে নাগরী আন্দোলনের অগ্রগতি, বিশ শতকের দ্বিতীয় দশকে হিন্দি সাংবাদিকতা ও হিন্দু সমাজ-সংস্কার, এগুলোই ১৯১৯-২০ পর্যন্ত গোরখপুরের রাজনৈতিক ইতিহাসের উল্লেখযোগ্য অধ্যায়।[১]

জেলার বিভিন্ন স্তরের লোকেরা এই সব আন্দোলনে জড়িয়ে পড়েন। পরগনার ভূতপূর্ব রাজারানিরা, জমিদার-বংশের প্রতিনিধিবর্গ, স্কুলশিক্ষক, পোস্টমাস্টার, নায়েব, তহশীলদার, আহির এবং কুর্মী রায়ত, সবাই সেই আন্দোলনে মেতে ওঠে। যদিও সেই আন্দোলন সম্বন্ধে আহির আর কুর্মীদের ধারণা ছিল অন্যদের থেকে আলাদা। বর্তমান শতাব্দীর প্রথম কুড়ি বছরের ঘটনাসমূহ মূলত গণ্যমান্য বণিকশ্রেণীর সাহায্যনির্ভর, তবু বুদ্ধিজীবী, ধর্মপ্রচারক এবং গ্রামবাসীদের অংশবিশেষও সেই ইতিহাসের অঙ্গীভূত হয়ে যায়। কিন্তু সেখানে গড়ে ওঠেনি রাওলাট অ্যাক্ট-এক বিরোধিতায় কোনও আন্দোলন, যেমন হয়েছিল পঞ্জাবে, জন্ম নেয়নি অযোধ্যার সমতুল কোনও কিষাণ সভা-আন্দোলনও। গোরখপুরের গৌ-রক্ষণীসভাগুলি সমাজ-সংস্কারের প্রয়াসে বিংশ শতাব্দীর 'সেবাসমিতি' হিতকারিণী সভাগুলির পথ প্রদর্শক। বর্তমান শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকে গোরখপুরে সমাজ-সংস্কার, হিন্দিভাষা বা হিন্দুধর্মসংক্রান্ত বিভিন্ন সংগঠন আর আন্দোলনগুলো ছিল জাতীয়তাবাদী কর্মধারায় অপ্রত্যক্ষ সাহায্যের মতো।

জাতি বা বর্ণকে ভিত্তি করে যেসব সভা গড়ে উঠেছিল, তার মধ্যেও কিছু পরিবর্তন লক্ষণীয়। যেমন ১৯২০-র ডিসেম্বরে ভিতিগ্রামে ভূমিহার-রামলীলামণ্ডল, উদ্দেশ্য শ্রীরামচন্দ্রজীর প্রকৃত চরিত্র উদ্‌ঘাটন করে একতা ও সত্যাগ্রহ প্রচার। একইভাবে নিম্ন আর মধ্যবর্ণের পঞ্চায়েতে দেখা গেল আহারের ব্যাপারে নতুন বাছ-বিচার। আসলে এ-সবই আত্মপ্রতিষ্ঠার আন্দোলন, যার প্রকাশ মেয়েদের পরের বাড়িতে কাজ করায় অসম্মতিতে, অথবা সরকার কি জমিদারকে বেগার দেওয়ায় আপত্তিতে। একই সময় মেথর, ধোপা বা নাপিতের মতো বহু নিম্নবর্ণের মানুষ মদ মাংস ছেড়ে দেয়। আচার অনুষ্ঠানে যারা ছিল অশুদ্ধ, তাদের এই আত্মশুদ্ধির প্রয়াস অনেক ক্ষেত্রেই নিগ্রহের চিহ্নসমূহকে সম্পূর্ণ ঘুরিয়ে দেওয়ার সমতুল। উনিশ শতকে নিম্নবর্ণের হিন্দুরা প্রায় সকলেই মাংসাশী ছিল। ১৯২০ সালে হঠাৎ মাংস ছেড়ে দেওয়া তাদের দিক থেকে একটা জাতে ওঠার বা 'সংস্কৃতায়ন'-এর প্রচেষ্টামাত্র নয়। মদ-মাংস, অন্যান্য নেশাদ্রব্য ছেড়ে দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তারা জেলাশাসকদের জানিয়েছিল চিরাচরিত বেগার দেওয়ায় তাদের আপত্তির কথাও।

১৯২০ সালের গোরখপুরকে কোনওভাবেই কংগ্রেস অথবা স্বাধীন কিষাণ সভার দুর্গ বলা চলে না। কংগ্রেস সাপ্তাহিকী *স্বদেশ*-এর সম্পাদক গোরখপুর, বস্‌তি, আজমগড়ের এই অবস্থা নিয়ে একাধিকবার আক্ষেপ করেছেন। উপযুক্ত কর্মনিষ্ঠ নেতৃত্বের অভাবই এমন পরিস্থিতির হেতু, এই ছিল তাঁর যুক্তি। গোরখপুর শহরে, এমন কী দেওরিয়া, বাহরাজ বাজারের মতো ছোট শহরেও রাজনৈতিক সভা জোরদার হয় ১৯২০-র জুলাই-আগস্ট থেকে। ওই সময় কাউন্সিল নির্বাচনে রাজা রইস এবং উকিলদের প্রচারের বিরোধিতা করা হয়, সরাসরি প্রশ্ন ওঠে অত্যাচারী জমিদার আর স্বার্থান্বেষী উকিলদের সততার বিষয়ে। বহু খোলা চিঠি প্রকাশিত হয় *স্বদেশ*-এ, যার মূল বিষয় বড় জমিদারদের কৃষক নিপীড়ন। এতদূরও শোনা গেল যে প্রজাদের হয়ে কথা বলবার কোনও স্বাভাবিক অধিকার রাজাদের নেই। ডিসেম্বর ১৯২০-র নাগপুর কংগ্রেস আর কাউন্সিল নির্বাচন বয়কট-এর ধারাবাহিকতাতেই অসহযোগ আন্দোলনের প্রচার মহাত্মার

আত্মিক জীবনীর অংশ হিসাবে জোর পায়। ১১ নভেম্বরের *স্বদেশ*-এ প্রথম পৃষ্ঠায় দশরথ দ্বিবেদীর জোরাল সম্পাদকীয়তে বোল্ড হরফে ছাপা হল ভোটদাতাদের উদ্দেশে আবেদন:

> গোরখপুরের ভোটদাতারা শুনুন! নিজেদের আত্মসম্মানের কথা সম্পূর্ণ বিস্মৃত হবেন না। পোষা দালালদের থেকে সাবধান। আপনাদের প্রকৃত শুভার্থী কে, সে বিষয়ে অবহিত থাকুন। মহাত্মা গান্ধী, পণ্ডিত মতিলাল নেহরু, পণ্ডিত মালভিয়াজী, না সেই সব লোক যারা ভোট ভিক্ষে করতে এখন আপনাদের পিছনে ছুটছে? নিজেরাই ভেবে দেখুন, এসব লোক কী করেছে আপনাদের জন্য, যে কাউন্সিল-এর ভিতর থেকে তারা আপনাদের দুঃখদুর্দশার সম্মান আনবে? এবারে মহাত্মা গান্ধীর দিকে চোখ ফেরান। এই পবিত্র মূর্তি আপনাদের জন্য নিজের তনু মন ধন অর্পণ করেছেন। আপনাদের কল্যাণ করতেই তিনি সন্ন্যাসব্রত নিয়েছেন, জেলে গেছেন, অনেক কষ্টের সম্মুখীন হয়েছেন। অসুস্থ শরীরেও এই মুহূর্তে যে তিনি সারা দেশে ঘুরছেন, এ শুধু আপনাদেরই স্বার্থে। এ হেন মহাত্মা গান্ধীরই উপদেশ—আপনারা ভোট দেবেন না। দেবেন না, কারণ আপনাদের প্রায় তিরিশ হাজার পাঞ্জাবী ভাইদের উপর গুলি চলেছে অমৃতসরে। মানুষকে চলতে হয়েছে বুকে ভর দিয়ে। যাঁরা ন্যায়-অন্যায়ের প্রশ্ন তুলেছেন, তাঁদের কুকুরের মতো তাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। সাবধান! সাবধান! কাউকে ভোট দেবেন না।

গোরখপুরে জাতীয় আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে কাউন্সিল বয়কট নিয়ে যে আলোচনা হয়, এই পাঠ্যাংশটিকে বলা চলে তার প্রতীক। ভোটদানে বিরত থাকার কারণ হিসাবে পাঞ্জাবের অত্যাচার, ব্রিটিশের উদাসীনতার উল্লেখ ছিল সেই লেখায়। লেখাটিতে অনস্বীকার্য যা, তা হল গান্ধীর সাধুসুলভ ব্যক্তিত্ব, দরিদ্রের যন্ত্রণায় যে ব্যক্তি দগ্ধ, আবার একই সঙ্গে নিজের আদেশের প্রতি সম্পূর্ণ আনুগত্য যে দাবি করে। এমনভাবে যদি দেখি, নির্বাচন-বয়কট বা ব্রিটিশদরদী প্রার্থীদের প্রত্যাখ্যান ঠেকে ধর্মীয় আচরণের মতো; যে আচরণ মিল খুঁজে পাবে তৎকালীন বহু হিন্দু আচার-অনুষ্ঠান পালন এবং আত্মশুদ্ধির প্রয়াসে। যা আবার জাতীয়তাবাদ ধর্মের প্রচারকদেরই প্রচার, যাকে পালনীয় ধর্ম বলে মেনে নেন হিন্দু নিম্নবর্ণের অনেক পঞ্চায়েত। এ তবে তেমনই এক অঞ্চল, যার সংশ্লিষ্ট দক্ষিণ অযোধ্যায় হয়েছে কৃষকবিদ্রোহ, অথচ সেই অঞ্চলটিতে তখনও গড়ে ওঠেনি তেমন কোনও কৃষক আন্দোলন। এ-হেন গোরখপুরে গান্ধী এলেন ১৯২১ সালের ৮ ফেব্রুয়ারি।

১৯২০ সালের ১৭ অক্টোবর এক জনসভায় গান্ধীকে গোরখপুরে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল। সভাপতি ছিলেন মৌলবী মকসুদ আলি ফৈজাবাদী, প্রধান বক্তা গৌরীশঙ্কর মিশ্র। সভায় খিলাফত আন্দোলনের বন্দিদের সমর্থন করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হল। অপর একটি সিদ্ধান্তে অসহযোগই অবশ্যকর্তব্য বলে ঘোষণা করা হয়। একই সঙ্গে গান্ধী এবং আলি ভ্রাতৃদ্বয়কে গোরখপুরে আসবার জন্য তারবার্তা পাঠানো হয়। নাগপুর কংগ্রেসে গোরখপুরের প্রতিনিধিরাও দেখা করেছিলেন গান্ধীর সঙ্গে। গান্ধী কথা দিলেন,

জানুয়ারির শেষে কি ফেব্রুয়ারির গোড়ায় আসবেন গোরখপুরে। প্রতিনিধি দলটিতে যাঁরা ছিলেন, তাঁদের মধ্যে সব থেকে উল্লেখযোগ্য বাবা রাঘবদাসের নাম। অনন্ত মহাপ্রভুকে ঘিরে যে আধ্যাত্মিক সংগঠন, সেই সময় রাঘবদাস তার নেতা, বাহরাজ-এর পরমহংস আশ্রমের প্রতিষ্ঠাতাও বটে। অসহযোগের যে মন্ত্র রাঘবদাস আর দশরথ দ্বিবেদী নাগপুর থেকে নিয়ে এলেন তার সঙ্গে যুক্ত হল মন্ত্রের প্রবক্তার প্রত্যাশিত আবির্ভাবের উত্তেজনা। খুব তাড়াতাড়ি অসহযোগ আন্দোলনের প্রচার জেলাকে একটা উৎসবের সাজে সাজিয়ে ফেলল। যেন আরও বড় কোনও ঘটনার প্রস্তুতিতে মাতিয়ে দেওয়া হল অঞ্চলটিকে। বাহরাজ-এর কাছে রাঘবদাস আর তাঁর ব্রহ্মচারী শিষ্যদের পদভ্রমণ, নিকটস্থ কুইন অঞ্চলে কৃষকদের কাছে গাওয়া চঙ্গুর ত্রিপাঠীর গান্ধীভজনের সুর তেমন কিছু উত্তেজনা আর প্রতীক্ষার ইতস্তত নিদর্শন। আবার নবপর্যায়ে প্রকাশিত *কবি* পত্রিকার প্রথম সংখ্যায় কাব্যময়তার প্রবল আবেগেও সেই একই উত্তেজনার প্রতিফলন। যে কবিত্বের উদ্দেশ্য সকল মানুষকে শ্রেণী-নির্বিশেষে পরিত্রাতা কৃষ্ণের পুনরায় মর্ত্যে আবির্ভাবের বার্তায় আকুল করে তোলা।

জনগণের উত্তেজনার আভাস মিলবে গান্ধীর গোরখপুর আগমনের তারিখ নিয়ে বিভিন্ন জল্পনাকল্পনা এবং সংবাদ পরিবেশনায়। জানুয়ারির প্রথম সপ্তাহের মধ্যে গান্ধীর আগমনবার্তা বাধাহীন আগুনের মতো দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়ছিল। *স্বদেশ*-এর সম্পাদক দশরথ দ্বিবেদীর কাছে শত শত চিঠি আসে, প্রতিটিরই প্রশ্ন গান্ধীর আগমনের সঠিক তারিখ নিয়ে। এই উত্তেজনা আর উৎকণ্ঠার আবহে ৯ জানুয়ারির *স্বদেশ* পাঠকদের জানাল যে বারাণসীর *আজ* পত্রিকায়, কানপুরের *প্রতাপ* এবং *বর্তমান*-এ, প্রয়াগের ভবিষ্য পত্রিকায় গান্ধীর আগমনের তারিখ প্রকাশিত হবে, *লিডার* আর *ইনডিপেনডেন্ট* কাগজেও থাকবে তার খবর। গোরখপুর জেলার ছ'টি তহশীলে পোস্টার, চিঠি, বিজ্ঞপ্তি ইত্যাদি পৌঁছিয়ে দেওয়ার দায়িত্ব নিল *স্বদেশ* নিজে।

একই সঙ্গে প্রস্তুতি চলছিল কংগ্রেস জেলা পরিষদেও। স্থির হল, একটি জাতীয় বিদ্যালয় উদ্বোধন করবেন গান্ধী, জেলা পরিষদই এ-বিষয়ে অগ্রণী ভূমিকা নিল। গান্ধীর আগমনবার্তা নিয়ে বক্তারা আগেই চলে যাবেন তহশীলভুক্ত বিভিন্ন অঞ্চলে, বক্তৃতায় তারা কংগ্রেসের আদর্শ প্রচার করবেন, অনুরোধ করবেন জাতীয় বিদ্যালয়ে অর্থ সাহায্যের জন্য। ৮ ফেব্রুয়ারির জনসভা, স্টেশনে স্টেশনে গান্ধীকে দেখবার জন্য বিশাল জনসমাগম প্রমাণ করে যে সংবাদ প্রচারের গতি ছিল যথেষ্ট দ্রুত। ৬ ফেব্রুয়ারির *স্বদেশ*-এ গান্ধীর আগমন সম্বন্ধে যে সম্পাদকীয় প্রকাশিত হল, তা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। সেই লেখা থেকে বোঝা যায় গান্ধীর কোন মূর্তি স্থানীয় কংগ্রেসকর্মীরা তুলে ধরেছিলেন; জানা যায় জাতীয়তাবাদী পরিপ্রেক্ষিতে নিম্নবর্গের সঙ্গে এলিট নেতৃত্বের সম্বন্ধটা কোন প্রকৃতির, সেখানে গান্ধীর অবস্থানই বা কোথায়। 'গোরখপুরের পরম সৌভাগ্য' শিরোনামের এই সম্পাদকীয়টি দশরথ দ্বিবেদীর লেখা। একজন গোঁড়া জাতীয়তাবাদী তিনি। ভেবেছিলেন, গান্ধীর আগমনের সঙ্গে সঙ্গে গোরখপুরের অরাজনৈতিক পরিবেশ বদলে যাবে। সাধারণ মানুষের প্রতি আচরণের যে নমুনা সম্পাদকীয়তে পাই, তা জরুরি:

প্রার্থনা এই যে গোরখপুরের সাধারণ জনতা কেবলমাত্র মহাত্মাজির দর্শন পেতেই উৎসুক। মহাত্মাজি আসবেন, কৃতার্থ করবেন দর্শন দিয়ে। নিজেদের ত্রাতাকে স্বচক্ষে দেখে মানুষের আনন্দের সীমা থাকবে না। তবে আমার জিজ্ঞাস্য, সরকারের সঙ্গে সরাসরি সহযোগিতা করছে যারা, এ সময় তাদের কোনও কর্তব্য আছে কি না। হৃদয় থেকে যে উত্তর পাই, তা বলে, নিশ্চয় আছে। তারা যেন মহাত্মা গান্ধীর সামনে নতজানু হয়ে সেই পরমাত্মার কাছে প্রার্থনা করে, যাতে তিনি তাদের নৌকাকে এই ঘূর্ণিঝড় থেকে বাঁচিয়ে নিরাপদ আশ্রয়ে পৌঁছিয়ে দেন।... এই সময় আমাদের মধ্যে মহাত্মা গান্ধীর অবতীর্ণ হওয়া দেশ এবং সমাজের পক্ষে কতখানি কল্যাণের, তা সহজেই তোমরা বুঝতে পারবে।... কোনওরকম ইতস্তত না করে এগিয়ে এসো জেলার পীড়িত ভাইদের সেবায়। গ্রামে গ্রামে ঘরে ঘরে বাজাও স্বরাজের শঙ্খ। এই আন্দোলন, যা মহাত্মা গান্ধী তোমাদের কাছে পেশ করছেন, তা তোমাদের কাছে অমৃতস্বরূপ।

সাধারণ মানুষ এবং এলিট কীভাবে গান্ধীর আগমনকে আমন্ত্রণ জানাবে, এ লেখাতে তা পরিষ্কার। সমবেতভাবে গান্ধীদর্শন, দর্শন পেয়ে নিজেদের ভাগ্যবান মানা, আর এই স্বর্গসুখের আস্বাদ নিয়ে নিষ্ক্রিয়, নিপীড়িত জীবনে ফিরে যাওয়া—এই তাদের কর্তব্য। সাধারণ মানুষ এটাই কেবল জানবে যে মহাত্মা গোরখপুরে আসছেন শুধুমাত্র তাদের দর্শন দিতে। স্বরাজ আন্দোলনের আহ্বান তারা নিজেদের ভিতরে নিজেরা অনুভব করবে, এটা আদৌ প্রত্যাশিত ছিল না। গ্রামে গ্রামে স্বরাজের শঙ্খ বাজাবে এলিটরা, গোরখপুরের নিপীড়িত ভাইদের আন্দোলন হবে গান্ধীর এলিট-অনুগামীদের প্রেরণানির্ভর। গান্ধীকে দেখতে কৃষকের গোরখপুরে আসা, মফস্বল স্টেশনে গান্ধীদর্শনের আশায় তাদের ভিড়, জাতীয়তাবাদের দর্পণে এ সবই তো অর্থহীন, যদি না নেতারা এই বিপুল জনসমর্থনকে সঠিক পথ দেখাতে পারেন। কৃষকের এই যাত্রা যে অনেক সময়েই জমিদারের আদেশের বিরুদ্ধে, এবং সে অর্থে এক রাজনৈতিক প্রতিবাদ, এমনভাবেই যে সাধারণ গ্রামবাসী কোনও পণ্ডিতের ব্যাখ্যা ছাড়াই বুঝে নিতে পারে গান্ধীর মন্ত্রকে তার নিজের মতো করে, অনুরূপ কোনও সম্ভাবনা দশরথ দ্বিবেদীর মনে আদৌ দেখা দেয়নি। অথচ পরবর্তী কয়েক মাসে দ্বিবেদীর পত্রিকায় যেসব স্থানীয় খবর প্রকাশ পেল, তাতে দেখি গান্ধীর আগমনে সাধারণের প্রতিক্রিয়া সম্পাদকের প্রত্যাশার অতীত। গান্ধীর গোরখপুর ভ্রমণ একান্ত সুব্যবস্থায় চিহ্নিত, তৎকালীন জনসমাবেশও বিস্ময়কর। *স্বদেশ* পত্রিকার বিবরণই বলে দেয়, যে ট্রেনে গান্ধী গোরখপুরে আসছিলেন, তা কীভাবে স্টেশনে স্টেশনে দর্শনপ্রার্থীর ভিড়ে বাধাপ্রাপ্ত হয়। ১৯২১-এ গান্ধী দর্শনের প্রত্যাশা নিয়ে গোরখপুরে যারা এসেছিল, তাদের মধ্যে বহু কৃষকই এক বছরের ব্যবধানে ১৯২২-এর ফেব্রুয়ারি মাসে চৌরিচৌরা রেল স্টেশনের পাশ দিয়ে হেঁটে যায় সম্পূর্ণ অন্য এক ইতিহাস রচনা করতে। গোরখপুরে কৃষকদের মহাত্মাভক্তি যেন খানিকটা উগ্র ঠেকেছিল। মহাদেব দেশাই-এর ডায়েরি থেকে জানতে পারি, দর্শনলাভ ক্রমশই চলে যায় জনগণের অধিকারের পর্যায়ে। 'জনতার হঠগ্রহ', যা নাকি মধ্যরাত্রিতেও দর্শন দাবি

করে, গান্ধীজির সহ্যসীমাকেও ছাড়িয়ে গিয়েছিল।

এমন করে যদি গান্ধীকে অভ্যর্থনা জানায় কৃষক, তাঁর মন্ত্রকে তারা তবে বোঝে কীভাবে? এমন কিছু কি ছিল গান্ধীর বাণীতে, যা দ্ব্যর্থবোধক? গোরখপুরের কৃষককে গান্ধী যা বলেছিলেন, তার প্রধান বক্তব্য এইভাবে সাজানো যায়: (১) হিন্দু-মুসলমান ঐক্য, (২) যেসব কাজ করা জনগণের পক্ষে অনুচিত—লাঠির ব্যবহার, হাটবাজার লুট, সামাজিক বয়কট, (৩) মহাত্মা তাঁর অনুগামীদের যা যা বর্জন করতে বলেন—জুয়া, মদ-গাঁজা, বেশ্যালয়ে যাওয়া, (৪) উকিলদের কর্তব্য ওকালতি ছেড়ে দেওয়া, সরকারি বিদ্যালয় বয়কট করা এবং সরকারি খেতাব বর্জন করা উচিত, (৫) সাধারণের উচিত তাঁত বোনা, তাঁতিদের উচিত হাতে-বোনা সুতোয় কাপড় তৈরি করা, (৬) স্বরাজ আসন্ন, কিন্তু স্বরাজের জন্য প্রয়োজন আত্মিক শক্তি ও শান্তি, ঈশ্বরের কৃপা, আত্মত্যাগ, আত্মশুদ্ধি।

গান্ধীর বক্তৃতার বক্তব্যকে তাঁর ভাবাদর্শের মূল উপাদানসমূহে এইভাবে ভেঙে নিয়েই হয়তো গোরখপুরের কৃষক নিজেদের মধ্যে আলোচনা করেছিল।

উপরোক্ত (৩) এবং (৬) সংখ্যক উপাদানকে জড়িয়ে তাঁর প্রতাপ এবং জাদু সম্পর্কে তখনকার যে ধারণা, তা গান্ধী সম্পর্কিত অনেক গুজবের মূলে কাজ করে। কী উচিত আর কোনটা অনুচিত, অর্থাৎ (২) আর (৩) সংখ্যক উপাদান গ্রামের মানুষের কাছে তেমন অর্থবহ ছিল না। কিন্তু উপাদান (৩) আর (৬) একত্রে দেবতুল্য মানুষের আদেশে উপমা পায়। সামাজিক বয়কট ১৯২১-এর আগে প্রায় অপ্রচলিত ঘটনা। গান্ধী গোরখপুরে আসবার পরপরই মানুষ নিজের তাগিদে কি পঞ্চায়েত বা সভার মাধ্যমে আত্মশুদ্ধির কাজে ব্যাপৃত হতে থাকে। গান্ধীর মন্ত্রের প্রসার, আবার একই সঙ্গে তার পরিবর্তনের এটাই প্রণালী। গোরখপুরে তখন যেসব কাহিনী চালু হয়েছিল, তাতে পাই সেই পরিবর্তনের আভাস, ওই বদলের উপর অতি-মানবিকের প্রভাব আর সব কিছুর সঙ্গে মহাত্মার যোগাযোগ।

গান্ধীর অতিপ্রাকৃত ক্ষমতার গল্প স্থানীয় পত্রিকায় প্রথম বেরোয় ১৯২১ সালের জানুয়ারির শেষে। *স্বদেশ*-এর যে সংখ্যা গোরখপুরে তাঁর আগমনের সংবাদ জানায়, তাতেই ছিল আর এক নিবন্ধ, শিরোনাম 'স্বপ্নে মহাত্মা গান্ধী: উলঙ্গ ইংরেজদের পলায়ন'। এক জন ইঞ্জিন ড্রাইভার, সম্ভবত সে অ্যাংলো ইন্ডিয়ান, রাত এগারোটা নাগাদ খবরের কাগজ পড়তে পড়তে তার ঘুম এসে গেল; এক দুঃস্বপ্ন দেখল সে, ঘুম ভেঙে গেল সেই স্বপ্ন দেখে। ইংরেজদের বাংলোর দিকে ছুটে গেল চিৎকার করতে করতে, পালাও পালাও, গান্ধী আসছেন অনেক অনেক ভারতবাসী সঙ্গে নিয়ে, ইংরেজদের ধ্বংস করতে করতে। সেই চিৎকারে যে আতঙ্ক সৃষ্টি হয়, তাতে সাহেবরা সব বিছানা ছেড়ে উঠে উলঙ্গ অবস্থাতেই ছুটে গেল স্টেশনের দিকে, মেমসাহেবদের বন্ধ করল বাক্স অথবা আলমারিতে। অফিসার অনুপস্থিত, তাই পাওয়া গেল না অস্ত্রাগারের চাবি। কিন্তু ইংরেজরা বলে চলে, বাব্বা, এখনও জয়ধ্বনি কানে ভাসছে, আর আমরা ফিরব না বাংলোয়। সকালে ঘটনা শুনে ইংরেজদের আত্মিক শক্তি নিয়ে ভারতীয়রা খুব একচোট

হাসিঠাট্টা করল। গল্পটি প্রথম প্রকাশিত হয় বারাণসীর *আজ* পত্রিকায়, পরে *স্বদেশ*-এ। ইংরেজদের ছোট করে ভারতীয় শক্তিকে বাড়িয়ে দেখবার যে তৎকালীন প্রবণতা, এ কাহিনীর প্রচলন তারই এক নিদর্শন। এমন সব গল্পে ইংরেজকে দেখা হতো নেহাতই দুর্বল এক জাতির চেহারায়, যাদের মনে অহিংস মহাত্মাকে নিয়ে নিদারুণ আতঙ্ক।

গোরখপুর আর উত্তরপ্রদেশের বিস্তীর্ণ অঞ্চলে গান্ধীর সম্বন্ধে এরকম বহু গল্প সে-সময় চলত। কাঠামো আর ধারাবাহিকতার বিচারে কাহিনীসমূহ প্রায় একই রকম। চারটি ভাগে এ ধরনের গল্পসমূহের আলোচনা করা যায়: (ক) মহাত্মার শক্তির পরীক্ষা, (খ) মহাত্মার বিরুদ্ধাচরণ, (গ) গান্ধীবাদী মন্ত্রের বিরোধিতা, বিশেষত খাওয়া-দাওয়া, মদ্যপান আর ধূমপান-সংক্রান্ত ব্যাপারে এবং (ঘ) বরপ্রাপ্তি, অলৌকিক ক্রিয়াকলাপের ফলস্বরূপ হারানো জিনিস ফিরে পাওয়া, বৃক্ষ বা কূপের প্রাণলাভ।

(ক) ১। বস্‌তি জেলায় মনসুরগঞ্জ থানার সিকন্দর শাহু ১৫ ফেব্রুয়ারি বললে, মহাত্মাজিতে তার বিশ্বাস আসবে, যদি তার কারখানায় আখের রস-ভরা কড়াই দুভাগে ভাগ হয়ে যায়। কড়াইটি ঠিক মাঝখান দিয়ে ভেঙে গেল।

২। ফেব্রুয়ারির ১৮ তারিখ, বসন্তপুরের এক কাহার মহাত্মাজিকে সাচ্চা মানবে বলেছিল, একমাত্র যদি তার বাড়ির চাল উপরে উঠে যায়। লোকটার বাড়ির চাল দেয়াল ছেড়ে একহাত উপরে চলে গেল। আবার স্বস্থানে তা ফিরে এল তখনই, কাহার যখন মহাত্মাকে মেনে নিয়ে কেঁদে উঠল।

৩। ১৫ মার্চ আজমগড়ের এক চাষি বলে, মহাত্মাকে সে সত্যি মানবে, যদি তার দেড় বিঘে জমি সর্ষেতে ভরে যায়। পরের দিন তার গমের ক্ষেতের সব শস্য সর্ষে হয়ে গেল।

৪। ১৫ মার্চ রিয়াজন মৌজার বাবু বীরবাহাদুর শাহী ক্ষেতের ফসল তুলতে তুলতে কিছু মিষ্টি প্রার্থনা করলেন মহাত্মার শক্তি পরীক্ষার জন্য। অকস্মাৎ তাঁর শরীরের উপর মিষ্টিবর্ষণ হলো। মিষ্টির অর্ধেকটা দিলেন তিনি মজুরদের, বাকিটা রাখলেন নিজের জন্য।

৫। ১৩ এপ্রিল মহাত্মাজির নাম করে একটি কড়াই তৈরি হচ্ছিল। এক ঠাকুরের বউ বললেন, কোনও অলৌকিক ঘটনা ঘটলে, তবেই তিনি কড়াইটি মহাত্মাকে নিবেদন করবেন। সঙ্গে সঙ্গে ঝুলিয়ে রাখা একটা ধুতিতে আগুন লেগে সেটি পুড়ে ছাই হয়ে যায়, যদিও কোনও পোড়া গন্ধ সেখানে পাওয়া যায়নি।

৬। বাহরাজ থেকে *স্বদেশ*-এর এক পাঠক লিখছেন, দুজন চামার মাটি খুঁড়ছিল, আর কথা বলছিল ভোর গ্রামে সদ্য-আবিষ্কৃত মূর্তিটি নিয়ে। এক জন হঠাৎ বলে, এইখানে যদি একটি মূর্তি বেরিয়ে পড়ে, তবেই সে বিশ্বাস করবে ভোর গ্রামের মূর্তিটি মহাত্মাকে ডাকছে। মাটি খুঁড়তে খুঁড়তে মহাদেবের একটি মূর্তি সেখানে পাওয়া গেল কাকতালীয়ভাবে। খবর ছড়িয়ে পড়ল, মানুষজন মেতে উঠল দর্শন পেতে, পূজা আর প্রণামী দিতে। স্থানীয় লোকেদের মত হলো যে, সেই প্রণামী দেওয়া উচিত জাতীয় বিদ্যালয়ের অর্থভাণ্ডারে।

৭। এমনই আর এক ঘটনা ঘটে বাহরাজ-এর কাছে বাবু শিবপ্রতাপ সিং-এর

কুয়োতে। কিন্তু সেখানে লোকে যখন কুয়োর কাছে ছুটে যায় মূর্তিটি দেখবার আশায়, সেটি আর দৃশ্যমান ছিল না।

৮। রুদ্রপুর মৌজায় এক ব্রাহ্মণের অভ্যাসই হল ঘাস চুরি করা। লোকে তাকে অনেকভাবে বোঝাতে চেয়েছে যে এসব কুকাজ বন্ধ করাই মহাত্মা গান্ধীর উদ্দেশ্য। ব্রাহ্মণ বলে, গান্ধীজিতে তার বিশ্বাস আসবে, যদি সে চুরি করতে গিয়ে ধরা পড়ে, বা অসুস্থ হয় কি গোবর খায়। ভগবানের এমনই লীলা যে তিন-তিনটি ঘটনাই ঘটে গেল। ঘাস চুরি করতে করতে হঠাৎ তার মনে হল, কে যেন ধরতে আসছে তাকে। চিৎকার শুরু হল তার। তার পর জ্ঞান হারাল, প্রচণ্ড জ্বরে পড়ল সে। লোকজন তাকে বাড়ি নিয়ে এল ধরাধরি করে। কিন্তু খানিক পরেই সে বাইরে গিয়ে গোবর খেল। তিন দিন বাদে তার পরিবারের লোকেরা মানত নেওয়ার পর সে সুস্থ হয়। এই ঘটনার ফলে সেই গ্রাম আর সেই অঞ্চলের সবাই চুরি করা ছেড়ে দিল।

৯। গোরখপুর বিদ্যালয়ের শ্রীবলরাম দাস *স্বদেশ* পত্রিকায় লিখে জানান যে ফেব্রুয়ারি মাসের ২৬ তারিখে তিনি রুদ্রপুর গ্রামে বক্তৃতা দিতে গিয়েছিলেন। মহাত্মা-নির্দিষ্ট পথ সেখানে সবাই স্বীকার করে নেয়। এক ব্যক্তি শুধু তার পুরনো অভ্যাস ছাড়তে নারাজ, সে ঘাস কাটতে যায়। ফিরে এসে সে পাগল হয়ে গেল, জিনিসপত্র ভাঙচুর করতে লাগল। মহাত্মার নামে পাঁচ টাকা দেওয়ার পর সে শান্ত হয়।

এইসব গল্পে দুটি তথ্য খুব পরিষ্কার। প্রথমত, গোরখপুরের গ্রামে গ্রামে গান্ধী তখন বিস্তৃত আলোচনার বিষয়। আমি গান্ধীজিতে বিশ্বাস করব, যদি কোনও অলৌকিক সম্ভব হয়, এই যে কথাটি বার বার ফিরে আসে, তা বিশ্বাসী আর অবিশ্বাসীর পারস্পরিক কথোপকথনেরই প্রমাণ। দ্বিতীয়ত, এই গুরুত্বপূর্ণ সংলাপে অপর একটি ইঙ্গিত নিহিত। উত্তরপ্রদেশের গ্রামীণ অঞ্চলে অসামান্যকে পূজা করবার যে রীতি লোকায়ত বিশ্বাসের অঙ্গ, গান্ধীর প্রতি মানুষের আচরণ তার সঙ্গে এক হয়ে যায়। উইলিয়াম ক্রুক লিখছেন, এমন সব অসামান্য ব্যক্তিত্বে দেবত্ব আরোপের মূলে ছিল তাঁদের শুদ্ধ জীবনযাপন এবং অলৌকিক ক্ষমতা।[২] জীবনযাপনে শুদ্ধতার শর্তটি গান্ধী তাঁর চেহারা, ব্যক্তিত্ব এবং কর্মে পূর্ণ করতেন। ভগবৎবিশ্বাসী গ্রামীণ মানুষ এতে দেবত্বের সন্ধান পায়। প্রতিটি কাহিনীই গান্ধীকে দেয় জাদু আর অলৌকিকের অধিকার। ফলে সেলিম চিশতির গল্পে অভ্যস্ত যে কৃষক, তার মনে গান্ধীর চেহারা উপমা পায় কল্পনার ঈশ্বরের অবয়বে।

(১), (৩), (৪) এবং (৫) সংখ্যক আখ্যানে, কোনও ব্যক্তি তার কাজ অথবা পরিপার্শ্বকে জড়িয়ে কোনও প্রার্থনা করে। প্রার্থনা পূর্ণ হওয়াতেই কাহিনীর সমাপ্তি। কিন্তু (২) নং আখ্যান আরও কিছুদূর যায়। যে ব্যক্তি গান্ধীর শক্তি যাচাই করতে চেয়েছিল, তাকে মহাত্মার ক্ষমতার কাছে সম্পূর্ণ নতি স্বীকার করতে হয়। এমন সব কাহিনী কেমনভাবে গান্ধীর নাম ছড়িয়ে দেয় গ্রামে গ্রামান্তরে, সাধারণের আচারকে ব্যবহার করে জাতীয়তাবাদী উদ্দেশ্যে, তার প্রমাণ (৬) সংখ্যক আখ্যান। মূর্তির উদ্দেশে দেওয়া প্রণামী কোনও ধর্মীয় কাজে ব্যবহৃত হয় না, চলে যায় জাতীয় বিদ্যালয়ের অর্থভাণ্ডারে, যার সঙ্গে গান্ধীর গোরখপুরে আসা সরাসরি জড়িত। (৭) সংখ্যক কাহিনীতে মূর্তিটি

অদৃশ্য হয়েছিল এবং খুবই সম্ভব একদল লোক নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির জন্য গোটা গুজবটা ছড়িয়েছিল, এসব প্রসঙ্গ এখানে অবান্তর। যা গুরুত্বপূর্ণ, তা হল এমন অলৌকিক ঘটনাসমূহকে গোরখপুরে গ্রামবাসীর একান্ত স্বাভাবিকভাবেই মেনে নেওয়া। যার ধরনটি হয়তো মেলে ধর্মগ্রন্থপাঠের সঙ্গে। তবে সুপ্ত এক রাজনৈতিক চেতনার প্রভাবও সেখানে নিহিত থাকে।

(২) সংখ্যক আখ্যানের বিষয়বস্তুর সঙ্গে মিল আছে (৫) সংখ্যক কাহিনীর। দুটি গল্পেই অবিশ্বাসীকে বিশ্বাসী করে তুলছে ভীতি। শাস্তির ভয় পূর্ব ভারতের বহু ধর্মোপাখ্যানেরই বিষয়। সন্দিগ্ধ কাহার অথবা অবিশ্বাসী মহিলা যখন ভক্তি আর বিশ্বাসেই আত্মসমর্পণ করে, মনে হয় এ যেন সেই পাঁচালি কি ব্রতকথার সমতুল, যেখানে দেবদেবীর ক্রোধ অবিশ্বাসীর বিরোধকে ভেঙে দেয়। একই বিষয়বস্তু আরও সুবিন্যস্ত (৮) এবং (৯) সংখ্যক আখ্যানে। যেখানে মহাত্মার ক্ষমতার প্রতি চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দেয় মানুষ, আর মহাত্মার শক্তি সেই চ্যালেঞ্জকে পেরিয়ে নিজেকে অজেয় প্রমাণিত করে। রুদ্রপুরের ব্রাহ্মণ কোনও এক জন সাধারণ অবিশ্বাসী নয়; গান্ধীর মন্ত্রে উচ্চবর্ণের যে বিরোধিতা, তারই প্রতিনিধি ওই ব্রাহ্মণ। তার বিরুদ্ধতা এক অর্থে সমগ্র গ্রামের বিশ্বাসকেই প্রশ্ন জানায়। কিন্তু অবিশ্বাসের দাম তাকে দিতে হয় শারীরিক আর মানসিক যন্ত্রণায়। কাহিনীর পরিণামে গ্রামের সব মানুষ চৌর্যবৃত্তি বর্জন করে। এক নতুন নীতিবোধ যে গ্রামে জয়ী হল, এ তারই ইঙ্গিত। জয় আরও জোরদার, কারণ যথেষ্ট প্রতিকূলতার সঙ্গে লড়েই সে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করেছে।

(খ) ১০। বস্‌তি জেলার দামোদর পাণ্ডে জানায়, দুমারিয়া মৌজায় গান্ধীকে গালাগালি দেওয়ার ফলে এক ব্যক্তির চোখের পাতা জুড়ে গেছে।

১১। চারাঘাটের এক মাইল দূরে উনছাভা গ্রামে অভিলাখ আহীর-এর চার সের ঘি নষ্ট হয়ে যায়, কারণ সে গান্ধীর উদ্দেশে ব্যঙ্গোক্তি করেছিল।

১২। বেনুয়াকুটী মৌজার মৌনীবাবা রামানুগ্রহদাস বার বার গান্ধীকে গালমন্দ করেছিলেন। ফলে তাঁর শরীর থেকে দুর্গন্ধ বেরতে থাকে। খানিক যত্ন নিলে, অবস্থার কিঞ্চিৎ উন্নতি হয়। মৌনীবাবা তখন যজ্ঞাহুতির আয়োজন করলেন।

১৩। মাঝৌলি থেকে মুরলীধর গুপ্ত লিখে জানিয়েছেন যে, ৮ ফেব্রুয়ারি মহাত্মা গান্ধী যখন গোরখপুর থেকে বারাণসী ফিরে যাচ্ছিলেন, সালেমপুর স্টেশনে তাঁকে দেখবার জন্য এক বিশাল জনসমাবেশ হয়। সেই জনসভায় এসেছিল এক বারাই অর্থাৎ পানপাতার চাষির ছেলে। স্টেশনে আসবার সময় এক ব্রাহ্মণীর কাছে সে একটি চাদর চায়। ব্রাহ্মণী সেই অনুরোধ ক্রোধের সঙ্গে প্রত্যাখ্যান করলেন। ছেলেটি কাঁপতে কাঁপতে কোনওমতে স্টেশনে এসে মহাত্মাকে দেখে বাড়ি ফিরে যায়। সকালবেলা আমি গ্রামে গুজব শুনলাম যে সেই ব্রাহ্মণীর গৃহে বিষ্ঠাবর্ষণ হয়েছে। শেষে ব্রাহ্মণী চব্বিশ ঘণ্টা নির্জলা উপোস আর মহাত্মাজির আরাধনায় শান্তিস্বস্ত্যয়ন করলেন।

১৪। বস্‌তি জেলার হরিহরপুর কসবায় এক রইস বাবু জ্ঞানপাল দেব মন্দির প্রতিষ্ঠা করছিল নিজের পিতার অন্তিম ইচ্ছানুসারে। সে ছিল গান্ধীবিরোধী; প্রজাদের ভয়

দেখাত, যদি কেউ গান্ধীর শিষ্য হয়, এমন কি তাঁর নাম উচ্চারণ করে, পাঁচ টাকা জরিমানা হবে। চতুর্ভুজ এক বিশালাকার পুরুষ আবির্ভূত হলেন ৪ এপ্রিল রাত্রি সাড়ে এগারোটা নাগাদ, জনসমাবেশে তিনি বললেন, 'আমি শিবভক্ত। তোমরা সবাই শিবকে ভজনা কর। বাবুসাহেব, নীতিহীনতাকে প্রশ্রয় দেবেন না। সত্য বলুন, অধর্ম বর্জন করুন, ধর্মকে অনুসরণ করুন।' এর পর সেই মূর্তি ধীরে ধীরে অদৃশ্য হয়ে গেল।

প্রথম চারটি আখ্যানে শারীরিক যন্ত্রণা এবং শুদ্ধতাহানিকে দেখা হয়েছে গান্ধীর বিরুদ্ধাচরণে দৈবিক শাস্তিস্বরূপ। (১৪) সংখ্যক আখ্যানে শরীরের যন্ত্রণার পরিবর্তে আসল দেবতার হুঁশিয়ারি, যার প্রকাশ এক জনসমাবেশে। ফলে যাদের সামাজিক অবস্থান বাবুটির নীচে, তাদেরই সামনে বাবুর ইজ্জৎ ভাঙচুর হয়ে যায়।

'সন্ন্যাসী', 'বাবা'—এই ধরনের লোকেরা জাতীয়তাবাদী মন্ত্রকে লোকায়ত বিশ্বাসে মিলিয়ে দিতে সহায়ক হয়েছিলেন, এমন ধারণা প্রচলিত আছে। কিন্তু (১২) সংখ্যক আখ্যানটি ভিন্ন এক ইঙ্গিতেই পূর্ণ। মৌনীবাবা তার মৌন ভেঙেছিল গান্ধীর সমালোচনা করতে। ফলে যে পরিণতি তার হয়, তাতে বুঝি, গ্রামের মানুষ স্থানীয় সাধুটির কথা আক্ষরিক অর্থে মানেনি। সাধুর যন্ত্রণা যে গান্ধী বিরোধিতারই পরিণতি এমন ব্যাখ্যা বিস্তৃত অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে। মৌনীবাবার কাছেও এই বিশ্লেষণ বিশ্বাসযোগ্য ঠেকে, তাই তিনি যথোপযুক্ত প্রায়শ্চিত্ত করেন। জানি না ওই ব্যাখ্যার আদিকর্তা কে, কোনও স্থানীয় কংগ্রেস নেতা, নাকি সাধারণ মানুষ। কংগ্রেস মহলে ব্যাখ্যার সূত্রপাত হলেও, তার প্রচলন, এবং এমন আরও অনেক কাহিনীর চলন বৃহত্তর এক বিশ্বাসেরই ইঙ্গিত।

দর্শনপ্রার্থীর নিষ্ঠা তাকে কতদূর কষ্টসহিষ্ণু করে, (১৩) সংখ্যক আখ্যানে তা দেখি। এও দেখি যে মহাত্মা-বিরোধীর যন্ত্রণা বা অশুদ্ধতা কীভাবে বাড়তে থাকে। উপবাস এবং পূজা প্রায়শ্চিত্তের অঙ্গ। গল্পটি পড়লে বোঝা যায়, গুজবের গতি কী দ্রুত, তার শক্তিই বা কী মারাত্মক। এই আখ্যানে ব্রাহ্মণী ছেলেটিকে কেবল সক্রোধ প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। কিন্তু রায়কিশোর চাঁদ বা বাবু জ্ঞানপালদেবের মতো বড় জমিদার প্রজাদের গান্ধী দর্শনে আরও প্রত্যক্ষ বাধা হয়ে দাঁড়ান। (১৪) সংখ্যক কাহিনীটির একাধিক ব্যাখ্যা আছে। *স্বদেশ*-এ এই কাহিনী যিনি লিখে পাঠান, সেই যমুনাপ্রসাদ ত্রিপাঠী বাবু জ্ঞানপালদেবের সঙ্গে একমত যে এক দৈত্যের আবির্ভাব ঘটেছিল। প্রথমজন ঘটনাকে দেখছেন গান্ধী-বিরোধীর প্রতি ঈশ্বরের ক্রোধের উপমায়। বাবু জ্ঞানপালদেব তা অস্বীকার করেন। তাঁর মতে শিবপূজার উন্নতি প্রকল্পেই ওই আবির্ভাব। অতিপ্রাকৃতের সেই উপস্থিতিকে কৃষক কোন অর্থে বুঝেছিল, তা সঠিক জানা যায় না। তবে এমন চিন্তা অমূলক নয় যে তাদের কাছে ঘটনাটি জমিদারের অত্যাচারের বিরুদ্ধে দৈবতিরস্কার।

(গ) ১৫। গোরখপুর থেকে এক ভদ্রলোক লিখে জানান, আলিনগর মহল্লার এক মোক্তার তার বাড়ির মেয়েদের চরকা কাটতে বলেছিলেন। মেয়েরা বলে, তাদের তো কিছুরই অভাব নেই, কেন তারা অকারণে চরকা কাটবে? ঠিক সেই সময় বাড়ির একটি তোরঙ্গে কাকতালীয়ভাবে আগুন ধরে যায়। গোটা শহরে এই খবর মুখে মুখে ছড়িয়ে

পড়ে।

১৬। বিস্তাউলি মৌজায় এক ফৌজদারি মামলা চলছিল। পুলিশ সেখানে পৌঁছলে, আসামী, প্রতিবাদী উভয় পক্ষই মিথ্যা ভাষণ করে। একজন মহাত্মার প্রতাপের দোহাই দিয়ে মিথ্যা ভাষণ থেকে বিরত হতে বলল তাদের। মামলার সাক্ষ্য-প্রমাণ লিখে নেওয়ার পরেই আসামীর পুত্রবধূ মারা যায়।

১৭। আজমগড় থেকে শ্রীতিলকধারী রাই লিখে জানান, মৌজাগাজিয়াপুরে ১৮ ফেব্রুয়ারির সভায় স্থির হল যে গবাদিপশু আর ছাড়া থাকবে না। কাদের চৌকিদার এই প্রতিজ্ঞায় বদ্ধ ছিল, কিন্তু পরে সে তার কথা রাখেনি। সে অঞ্চলের মানুষজন প্রতিজ্ঞার কথা তাকে মনে করিয়ে দিলে, কাদের বলল, গবাদিপশু সে ছেড়েই রাখবে, দেখবে পঞ্চায়েত বা গান্ধীজি কী করতে পারেন। এক ঘণ্টার মধ্যে লোকটার পা ফুলে উঠে যন্ত্রণা শুরু হয়। সে ফোলা আজও কমেনি।

১৮। দেওরিয়া থেকে বিশেষ প্রতিনিধি জানালেন, উকিল বাবু ভগবানপ্রসাদের কী অদ্ভুত পরিস্থিতি! তার বাড়ির চারদিকে বিষ্ঠা; বাড়ির একটি মূর্তি, যা রাখা থাকত ট্রাঙ্কে, হঠাৎ পড়ে গেছে বাড়ির ছাদ থেকে। ভদ্রলোক বাড়ি ছেড়ে যাওয়ার পরেও, চারপাশের সেই বিকট অবস্থা বদলায় না। শহরের অশিক্ষিত মানুষ বলে, উকিলসাহেব অসহযোগ নিয়ে আলোচনারত এক ব্যক্তির সঙ্গে তর্ক করেছিলেন, তাই এই দুরবস্থা।

১৯। দেওরিয়ার নামকরা উকিল ভগবানপ্রসাদের স্ত্রীর অবস্থাও অদ্ভুত। যেখানেই তিনি বসেন, চারপাশেই বিষ্ঠা দেখেন। যে পাতার উপর খাবার থাকে, সেখানেও মাঝেমধ্যে দেখেন বিষ্ঠা। বাড়িতে যে মূর্তি আছে, পূজার পর তাকে রাখলে সে অদৃশ্য হয়, অথবা উঠে যায় ছাদে কি পড়ে যায় ছাদ থেকে। কাউকে তিনি পুরি খেতে দিলে, চারটের জায়গায় দুটো কি পাঁচটা দিলে তিনটে থাকে। এ কথা সত্যি নয় যে মহিলাকে গান্ধীর এক অনুগামী অভিশাপ দিয়েছিল। কেউ কেউ বলেন, উকিল সাহেব কলকাতা কংগ্রেসে গিয়েছিলেন, প্রতিজ্ঞা করেছিলেন ওকালতি ছেড়ে দেবেন। কিন্তু ফিরে এসে কথা রাখেননি। তখন গান্ধীজির শিষ্যরা তাকে অভিশাপ দেন। তাই নাকি তিনি যত্রতত্র বিষ্ঠা দেখেন, এমনকি তাঁর আহার্যও মাঝেমধ্যে রূপান্তরিত হয় বিষ্ঠায়। এ সবই অসত্য। উকিলসাহেব দিব্যি আছেন। ওসব তিনি কিছুই দেখেন না। কলকাতায় কখনওই যাননি তিনি, ওকালতি ছেড়ে দেওয়ার কথাও বলেননি, কেউ কোনও অভিশাপও দেয়নি তাকে। তার বউ বাড়িতে যেসব ঘটনা দেখে থাকেন, সে সবই ভূতের লীলা।

২০। ১১ এপ্রিল পরাশিয়া আহীর-এর গ্রামে কয়েকজন জুয়ো খেলছিল। *স্বদেশ* পত্রিকার লেখক কাশীনাথ তেওয়ারি তাদের বারণ করেন। সবাই তাঁকে মেনে নেয়, কেবল একজন ছাড়া। সে গান্ধীজির উদ্দেশে গালিগালাজ আরম্ভ করে। ঠিক পরদিনই তার ছাগলকে তারই চারটে কুকুর কামড়ে দেয়। ফলে লোকটি এখন বেজায় অখুশি— সে মেনেও নিয়েছে তার কসুর।

২১। রাও চক্রীপ্রসাদ লিখেছেন, ভাত্‌নি স্টেশনের কাছে এক পানবিক্রেতার ছেলেরা ছাগল মেরে তার মাংস খেয়েছিল। যারা বাধা দিয়েছিল, তাদের কারও বারণই ছেলেরা মানেনি। একটু পরেই তারা বমি করতে থাকে, ভয় পেয়ে যায় সবাই। শেষ পর্যন্ত তারা

মহাত্মার নামে শপথ নেয়, আর কোনওদিন মাংস খাবে না, সঙ্গে সঙ্গে তাদের অবস্থার উন্নতি হয়।

২২। বস্‌তি জেলার রামপুর গ্রামে এক পণ্ডিতকে বার বার বলা হয়েছিল মাছ খাওয়া ছেড়ে দিতে। বহু নিষেধ সত্ত্বেও পণ্ডিত অভ্যাস ছাড়েনি, বলেছিল মাছ সে খাবেই, দেখবে মহাত্মাজির দৌড় কতখানি। খেতে বসে সে দেখে, তার মাছভর্তি পোকা।

২৩। গোরখপুর জেলার নৈকট থানার বাবু ভগীরথ সিং লিখলেন, ২১ ফেব্রুয়ারি বাবু চন্দ্রিকাপ্রসাদের পরামর্শে তাঁর রায়তরা মাদকদ্রব্য বর্জনের প্রতিজ্ঞা করে। এক কালোয়ার কিন্তু তার কথা রাখেনি। শুঁড়িখানার দিকে এগোনোর পথে, তার চারদিক থেকে ইঁট পড়তে থাকে। সে আন্তরিকভাবে মহাত্মাকে স্মরণ করলে ইঁট পড়া বন্ধ হয়।

২৪। গোদবাল গ্রামে ২২ ফেব্রুয়ারি এক সাধু এসে গাঁজার ছিলিমে টান দিচ্ছিল। মানুষজন তাকে থামাতে চাইল, শুরু হল মহাত্মার প্রতি তার কটুকাটব্য। পরদিন সকালে দেখা গেল, তার দেহ বিষ্ঠায় ভরা।

২৫। আজমগড় জেলায় পাহাড়িপুর গ্রামে পণ্ডিত কৃষ্ণানন্দ মিশ্র লেখেন যে কমলাসাগর মৌজার একটি সভায় স্থির হয়, কেউ কোনওরকম নেশা করবে না। পরে দুজন লোক লুকিয়ে লুকিয়ে খৈনি খাচ্ছিল। হঠাৎ একটা বাছুরের কাটা পা এক চতুর্বেদী সাহেবের বাড়ির সামনে পড়ে। এই অস্বাভাবিক ঘটনায় সবাই তামাক খৈনি ইত্যাদি বর্জন করে।

২৬। মাঝ্‌ওয়া মৌজার এক ব্যক্তি ধূমপান ছেড়ে দেবে বলেছিল। কিন্তু কথা সে রাখতে পারেনি। ফলে চারপাশ থেকে নানাবিধ পোকামাকড় ঘিরে ধরে তাকে। এই খবরে মাঝ্‌ওয়ার দূরবর্তী অঞ্চলের লোকেরাও নেশা ছেড়ে দেয়।

২৭। দাভানি জেলায় পানবিক্রেতা একটি মেয়ে ধূমপান করত। একদিন স্বপ্নে সে দেখে, ধূমপানকালে হুঁকোটি আটকে গেছে তার মুখে। মেয়েটি ভয় পেয়ে প্রতিজ্ঞা করল, ধূমপান সে ছেড়ে দেবে।

এই সব আখ্যানে দেখি সেই একই ধারাবাহিকতা—ব্যক্তিগত যন্ত্রণা, শুদ্ধতাহানি, প্রায়শ্চিত্ত—যার একটি সামাজিক তাৎপর্য আছে। ধারাবাহিকতায় লক্ষণীয় যে গান্ধীর মন্ত্র অনুযায়ী যা কিছু নিষিদ্ধ, তাকে সিদ্ধ করতে চাইলেই যন্ত্রণা অথবা শুদ্ধতাহানির সূত্রপাত। বুঝি, শুদ্ধতার যে গান্ধীবাদী সংজ্ঞা, তা লোকায়ত ধ্যানধারণাকে নিশ্চিতভাবে স্পর্শ করেছে। (১৮) এবং (১৯) সংখ্যক আখ্যান একই ব্যক্তি বা পরিবারকে ঘিরে। এ গল্পের দুটি আলাদা পাঠ আমরা পাচ্ছি, একটি *স্বদেশ* থেকে, অন্যটি ইংরেজের অনুগত *জ্ঞানশক্তি* পত্রিকা থেকে। *স্বদেশ* পত্রিকার লেখক জনপ্রিয় ব্যাখ্যা থেকে নিজেকে তফাতে রাখেন, যেমন 'শহরের অশিক্ষিতদের মতে', নিজের কোনও ভিন্ন ব্যাখ্যা তিনি নির্মাণ করেন না। কার্যত দেওরিয়ার অশিক্ষিতদের ভাবনাই তাঁর লেখার মাধ্যমে চালু হয়ে যায়। *জ্ঞানশক্তি*-র সম্পাদক উপর্যুক্ত ব্যাখ্যার প্রতিটি ভাবাদর্শকেই খণ্ডন করেন। গৃহের অশুদ্ধতাকে তিনি মানেন, কিন্তু সেক্ষেত্রে উকিল স্বামীর থেকে তাঁর স্ত্রীরই ক্ষতি বা দায়, দুইই বেশি। স্ত্রীর ওই অস্বস্তির মূলে স্বামীর কোনও আচরণের তেমন ভূমিকা

নেই। লেখক দেখান, স্বামীর সম্পর্কে গুজবগুলো সবই মিথ্যে। কংগ্রেসের কাছে কোনও প্রতিজ্ঞা করেননি তিনি, শারীরিক বা মানসিক আরামেরও কোনও অভাব নেই তাঁর। অস্বাভাবিক ঘটনাবলী নিয়ে সন্দেহের অবকাশ না থাকলেও, তার ব্যাখ্যা নিয়ে দ্বিমত আছে। প্রচলিত বিশ্লেষণে গুজবটি জাতীয়তাবাদী রাজনীতি প্রসারের অংশ হয়ে যায়। ব্রিটিশ অনুগামী *জ্ঞানশক্তি*-র কলমে এই বিশেষ দিকটি অনুপস্থিত। তথ্যখণ্ডনের প্রণালীতে মহাত্মা গান্ধীর স্থান নিল সেখানে ভূতের লীলা।

গান্ধীর মন্ত্রের জনপ্রিয় ব্যাখ্যার দিকটা অন্য কয়েকটি আখ্যানে আরও প্রকট। এখানে কাকতালীয় আর ঘটনাপরম্পরা কার্যকারণের স্থানে প্রতিষ্ঠিত। গোরখপুরের শ্রোতৃবৃন্দকে গান্ধী মাছ-মাংস পরিত্যাগ করতে বলেননি। অথচ (২১), (২২) বা (২৪) সংখ্যক আখ্যানে গান্ধীর ভাবরূপ এবং প্রতাপ কাহিনীর মোড় ঘুরিয়ে দেয়, ঘটনাপরম্পরায় বৃহত্তর অর্থসমূহ প্রাধান্য পেয়ে যায়। 'আমি মাছ-মাংস খাব, ধূমপান করব, গাঁজা-তাড়ি-মদ খাব, দেখি তোমার মহাত্মাজি কী করতে পারে', গান্ধীর প্রতি এই অবজ্ঞাপূর্ণ বিরোধী মন্তব্যই গুজবের জন্ম আর প্রচলনে জরুরি। মিতাচারের পক্ষ আর বিপক্ষের সংলাপে গান্ধীর নাম কীভাবে ব্যবহৃত, সে ইঙ্গিত কাহিনীগুলিতে পরিষ্কার। গান্ধীর পথকে মানতে চাইল না যারা, তাদের সর্বনাশ অবশ্যম্ভাবী; সে সর্বনাশের সামাজিক তাৎপর্য এবং প্রায়শ্চিত্ত লোকায়ত বিশ্বাসকে অন্য এক চেতনার আস্বাদ দেয়; যা বোঝায়, স্থানীয় নিয়মে নির্ধারিত এসব রীতিনীতির বিরুদ্ধাচরণ ব্যবহারিক জীবনে কত অসম্ভব, কত অবাঞ্ছিত।

খাওয়াদাওয়ার শুদ্ধতা নিয়ে কেন এত উদ্বেগ? এই প্রশ্নের সম্পূর্ণ উত্তর জানবার মতো তথ্য আমাদের নেই। তবে কয়েকটি ইঙ্গিতপূর্ণ ব্যাখ্যা আছে। আগেই দেখেছি ১৯১০ সালে আচার-আচরণের শুদ্ধিকরণ নিয়ে গোরখপুরে একটি আন্দোলন গড়ে উঠেছিল, যার জের নিরামিষ ভক্ষণ পর্যন্ত গড়ায়। নিরামিষাশী হওয়ার কথা যে শুধু ধর্মপ্রচারকরা বলেছিলেন, তা নয়, নিম্নবর্ণের পঞ্চায়েত যেমন ধোবি, ভাঙ্গি, নাপিত, এরাও ঠিক করে, আহারের নিষেধাজ্ঞা না মানলে, জরিমানা দিতে হবে। ১৯২১-এর গোড়ায় শুদ্ধতার প্রতি এই আসক্তিকে দেখা যেতেই পারে গান্ধীবাদী আত্মশুদ্ধির (যথা মদ-গাঁজা বর্জন) বিস্তার হিসাবে। এই বিস্তারের পরিপ্রেক্ষিত এমনই যে, নিষেধাজ্ঞা মাছ-মাংস বর্জন পর্যন্ত অগ্রসর হতে পারে সহজেই। সঙ্গে সঙ্গে একে ভাবা যায় ধর্মভাব এবং নিম্নবর্ণের আত্মপ্রতিষ্ঠার প্রমাণ। উল্লেখযোগ্য যে, ১৯২১-এর জানুয়ারিতে উত্তর বস্তির পঞ্চায়েতরা বলে, নিষেধাজ্ঞা অমান্য করার যে একান্ন টাকা জরিমানা, তা দেওয়া হবে গৌশালার অর্থভাণ্ডারে।

(ঘ) ২৮। ভাগলপুরের দেবকলি মৌজার পণ্ডিত জীবনন্দন পাঠক লেখেন, ছ-মাস পূর্বে এক মুসলমানের পাত্র কূপে পড়ে গিয়েছিল। মহাত্মাজির কাছে মানত করার পরে পাত্রটি আপনিই আবার উঠে আসে।

২৯। আজমগড়ে নৈপুরা গ্রামে ডালকু আহীর-এর বহুদিনের হারানো বাছুর আবার তার খুঁটিতে ফিরে আসে, মহাত্মাজির উদ্দেশে মানত করার পর। ডালকু আহীর স্বরাজ

অর্থভাণ্ডারে মানতের এক টাকা দান করেছিল।

৩০। বার্নিয়া জেলার এক ভদ্রলোক লেখেন, রুস্তমপুর মৌজায় গোয়ালাসাধুর কুঁড়েঘর থেকে নব্বই টাকা সমেত থলিটি উধাও হয়েছিল। মহাত্মার উদ্দেশে মানত করার পর টাকা-সমেত থলি ফিরে আসে।

৩১। দেওরিয়া তহশিল-এ সমগড় মৌজার এক নামী জমিদার ভগবতীজির কাছে মানতে ছাগবলি দেন। সেই মাংসের প্রসাদ অনেকেই নিয়েছিল। কিছুক্ষণের মধ্যে জমিদারতনয়ের হাত তার বুকের কাছে আটকে গেল, পাগল হয়ে গেল তার বউ। জমিদার তখন জাতীয় অর্থভাণ্ডারে সেই ছাগলের মূল্য দান করতে সম্মত হন। ব্রাহ্মণ-ভোজন করাবেন, এমন প্রতিজ্ঞাও নেন। ছেলে, ছেলের বউ, উভয়েরই স্বাভাবিকতা ফিরে এল।

৩২। গোরখপুর শহরে হুমায়ুনপুর মহল্লায় উকিলবাবু যুগলকিশোরের বাগানে দুটি গাছ মরে পড়ে গিয়েছিল। আবার তারা সজীবতা ফিরে পায়, উঠে দাঁড়ায় সোজা হয়ে। অনেকেই বলেন, মহাত্মাজির আশীর্বাদ এর মূলে। কারণ, যে লোকটি গাছ কেটেছিল, সে বলে মহাত্মাজির প্রতাপ যদি সাচ্চা হয়, গাছ দুটি আপনিই জীবন ফিরে পাবে। হাজার হাজার লোক রোজ আসে সেখানে, দেয় বাতাসা, টাকা, গয়না। লোকে বলে, এই প্রণামী স্বরাজ আশ্রম এবং তিলক স্বরাজ-অর্থভাণ্ডারে দেওয়া হবে।

৩৩। *জ্ঞানশক্তি* ১৯২১-এর এপ্রিলে লিখল, একটি শীর্ণকায় আম্রবৃক্ষ ঝড়ে উৎপাটিত হয়েছিল। গাছটির শাখাপ্রশাখার ভারবহনের পক্ষে তার শিকড় ছিল দুর্বল। গাছটি পড়ে যাওয়ার পরেও, তার মূলের অংশবিশেষ মাটির তলায় ছিল। লোকে যখন জ্বালানির প্রয়োজনে পড়ে-যাওয়া গাছের ডালপালা কেটে নিয়ে যায়, অপেক্ষাকৃত লঘুভার গাছটি সেই শিকড়ের জোরে আবার সোজা হয়ে দাঁড়ায়। কিন্তু লোকের মুখে মুখে চালু হল, গাছটি আপনা থেকেই পুনর্জীবন পেয়েছে। লোকজন জড়ো হয় সেখানে, জায়গাটিতে যেন সর্বদাই মেলা। সকলেই দান করে বাতাসা, ফুল, টাকা। বলা হয় গান্ধীর প্রতাপেই নাকি তার জীবনলাভ। এই মেলা, লৌকিক বিশ্বাসের এই প্রকাশ শিক্ষিতের কাছে হাস্যকর।

৩৪। বস্‌তি জেলার এক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি *স্বদেশ* পত্রিকায় ঘটনাসমূহ লিখে পাঠিয়েছিলেন। চাকদেহী গ্রামে মহুয়া গাছের খুঁটি থেকে দুটি গাছ বেরিয়েছিল। কার্তিক মাসে খুঁটিটি পোঁতা হয়। তাতে বাঁধা থাকত এক পাঁড়েজির দুটি মহিষ। গুজব, যে এক চামার দেখেছিল, খুঁটি থেকে গাছটিকে বেরিয়ে আসতে। কিন্তু চামারের বউ সেটি টেনে একেবারে বের করে নেয়। ফলে চামারের উপর খানিকটা চোটপাট করে লোকজন। চামার প্রার্থনা করে, মহাত্মা, 'তুমি যদি সত্যি সত্যি মহাত্মা হও, এই খুঁটিতে আর একটি গাছের জন্ম দাও।' তাই ঘটল। এখন প্রত্যহ সেই গাছ দেখতে বহু লোকের জমায়েত হয় জায়গাটিতে।

৩৫। বস্‌তি শহরে রঘুবীর কাসাউধন-এর বিধবা থাকেন। বিধবার পুত্রও বছর তিনেক হল মারা গেছে। তার স্বর্গত স্বামী দুটি আমগাছ পুঁতেছিলেন। একটিকে কিছুদিন আগে কেটে ফেলা হয়েছে, অন্যটিও গেছে শুকিয়ে। পনেরো দিন হল, শুকিয়ে যাওয়া

গাছে হঠাৎ এসেছে নতুন পাতা। বৃদ্ধা সেই বিধবা বলছেন, তিনি মহাত্মাজির কাছে মানত মেনেছিলেন—এই গাছই আমার স্বামীর একমাত্র স্মৃতিচিহ্ন, একে তুমি বাঁচিয়ে দাও। এই স্থানেও এখন বিরাট জনসমাগম হয়।

৩৬। *স্বদেশ,* ১৩ মার্চ ১৯২১: গত শনিবার গোরখপুর শহরের গোটা চার পাঁচ কুয়ো থেকে ধোঁয়া বেরতে শুরু করে। লোকের ধারণা হল, কূপের জলে আগুন লেগে গেছে, গোটা শহর ভেঙে পড়ল কূপগুলির কাছে। কিছু মানুষ একটি কূপ থেকে জল তুলল, সেই জলে ছিল ক্যাওড়াফুলের সুবাস। লোকের মনে হয়, এটা মহাত্মাজির প্রতাপের ফল। কুয়োটিতে কিছু টাকা প্রণামী দেওয়া হয়।

৩৭। *স্বদেশ,* ১০ এপ্রিল ১৯২১: কিছুদিন আগে গোরখপুর সিভিল কোর্টের কাছে এক গ্রামে মারাত্মক আগুন লাগে। গোটা গ্রামই প্রায় ধ্বংস হয়ে যায়। কাছাকাছি একটি নালা ছিল। কাদা আর জলের আশায় লোকে সেই নালার মধ্যে একটি কাঁচা কুয়ো খুঁড়তে থাকে। অনেক হাত খুঁড়বার পরেও কিন্তু জল মেলে না। লোকমুখে শোনা যায়, সেই সময় কেউ একজন মহাত্মার কাছে মানত করেছিল। হঠাৎ ফোয়ারার মতো জলে উপচে উঠল কুয়ো, ষোলো-সতেরো হাত কুয়োটি ভরে গেল জলে। আশপাশের গর্তগুলিও জলে পরিপূর্ণ হল। তার পর থেকে হাজার হাজার মানুষ সেখানে আসছে, ফুল বাতাসা টাকা দিচ্ছে, স্নান করছে, মুখ ধুচ্ছে সেই জলে, বাড়িতে নিয়ে যাচ্ছে সেই জল।

৩৮। ওই একই ঘটনা সম্বন্ধে *জ্ঞানশক্তি* লেখে: গোরখপুর শহরের বাইরে বুলন্দ্‌পুর গ্রামের দক্ষিণে একটি বিশাল গর্ত আছে, যার গভীরতা ২৩ ফুটের কম নয়। গোরখপুর শহরের জলসীমা ২১ ফুট। অনেক সময় ওই সীমার আগেই জল পাওয়া যায়। ওই অঞ্চলে কুয়ো থেকে জল তুলতে সাধারণত ১১ হাত দড়ি ব্যবহার করা হয়। যে কুয়ো থেকে ফোয়ারার মতো জল বেরিয়েছে, সেটি এই গর্তের মধ্যে। জল পাওয়া গেলে, তা কুয়োটিকে কানায় কানায় ভরিয়ে দেয়। সেখানে এখন মেলা হচ্ছে। এমন একটি বিশাল গর্তে যখন কুয়ো খোঁড়া হয়, এরকম ঘটনা তো স্বাভাবিক। এ ধরনের কুয়ো অনেক দেখা যায়, যা গর্তের ভিতরেই খোঁড়া আর কানায় কানায় ভর্তি। লোকে বিশেষ কুয়োটিকে এখন টাকা বাতাসা ফুল দিচ্ছে, বলছে এ নাকি গান্ধীর আশীর্বাদের নিদর্শন, কূপের নামকরণও হয়েছে গান্ধীর নামে।...স্বরাজের জন্য কি এমন জ্ঞানবুদ্ধি প্রয়োজন?

৩৯। মির্জাপুর বাজার, যেখানে জল আপনাআপনি বেবিয়ে এসেছে, ভক্তরা সেখানে দান করেছে ২৩ টাকা ৮ আনা ১২ পাই। শ্রীছেদিলাল এই টাকা গোরখপুর স্বরাজ অর্থভাণ্ডারে পাঠাবার বন্দোবস্ত করেছেন।

৪০। বস্‌তি জেলার বিক্রমজিৎবাজারে এক কুয়োর জলে দুর্গন্ধ ছিল। দুজন মহাজন মহাত্মাজির নামে মানত করলেন। পরের সকালেই জল শুদ্ধ হয়ে যায়।

৪১। সোনাওরা গ্রামে মহামারী লেগেছে। লোক এসে থাকছে গ্রামের বাইরে এক কুঁড়েঘরে। কিন্তু সেখানকার কুয়ো এতই অগভীর যে ২৭ এপ্রিল একটা লোটাও তার জলে পুরোপুরি ডোবানো যাচ্ছিল না। দেখেশুনে এক মিশ্রজি গান্ধীজির নামে পাঁচ টাকা বিতরণ মনস্থ করলেন। এর পরই জল ক্রমশ বাড়তে থাকে, ২৮ তারিখ দুপুরের মধ্যে জল ওঠে পাঁচ হাত, তার পরদিন এগারো হাত।

কাহিনীগুলিতে আবার দেখছি, মহাত্মার ভাবরূপ লোকায়ত বিশ্বাস আর আচার-অনুষ্ঠানের কাঠামোতেই স্থান পাচ্ছে। আঞ্চলিক ধর্মীয় অনুষ্ঠানে মানত করার যে প্রথা. তাই গান্ধীর আরাধনার উপায় (২৮) থেকে (৩০) সংখ্যক আখ্যানে। (৩১) সংখ্যক গল্পে দেখলাম তারই এক ভিন্ন চেহারা। যেখানে ভগবানকে মানত করা ছাগলের জন্য ফল হল হিতে বিপরীত, যেমন উচ্চবর্ণ জমিদার-পরিবারে শারীরিক যন্ত্রণা, মানসিক অসুস্থতা। যার প্রায়শ্চিত্ত শুধুমাত্র ব্রাহ্মণভোজনে সীমাবদ্ধ থাকল না, ছাগলের মূল্য-সমান টাকা দান করতে হল জাতীয় বিদ্যালয়ের অর্থভাণ্ডারে।

কংগ্রেসবিরোধী *জ্ঞানশক্তি* পত্রিকা বৃক্ষ কি কূপের জীবনলাভকে (৩৩ নং, ৩৮ নং) যুক্তিপূর্ণ ব্যাখ্যা করল। অথচ রাজনৈতিক সচেতনতা সে বিন্যাস থেকে লুপ্ত। অঘটনের পার্থিব হেতুর দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করে এই ব্যাখ্যা। পানীয় জল সরবরাহ এবং সেচব্যবস্থার গুরুত্ব বুঝি কূপ-সংক্রান্ত আখ্যানগুলি (৩৬ সংখ্যক থেকে ৪১ সংখ্যক) থেকে। তবে, এ বিষয়ে আরও কিছু কথা বলা প্রয়োজন। প্রধান বিষয়বস্তু এক্ষেত্রে দুটি; প্রথমত, মহাজন কি উচ্চবর্ণের কোনও ব্যক্তির (সাধারণত জমিদার) পানীয় জল শুদ্ধ করার উদ্দেশ্যে মানত (আখ্যান ৪০ এবং ৪১ সংখ্যক); দ্বিতীয়ত, যেসব কূপে অলৌকিকভাবে জল এসেছে, সেখানে জনসাধারণের টাকা, ফুল, বাতাসা ইত্যাদি প্রণামী দেওয়া। দুটি বিষয়ই সহজে বোধগম্য, যদি মনে রাখি জমিদারেরই একমাত্র সামর্থ্য ছিল ইঁদারা নির্মাণের খরচ বইবার, আর গোরখপুরে ইঁদারা নির্মাণ ঘিরে গড়ে উঠেছিল আচারবহুল অনুষ্ঠান।

গোরখপুরে কূপ নির্মাণ নিয়ে পুজার মনোভাব তখন বর্তমান। তাই কুয়োর উদ্দেশে ফুল, বাতাসা, টাকা প্রণামী দেওয়া, বা সেই টাকা জাতীয় বিদ্যালয়ে দান করা, ১৯২১-এর গোড়ায় যা বিশেষ লক্ষণীয়, এই সব কিছুই উপস্থিত ধ্যান-ধারণাকে এক নতুন পরিপ্রেক্ষিতে বিস্তৃত করছে। গান্ধীর নামে মানত, ব্রত বা আরাধনা, কি তাঁর নাম করে মহিলাদের ভিক্ষা চাওয়া, ভোগবিতরণ, সবই সেই একই বিস্তারের অংশ।

স্বদেশ-এর সম্পাদক ১৯২১-এর এপ্রিলে লিখছেন, দেবী ভবানীর নামে ভিক্ষা অথবা ভোগ যেমন প্রচলিত, তেমনি গান্ধীর নামে মেয়েদের ভিক্ষা চাওয়া আর ভোগ দেওয়ার খবর এসেছে বিভিন্ন জায়গা থেকে। এমন কী ঢেঁকিশালে যখন সদ্য রবিশস্য তুলে আনা হয়েছে, মহিলারা আসতেন শস্যভিক্ষা চাইতে, যা লাগবে মহাত্মার ভোগে। ভোগ দেওয়ার যে আচার, তার সমসাময়িক তাৎপর্য সম্পূর্ণ পরিষ্কার নয়। তবে মনে হয় ভাগ্য ফেরানোর বিশ্বাস এর সঙ্গে জড়িত। কিন্তু এক্ষেত্রে লক্ষণীয় হল দেবী ভবানীর আরাধনাসংক্রান্ত আচারের বিস্তার; ঢেঁকিশালে ভিক্ষা চেয়ে কৃষকের মনে এমন এক নৈতিক দায়বোধ চারিয়ে দেওয়ার প্রয়াসও বটে, যে শস্য যখন প্রয়োজনের অতিরিক্ত আছে, তখন মহাত্মার নামে তা দান করা কর্তব্য। আরও লক্ষণীয়, যে গুড় তৈরি করে যে চাষি. তাকেও এমন দায়ে বদ্ধ করা হত। আখখোয়াড়ে গিয়ে গুড় ভিক্ষা চাওয়া প্রচলিত ছিল। আর সেই স্থান থেকে ভিখারিকে ফিরিয়ে দেওয়া নাকি অমার্জনীয় অপরাধ। ১৯২১-এর ১ মার্চ আজমগড় জেলায় নানুশাক গ্রামে এক আহীরের কাছে গুড় ভিক্ষা চাইতে গিয়েছিল একজন সাধু। আহীর সাধুকে ফিরিয়ে দেয়। গুজব যে আধ ঘণ্টার মধ্যে

আহীর-এর গুড় আর সঙ্গে দুটি মহিষ আগুনে পুড়ে শেষ হয়ে যায়। *স্বদেশ* পত্রিকায় এ কাহিনীর যে বিবরণ পাই, তাতে গান্ধীর কোনও উল্লেখ নেই। কিন্তু লক্ষ্ণৌ-এর *পায়নিয়র* পত্রিকা অনুযায়ী, সাধুটি মহাত্মার নামেই ভিক্ষা চাইছিল। সত্যি হোক আর নাই হোক, গান্ধীর নাম যে এ ঘটনার সঙ্গে আরও পত্রিকাও জড়িয়েছিল, এটা খুবই সম্ভব।

স্থানীয় জাতীয়তাবাদী সাপ্তাহিকে এসব গুজবের প্রতিবেদন কি একটা ইঙ্গিত স্পষ্ট করে না যে কিছু গোষ্ঠী কায়েমি স্বার্থসিদ্ধির তাগিদে গুজবগুলো ছড়িয়েছিল? এ কথা সত্যি যে *স্বদেশ*-এ তা ছাপা হত তখনই, যখন পত্রিকা দপ্তরে কেউ লিখে পাঠাত তেমন কাহিনী। তবে তার অর্থ এই নয় যে, ছাপার অক্ষরে প্রকাশিত হওয়ার আগে এমন-সব গুজবের অস্তিত্ব কি প্রচলন ছিল না। *জ্ঞানশক্তি*-র মতো জাতীয়তাবাদবিরোধী স্থানীয় পত্রিকায় গুজবের প্রতিবেদনে সেই প্রচলনেরই প্রমাণ।

একথা অবশ্য সন্দেহাতীত যে *স্বদেশ*-এ প্রকাশ পেলে, তাদের প্রচলন বাড়ে, আরও বিশ্বাসযোগ্যও হয় তারা। ফরাসি বিপ্লবকালে গ্রামে আতঙ্কের বিশ্লেষণে ঐতিহাসিক লেফেব্র দেখিয়েছেন, গুজবকে ছাপার অক্ষরে প্রকাশ করে সাংবাদিকরা কীভাবে তাতে জুড়ে দিতেন নতুন জোর। তা সত্ত্বেও এটা পুরোপুরি মানা যায় না যে ছাপার অক্ষর গুজবের চেহারাকে খুব বেশি বদলে দেবে। গুজব এমনই এক মৌখিক ভাষা, যার স্রষ্টার নাগাল পাওয়া ভার। ছাপার অক্ষরে তার কার্যকারিতা বাড়ে। তবে গোরখপুরের মানুষ যে গল্পসমূহ মেনে নেয়, তার কারণ এই নয় যে স্থানীয় সংবাদপত্রে তাদের আস্থা অগাধ। কাহিনীগুলি তাদের বিশ্বাস, অলৌকিক নিয়ে তাদের ধারণা, তাদের নীতিবোধ, এসবের সঙ্গে একাকার হয়েছিল—গোরখপুরের মানুষের বিশ্বাসের মূল এটাই।

এমন সব গুজবের প্রচলনে স্থানীয় কংগ্রেস নেতাদের প্রতিক্রিয়া কী ছিল? জেলা কংগ্রেসের সভাপতি মৌলভী সুবহানুল্লাহ ১৯২২ সালে স্টেশন কোর্টে স্বীকার করেন যে, জনগণকে গুজবে বিশ্বাস থেকে বিরত রাখতে কংগ্রেস বা খিলাফৎ-এর পক্ষে কোনও প্রচেষ্টাই ছিল না। *স্বদেশ* পবিত্রতার দোহাই দিয়ে গুজব ছেপে চলে 'ভক্তদের বিশ্বাস' শিরোনামে। কিন্তু গুজবের প্রতি এই কাগজেরও ছিল দুটি ভূমিকা। একদিকে, তারা মাঝেমধ্যে নোট ছাপত অলৌকিক ঘটনাসমূহকে উড়িয়ে দিতে, এমন কি ব্যঙ্গকৌতুকও করত সেসব নিয়ে। অন্য দিকে, *পায়নিয়র*-এর আক্রমণের প্রতিবাদে নিজেদের তরফে গুজব ছাপার সাফাই গাইত। চাপে পড়ে, *স্বদেশ*-এর সম্পাদক কৃষকের মেনে নেওয়াকেও সাধুবাদ জানিয়েছেন। *স্বদেশ*-এর সম্পাদক, মহাত্মার প্রতি ভক্তির আদর্শ যিনি জেলায় ছড়িয়ে দিতে চেয়েছিলেন, তাঁর দ্বিধা ছিল না মহাত্মার প্রতাপ-বিষয়ে গুজব প্রকাশ করতে। তবে গুজব যখন বিপজ্জনক কোনও ধারণা অথবা কাজের প্ররোচক, যেমন জমিদারিপ্রথা বিলোপ, খাজনা কমানো, বাজারে ন্যায্যমূল্য প্রতিষ্ঠা, তখনই আবার *স্বদেশ* পত্রিকা গুজবের বিরোধী ভূমিকায় চলে যায়।

ঠিক যেমন গোরখপুরে নানান অলৌকিক ঘটনায় মহাত্মার নাম জড়িয়ে গেল, তেমনিভাবে জনসভা, পুস্তিকা ইত্যাদির সঙ্গে যুক্ত হয় তাঁর নাম। যুক্ত হয় মহাত্মার নাম স্বরাজ কথাটির সঙ্গে, একাধিক অর্থে যার ব্যবহার। চৌরিচৌরা দাঙ্গার পরিপ্রেক্ষিতে এলাহাবাদ কোর্টে জজেরা বললেন, এটা লক্ষণীয় যে গোরখপুরে কৃষকের মনে স্বরাজের

সঙ্গে মিস্টার গান্ধীর নাম কীভাবে জড়িত। সাক্ষীরা বার বার বলে, এ হল গান্ধীর স্বরাজ অথবা মহাত্মার স্বরাজ, কৃষক যার পথ চেয়ে আছে। চৌরিচৌরা মামলার প্রধান আসামী লাল মহম্মদ কিছু উর্দু ঘোষণাপত্র বিক্রি করেছিল। তার মতে, সেগুলি গান্ধীর কাগজ; যখন গান্ধী চাইবেন, তখনই বের করবে বলে সে রেখেছিল। খিলাফৎ অর্থভাণ্ডারে দান করলে যে রসিদ পাওয়া যেত, তা অনেকটা এক টাকার মতো দেখতে। গোরখপুরের চাষিরা তাকে বলত গান্ধী-নোট। এসবের মধ্যে আমরা দেখি গান্ধীকে বিকল্প শক্তির স্রষ্টা ভাবতে জনসাধারণের বিশেষ প্রবণতা। স্থানীয় এক প্রামাণিক বিবৃতিতে পাওয়া যায়, ১৯২২-এর ৪ ফেব্রুয়ারি চৌরা থানায় ঐতিহাসিক সংঘর্ষের ঘণ্টা কয়েক আগে যেসব কৃষক-ভলান্টিয়ার দু মাইল দূরে ডুমরীর দিকে যাচ্ছিল এক সভায় যোগ দিতে, তারা বলে, গান্ধী-মহাত্মার সভায় যাচ্ছে তারা, যা এনে দেবে গান্ধী-স্বরাজ। গোরখপুরে জেলা-কংগ্রেসের নেতৃত্ব ছাড়াই গান্ধী-স্বরাজ সম্পর্কে ধারণা তৈরি হয়েছিল। হাইকোর্ট জজরা লক্ষ করেছেন যে স্থানীয় কৃষক স্বরাজকে মিলিয়েছিল সেই আদর্শ স্বপ্নযুগে, যখন খাজনা নেওয়া হবে কম টাকায়, কি মাঠ বা ঢেঁকিশাল থেকে নেওয়া শস্যে, কৃষক জমি রাখতে পারবে নামমাত্র খাজনায়। আদালতে বিচারের সময় কংগ্রেস এবং খিলাফৎ-এর নেতারা বার বার বলেন যে এমন কোনও ধারণা গ্রামে তাঁরা প্রচার করেননি। বস্তুত এমন তথ্য আছে যে ১৯২১-এর মার্চ মাস থেকেই গোরখপুরের গ্রামে গ্রামে স্বরাজের আগমনবার্তা ঘোষিত হচ্ছিল। জমিদারদের অনুগামী *জ্ঞানশক্তি* পত্রিকা এসব ঘটনার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে; তাদের ভাষায়, এগুলি অশুভ ইঙ্গিত:

> এক রাত্রে গ্রামবাসীরা নিদ্রা ত্যাগ করে আশপাশের চারটি গ্রামে ঘুরে বেড়াল। সে রাত্রে ঘুমনো প্রায় অসম্ভব। তারা চিৎকার করছিল—গান্ধীজির জয় হোক। তাদের সঙ্গে ছিল ঢোল, তাশা ইত্যাদি। আওয়াজে কান পাতা দায়। লোকে চেঁচিয়ে বলে যে, এ স্বরাজের ডঙ্কা। স্বরাজ এসে গেছে। গান্ধীর সঙ্গে বাজি ধরেছিল ইংরেজ—স্বরাজ তারা দেবে, যদি গান্ধীজি অগ্নিপরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। একটি বাছুরের লেজ ধরে আগুন দিয়ে হেঁটে গেছেন গান্ধীজি। এখন স্বরাজ এসে গেছে। বিঘা প্রতি চার থেকে আট আনার বেশি খাজনা দেওয়া হবে না, এমন ঘোষণাও কানে আসে। এসব গুজব জমিদার আর কৃষকের মধ্যে সংঘাতের প্রতীক। চাষি আর জমিদারের কথা মানতে বা তার কাজ করতে রাজি নয়। এর প্রতিটিই দেশের পক্ষে অশুভ ইঙ্গিত।

গান্ধীর আগুন দিয়ে হেঁটে যাওয়ার কৃতিত্ব যে তৎকালীন কৃষকচৈতন্যের স্তরে খাপ খেয়ে যাবে, তা স্পষ্ট। যা মিলে যায় সেই স্বর্গরাজ্যের স্বপ্নে, যে রাজ্যে কোনও খাজনা নেই। সেই রাত্রে গোরখপুরের গ্রামে স্বরাজের আগমনবার্তায় এমন চেতনাই ভাষা পেয়েছিল। স্বীকৃত কংগ্রেস নীতি থেকে এর দূরত্ব অনেক। ১৯২১-এর শেষে স্থানীয় ভলান্টিয়ারদের কার্যকলাপ আরও মারমুখী হয়ে ওঠে, স্বরাজের উপমা তখন পুলিশি শক্তির বিকল্পে। এটাও তৎকালীন কংগ্রেস নীতির স্বপক্ষে নয়। চৌরার যে থানাদার খুন হয়, তার ভৃত্য সরযু কাহারের কথায়, ঘটনার দু চার দিন আগেই সে শুনেছিল, গান্ধী-মহাত্মার স্বরাজ এসে গেছে। চৌরা থানা উঠে যাবে, স্থাপিত হবে ভলান্টিয়ারদের নতুন

থানা। ১৯২২ এর আগস্ট মাসে ফেঁকু চামার জজকে বলে, 'বিপথ কাহার, স্বরূপভার আর মহাদেও ভুজ, এরা সবাই গান্ধী মহারাজ, গান্ধী মহারাজ বলতে বলতে উত্তর দিক অর্থাৎ চৌরার দিকে এগিয়ে আসে। আমি তাদের শুধোলাম, গান্ধী মহারাজের নাম করে তারা চেঁচাচ্ছে কেন? তারা উত্তর করল, চৌরা থানা পুড়িয়ে দিয়েছে তারা, মহারাজের স্বরাজ এসে গেছে।'

গান্ধীর স্বরাজের প্রকাশে যেমন পরিবর্তন এল, তেমনি চৌরিচৌরায় কৃষক ভলান্টিয়ারদের গান্ধী মহারাজের নামে জয়ধ্বনিতেও একটা প্রভেদ লক্ষণীয়। আগেই দেখেছি, ১৯২১-এর ফেব্রুয়ারিতে গান্ধী যখন গোরখপুর থেকে ফিরছিলেন, জয়ধ্বনিতে ছিল দাবির সুর। এক মাসের ভিতরে সেই ধ্বনি কৃষক ভলান্টিয়ারদের সংগঠিত শক্তি আর সংগ্রামের নিদর্শনে রূপান্তরিত হল। সে এমনই এক ধ্বনি, যা শত্রুদের মনে, এমনকি যে সম্পূর্ণ বিশ্বাসী নয়, তার মনেও জাগায় আতঙ্ক। উত্তর ভারতে কৃষকের কাছে এ আর গান্ধীর জয়ধ্বনি নয়, থানা বা বাজারের উপর আক্রমণের ঘোষণামন্ত্র। জয় মহাবীর, বম্ বম্ মহাদেও, যা ছিল যুদ্ধের মন্ত্র, মহাত্মা গান্ধী কী জয় এখন তারই সমতুল। ভক্তি আর শ্রদ্ধার সেই জয়ধ্বনি সরাসরি সংঘর্ষের উদ্দীপনায় পরিণতি পেল। যেসব সংঘর্ষ মহাত্মা নামের দোহাই দিয়ে খাড়া করতে চায় সততাব যুক্তি। কিন্তু কৃষকের এই মহাত্মা প্রকৃত গান্ধী নয়, কৃষকের কল্পনার প্রতিরূপ তিনি। যা করত তারা, ভেবে নিত তার বিধান আসছে তাদের কল্পনার মহাত্মার কাছ থেকে। আসলে সঠিক নীতি, ঔচিত্য আর সম্ভাব্য নিয়ে তাদেরই যে লোকায়ত ধারণা, সেখানেই তার প্রকৃত ভিত্তি। ১৯২১-এব শীতকালে উত্তর বিহারে যে সব হাট লুটের ঘটনা হয় সে-বিষয়ে এক জন আমলা লিখছেন:

> সরকারের হাতে যা সাক্ষ্য রয়েছে, তাতে আর কোনও সন্দেহই নেই যে ওই হাট লুটের ঘটনা আর অসহযোগ আন্দোলনের মধ্যে সরাসরি যোগাযোগ রয়েছে। লুণ্ঠনকারীরা এসে প্রথমে চাল বা কাপড় বা সবজি বা ওই জাতীয় কোনও জিনিসের দাম জিজ্ঞেস করে। দাম শুনেই তারা বলে যে গান্ধী হুকুম দিয়েছেন দাম এই হবে, বলে চলতি মূল্যের এক-চতুর্থাংশ একটা মূল্য উল্লেখ করে। দোকানি ওই দামে জিনিস বিক্রি করতে অস্বীকার করলে তাদের গালাগাল আর মারধর করে তাদের দোকান লুঠ করা হয়।[৩]

পূর্ব উত্তরপ্রদেশ বা উত্তর বিহারের কৃষকের মনে মহাত্মা কোনও একটি বিশেষ স্বীকৃত ধারণা নয়। গান্ধীর বিধান আর প্রতাপ নিয়ে তাদের যে বোধ, তা অনেকাংশেই স্থানীয় কংগ্রেস নেতাদের ধারণার বিরুদ্ধে, গান্ধীবাদের মূলমন্ত্রেরও তা প্রতিকূল। এই স্ববিরোধই চৌরিচৌরার হিংসাত্মক ঘটনাবলীর সূত্র।

অনুবাদ: রুদ্রাংশু মুখোপাধ্যায়, রুশতী সেন

টীকা

১ উত্তরপ্রদেশ ও বিহারে গোরক্ষা আন্দোলন প্রসঙ্গে দ্রষ্টব্য· John R McLane, *Indian Nationalism and the Early Congress* (Princeton, 1977), Sandria Freitag, 'Sacred Symbol as Mobilizing Ideology The North Indian Search for a "Hindu" Community' *Comparative Studies in Society and History* 22 (1980), pp 597-625, Gyan Pandey, 'Rallying Round the Cow Sectarian Strife in the Bhojpur Region, c 1886-1917' in R Guha (ed), *Subaltern Studies* II (Delhi, 1983)

২ William Crooke, *The Popular Religion and Folklore of Northern India*, Vol 1 (London, 1896), pp 183-96

৩ *Bihar and Orissa Legislative Council Debates*, 8 March 1921 vol 1, p 293

একটি অসুরের কাহিনী

রণজিৎ গুহ

১

যেসব তথ্যের সূত্র ধরে ইতিহাস রচনা সম্ভব, আমাদের এই উপমহাদেশে তার প্রাচীনতম সংকলন রয়েছে ধর্মে। প্রভু আর অধীনের সনাতন সম্পর্কের সব বিশিষ্ট মুহূর্ত ধর্মেই গ্রথিত রয়েছে কর্তৃত্ব, সহযোগিতা আর প্রতিরোধের নিয়মে। এমন নিয়মের মূলে আছে কিছু ক্ষমতার বিধান; ইতিহাসে তার উচ্চারণ স্পষ্ট। দীর্ঘ দিন ধরে ফিরে ফিরে আসে এসব নিয়ম, শক্ত হয় তাদের ভিত, সার্বজনীন চেহারা পায় তারা; নিজেদের প্রারম্ভিক কর্মকে ছাপিয়ে উত্তরকালের সাংস্কৃতিক পর্যায়ে তারা আর শুধু স্মৃতিচিহ্নমাত্র নয়, বিশেষ ভাবে কার্যকর উপাদানও বটে। ফলে ক্ষমতার প্রতি উচ্চবর্গ এবং নিম্নবর্গের যে মনোভাব, তার এক পুঞ্জীভূত তথ্যসমগ্র গড়ে ওঠে। তার প্রকাশ আমরা দেখি কখনও পৌরাণিক কাহিনীতে, কখনও বা আচার-অনুষ্ঠানে, আবার কখনও রীতিনীতিতে, অথবা বিশ্বাসের জগতে পূর্বোক্ত উপকরণসমূহের বিচিত্র যোগাযোগের বিভিন্ন বিন্যাসে। যে আকারে এই তথ্যসমগ্র আমাদের নাগালে আসে, তাতে এর অধ্যয়ন সহজ থাকে না। কারণ লিখিত ভাষ্যের স্বচ্ছতা এই সমগ্রে অনুপস্থিত, মৌখিক লোককথার পরম্পরাতেই তার প্রধান অবলম্বন। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অতীন্দ্রিয় ভাবপ্রবণতা এবং অজ্ঞাত প্রতীকে তা আচ্ছন্ন; তার যুক্তি ভাষ্যকারদের যুক্তিবাদী ধারণাকে অস্বীকার করে। নানান যোগবিয়োগে পরিমার্জিত হতে হতে এই তথ্যসমগ্র আইনের সংগতিপূর্ণ চেহারা কখনওই পায় না। এর প্রকাশ অতি সংক্ষিপ্ত, একে বোঝা কঠিন, কারণ যে বার্তা সে রেখে যায়, তার প্রকৃতি দ্ব্যর্থবোধক; একাধারে জাগতিক এবং আধ্যাত্মিক সেই প্রকৃতি।

এই তথ্যসমগ্রের অস্তিত্ব এবং তার গুরুত্ব বিষয়ে আমরা যে সচেতন, তার জন্য ঐতিহাসিক দামোদর ধর্মানন্দ কোশাম্বির কাছে আমাদের ঋণ সব থেকে বেশি। অতীতের আদিবাসী ইতিহাস ছাপিয়ে পরবর্তী উন্নয়নের পর্যায় এসে পড়ে; পুরনো যা-কিছু উপাদান অবশিষ্ট থাকে, তা নতুন সামাজিক স্তরের সঙ্গে মিলে মিশে যায়; এই সংমিশ্রণেই প্রাত্যহিক জীবন আর চিন্তাশীল মননের সংস্কৃতি প্রকাশ পেয়েছে। কোশাম্বি তাঁর প্রখ্যাত ঐতিহাসিক গ্রন্থ দুটিতে একথারই বিশ্লেষণ করেন।[১] ভাবজগতের স্তরে এই বিন্যাস সব চেয়ে স্পষ্ট সেই-সব জাতির ধর্মে, হিন্দু বর্ণভেদ অনুসারে সকলের নিচু ধাপে যাদের জায়গা। বর্তমানে এবং অতীতে খাদ্যোৎপাদন আর হালচাষকে এরা বর্জন করেছে; এদের অর্থনৈতিক এবং সামাজিক বিপর্যয়ের মূল কারণ সেটাই। এই সব

নিম্নতম জাতি ঔপনিবেশিক শাসকদের বর্ণনায় অপরাধপ্রবণ উপজাতি বা 'ক্রিমিনাল ট্রাইব'; অনেক সময়েই উপজাতীয় আচার-ব্যবহার এবং পৌরাণিক কাহিনীকে তারা বাঁচিয়ে রাখে।[১] কিন্তু সেই আচার অথবা পুরাণ, কোনও কিছুই এই সংরক্ষণে অপরিবর্তিত থাকা সম্ভব নয়। 'সমান্তরাল ঐতিহ্যে'র আকর্ষণ, উচ্চজাতির প্রধানত ব্রাহ্মণ্য-সংস্কৃতির ভার তাকে বদলায়, আত্মসাৎ করে। এতখানিই বদলায় যে মনে হয় আচার-ব্যবহার হিন্দুদের প্রতিষ্ঠিত প্রকাশভঙ্গিমার অভ্যন্তরীণ চিহ্নমাত্র; যেটুকু ফারাক, সে যেন কেবল তারা বহুল প্রচলিত নয় বলেই। কোশাম্বি বলেছেন, ব্রাহ্মণ্যবাদের মূল কাজই হল পৌরাণিক কাহিনীকে একত্র করা, যে আলেখ্য নানান চেহারায় বার বার ফিরে আসে, তাকে একতায় চিহ্নিত করা আর তাকে স্থাপন করা কোনও উন্নত সামাজিক কাঠামোর অভ্যন্তরে।[২] একবার বহুমিশ্রিত সামঞ্জস্যের এই আবরণ সরিয়ে নিলে, অনেক পৌরাণিক কাহিনীর বিষয়ই মূর্ত হয়ে ওঠে অমীমাংসিত কোনও এক প্রাচীন বিরোধের রূপকে। বস্তুত সেই বিরোধের মূর্তিতেই পৌরাণিক কাহিনীর স্বরূপ।

২

রাহুকে নিয়ে যে পৌরাণিক আলেখ্য,[৩] তাকে এমন এক বিরোধের স্মারক বলা চলে। *মহাভারত*-এর সমুদ্রমন্থনে এই আখ্যানের প্রথম বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া যায়।

> প্রথম উপাখ্যান।
> তার পর মথ্যমান সাগর থেকে...ধন্বন্তরিদেব অমৃতপূর্ণ কমণ্ডলু নিয়ে উঠলেন, তা দেখে দানবগণ 'আমার' 'আমার' বলে কোলাহল করতে লাগল। নারায়ণ মোহিনীমায়ায় স্ত্রীরূপ ধারণ করে দানবগণের কাছে গেলেন, তারা মোহিত হয়ে তাঁকে অমৃত সমর্পণ করলে। তিনি দানবগণকে শ্রেণীবদ্ধ করে বসিয়ে কমণ্ডলু থেকে কেবল দেবগণকে অমৃত পান করালেন। দানবগণ ক্রুদ্ধ হয়ে দেবগণের দিকে ধাবিত হল, তখন বিষ্ণু অমৃত হরণ করলেন। দেবতারা বিষ্ণুর কাছ থেকে অমৃত নিয়ে পান করছিলেন সেই অবসরে রাহু নামক এক দানব দেবতার রূপ ধরে অমৃত পান করলে। অমৃত রাহুর কণ্ঠদেশে যাবার আগেই চন্দ্র ও সূর্য বিষ্ণুকে বলে দিলেন, বিষ্ণু তখনই তাঁর চক্র দিয়ে সেই দানবের মুণ্ডচ্ছেদ করলেন। রাহুর মুণ্ড ভূমিতে পড়ল এবং ভয়ঙ্কর গর্জন করতে লাগল। সেই অবধি চন্দ্র-সূর্যের সঙ্গে রাহুর চিরস্থায়ী শত্রুতা হল। আজও সে চন্দ্র-সূর্যকে গ্রাস করে।

স্বর্গীয় এই লড়াইয়ের প্রতীকে নৈতিকতা নিয়ে সন্দেহের কোনও অবকাশ থাকে না। সৃষ্টির সেই দ্বন্দ্বময়তায় দেবতা-দানব, অমৃত-কালকূট, এমন-সব পরস্পরবিরোধী ধারণার ঘাতপ্রতিঘাত প্রয়োজন ছিল।[৪] অমৃত নিয়ে দেবদানবের যুদ্ধে দেবতাদের অনুকূল পরিস্থিতি গড়ে দিতে মোহিনীমায়ার ছলনাই দেখি বিষ্ণুর একমাত্র আশ্রয়; আর সেই নীচ উপায়েই দানবদের বঞ্চিত করা হলো অমৃতের ভাগ থেকে। যদি কোনও দানব সবার অলক্ষ্যে স্বর্গীয় ভোজ সভায় ঢুকে পড়ার সাহস রাখে, তার শাস্তির মূলে থাকে দ্বৈত অপরাধ—দেবতার জন্য নির্দিষ্ট আহার্য অন্যায়ভাবে আত্মসাৎ করা এবং অশুচি

করা সেই আনুষ্ঠানিক ভোজকে। অমৃত পানের এই অনুষ্ঠান তাই মিলে যায় নিশ্চিত এক হত্যার কারণে। অর্থাৎ ব্রাহ্মণ্যপ্রথায় দণ্ডের সর্বোচ্চ ধারণা রাহুর মুণ্ডচ্ছেদে সঙ্গতি পায়।

গ্রহণ সম্পর্কে বিভিন্ন সংস্কৃতির পৌরাণিক কাহিনীর আর আচার-অনুষ্ঠানের বিকৃতি কি বিচ্ছিন্নতার ধারণা এই প্রতীকে সামঞ্জস্য খুঁজে পায়। সূর্য থেকে চন্দ্র, দিন থেকে রাত্রি, আলো থেকে অন্ধকার, উষ্ণতা থেকে শৈত্যের পালাবদল[৬] যে নিয়মে গ্রথিত, গ্রহণ তার ব্যতিক্রমের প্রতিনিধি। লেভি-স্ত্রোস বলেছেন 'প্রাকৃতিক ধারাবাহিকতার এই ভাঙন আসলে এক বিকৃতি; প্রকৃতির স্বাভাবিক নিয়মে বাইরের কোনও এক উপাদান এসে পড়লে এমন বিকৃতির সূত্রপাত ঘটে।' পাশ্চাত্য সমাজের বাইরে গ্রহণের মতো মহাজাগতিক ঘটনা নিয়ে যে লোকায়ত বিশ্বাস প্রচলিত, সমাজতাত্ত্বিক স্তরে কোনও কোনও ইউরোপীয় মনোভাবে তার প্রতিতুলনা মেলে। লেভি-স্ত্রোস দেখান, বেনিয়মের বিয়ে নিয়ে মশকরা এমনই এক নিদর্শন। গ্রহণ যেভাবে গ্রহসমূহের গতিকে ব্যাহত করে, ঠিক তেমনি বিরূপ সম্বন্ধের উদবাহ বন্ধন ভেঙে দেয় বৈবাহিক সম্পর্কের আদর্শ পরম্পরাকে।[৭]

ভারতবর্ষেও লোকায়ত কল্পনায় সামাজিক বিচ্যুতির আশঙ্কা জড়িয়ে গেছে গ্রহণসৃষ্ট ভ্রষ্টতার সঙ্গে; সে ভ্রষ্টতা প্রকৃতির স্বাভাবিক কর্মপদ্ধতিকে ব্যাহত করে। এমন বিশ্বাস ছিল যে গ্রহণ প্রজননের আবর্তনে বাধা দিতে পারে, জন্মকে রোধ করে অথবা তাকে সম্পূর্ণ বিকৃত করে ভাঙতে পারে সে জন্মমৃত্যুর ধারাবাহিকতা। গ্রহণ সন্তান প্রসবের পক্ষে প্রতিকূল সময়, এই শঙ্কা তাই লোকগাথায় ফিরে ফিরে আসে। বহু স্থানে গর্ভবতী নারী এমন কী তার স্বামীরও গ্রহণ দেখা নিষিদ্ধ, অন্যথায় তাদের সন্তান নাকি হবে বিকলাঙ্গ। গ্রহণ দেখাই শুধু নয়, গ্রহণ-লগ্নে অন্য যে কোনও কাজের ফলেই ভ্রূণ ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। সেইসব কাজ সন্তানের শরীরে নিজের ছাপ রেখে যায়; যেমন সন্তানের দ্বিধাবিভক্ত ওষ্ঠ গ্রহণকালে পূর্বপুরুষের কর্তনকর্মের সাক্ষী, কাঠ কি আর কিছু চেরার শ্রম দাগ ফেলে সন্তানের আঙুলে, তার বাঁকানো আঙুল হয়ে থাকে মা-বাবার তালা নিয়ে কাজ করবার চিহ্ন, আর তিল জড়ুল ইত্যাদি বিভিন্ন জন্মচিহ্ন মায়ের চোখে সুর্মাটানা অথবা বাবার কপালে তিলক-কাটার পরিণাম।[৮] ধর্মশাস্ত্রের দণ্ডবিধিতে এ সবই সঙ্গত; সেখানে পাতকের শাস্তি প্রায়ই নির্দিষ্ট হয় তার দেহের সেই অঙ্গে, যা বিশেষ অপরাধে প্রত্যক্ষ লিপ্ত ছিল। গ্রহণ-লগ্নে জন্মগ্রহণের ক্ষতি তার শারীরিক অক্ষমতাকে ছাপিয়ে মানুষকে জীবনভর নানাভাবে অতিষ্ঠ করতে পারে। রাহুর দশায় যার জন্ম, তার ধনসম্পদ, বিদ্যাবুদ্ধি, সন্তানসন্ততি ধ্বংস হয়, দুঃখজর্জর হয় তার জীবন, একাধিক শত্রুর সম্মুখীন হতে হয় তাকে।[৯]

মরণে যেমন অশুদ্ধতার সংক্রমণ, গ্রহণ তেমনি ত্রাসে সমাজকে নিমজ্জিত করে। হিন্দু আচার-অনুষ্ঠানের শুদ্ধতার সঙ্গে রাহুর পৌরাণিক আখ্যানকে মিলিয়ে তার ব্যাখ্যা: '...যখন গ্রহণ লাগে, সেই বিশাল সর্প রাহু গ্রাস করে সূর্য অথবা চন্দ্রকে; অর্থাৎ হল সূর্য কি চন্দ্রের মৃত্যু; গ্রহণকাল ব্যেপে মানুষকে তাই অশৌচ পালন করতে হয়।'[১০]

এই বিশ্লেষণের অন্য পাঠে চন্দ্র বা সূর্যের মৃত্যু নয়, রাহুর আগমনই[১১] অশুদ্ধতার হেতু, ঠিক যেমন নিম্নজাত ব্যক্তির ছায়া গায়ে পড়লে শুদ্ধতা হারায় ব্রাহ্মণ। অশুদ্ধতা

সংক্রামক, তাই চন্দ্র বা সূর্য যতক্ষণ রাহুর কবলে, সমগ্র পৃথিবীও ততক্ষণ শুদ্ধতা থেকে বঞ্চিত। গুজরাট অঞ্চলে উচ্চজাতির ঐতিহ্যের ব্যাখ্যায় বিংশ শতাব্দীর শুরুতে এক পর্যবেক্ষক লেখেন 'দানবের ছায়া আর ভাঙ্গির ছোঁয়া অশুদ্ধতায় সমতুল্য, যাতেই এ-ছায়া পড়ে, তাকেই সে অশুদ্ধ করে। যেহেতু গ্রহণকালে সূর্য অথবা চন্দ্র অশুদ্ধ, তখন তাদের আলো যেখানে পড়ে, সেখানকার শুদ্ধতা অবশিষ্ট থাকে না।'[১২] সুতরাং যে রন্ধিত আহার্য বা পানীয় জল মজুত ছিল গ্রহণের সময়, অশুচি বলে গৃহস্থকে তা ফেলে দিতে হয়; গ্রহণ ছেড়ে যাওয়ার আগে নতুন করে রান্না করা, এমন কী রান্নার উদ্যোগ নেওয়াও ঠিক নয়।[১৩] এমনই প্রকট গ্রহণের অশুদ্ধতা যে সে সময় পরিবারে কোনও মৃত্যু বিশেষ অমঙ্গলের ইঙ্গিত।[১৪] মনুর বিধান হল, 'রাহু যখন গ্রহণকালে চন্দ্রের শুদ্ধতা হরণ করেছে, বিদগ্ধ ব্রাহ্মণের তখন উচিত নয় বেদপাঠ করা।'[১৫] গ্রহণ সম্বন্ধে লোকায়ত ধ্যানধারণা যে প্রাচীন ব্রাহ্মণ্যবাদের সংস্কার থেকেই উদ্ভূত, এই আদেশ তারই প্রমাণ।

গ্রহণের সময় প্রতিষেধক হিসাবে কিছু আচার-অনুষ্ঠান নির্দিষ্ট আছে। রাহুর অমঙ্গলসূচক মূর্তিটিকে সেগুলি আরও জোরদার করে। এমন অনেক অনুষ্ঠানে গন্ধের একটি বিশেষ জায়গা আছে; যেমন থারস্টান-এর লেখায় পাই, দক্ষিণ ভারতে পশুর শিং আর খুর পোড়ানোর প্রথা, 'যার গন্ধ নাকি অশুভ অশরীরীকে দূরে রাখবে।'[১৬] এই উপমহাদেশের বহু স্থানেই ভূত ছাড়ানোর এমন উপায় বর্তমান। আরও বেশি প্রচলিত কোলাহলের ব্যবহার; যেন সেই কোলাহলে 'ভেকধারী দৈত্য বাধ্য হবে খাদ্যের গ্রাস উদ্‌গীরণ করতে।' যেমন লিখেছিলেন অষ্টাদশ শতাব্দীতে এক জেসুইট তাঁর ভ্রমণকাহিনীতে।[১৭] এমন কোলাহলের কথা গোটা বিশ্ব জুড়ে, পেরু থেকে পিকিং পর্যন্ত বিভিন্ন সংস্কৃতিতেই পাওয়া যায়।[১৮] আমাদের দেশে এই কোলাহল শোনা যায় আসামের ঘণ্টাধ্বনিতে, নীলগিরি পাহাড়ে টোডাদের কণ্ঠনাদে এবং আকাশ লক্ষ্য করে কুর্গদের বন্দুক-চালনায়।[১৯] লেভি-স্ট্রোস বলেছেন, 'একটি অণুক্রমের সুষম বিন্যাসের অসংগতির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণেই কোলাহলের সক্রিয়তা। এই অণুক্রমের দুটি রাশি এখন একে অপরের থেকে বিচ্ছিন্নতার অবস্থায়; এবং তার একটি রাশি তৃতীয় রাশির সঙ্গে সংযোগ ঘটায়, যদিও এই তৃতীয় রাশিটি অণুক্রমের অন্তর্ভুক্ত নয়।'[২০] লোকায়ত কল্পনায় বহিরাগত রাশিটিকে যে চেহারায় দেখি তাতে এক সাপ একটি খরগোশকে ভক্ষণ করছে এবং সংস্কৃত পাঠে এক দানব স্বর্গীয় অস্তিত্বকে গ্রাস করছে। আমাদের আলোচনার পক্ষে এটাই গুরুত্বপূর্ণ। দানব এবং গ্রহের মূর্তিটি মনে রেখেই গ্রহণে শুদ্ধতাহানির প্রতিষেধক আচারে দূর্বা এবং কুশের প্রয়োজন হয়।[২১] আশীর্বাদের সামগ্রীরূপে দূর্বা এবং কুশ উভয়ই পবিত্র; এই পবিত্রতার মূলে আছে দানবগণের সঙ্গে যুদ্ধে তাদের বিশিষ্ট ভূমিকা। এক দানব বিশ্বকে যখন সাগরের অতলে ডুবিয়ে দিতে চেয়েছিল, বরাহ অবতার বিষ্ণু তাকে ধ্বংস করেন। তখন তাঁর মাথা থেকে কেশকণা পড়েছিল ভূমিতে; সেই কেশকণা ধর্মীয় কাহিনীর আশ্রয়ে পরিবর্তিত হয়ে পৃথিবীতে দূর্বা (সংস্কৃত দর্ভ শব্দ থেকে) রূপে বিরাজমান। আবার পৌরাণিক কাহিনীর সৃজনশীলতায় তৃণ হয়ে ওঠে অস্ত্র; তাই কুশ নিয়ে দেখি বিভিন্ন আখ্যান, সেখানে কুশ মুণ্ডচ্ছেদের এক হাতিয়ার; দেবতা এবং ঋষিগণ তাকে ব্যবহার করেন তাদের শক্তিশালী শত্রুদের বিরুদ্ধে।[২২] তাই কার্যকারিতায় বিষ্ণুর

চক্রের সঙ্গে কুশের তুলনা চলে। বিষ্ণুর চক্রে ধ্বংস হয়েছিল সেই দানব যে সমুদ্রমন্থনের (প্রথম উপাখ্যান) সময় অমৃত আত্মসাৎ করতে চায়। ঠিক একই উপায়ে কুশ শাস্তি দিয়েছিল নাগদের, জিহ্বা বিভক্ত করে: নাগগণ তখন গরুড়ের কাছ থেকে বলপূর্বক অমৃত হরণের প্রয়াস পেয়েছিল।[২৩] পৌরাণিক কাহিনী এবং আচার-অনুষ্ঠান একই সঙ্গে সমর্থন করে রাহুর সাবেকি হিন্দু মূর্তিটি। সমাজতত্ত্ব এবং বিশ্বতত্ত্বের স্তরে রাহু তেমনি এক শক্তি, যে কেবল ভাঙে, ধ্বংস করে। তাই আকাশে তার আবির্ভাবে ব্রাহ্মণের এমন আশঙ্কার কারণ থাকে যে বিশ্ব আজ আসন্ন প্রলয়ের পথে এসে দাঁড়িয়েছে।[২৪]

৩

ব্রাহ্মণদের বিশ্লেষণই শেষ কথা নয়। ব্রাহ্মণদের নিন্দায় দূষণ আর লুণ্ঠনের অপরাধে চিহ্নিত রাহু বহু অনুগামী খুঁজে পায় তাদের মধ্যে, হিন্দুধর্মের স্তরবিন্যাসে যাদের স্থান নিম্নতম ধাপে। এ-বিষয়ে ঔপনিবেশিক পর্যায় থেকে আমরা কিছু তথ্য পাই; তা একাধারে প্রভূত এবং অভ্রান্ত। উনিশ শতকের শুরুতে বিউক্যানান হ্যামিলটন-এর পর্যবেক্ষণ থেকে ব্রিটিশ রাজের শেষ পাঁচ দশকে বহু আমলা এবং নৃতত্ত্ববিদের বর্ণনায় এইসব তথ্য ছড়িয়ে আছে।[২৫] সেই তথ্য প্রমাণ করে যে গ্রহণপূজার অস্তিত্ব একান্ত প্রাচীন এবং ডোম, দোসাদ, ভাঙ্গি আর মাঙ্গ প্রভৃতি জাতির বিশ্বাসের জগতে আজও তা এক কার্যকরী উপাদান।

অভ্যন্তরীণ কাঠামো এবং জীবনযাত্রার বিন্যাসে এই জাতিগুলি নানাভাবেই পৃথক এবং বিভক্ত। কিন্তু সকলে মিলে তারা যে গোষ্ঠী গড়ে তোলে, ব্রিগস-এর প্রামাণ্য পুস্তিকায় তাকে বলা হয়েছে ডোম। এরা এক গোষ্ঠী, কারণ অর্থনৈতিক অবনতি, সামাজিক কলঙ্কচিহ্ন এবং আচার-অনুষ্ঠানের অশুচিতে এদের প্রত্যেকেরই এক দশা। পঁচাত্তর বছর আগে এক পর্যবেক্ষক তাদের অবস্থান বর্ণনায় লিখেছিলেন:

> ডোম জন্মায় অড়হর খেতে, ছোটবেলা থেকেই সে চুরি করতে শেখে। জীবনের প্রথম থেকেই সে পতিতের মতো ঘুরে বেড়ায়। মাথার উপর ছাদ ছাড়াই সে বাঁচে, থাকে না পরের দিনের অন্নের কোনও সংস্থান। পুলিশের তাড়নায় জীবনভর সে পালিয়ে বেড়ায় এক শিবির থেকে অন্য শিবিরে। গ্রাম থেকে সে সদাই বহিষ্কৃত।...সে আছে হিন্দুধর্মের নাগালের বাইরে।... সভ্যতার অগ্রগতি তাকে শুধু আরও অবনমনের দিকেই ঠেলে দিয়েছে।[২৬]

এই সূত্রের সারকথা মিলে যায় চণ্ডাল এবং শ্বপচদের সম্পর্কে মনুর বচনে। অনেক পণ্ডিতের[২৭] মতে ইতিহাসে চণ্ডাল এবং শ্বপচরাই ডোম সম্প্রদায়ের পূর্বসুরী। অতএব:

> 'চণ্ডাল এবং শ্বপচ জাতি গ্রামের বাইরে বাস করবে...কুকুর আর গাধা এদের ধনসম্পদ হবে। এরা শববস্ত্র পরিধান করবে, এরা ভগ্নপাত্রে ভোজন করবে, লৌহ অলঙ্কার ধারণ করবে এবং এরা সর্বদা ভ্রমণ করবে।... রাত্রে এরা গ্রামে কি নগরে কদাচ গমনাগমন করবে না।'[২৮]

এ কথা স্পষ্ট যে কালের ধারায় ডোমেদের অবস্থা বদলায়নি। তারা সমাজের প্রান্তে ভবঘুরের জীবনেই দণ্ডিত। প্রাচীন আইন-প্রণেতার বিধান ছিল, 'এরা সর্বদা ভ্রমণ করবে'; আজ বিশ শতকেও তাদের একই দশা। ঘুরে বেড়ানোর এই স্পৃহা যেন শাস্ত্রের নির্দেশের মতো; ইংরেজ আমলের সরকারি লেখাপত্রে এই স্পৃহাকেই মনে হয় স্বভাবের অঙ্গ। পবিত্র জ্ঞান থেকে ধর্মনিরপেক্ষ জ্ঞান, এই অগ্রগতি দেড় হাজার বছরে নৃতত্ত্ব বর্ণনার পরিবর্তনকেই নির্দেশ করে। ধর্মীয় প্রাচীন থেকে সমাজতাত্ত্বিক আধুনিকে এই বিবর্তন এবং দীর্ঘকালীন ইতিহাসের ধারায় রক্ষণশীল শক্তি, এরা বৈপরীত্যের সম্পর্কেই যুক্ত। কৃষি সমাজে অথবা তার ভাবজগতে ব্রাহ্মণ্যবাদের প্রাধান্য; এই প্রাধান্যের অভ্যন্তরে বিলীন হয়ে যাওয়ার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেছিল আর্যপূর্ব দেশজ আদিবাসী সম্প্রদায়। সে বিষয়ে কোশাম্বির বিশ্লেষণ:

> সামাজিক স্তরবিন্যাসের একেবারে নিচু ধাপে এখনও দেখি সেই-সব আদিবাসী গোষ্ঠীকে, যারা খাদ্য সংগ্রহের পর্যায়ে আছে। পারিপার্শ্বিক সমাজে খাদ্য উৎপাদনই বর্তমানে স্বাভাবিক পর্যায়। সুতরাং এমন সব নিম্নতম জাতির খাদ্য সংগ্রহ সাধারণত ভিক্ষাবৃত্তি অথবা চৌর্যবৃত্তির চেহারা নেয়। নিম্নতম এই গোষ্ঠীদের যথার্থ নামকরণ করেছিলেন ইংরেজরা 'অপরাধপ্রবণ উপজাতি' বলে, কারণ গোষ্ঠীর বাইরে কোনওরকম আইন-শৃঙ্খলা মানতে এরা অস্বীকার করত।
>
> ভারত ইতিহাসের অনেকখানি ব্যাখ্যা করে বলেই ভারতীয় সমাজের এই স্তরবিন্যাস ইতিহাসের প্রতিচ্ছবি।...অতীতে অথবা বর্তমানে কৃষিকাজ কি খাদ্যোৎপাদনের জীবিকা গ্রহণে তারা অনিচ্ছুক; সেই কারণেই যে তারা অর্থনৈতিক এবং সামাজিক মর্যাদায় হীন, তা সহজেই ধরা পড়ে। এই সব নিচু জাতি অনেক সময়েই উপজাতীয় আচার-ব্যবহার এবং পৌরাণিক কাহিনীকে বাঁচিয়ে রাখে।[২৯]

প্রামাণ্য সূত্রে বলা হয়েছে যে উপরোক্ত জাতিগোষ্ঠীগুলি মূলত ডোম আর মাঙ্গদের মতো সম্পূর্ণ আদিবাসী।[৩০] অথবা দোসাদ আর ভাঙ্গিদের মতো 'আদিবাসীভিত্তি থেকে গড়ে উঠে' আদিবাসী নয় এমন মানুষের অন্তর্ভুক্তিতে তাদের পুনর্বিন্যাস।[৩১] উভয় ক্ষেত্রেই যা অভিন্ন, তা হল এদের জমিতে কাজ করার উল্লেখযোগ্য অক্ষমতা— ইতিহাসে খাদ্যোৎপাদন বা কৃষিকাজে তাদের যে অনীহা দেখি, এই বৈশিষ্ট্য নিঃসন্দেহে তারই জের। ফলত, ১৮৯০ খ্রিস্টাব্দেও রিসলি লেখেন, ডোম আর দোসাদ হল দরিদ্র কৃষক; যে রায়তকে যদৃচ্ছ উৎখাত করা যায়, অথবা বড়জোর দখলী স্বত্ববান রায়ত— তাদের থেকে উন্নত অবস্থা এদের কোনওকালেই হয়নি। মাঙ্গদের মতো এদের বেশির ভাগই জীবিকায় যাযাবর চাষি, নয়তো ভূমিহীন দিনমজুর।[৩২] দরিদ্রতম এবং দুর্বলতম গ্রামবাসী তারা, তাই জমিদার কি সরকারের বেগার দেওয়া এদেরই কাজ; 'যে কোনওরকম অস্পৃশ্য কর্মপালনে তারা বাধ্য'; যুগ যুগ ধরে এরাই আছে 'সমগ্র হিন্দুসমাজের ক্রীতদাসের ভূমিকায়।'[৩৩] অন্যথায় তার জন্য পড়ে থাকত ভবঘুরের অপদার্থ জীবন এবং আনুষঙ্গিক জীবিকায় ভিক্ষা কিংবা ডাকাতি। যে সমাজ কৃষি ব্যবস্থায় নিজের আত্মপরিচয় খুঁজে পাচ্ছে, সেখানে এমন মানুষকে ভাবা হত প্রান্তিক; তাদের বাস

সমাজের প্রান্তে, তাই সমাজের অন্যান্য অধিবাসীদের কাছে তারা ঘৃণ্য। কর্তৃপক্ষ অত্যাচার করত এদের উপরে, এমন কী মনুর সময়েও এরা সমাজের আইন-শৃঙ্খলার পক্ষে বিপদের আশঙ্কা বলে গণ্য হত। যে অরণ্য ছিল তাদের খাদ্য সংগ্রহের উৎস, ঔপনিবেশিক শাসনব্যবস্থার চাপে সেখানে তাদের প্রবেশাধিকার বন্ধ হল, বাড়ল তাদের জীবিকার অনিশ্চিতি। ঔপনিবেশিক শাসকের ভাষায় তারা 'অপরাধপ্রবণ উপজাতি'; এই নামকরণ তাদের পতিত দশাকে আরও স্পষ্ট করে তোলে। তাদের জীবন বন্দি শিবিরে নির্দিষ্ট, সেখানকার নিয়ম চলে কার্ফু-র ঘণ্টায় আর ফৌজদারি ব্যবস্থায়।[১৩৪]

এমন সব গোষ্ঠী সমাজে যেমন দরিদ্র এবং বিপর্যস্ত, কোনও আচার-অনুষ্ঠানের পক্ষে তাদের উপস্থিতি তেমনি চরম অশুচি। ধর্মশাস্ত্রে আক্ষরিক অর্থেই তাদের অশুদ্ধতার প্রতিভূ বলে বর্ণনা করা হয়েছে। এ অশুচি এমন মারাত্মক যে যদি কোনও উচ্চবর্ণজাত ব্যক্তি তাদের দৈহিক সংস্পর্শে আসে, এমনকী তাদের ছায়া পড়ে সেই ব্যক্তির গায়ে, অথবা তাদের চোখে পড়ে যায় তেমন এক উচ্চবর্ণ, কঠিন শাস্তি আর কঠোর শুদ্ধাচারের প্রায়শ্চিত্ত মেনে তবেই সে ফিরে পাবে তার উচ্চবর্ণের গৌরব। এই রীতি ব্রাহ্মণধর্মের শূন্যগর্ভ আদেশমাত্র নয়. অষ্টাদশ শতাব্দীর উপান্তেও সামাজিক প্রথা এমন রীতিকে স্বীকৃতি দিয়েছে। কারণ, 'এমন তথ্য লিপিবদ্ধ আছে যে স্থানীয শাসকদের আমলে পুনার ফটকের ভিতরে দুপুর তিনটে থেকে সকাল ন-টা পর্যন্ত মাহার এবং মাঙ্গদের প্রবেশাধিকার ছিল না, কারণ সেই সময়ে তাদের দেহ নাকি একান্ত দীর্ঘ ছায়া ফেলে।'[১৩৫] এই সংস্কারের বিলোপসাধনে ঔপনিবেশিক 'আধুনিকীকরণের' কার্যকারিতা সামান্যই ছিল; ইংরেজ শাসনের শেষ দশকের একটি পর্যবেক্ষণে তারই স্বচ্ছ পরিচয় আমরা পাই: 'যখন কোনও ডোমকে সাক্ষ্য দিতে আদালতে ডাকা হয়, দর্শকবৃন্দ তার স্পর্শ থেকে নিজেদের বাঁচাতে আপন আপন পরিচ্ছদ সম্পর্কে অতিরিক্ত সচেতন হয়ে ওঠে [এই প্রথা ভাঙ্গি এবং ওই শ্রেণীভুক্ত যে কোনও মানুষের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য]।'[১৩৬]

যেসব মানুষ ঘৃণার লক্ষ্য, ঐতিহ্যের ভারে অশুচির বোধকে তারা আত্মস্থ করে নিয়েছে; বৈপরীত্যের ব্যঞ্জনা এখানেই। তারা সকলেই এমন পুরাণের অনুগামী, যে কাহিনীতে কোনও এক আদি পাপ তাদের অশুদ্ধ পরিণামের হেতু; আর সেই পাপ সব ক্ষেত্রেই ব্রাহ্মণ্যের শুদ্ধতাবিধি থেকে তাদের কোনও-না-কোনও পূর্বপুরুষের বিচ্যুতিতে প্রকাশ পায়। শিব পার্বতী এক ভোজসভায় বর্ণনির্বিশেষে সকলকে নিমন্ত্রণ করেছিলেন। সর্বপ্রথম ডোম সুপাচ ভগৎ সেখানে পৌঁছেছিল বিলম্বে এবং ভক্ষণ করেছিল উচ্ছিষ্ট। সেদিন থেকে তার উত্তর-পুরুষেরা অন্য বর্ণের উচ্ছিষ্ট ভক্ষণে বাধ্য। দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের উচ্ছিষ্টভোজী জাতির সঙ্গে তারা সহজেই নিজেদের মিলিয়ে নিতে পাবে, রিসলির এই ধারণার উৎস পূর্বোক্ত উপাখ্যান।[১৩৭] এই আখ্যানেরই এক পরিবর্তিত পাঠে (যেখানে আতিথেয়তায় রয়েছেন রাম সীতা) ভাঙ্গিরা খুঁজে পায় জীবনের প্রসাদ থেকে নিজেদের বিচ্যুতির কারণ।[১৩৮] ডোম, ভাঙ্গি উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে এমন অনেক আখ্যান প্রচলিত আছে যেখানে তাদের পূর্বপুরুষ মৃত পশু স্পর্শ করার অশুচি অপরাধে দুষ্ট। নিজেদের জন্মগত অশুদ্ধতার সূত্রনির্দেশে মাঙ্গরা বলে, সে বংশের প্রথম মানুষকে লেগেছিল শিবের বাহন ষাঁড়কে খোজা করার অভিশাপ। এমন আরও বহু কাহিনীর

প্রচলন আছে। আখ্যানগুলিতে দেখি, কী ভাবে বিশ্বের হতভাগ্যরা নিজেদের ভাগ্যহীনতাকে আধ্যাত্মিক উপায়ে যৌক্তিক আর বুদ্ধিগ্রাহ্য করে তুলতে চায়।

মনে হতে পারে, হিন্দু সমাজের পতিতদের কাছে এই ধর্মীয় চেতনা শুধু নিজেদের অবস্থাকে ভাগ্যের সঙ্গে মানিয়ে নেওয়ার উপায়; এমন চিন্তা একপেশে আর সেই কারণেই বেঠিক। একই চৈতন্যের ভিন্ন উপাদানসমূহ প্রকাশ পেয়েছে সমান্তরাল অন্যান্য কাহিনীতে। ওই একই নিম্নবর্গের কল্পনায় সেই সব আখ্যানের নির্মাণ, কিন্তু বিষয়ে তা বিষাদের আখ্যান তো বটেই, কখনও বা বিদ্রোহের ইস্তাহারও। এই চেতনাকে স্বীকৃতি দেওয়ার অর্থই এক গণ্ডিকে নির্দেশ করা; সে গণ্ডির বাইরে মানুষ নিজের হীনতাকে মেনে নিতে অক্ষম। সে গণ্ডি মানুষের আধ্যাত্মিক বিশ্বাসের অঙ্গীভূত। অবশ্য উচ্চবর্গের ধারণা এর বিপরীত; তারা ভাবে, সাধারণ মানুষ নিজের নিয়তিকে বিনা দ্বিধায় মেনে নেয়।

৪

বিরুদ্ধতার উপাদানে এসব জাতির বিশ্বাসের জগৎ স্পষ্টই চিহ্নিত। যে শাসনব্যবস্থা তাদের উপরে আরোপ করা হয়েছে, তার সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক প্রভুত্বের কাছে নতি স্বীকার নয়, বরং তাকে অস্বীকার করাই এই বিরোধের প্রবণতা। তবু এই বিরুদ্ধতা এমন কোনও সুস্পষ্ট কর্ম খুঁজে পায় না, যার জোরে দুনিয়াটাকে উলটে দেওয়া যায়। বরং, এই যে বিরোধের সম্ভাবনা ব্যর্থ হয়, সেখানেই শুরু হয় নানান আচার-অনুষ্ঠানের অবক্ষেপ; ফলে শেষ পর্যন্ত বিরুদ্ধতার উপাদান প্রভুর জন্যেই অনুকূল পরিস্থিতি গড়ে দিয়ে যায়। অন্যভাবে বলতে গেলে, বিরুদ্ধতা থেকে যায় সেই চেতনার পর্যায়ে, যার অস্তিত্ব শুধুই তত্ত্বে, জীবনে নয়; বিরুদ্ধতার এই চৈতন্যে প্রকৃত যন্ত্রণা থাকে নিশ্চয়, কিন্তু তার তত্ত্বের অনুষঙ্গে কোনও উপযুক্ত কর্ম অনুপস্থিত। এমন অবস্থায় চেতনাই হয়ে পড়ে নিছক এক নেশার আচ্ছন্নতা, তার পরিণাম নিষ্ক্রিয়তায় আবিষ্ট। নিচু জাতির ধর্মবিশ্বাসের একেবারে মূলে রয়েছে এই স্ববিরোধ। সুতরাং শাসক সংস্কৃতির প্রতি আনুগত্যের এই ঝোঁককে বিপরীত প্রবণতার সঙ্গে মিলিয়ে দেখা দরকার—বিপরীত প্রবণতার আকর্ষণ উলটোপথে—প্রতিবাদের দিকে।

একাধারে স্ববিরোধী এবং পরিপূরক এই প্রবণতার সুস্পষ্ট প্রমাণ আছে ডোম সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রচলিত বেশ কিছু উপাখ্যানে এবং পূজাপার্বণে। তার প্রকাশ আধ্যাত্মিক দুঃসাহসে। কর্তৃত্বকারী সংস্কৃতির কাছে যারা কোনও স্বীকৃতি পায় না, সেই সব বাস্তব চরিত্র এবং পৌরাণিক মূর্তিকে এমন সাহস ঐশ্বরিক মর্যাদায় ভূষিত করে। বাস্তবের চোর ডাকাত যেমন মরণোত্তর দেবত্ব লাভ করে, তেমনি দেশের অক্ষম দরিদ্র মানুষের উপর প্রভাব ফেলে পৌরাণিক বীরের অসাধারণ কীর্তি, তাদের অতিমানবিক ক্ষমতার রূপক। সেই ক্ষমতা একাধারে দৈহিক এবং আধ্যাত্মিক। ইতিহাসের যে দুই রদবদলের মূলে ছিল আর্য সভ্যতা এবং উপনিবেশের সংস্থাপন, পূর্বোক্ত দৃষ্টান্তগুলিতে একসঙ্গে তারই আধ্যাত্মিক উত্তরাধিকার প্রকাশ পায়। জনসংখ্যার এক বিপুল অংশ কৃষিজীবিকার সংস্কৃতিতে, ব্রাহ্মণ্যধর্মের আধ্যাত্মিকতায় পুরোপুরি মিশে যেতে পারেনি;

ইংরেজ শাসনেও তাদের অবস্থা অনেকাংশেই অপরিবর্তিত থাকে. তারা বিকল্প জীবিকার পথ খুঁজে পায় অসৎ কর্মে; এর অনুষঙ্গে তাদের ধর্মে আসে এক ভিন্ন প্রবণতা, যা অপরাধীকে বানিয়ে তোলে উপদেবতা।

হিন্দুসমাজে যে-সব মূল্যবোধ মুখ্য, এই পরিবর্তন প্রণালী তার প্রতিবিধানেরই সামিল; এই প্রণালী আধ্যাত্মিক চেহারা দিল কিছু উপাদানকে; সমাজের তত্ত্বাবধায়কদের বিচারে সেই উপাদানগুলি এতদিন ছিল অসামাজিক। এই প্রণালীর কর্মকাল এতই দীর্ঘ যে তাকে আমরা বিপরীত ঐতিহ্যের চেহারায় দেখি। কোশাম্বি লিখেছেন পশ্চিমাঞ্চলের সেই বোলহাই দেবীর কথা; এই দেবী 'নাকি গিয়েছিলেন কতিপয় তস্করের সঙ্গে।' কোশাম্বির মতে, তাঁর এই যাত্রা সেই তথ্যেরই নিশ্চিত ইঙ্গিত যে, 'দেবী তেমনি এক উপজাতির রক্ষাকর্ত্রী, যারা কখনও বশ্যতা স্বীকার করেনি।'[৩৯] একইভাবে দোসাদরা ডাকাত দেবতা গোড়াইয়া আর সালেশকে পূজা করে; সেই যে চোর গণ্ডক, যার ফাঁসি হয়েছিল আর তার বন্ধু সামাইয়া, দুজনকেই মঘইয়া ডোমরা দেবতা বলে মানে; ডাকাত সর্দার শ্যাম সিংকে সব ডোমই ভাবে রক্ষাকর্তা ভগবান এবং নিজেদের পূর্বসূরী। এমন করে বার বার জাতিগুলির দেশজ পূর্ব ইতিহাস প্রমাণ হয়।[৪০] যেসব আদিবাসী বশ্যতা মানেনি, তাদের নিয়ে কোশাম্বির ইঙ্গিত আরও জোরদার হয় যখন দেখি তাদের দেবতার প্রতিনিধি কখনওই হিন্দু প্রথানুরূপ মূর্তি নয়, বরং পাথর অথবা ঢেলা। আচার-অনুষ্ঠানে তাদের নৈবেদ্যও ব্রাহ্মণ্য প্রথানুরূপ নয়, এদের নিবেদন শুয়োর, মোরগ আর কারণ।

একজন দস্যুদেবতার আরাধনা অন্যান্য অনুরূপ দেবতার মতো কোনও এক বিশেষ অঞ্চলে সীমাবদ্ধ নয়। তাঁর নাম বাল্মীকি। ব্রিগ্‌স বলেছেন,[৪১] বাল্মীকি 'মধ্য ভারতের দেশজ আদিবাসীদের একজন।' এই মত সন্দেহাতীত নয়। কিন্তু এ বিষয়ে সন্দেহের কোনও অবকাশ নেই যে, দক্ষিণ ভারতের নিম্নজাতির মানুষও তাকে ঈশ্বর বলে মানে। হিংসাত্মক জীবনে লিপ্ত বাল্মীকি প্রায়শ্চিত্তের মাধ্যমে নিজেকে মুক্ত করেছিলেন। এই কাহিনী সব শ্রেণীর হিন্দুরাই মেনে নেয়। কিন্তু পতিতরা তাঁর উপাখ্যানকে নিজেদের বিশ্বাসের সঙ্গে মিলিয়ে বাল্মীকিকে একান্তই নিজের করে নিয়েছে। একটি আখ্যানে বাল্মীকি কালু আর জীবনের জনক। সেই কালু আর জীবন থেকে আবার ডোম আর ভাঙ্গিরা তাদের উৎপত্তি নির্দেশ করে। ভিন্ন কিছু গল্পে কখনও ভাঙ্গিদের পূর্বপুরুষ লাল বেগ স্বয়ং অথবা তাঁর পুত্র বলে, কখনও বা ডোম সম্প্রদায়ের কাল্পনিক প্রতিষ্ঠাতা সুপাচ ভগৎ বলে অথবা পঞ্চপাণ্ডবের একজন নকুল বলে বাল্মীকিকে সনাক্ত করা হয়। শব্দের খেলায় নকুল কথাটির অর্থ হতে পারে কুল নেই যার; আর এই ভাবে নকুল পেয়ে যায় প্রথম ভাঙ্গির পদমর্যাদা।

বাল্মীকির দৃষ্টান্তে আরও কিছু মন্তব্য সম্ভব। ভাষাগত রীতির জোরে এই বিশেষ উপাখ্যানটির বৃত্তে আরও পরিবর্তন আসতেই পারে। শ্লোকছন্দের কাঠামো নিয়ে কাহিনীর প্রচলন আছে; রামায়ণের শুরুতে ব্যাধের নিষ্ঠুর হত্যার প্রতিবাদে বাল্মীকি ব্যাধকে অভিশাপ দেন, সেই অভিশাপের বচন আরম্ভ হয় 'মা নিষাদ' বলে। অভিশাপের সেই স্বতঃস্ফূর্ত ছন্দেই শ্লোকের ছন্দ।[৪২] আবার এমন লোকগাথারও চল আছে, যার নানান পাঠে[৪৩] জানি, বাল্মীকি পাপমুক্ত হয়েছিলেন বার বার সেই ইতর আর অশুচি শব্দ 'মরা'

উচ্চারণ করে। নিরবচ্ছিন্ন উচ্চারণে শব্দ গেল উলটে, অর্থাৎ রাম, যে নাম ঐশ্বরিক বীরের, যে নাম পবিত্র।

ভাঙ্গিদের পৌরাণিক আখ্যান অন্যান্য অনুরূপ আখ্যান থেকে বিশিষ্ট; সেখানে এক মহাকাব্যের উপাদান আর এক মহাকাব্যের উপাদানে জড়িয়ে গেছে, মিলে গেছে বাল্মীকি আর নকুল। ব্রিগ্‌স মনে করেন, এই যোগাযোগ সম্ভব হয়েছে 'বাল্মীক' শব্দটির নিপুণ ব্যবহারে। বাল্মীক, অর্থাৎ ভাল ছেলে। আখ্যানমতে, কথাটি ব্যবহার করে ভাইরা নকুলকে ভুলিয়েছিল, একটি মৃত পশুকে স্থানান্তরে নিয়ে যেতে নকুল সম্মত হয়েছিল। আর যখন সে কাজটা করছে, ভাইরা পালাল তাকে ফেলে। তার পর, অপর এক বাক্‌চাতুর্যে, নকুল, যার নতুন পরিচয় এখন বাল্মীক, অর্থাৎ আখ্যানের সৃজনশীলতায় বাল্মীকি, হয়ে গেল সুপাচ ভগৎ। সেই সব মানুষের জন্মদাতা এই সুপাচ ভগৎ, যারা রুটি বানাতে আটায় যে ছাঁকুনি দরকার, তাই বানিয়ে আর বেচে জীবিকা নির্বাহ করে।[৪২] রামায়ণে বাল্মীকি আগে দস্যু, পরে পাপমুক্ত কবি। সাত্ত্বিক শূদ্রের নিধনকে তাঁর মনে হয়েছিল ন্যায়ের প্রতিভূ, সেই হত্যার গুণগান করেছিলেন তিনি। কারণ সেই শূদ্র ব্রাহ্মণ্যের উৎকর্ষ এবং তার পুরস্কার পেতে চেয়েছিল; সে উৎকর্ষ অথবা পুরস্কার শুধুমাত্র উচ্চজাতেরই যোগ্য, তাই শূদ্রের এই কামনা ব্রাহ্মণদের অপমানের সামিল। উচ্চবর্ণদের যথার্থ জবাব দিয়েছিল ভাঙ্গিরা। সংস্কৃত কৃষ্টিকে সম্পূর্ণ অবজ্ঞা করে নিজেদের কথায়, কল্পনায় পাপভ্রষ্ট দস্যুকেই তারা বানিয়ে নেয় নিজেদের পূর্বপুরুষ এবং রক্ষাকর্তা। নিম্নবর্গের এক ধরনের কার্যকলাপ নির্বিচারে অপরাধ বলে চিহ্নিত হয়। তার মধ্যে যদি সেই দ্ব্যর্থ নীতিবোধের পরিচয় মেলে, যা 'সামাজিক দস্যুবৃত্তি' বা সোশ্যাল ব্যান্ডিট্রির ধারণায় স্বীকৃত, তবে বাল্মীকিতে দেবত্ব আরোপ এবং অপরাধে দুষ্ট আরও বহু দেবদেবীর অস্তিত্ব পূর্বোক্ত নীতিবোধ এবং তার সঙ্গে প্রচলিত ধারণাকে গৌরবান্বিত করে।

বিকল্প ন্যায়বোধ আর সেখানে নিহিত সমালোচনার নিদর্শন কেবল দস্যুবৃত্তির আধ্যাত্মিক মূল্যায়নেই নয়; হিন্দু পুরাণের সেই কুখ্যাত বিদ্রোহী রাজা বেণ-এর[৪৩] প্রতি সুস্পষ্ট অনুমোদনও তেমন প্রতিবিধানের প্রবণতাই প্রমাণ করে। ব্রাহ্মণ্য সাহিত্যে তো রাজার কুকীর্তি নিয়ে কাহিনীর ছড়াছড়ি। *মনুসংহিতায়* (৯, ৬৬) বিধবাবিবাহ প্রচলনের, অন্তত তাকে মেনে নেওয়ার অপরাধে রাজাকে দোষারোপ করা হয়। মনুর মতে, দ্বিজজাতির বিদগ্ধগণ এমন বিবাহকে একমাত্র পশুরই উপযুক্ত মনে করেন। পদ্মপুরাণ বলে, শাসক হিসাবে রাজা বেণ-এর প্রথম আত্মপ্রকাশ যথেষ্ট ভাল, কিন্তু পরবর্তীকালে জৈন ধর্মে তাঁর মতি হল। শাস্ত্রমতে তাঁর চরমতম অপরাধ ছিল সর্বপ্রকার বলি, দান এবং নৈবেদ্য বন্ধ করা, ব্যতিক্রম কেবল সেই সব ক্ষেত্রে, যেখানে রাজা নিজেই উৎসর্গের লক্ষ। রাজা ঘোষণা করেছিলেন, 'সকল নৈবেদ্যের উপরে একচ্ছত্র অধিকার আমার।' যে ঋষিরা ওই সব অনুষ্ঠান পরিচালনা করত এবং দেবতাকে উৎসর্গীকৃত দানসামগ্রী আত্মসাৎ করত, তারা রাজার আদেশে আপত্তি জানায়। তাচ্ছিল্যের সঙ্গে রাজা বলেন, 'কে তোমাদের এই হরি যাকে তোমরা বর্ণনা কর তোমাদের নৈবেদ্যের অধিকারী বলে? ব্রহ্মা...এবং অন্য সব দেবতাই...রাজার ব্যক্তিত্বে বিরাজ করেন...।' ঋষি এবং

পুরোহিতগণ এতদূর সহ্য করতে পারেননি। কুশতৃণ দিয়ে রাজাকে তাঁরা বধ করেন; এই কুশতৃণ পৌরাণিক আখ্যানে দেবতাদের শত্রুনিধনের হাতিয়ার। কাহিনীতে আছে বিন্ধ্য অঞ্চলের বন্য উপজাতি নিষাদ এবং ম্লেচ্ছরা এই রাজার শরীর থেকে উদ্ভূত। ডোমেরাও বলে যে তারা রাজা বেণ-এরই বংশধর। এ হয়তো তাদের আদিবাসী জন্মের স্মৃতি। কথাটির ঐতিহাসিক ভিত্তি যাই হোক, এর নিশ্চিত সাদৃশ্য আছে ডোমেদের ঐতিহ্যের কিছু উপাদানের সঙ্গে; বিদ্রোহের মানসিকতা তেমন উপাদানের অবলম্বন। যেমন বস্তি-গোরখপুরে ডোম সম্প্রদায়ভুক্ত শাসকেরা ব্রাহ্মণ কন্যাদের বিবাহ করতে চেয়ে সেখানকার ব্রাহ্মণদের বিপদে ফেলেছিল।

৫

রাহুও ব্রাহ্মণদের শত্রু, তাদের ঘৃণার পাত্র। রাহু যে ডোম সম্প্রদায়ের আরাধ্য, তা বর্ণহিন্দু সংস্কৃতির প্রতি নিম্নবর্গের বিরোধিতার আর এক নিদর্শন। আমরা রাহু পূজার প্রথম এবং সর্বাপেক্ষা বিস্তৃত বিবরণ পাই বিউক্যানান-হ্যামিলটন-এর লেখায়। উনিশ শতকের গোড়ার বছরগুলিতে পূর্ণিয়া অঞ্চলে তিনি দেখেন[৪৬], নাথপুরের দোসাদরা ব্রাহ্মণধর্মের বিরোধিতার উদ্দেশ্যে কী ভাবে নিজেদের আচার-অনুষ্ঠানগুলিকে জাহির করত, রাহু-আরাধনার উপলক্ষে। সেখানে রাহু পূজা এক বলির চেহারা পেত; তার কেন্দ্রে ছিল মুখ্যভক্তের অগ্নিপরিক্রমা; সে নিজে একজন দোসাদ, আবার অশরীরীর সঙ্গে সংযোগস্থাপনের মাধ্যমও বটে।[৪৭] সেই ভক্ত ফুটন্ত জলে ডুবিয়ে দিত নিজের হাত; খালি পায়ে হেঁটে যেত সাড়ে তিন মিটার দীর্ঘ জ্বলন্ত কয়লার জাজিমের উপর দিয়ে, তবু তার দেহ পুড়ত না, কোনও ফোসকাও পড়ত না তার শরীরে। এই দৃশ্য দেখতে দেখতে জনতার যে মানসিক প্রতিক্রিয়া হত তার বর্ণনায় বিউক্যানান-হ্যামিলটন লিখছেন, ‘এটা স্পষ্ট...যে সমগ্র দর্শক, সংখ্যায় যারা অগণিত, তারা সকলেই রাহুর প্রভাবে বিশ্বাস করত; দোসাদরা তো বটেই, সম্ভবত অন্য সকলেও বিশ্বাস করত যে রাহুর প্রভাবেই মানুষটি আগুনের প্রকোপ থেকে রক্ষা পাচ্ছে। আমার সঙ্গে যেসব ব্রাহ্মণ ছিল তাদের মহোল্লাসে চ্যালেঞ্জ জানাল মুখ্যভক্তের অনুগামীরা, সেই উপাসককে অনুকরণ করতে।’[৪৮] সাহেবের দলে যে পণ্ডিত ছিল, এই দ্বন্দ্বের পরিণাম তার অনুকূল হয়নি।

আচার-অনুষ্ঠানে এ রকম ক্ষমতার যে স্বীকৃতি, তার চেয়ে নিম্নজাতির মধ্যে প্রচলিত গ্রহণ বিষয়ক পৌরাণিক কাহিনী বেশি আলোকিত করত উচ্চবর্গ আর নিম্নবর্গের মধ্যে ধর্মীয় বচনের বিরোধকে। নিম্নজাতির এই পুরাণ সমুদ্রমন্থনের কাহিনীর (প্রথম উপাখ্যান) সমান্তরালে থাকে; এবং তারা দুয়ে মিলে একত্রে এক পরম্পরা নির্মাণ করে, ভাবের জগতে সে পরম্পরার স্বতন্ত্র অস্তিত্ব আছে। পৌরাণিক কাহিনীর এই পরম্পরা কখনওই বিচ্ছিন্নভাবে কার্যকরী হয় না। বরং সাবেকি হিন্দু পুরাণের কাহিনীতে নিজেদের বিষয়বস্তু মিশিয়ে তাকে বদলে দেয়। প্রথমত রাহু এবং তার অনুগামীদের মধ্যে একটি সম্পর্কের অস্তিত্ব নির্দেশ করে; দ্বিতীয়ত নিম্নবর্গের বাস্তব এবং সামাজিক অবস্থার উপরে সেই সম্পর্কের ভিত্তি স্থাপন করে, আরও খুলে বলতে গেলে, সম্পর্কটি যেন গ্রথিত হয় পৃথিবীর মাটিতে। দ্বৈত প্রক্রিয়ায় সংঘটিত কাঠামোগত পরিবর্তনের সমগ্রতা থেকেই

গড়ে ওঠে নিম্নজাতির ভাবাদর্শের বৈশিষ্ট্য। পুরাণের উপাদানকে নিম্নবর্গের গোষ্ঠীগুলি কেমনভাবে আপন করে নেয়, নিম্নোক্ত আখ্যান তারই দৃষ্টান্ত।

দ্বিতীয় উপাখ্যান
রাবণ বিজয়ের পরে লঙ্কা থেকে ফিরে রাম তার সেনাবাহিনীর জন্য এক ভোজের আয়োজন করেন। মহাদেব (শিব) পার্বতীর উপরে ছিল পরিবেশনের ভার। এমন সময় নিম্নজাতির এক মাঙ্গ বালকের উপস্থিতির প্রতি মহাদেব পার্বতীর দৃষ্টি আকর্ষণ করেন,...এবং পার্বতীকে সতর্ক করে দেন, পরিবেশনের সময় তিনি যেন ছেলেটির থেকে যথোচিত দূরত্ব রাখেন। কিন্তু রাম যখন সেই মাঙ্গকে দেখতে পেলেন, তার দুঃসাহসিক অপরাধের জন্য রাম তাকে বধ করলেন; কারণ সেই বালক নিজের অশুদ্ধ উপস্থিতিতে ভোজসভার পবিত্রতা খর্ব করতে চেয়েছিল। মৃত ছেলেটির মাতা তখন সন্তানের মস্তক একটি ডালায় স্থাপনপূর্বক বিশুদ্ধ জলের ছিটায় প্রাণসঞ্চারের বৃথা চেষ্টা করতে লাগল। হারানো পুত্রের মস্তকবাহী সেই ডালা নিয়ে সে গেল দেবদেবীদের কাছে, নিজের খাদ্য ভিক্ষা চাইতে। পর্যায়ক্রমে গেল সে সূর্য এবং চন্দ্রের কাছে, ভয় দেখাল তাঁদের, বলল যদি তার অনুরোধ রক্ষা না হয়, সে চন্দ্র সূর্যকে স্পর্শ করবে, নষ্ট হবে তাঁদের শুদ্ধ চরিত্র। সেই ডালার ছায়াই গ্রহণের কারণ। এই মাঙ্গনারী, অর্থাৎ সেই উত্যক্তকারী পাওনাদারের হাত থেকে রেহাই পেতে চন্দ্র সূর্যকে নৈবেদ্য দান এবং মাঙ্গদের ভিক্ষাদানের প্রথা চালু হলো।[৪১]

পরিবর্তনের উপাদানগুলি এক নজরেই স্পষ্ট হয়ে যায়। প্রথম উপাখ্যান মহাভারতের অংশবিশেষ, কিন্তু দ্বিতীয় উপাখ্যান রামায়ণের পাঠ। প্রথম কাহিনীতে নিমন্ত্রণকর্তা এবং হত্যাকারী ছিলেন বিষ্ণু, কিন্তু এখানে সেই একই ভূমিকায় দেখি রামকে। তবে এই আখ্যানে দোষী এবং শিকার কোনও দানব নয়, শম্বুকের মতো একজন অস্পৃশ্য, অধিকারের নির্ধারিত সীমা লঙ্ঘন করবার জন্য যে প্রাণ দিল। এই কাহিনীর সঙ্গে সামঞ্জস্যবিধানেই দেখি, এখানে তার অপরাধ দেবতাদের আহার্য অপসারণে নয়, কিন্তু নিজের অশুদ্ধ উপস্থিতিতে ভোজসভাকে অপবিত্র করায়। মুণ্ডচ্ছেদের পরবর্তী ঘটনাবলী প্রথম কাহিনী থেকে দ্বিতীয় কাহিনীতে আলাদা। প্রথম আখ্যানে ছিল প্রতিশোধস্পৃহা, কিন্তু দ্বিতীয় উপাখ্যানে প্রতিশোধ-প্রবণতার থেকে বড় হয়ে ওঠে বিচারের অন্বেষণ; বিচার খুঁজে ফেরে এক মা, যে হারিয়েছে তার সন্তানকে, হারিয়েছে নিজের জীবিকার একমাত্র অবলম্বন। প্রথম পুরাণে ছিল বিষ্ণুর দুই বার্তাবহ চন্দ্র-সূর্যের বিরুদ্ধে ফিরে ফিরে আক্রমণ, দ্বিতীয় কাহিনীতে দেখি দেবতাদের কাছে ভিক্ষাপ্রার্থনা অর্থাৎ ধরনা দেওয়ার চিরাচরিত চেহারা।

পরিবর্তনের এই পরম্পরায় রাহু মিলে যায় মাঙ্গ-এর সঙ্গে, মাঙ্গ-এর সামাজিক অস্তিত্বই আরোপিত হয় রাহুতে। বাস্তবজীবনের এই প্রক্রিয়া ভারতের বহু পৌরাণিক কাহিনীতে উপস্থিত, যেখানে ঈশ্বর আর মানুষ একাত্ম এবং একে অপরের পরিপূরক। এই উদ্দেশ্যে তিনটি পদ্ধতি ব্যবহৃত হয়—ব্যাকরণের পদ্ধতি, কুলুজির পদ্ধতি এবং পূজার পদ্ধতি। ব্যাকরণ-পদ্ধতি যে কোনও দুটি রাশির মধ্যে সংযোগকে একটা সাধারণ

রূপ দেয়, যেমন *ক হচ্ছে খ*। দ্বিতীয় উপাখ্যানে দেখি রাহু *হচ্ছে* একজন মাঙ্গ। আবার মধ্যপ্রদেশ অঞ্চলের যেসব লোকগাথা রাসেল এবং লাল একত্র করেছেন সেখানে রাহু *হচ্ছে* একজন মেথর বা ভাঙ্গি। কুলুজি পদ্ধতি আসে নিম্নোক্ত আকারে, *ক হচ্ছে খ-এর একজন পূর্বপুরুষ*। বিহারের তিরহুত অঞ্চলের দোসাদরা বলে রাহু (আঞ্চলিক ভাষায় রাহ অথবা রাহ্) তাদের একজন পূর্বপুরুষ, যুদ্ধে যার মৃত্যু হয়েছিল। মির্জাপুরের দোসাদদেরও গর্ব আছে, রাহু তাদের পূর্বপুরুষ বলে; আখ্যান অনুযায়ী (যে আখ্যানে আজও পাই সেই পৌরাণিক যুদ্ধের স্মৃতি) তাদের রাহু বাংলাদেশ থেকে উত্তরপ্রদেশ যাত্রাপথে বন্দি হল জগন্নাথের (বিষ্ণু) মন্দিরে। কথিত হয় পশ্চিমাঞ্চলের মাঙ্গরাও সেই দানব কুলজাত, যে দানব গ্রহণকালে চন্দ্রকে গ্রাস করে। পূজা-পদ্ধতির (*খ ক-কে পূজা করে*) প্রক্রিয়ায় যে কোনও বিগ্রহ আরাধনার নিয়মাবলী নির্দিষ্ট হয়। সেখানেও পার্থিব বিশ্বের সঙ্গে সাদৃশ্য দেখি; পূজারী এবং তার আরাধ্য দেবতার সম্পর্ক পুত্র এবং পিতার বন্ধনের মতো। সুতরাং কুলুজি-পদ্ধতির প্রক্রিয়া হয়ে যেতে পারে পূজা-পদ্ধতির প্রক্রিয়া; পূজা-পদ্ধতি হতে পারে কুলুজি পদ্ধতি। রাহুর সব পূজারীই তাই নিজেকে রাহুর উত্তরপুরুষ ভাবতে পারে; এমন কী তারাও, দোসাদ বা মাঙ্গদের মতো যাদের পুরাণে রাহু পূর্বপুরুষ বলে বর্ণিত নেই।

ভাবজগতের যে কাঠামো আমাদের আলোচনার বিষয়, বাস্তব জীবনের সঙ্গে এই বন্ধন তার পক্ষে একান্ত তাৎপর্যপূর্ণ। এই বন্ধনের পরিণামে এক দিকে গ্রহণ, অন্য দিকে তার অশুদ্ধ আর অশুভ ইঙ্গিতে গ্রহণ যাদের ভয় দেখায়, এই দুয়ের ভিতরে এক মধ্যস্থতার ভূমিকা পেয়ে যায় পতিত মানুষেরা। প্রচলিত বিশ্বাস এই যে একমাত্র তাদেরই ক্ষমতা আছে রাহুকে ভুলিয়ে তার প্রকোপ থেকে চন্দ্র-সূর্যকে উদ্ধার করবার, কারণ তারা রাহুর অনুগামী। অর্থাৎ হিন্দুসমাজে যারা সবচেয়ে অক্ষম এবং ঘৃণ্য, তারাই পারে অশুদ্ধতা আর ধ্বংসের হাত থেকে সমাজকে রক্ষা করতে। বিপরীত অর্থের ব্যঞ্জনায় এর মধ্যে যেন এক রসিকতার আমেজ এসে যায়। এ যেন নিম্নজাতিদের দেয় এক কৃত্রিম প্রভুত্ব, যার উৎপত্তি ওই 'মধ্যবর্তী অবস্থায়' জড়িয়ে আছে। কারণ 'দুই বিপরীত মেরুকে অঙ্গীভূত করে এই মধ্যস্থতা; ফলে শেষ পর্যন্ত দুই প্রান্তের তুলনায় মধ্যবর্তীকেই মনে হয় অধিক গুরুত্বপূর্ণ।' বিত্তের জগতে বিনিময়মূল্যের মধ্যস্থতা এবং আধ্যাত্মিক জগতে মধ্যবর্তীদের ভূমিকা মার্কস-এর উক্তিতেও[৫৪] সমানভাবে সত্য।

'ধর্মের জগতে তাই দেখি খ্রিস্ট দেবতা আর মানুষের মধ্যবর্তী সেতু—তাদের পরস্পরের মধ্যে বহতার এক উপায়মাত্র, আবার সেই খ্রিস্টেই মিলে যায় দেবতা আর মানুষ, খ্রিস্ট হয়ে যান মানুষদেবতা, যাঁর তাৎপর্য দেবতার থেকে বেশি। সন্তরা খ্রিস্টের থেকে বেশি গুরুত্বপূর্ণ, আবার পোপদের গুরুত্ব সন্তদের থেকে বেশি।'

ঠিক তেমনি রাহু এবং এক জ্যোতিষ্কের পারস্পরিক বিরোধের চরম মুহূর্তে পতিতকে দেখি দুজনের মধ্যবর্তী অবস্থায়। মনে হয়, রাহু এবং জ্যোতিষ্ক, উভয়ের উপরেই এখন পতিতের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত; রাহু তার অধীন, কারণ সেই পতিতই একমাত্র চন্দ্র-সূর্য উদ্গীরণে দানবকে বাধ্য করতে পারে; অন্য দিকে চন্দ্র-সূর্য এবং চন্দ্র-সূর্যের উপরে যাদের জীবন নির্ভর, তারা সকলেই পতিতের অধীন, কারণ পতিতই একমাত্র

পারে এই পরিস্থিতিতে তাদের রক্ষা করতে।

ভাষার ব্যবহারে, পূজাপার্বণের সূত্রে এবং পবিত্র বংশানুক্রমের কাহিনীতে রাহুর সঙ্গে একাত্ম সব নিম্নজাতির মানুষের মধ্যবর্তীর ভূমিকা স্বীকৃতি পায় গ্রহণের লগ্নে, যখন আনুষ্ঠানিক সমারোহে তাদের উপর বর্ষিত হয় দান। 'দানবগণের পূজা করে ডোম, তাই চন্দ্রকে দানবের গ্রাস থেকে মুক্ত করতে তারাই সক্ষম। সেই কারণেই ধার্মিক মানুষ গ্রহণকালে ডোমকে ভিক্ষা দেয়, যাতে ডোম তার ক্ষমতা ব্যবহার করে চন্দ্রের মুক্তির শুভসাধনে।'[৫৫] উত্তরপ্রদেশে ভিক্ষাদান প্রথার এই বর্ণনার মিল আছে বাংলা এবং বিহার অঞ্চলে রিসলির পর্যবেক্ষণের সঙ্গে। পার্থক্য একটাই যে বাংলা অথবা বিহারে প্রথাটা ঠিক দানের নয়; সেখানে উচ্চবর্ণের হিন্দুরা তামার পয়সা বাড়ির বাইরে রেখে দিত, ডোমেরা যেন তা সংগ্রহ করতে পারে।[৫৬] রাহু 'একজন মেথর অথবা মেথরদের দেবতা', এই বিশ্বাসে মধ্যপ্রদেশের মানুষ গ্রহণলগ্নে মেথরদের ভিক্ষা দেয়, যদি রাহু 'সন্তুষ্ট হয়ে জ্যোতিষ্কদের মুক্তি দেয়।'[৫৭] আরও পশ্চিমে গুজরাটে 'গ্রহণ লাগলেই ভাঙ্গিরা ঘুরে বেড়ায় "গ্রহণদান", "বস্ত্রদান", "রূপাদান" কলরবে।'[৫৮]

৬

উচ্চবর্গের দৃষ্টিকোণ থেকে এসব দানকে বলা যায় স্বর্গে শান্তি এবং মর্ত্যে পবিত্রতা ফিরিয়ে আনার মূল্য। ধ্বংসাত্মক দানবকে শান্ত করবার উদ্দেশ্যে যে আচার নির্দিষ্ট, তারই নাম শান্তি; এই নামেই আছে ওই দানের যথার্থ তাৎপর্যের ইঙ্গিত।[৫৯] প্রথম উপাখ্যানের যে ব্রাহ্মণ্য বৈশিষ্ট্য, সেই দৃষ্টিকোণ থেকে এই দানের দ্বিতীয় কোনও ব্যাখ্যা অসম্ভব।

কিন্তু যে পতিত দান গ্রহণ করে, তার দৃষ্টিকোণ থেকে এই দানের এক ভিন্ন বিশ্লেষণ হতেই পারে। সেই সূত্র নিহিত আছে অপর পৌরাণিক আখ্যানে, যাকে অভিহিত করেছি দ্বিতীয় উপাখ্যান নামে। সেই আখ্যানে মাঙ্গনারী ভিক্ষার জন্য উত্ত্যক্ত করে দেবতাদের; ভিক্ষালাভে সেই নারীর অধিকার আছে; কারণ সেই নারী এমন এক মাতা, সন্তানের প্রাণনাশের পরে জীবনধারণের আর কোনও অবলম্বন যার অবশিষ্ট নেই। ভিক্ষাবৃত্তিতে ওই নারীর অর্থোপার্জন দেবতাদের বিবেককে সন্তুষ্ট রাখবারই সমতুল, কারণ দেবতাদের নায়ক রাম (বিষ্ণু) এবং শিব ছিলেন নিধনের কারক এবং প্ররোচক। বিপর্যস্ত মাতা জীবনধারণের ন্যূনতম দাবি করছেন, এ ঘটনা গভীর নীতিবোধে উদ্বুদ্ধ—যেন এক ন্যায্য ক্ষতিপূরণেরই অন্বেষণ। একই ভাবে ভিক্ষাদান প্রথাকেও বলা চলে নৈতিকতার প্রতিনিধি। তার ন্যায্য প্রাপ্য থেকে মাঙ্গনারীকে বঞ্চিত করলে, তা হবে নীতিগত ভ্রষ্টতা। কারণ হিন্দুদের আদর্শ ধারণায়, যে কোনও দানেই, দাতা এবং গ্রহীতা পারস্পরিক নির্ভরশীলতার এক সম্পর্কে যুক্ত; সে সম্পর্ক যতখানি আধ্যাত্মিক, ততটাই জাগতিক। মার্সেল মাউস যাকে বলেছেন 'আর্থনীতিক ধর্মতত্ত্ব' তার নিয়ম এই দেওয়া নেওয়ার পরিচালক। সেখানে স্তরবিন্যাস অনুযায়ী সম্পত্তিতে ব্যক্তি এবং গোষ্ঠীর অধিকার নির্দিষ্ট থাকবে; আর সেই অধিকার, যা তাদের আধ্যাত্মিক এবং জাগতিক চাহিদাকে পূর্ণ করবে, তা হবে এক নৈতিক অধিকার। তাই যাদের সম্পদ আছে, সম্পদ ভাগ করে নেওয়া

তাদের কর্তব্য। কিন্তু কোনও ক্ষতির প্রশ্ন এখানে নেই। বরং এ কেবল তাদের আধ্যাত্মিক উৎকর্ষের উপায়ই নয়, তাদের ধনসম্পদও এভাবে বৃদ্ধি পায়। কারণ দান 'সততই দাতাকে সমান প্রতিদান এনে দিতে পারে—কখনওই তা দাতার কাছ থেকে হারিয়ে যায় না, উপরন্তু এনে দেয় আরও কিছু, যা ছিল না আগে: অথবা দাতা তার দান লাভসমেত সম্পূর্ণ ফিরে পায়।' বলা যায়, পতিত ভিক্ষুকের প্রতি দাতার আচরণে পৃষ্ঠপোষকরা নিজেদেরই উপকার করেছিল: তারা যে কেবল সমতুল্য প্রতিদান এবং সম্পদবৃদ্ধির নিশ্চিতি পেল তাই নয়, চাওয়া-পাওয়ার যে প্রবাহে দানের স্থান, সেই প্রবাহে বাধাসৃষ্টির পাপও তাদের স্পর্শ করতে পারল না।

স্বকীয় প্রচেষ্টা সত্ত্বেও কোনও দাতা এই প্রবাহে বাধাসৃষ্টির পাপ নাও এড়াতে পারেন, হরিশ্চন্দ্রের নিয়তিই তার দৃষ্টান্ত। আখ্যানের সেই রাজা ব্রাহ্মণের দাবিতে সাড়া দিয়েছিলেন নিজের 'স্বর্ণ, স্ত্রীপুত্র, দেহ, রাজ্য, জীবন এবং সৌভাগ্য' উৎসর্গ করে। কথামতো সবই গ্রহণ করেন ব্রাহ্মণ, এবং প্রতিশ্রুতি পালনার্থে রাজাকে প্রথমে স্ত্রী, তার পর পুত্র, শেষ পর্যন্ত নিজেকেও বিক্রয় করতে হয়। চরমতম বিপর্যয় আসে, যখন নিজেকে তিনি বিক্রয় করেন এক চণ্ডালের কাছে। এই পুরাণ অবলম্বনে যে কাহিনী গড়ে ওঠে, সেখানে দেখি, ডোমদের পূর্বপুরুষ কলুবীর সেই দুর্ভাগা রাজাকে কিনেছিল, আর এতই সৎ ব্যবহার করেছিল রাজার সঙ্গে যে 'রাজা সমগ্র উপজাতিকে নিজের ধর্মে দীক্ষা দিলেন।'[৬১] এই কারণেই ডোমেরা বলে, তারা রাজা হরিশ্চন্দ্রের প্রতিনিধিরূপে গ্রহণকালে দান গ্রহণ করে। তাদের মতে, 'রাজা যখন ভিক্ষাচরণের উদ্দেশ্যে স্বর্গ থেকে প্রত্যাবর্তন করলেন, ভগবান বললেন, কেউ যদি তাঁকে খাওয়াতে স্বীকৃত না হয়, চন্দ্র-সূর্য তবে অদৃশ্য হবে। গ্রহণলগ্নে ডোমেরা তাই দান গ্রহণ করে, কারণ রাজার আত্মা তখন ক্ষুধার্ত।'[৬২] হরিশ্চন্দ্রের ভূমিকা সম্পূর্ণ উলটে গেছে; আদি পুরাণে তিনি ছিলেন দাতা, এখানে তিনি দানগ্রহণকারী। কিন্তু একজনের চাওয়া এবং আর একজনের দেওয়ায় মিলে দানের যে তাৎপর্য, তা সম্পূর্ণ অপরিবর্তিত আছে। দানের কোনও ত্রুটি-বিচ্যুতিতে চাওয়া-দেওয়ার পরম্পরা যদি ব্যাহত হয়, তবে শুধু এক গৃহস্থ নয়, সমগ্র বিশ্বই ধ্বংস হতে পারে গ্রহের প্রবর্তনে কোনও এক অসঙ্গতির আক্রমণে।

গ্রহণ-বিষয়ক আর এক উপাখ্যানেও দানের রূপকল্প পুনরায় ফিরে আসে। তবে এ কাহিনীতে পুরো বিন্যাসের তাৎপর্য অনেক কম।

তৃতীয় উপাখ্যান

চন্দ্র-সূর্য দুই ভাই। এক ক্ষুধার্ত পূজারী একদিন তাদের কাছে এসে বললে, 'আমি দরিদ্র, ক্ষুধার্ত। আমাকে কিছু খেতে দাও।' ভ্রাতৃদ্বয় তাই এক মেথরানির কাছে গিয়ে বলে 'এই লোকটিকে কিছু শস্য দাও।' মেথরানি এক বছরের জন্য কিছু শস্য ভিক্ষুককে দিতে সম্মত হল। ভ্রাতৃদ্বয় মেথরানিকে আদেশ করল, পাত্রের নীচের থেকে শস্য বের করে ভিক্ষুককে দিতে। এই ক্ষতি তারা পূরণ করে দেবে পাত্রের উপর থেকে শস্য ঢেলে ঢেলে। বছর চলাকালীন সূর্য-চন্দ্র পাত্র ভরে দিতে পারল না। বছর অতিক্রান্ত হলে মেথরানি বললে, 'আমাকে ক্ষতিপূরণ দাও, কারণ পাত্র এখনও

ভরেনি।' ক্ষতিপূরণে অক্ষম চন্দ্র-সূর্য নিজেদের গোপন করে রাখল। আজও যখন গ্রহণ লাগে, চন্দ্র-সূর্যের পূজারীরা বিভিন্ন শস্য সংগ্রহপূর্বক, তা একসঙ্গে মিশিয়ে ভিক্ষুকদের মধ্যে বিতরণ করে—চন্দ্র-সূর্যকে লজ্জা থেকে মুক্তি দেওয়াই তাদের লক্ষ্য।

পৌরাণিক প্রকাশভঙ্গি বাদ দিয়েই এ কাহিনী সম্পূর্ণ, সেখানেই আখ্যানটি অসাধারণ। গল্পে রাহুর কোনও উল্লেখ নেই, নেই এক প্রাকৃতিক ঘটনার ব্যাখ্যাকল্পে জীবজন্তু সম্বন্ধে হিন্দুরূপকের ব্যবহার। আমরা এখনও কল্পনার জগতেই আছি ঠিকই, তবু তার ভিতরে বাস্তব-বিশ্বের অংশবিশেষকে চিহ্নিত করতে অসুবিধা হয় না। স্বর্গে শান্তিভঙ্গের বিশ্লেষণ উপাখ্যানে পাই, কিন্তু অশান্তির উপাদান আমাদের অতি পরিচিত গ্রামীণ পরিপার্শ্ব থেকেই গৃহীত। ফসলের যখন মন্দা, এমন বছরের ক্ষুধা এবং অভাব, খাদ্যের জন্য ভিক্ষা, দরিদ্রের প্রতি সামাজিক কর্তব্য পালনে প্রতিবেশীর কাছে ঋণ চাওয়া, সেই ঋণ পরিশোধ করতে না পারার লজ্জা, এই সবই সেই উপাদান। স্বর্গের চিত্রনাট্যকে পার্থিব বাস্তবে মেলাতেই এমন উপাদানসমূহ গল্পে একত্র হয়। আখ্যানটিতে দেখি, নিম্নবর্গের অলংকারবিহীন শিল্পের উদ্দেশ্যই হল, যা যথার্থই অভাবনীয়, তার সম্পর্কে অবিশ্বাস কাটাতে চাওয়া। সূর্য-চন্দ্রের উচ্চবর্ণ পূজারী অভুক্ত, শস্যপূর্ণ পাত্র আছে ভাঙ্গি বা মেথরের কাছে, উচ্চবর্ণের মানুষ ভিক্ষা চাইছে, তাদের দৈব পৃষ্ঠপোষক ধার চাইছে, আর নিম্নবর্ণের মানুষ নিজেদের প্রয়োজনের অধিক শস্যের মালিক, এর থেকে অবিশ্বাস্য আর কীই বা হতে পারে? মনে হয়, গ্রামীণ সমাজ যেন সম্পূর্ণ উলটে গেছে, শুধু দুর্ভাগ্য এই যে এমন প্রতিবিধান ধর্মীয় চিন্তার সীমাকে পেরিয়ে যেতে পারছে না।

তবু এই প্রতিবিধানকে তাৎপর্যবিহীন বলে অস্বীকার করা ভুল হবে। কারণ সমাজের দরিদ্র এবং ঘৃণ্যরা নিজেদের দুর্দশা সম্বন্ধে সচেতন হচ্ছে, বুঝছে এই দুর্দশাকে অতিক্রম করবার প্রয়োজন, সেই দ্বৈত চেতনার প্রকাশ এমন প্রতিবিধান। বাস্তবে কোনও প্রতিকার খুঁজে না পেয়ে ইচ্ছা পূরণের স্বপ্নকেই তারা সত্যি বলে ভাবতে চায়। মৌলিক কোনও তাড়নায় স্বপ্ন এক বাস্তব পরিণতি পাবে, এমন ইচ্ছা আজও বড় দুর্বল। তবুও নিম্নবর্গের যে সামাজিক, সাংস্কৃতিক অবস্থান, তার বিরুদ্ধতাই এই ইচ্ছার ভিত্তি।

একদিকে এই বিরুদ্ধতা শিশুর মতো অসহায়, তবু এক পরিণতির আভাস তার ভিতরে নিহিত আছে। আমাদের আলোচনার পক্ষে সেটাই গুরুত্বপূর্ণ। প্রকাশের আদিপর্বে সংশয়ে আকুল এই বিরোধ উচ্চবর্গের কাছে ধার করা ভাষাতেই সবাক হয়ে ওঠে উচ্চবর্গের সংস্কৃতির বিরুদ্ধে; তখনই আমরা দেখি পরিণতির প্রথম মুহূর্ত। কিন্তু এই সমালোচনা পৌরাণিক উপাদানসমূহকে ঢেলে সাজাতে পারে, যাতে অতীতের অভিজ্ঞতা এবং সেই অভিজ্ঞতা থেকে উদ্ভূত রূপকল্পে এই নতুন মূর্তি সংগতি খুঁজে পায়; দ্বিতীয় উপাখ্যানেই এমন ইঙ্গিত আছে। তার পর তৃতীয় উপাখ্যানে নিম্নবর্গের ধর্মচেতনাকে দেখি তার নিজের স্বরূপে। ব্রাহ্মণ্য পুরাণতত্ত্বের জটিল অলংকৃতভারের জায়গায় এই বিরুদ্ধতা নিয়ে এল এক কল্পনার জগৎ, যার সূত্র মিলবে নিম্নবর্গের প্রাত্যহিক জীবনে। পরিবর্তনের এই ধারায় দানের সনাতন রূপকল্প অন্তরালে সরে যায়,

আখ্যানের কেন্দ্রে আসে সেইসব ঋণের প্রসঙ্গ যা শোধ হয়নি আজও। সব মিলে আর্থনীতিক ধর্মতত্ত্ব থেকে পলিটিকাল ইকনমির দিকে এ এক সীমিত কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ।

৭

রাহু বনাম চন্দ্র-সূর্যের আখ্যান বিবর্তনের ধারাবাহিকতায় শেষে তার নতুন চেহারা পেল আমাদের সমাজের প্রকৃত এক বিরোধের প্রসঙ্গে। ঋণদাতা ঋণগ্রহীতার পারস্পরিক বিরোধ বাস্তবিক একান্তই যন্ত্রণাদায়ক। মধ্যপ্রদেশ অঞ্চল থেকে দেওয়া যায় একটি প্রতিভূ দৃষ্টান্ত:

> চতুর্থ উপাখ্যান
>
> চন্দ্র এবং সূর্য রাহুর কাছে ঋণী; রাহু এসে ঋণ শোধের দাবি জানায়; একেই বলে গ্রহণ। ভিক্ষার যে দান মেথররা পায়, তা ওই ঋণ শোধের এক উপায়।[৬৪]

একই কাহিনীর বহু পাঠান্তরের মধ্যে কয়েকটি বাস্তবের বিন্যাসে বিশিষ্ট, যেমন,

> পঞ্চম উপাখ্যান
>
> সূর্য মেথরের কাছে ঋণী, কিন্তু অর্থ ফেরত দিতে সে অস্বীকার করে। মেথরও নাছোড়বান্দা, সূর্যের দুয়ারে সে ধরনা দেয়। তার কালো ছায়া খুব স্পষ্ট চোখে পড়ে। কালক্রমে সেই ঋণ শোধ হয় এবং মেথর চলে যায়।[৬৫]

> ষষ্ঠ উপাখ্যান
>
> কোনও এক সময় সূর্য চন্দ্র উভয়েই ধ্রুভ অর্থাৎ রাহুর কাছে কিছু ঋণ করেছিল।... ঋণ শোধ দেওয়া প্রয়োজন; যদি কখনও সূর্য ব. চন্দ্র ঋণ পরিশোধে সক্ষম না হয়, তবে রাহু তাকে আক্রমণপূর্বক গ্রাস করতে থাকবে। কিন্তু কখনওই রাহু তাকে পূর্ণগ্রাস করতে পারে না, উদ্গীরণ করে দেয়। যেহেতু ঋণ শোধ এখনও শেষ হয়নি, অর্থ দিয়ে যেতেই হবে।[৬৬]

এমন-সব কাহিনীসূত্রে রাহু তার আদি নিবাস পুরাণের সেই স্বর্গ ত্যাগ করে। যেখানে তার ভক্তদের জীবন, সেই পার্থিব জগতে রাহু খুঁজে পায় তার বাসভূমি। স্বর্গীয় হিংস্রতায় যে কাহিনী শুরু হয়েছিল, সে উপাখ্যান তাই সামাজিক হিংস্রতায় পরিণাম পায়। বাস্তব জগৎ পৌরাণিক বিশ্ব থেকে আলাদা; বাস্তবে এই হিংস্রতা দীর্ঘস্থায়ী ঋণানুবদ্ধতা অথবা ক্রীতদাস প্রথার মারাত্মক চেহারা নেয়; ডোম সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত মানুষই হয় এই হিংস্রতার চরম শিকার। ভারতে ব্রিটিশ রাজত্বের শেষভাগে ব্রিগ্স ডোম নামে পরিচিত এই জাতির বিষয়ে যা বলেছিলেন, তা ওই সম্প্রদায়ভুক্ত প্রতিটি মানুষের ক্ষেত্রেই সত্যি, যথা যেসব আর্থিক বোঝায় তারা ভারাক্রান্ত, তার মধ্যে ঋণের ভারই সর্বাধিক।... প্রতি মাসে টাকায় চার আনা সুদ, অর্থাৎ বার্ষিক সুদের হার শতকরা তিনশো

ভাগ ছিল একান্ত স্বাভাবিক ঘটনা। সাত পুরুষ ধরে পূর্বপুরুষের ঋণ উত্তরাধিকারীদের উপর বর্তায়, আর সেই ঋণ তারা শোধ করে চলে।'[৬৭] ১৯৩১ খ্রিস্টাব্দে উত্তরপ্রদেশ অঞ্চলের এক পর্যবেক্ষক বলেছিলেন, ডোম হল 'ক্রীতদাসদের মতো, বংশানুক্রমে কোনও ঠিকদারি পরিবারের কাছে তার চিরাচরিত বশ্যতা', অথবা 'সে জীবনভর কোনও মহাজনের দাসত্ব করে।'[৬৮] তাদের দারিদ্র্য, সাংস্কৃতিক অনগ্রসরতা এবং জীবিকার প্রয়োজনে প্রায়শই অসৎ কর্মপ্রবণতা, এসবেরই ব্যাখ্যা মেলে সেই ঋণের সূত্রে, যে ঋণের বোঝায় ভারাক্রান্ত তাদের পরিশ্রম।

ডোম সদাই ঋণানুবদ্ধ, তাই শক্তির ধারণায় সে স্বভাবতই ভাবত নিজের পরিপ্রেক্ষিতে তার ঋণদাতার ক্ষমতার কথা। কারণ, সর্বত্রই নিপীড়িত মানুষ কর্তৃত্বের মূর্তি গড়ে প্রত্যক্ষ অত্যাচারীর প্রতিরূপ সামনে রেখে। তাই যেসব জাতি বা গোষ্ঠী কখনও দীর্ঘমেয়াদী, কখনও বা বংশানুক্রমিক ঋণ বহন করে জীবন্ত ঐতিহ্যের মতো, তাদের লোকগাথায় মহাজন ফিরে ফিরে আসে আদর্শ কল্পনার ছবিতে। তাই বাস্তারে ধুরুয়াদের মধ্যে অনাথ শিশুর সাফল্য নিয়ে যেসব প্রবাদকাহিনী প্রচলিত, সেখানে শিশুটি সাহুকার হতে পারলেই তার জীবনের চরম কীর্তি।[৬৯] বোম্বাই এবং রাজস্থান অঞ্চলের গ্রাসিয়ারা বানিয়ার হাতে নিষ্ঠুরভাবে শোষিত; গ্রাসিয়ারা বিশ্বাস করে যে, বানিয়া পারে বৃষ্টিপাত কমিয়ে খরা নিয়ে আসতে; তখন শস্যের মূল্যবৃদ্ধি তাদের অধিক মুনাফালাভে সহায় হয়।[৭০] মহাজনের পক্ষে এমন আদর্শ কল্পনার ভূষণ সীমায় পৌঁছিয়ে যায়, রাহু-বিষয়ক উপাখ্যানেই। মহাজনের আচরণে যারা প্রায় দাসে পরিণত হয়েছিল, মহাজনকে নিজেদের আরাধ্য দেবতা বানিয়ে তারা চূড়ান্ত নতিস্বীকার করে। সুদখোরকে ভগবান বানানোর এই বোধ হয় চরম নিদর্শন।

ডোম, দোসাদ, ভাঙ্গি আর মাঙ্গরা ঋণদাতার ক্ষমতাকে যেমন স্বীকার করে নেয়, একই উপায়ে তারা ওই শক্তি থেকে মুক্তির পথ খোঁজে। কারণ তারা রাহুর সঙ্গে একাত্ম, তা সে সন্তানরূপেই হোক, পূজারীরূপেই হোক অথবা রাহুর থেকে উদ্ভূত বলেই হোক; ভাবজগতের ওই একই প্রক্রিয়ায় তারা নিজেদের দেয় উত্তমর্ণের চেহারা; বাস্তবে যার সীমা লঙ্ঘন করতে পারে না, নিজেদেয় সেই বন্দিদশাকে ভেঙে দেয় তারা তাদের কল্পনার আদর্শ জগতে। নিজেদের সমাজে তারা খাতক (খাদক)[৭১], অর্থাৎ ঋণের ভোগী, কিন্তু রাহুর সঙ্গে সঙ্গে তারা স্বর্গীয় অধমর্ণদের গ্রাস করবার অধিকার পেয়ে যায়। এতদিন যারা ছিল নিপীড়িত, তারা আজ নিজেদের অত্যাচারীর ভূমিকায় সাজাচ্ছে; সেখানে রয়েছে অর্থে প্রত্যর্থে এক বৈপরীত্যের ব্যঞ্জনা। বাস্তব জগৎকে উলটে দেওয়ার বহু প্রয়াসেই নেতিবাচক চৈতন্যের সেই ছাপ থেকে যায়। ধর্মের জগতেও প্রতিবিধান এমন বিপরীতের ব্যঞ্জনায় চিহ্নিত। চতুর্থ, পঞ্চম এবং ষষ্ঠ উপাখ্যানে তেমন ব্যঞ্জনারই দৃষ্টান্ত।

৮

এ কথা সন্দেহাতীত যে রাহুর স্বর্গ থেকে মর্ত্যে গমন অলীক এক মুক্তি ছাড়া কিছুই অর্জন করে না। তা সত্ত্বেও এমন সিদ্ধান্তে আসা ভুল হবে যে আমরা এখনও সেই আরম্ভেই দাঁড়িয়ে আছি। বরং এখন আমরা ধারাবাহিক এক ক্রমের শেষ প্রান্তে, প্রথম উপাখ্যান থেকে যার দূরত্ব অনেক। যেদিন অমৃতের ভাগ নিয়ে দেবতা আর দানব লড়াই করেছিল, সেই সমুদ্রমন্থন আজ থেকে কত যুগ আগে? অমৃতের ভোজসভায় সেই মুণ্ডচ্ছেদই বা কবেকার কথা? আজ আমরা দাঁড়িয়েছি আমাদের সময়ের সঙ্গে, আমাদের পদক্ষেপ হয়তো ততখানি নিশ্চিত নয়, যতখানি নিশ্চিতি আছে আমাদের আকাঙ্ক্ষায়, তবু সেই পদক্ষেপ আজ নিজেদের অভিজ্ঞতার ভূমিতে। অস্বীকার করব না যে গ্রহণের মতো প্রাকৃতিক ঘটনার ব্যাখ্যা আজও খোঁজা হয় পুরাণে, বিজ্ঞানে নয়। কিন্তু আজকের পুরাণে মূল চরিত্র আর দেবতা দানব নয়, মুখ্য ভূমিকা আজ জনগণের। পৌরাণিক কাহিনীর কেন্দ্রে ছিল অমৃতের প্রতিযোগিতা; সে লড়াইয়ের চেহারা বদলে গেছে; আজকের প্রতিযোগিতা মানুষের জীবনধারণের উপযোগী সব পার্থিব সম্পদের মালিকানা নিয়ে। ব্রাহ্মণ্যের আজব কল্পনায় যার উদ্ভব, দরিদ্র আর নিপীড়িতের সরল কল্পনা তাকে আমাদের কালের উপকথায় গ্রথিত করে। কাহিনীর যে পাঠ আমরা মৎস্যপুরাণে পাই, তাতে দেখি, রাহুর সঙ্গে চন্দ্র-সূর্যের শত্রুতা হয়েছিল এবং আজও গ্রহণের সময় রাহু দুজনের উপরেই প্রতিশোধ নেয়।[১২] এখনও সে তার আশানুরূপ পুরোপুরি প্রতিশোধ নিতে পারেনি, অবিরাম চলছে তার অন্বেষণ। সে যে নিজের শত্রুকে মর্ত্যেই খুঁজে পেয়েছে, এটা রাহুর পক্ষে অনুকূল পরিস্থিতি। উপরোক্ত কাহিনীসমূহের বিচারে এই সংগ্রাম এখনও ভাবজগতেই সীমিত; কিন্তু সেই সামাজিক সংগ্রামে পরিণতির সম্ভাবনা আজ অনেক বেশি: সেই সংগ্রামেরই রূপক শেষ তিনটি উপাখ্যান।

অনুবাদক: **রুদ্রাংশু মুখোপাধ্যায়, রুশতী সেন**

টীকা

১ D D Kosambi, *An Introduction to the Study of Indian History*, rev. 2nd ed (Bombay, 1975), ch 2, *The Culture and Civilisation of Ancient India in Historical Outline* (reprint Delhi, 1972), ch 1, এবং ঐ গ্রন্থের অন্যত্র।

২ Kosambi, *Culture and Civilisation*, p. 15

৩ ঐ, পৃ. ১৬।

৪ প্রথম উপাখ্যানের পাঠ নেওয়া হল *The Mahabharata* I *The Book of the Beginning*, tr and ed J A B Van Buitenen (Chicago, 1973), p 74-5। জর্জ দুমেজিল বলেন যে, এই আখ্যান বেদেও উপস্থিত, কিন্তু সেখানে দানবের নাম স্বরভানু। এই আখ্যানের সঙ্গে অমৃতের যোগাযোগ নেই। দুমেজিল-এর মতে, অমৃতের অনুপস্থিতি প্রমাণ করে যে পরবর্তী কাহিনীটি হিন্দুদের উদ্ভাবন। G Dumezil, *Le Festin d' Immortalite* (Paris 1924), p 20

৫ W D O'Flaherty *Hindu Myths* (Harmondsworth, 1975), pp 273-4-এ এই দ্বন্দ্বময়তার বিষয়ে সংবেদনশীল মন্তব্য আছে।

৬ C Levi-Strauss, *The Raw and the Cooked* (London, 1970), p 244.

৭ এই ধরনের সেনিয়মের বিবাহে অস্বাভাবিকতাগুলি হল, স্বামী স্ত্রীর বয়সের ব্যবধান, একে অপরের প্রতি কোমল আচরণ, পোয়াতি মেয়ের বিবাহ, আর বিবাহ উৎসবের জন্য ভোজসভার আয়োজন না করা (ঐ, পৃ ২৪৪)। Levi-Strauss ঐ, Part 5 (১) এ গ্রহণ এবং নশকরার কাঠামোগত সাদৃশ্যের আলোচনা করেছেন।

৮ H A Rose *A Glossary of the Tribes and Castes of the Punjab and North West Frontier Province* vol I (Lahore, 1919) pp 127 738

৯ G W Briggs *The Doms and their Near Relations* (Mysore, 1953) [এর পর Briggs] p 547

১০ E Thurston Ethnographic Notes in Southern India (Madras 1906) p 289

১১ Briggs, p 547

১২ S Stevenson *The Rites of the Twice-Born* (London, 1920) pp 351 2

১৩ ঐ, পৃ ৩৫২; Briggs, p 547

১৪ Rose Glossary p 869.

১৫ The Laws of Manu, ed G Buhler *Sacred Books of the East Series*, vol 25 (reprint Delhi ১৯৭৫) [এর পর থেকে *Manu*], IV, 110 এই অনুচ্ছেদটির টীকায় বিউলার বলছেন, 'অবশ্যই, সূর্যের গ্রহণও এতে অন্তর্ভুক্ত।'

১৬ Thurston, পূর্বোক্ত, পৃ ২৯০।

১৭ ঐ, পৃ. ৩০৭।

১৮ N M Penzer, 'Note on Rahu and Eclipses' in *The Ocean of Story*, vol II tr C H Tawney (reprint, Delhi, 1968), p 81-এ চীন ও পেরু সম্বন্ধে তথ্য আছে। লেভি-স্ট্রোসের যে গ্রন্থ টীকা ৬-এ উল্লিখিত, সেখানে এই কোলাহলের সর্বজনীনতা আলোচিত হয়েছে।

১৯ Penzer, 'Note on Rahu' pp 81-2, M N Srinivas, *Religion and Society among the Coorgs of South India* (Oxford, 1952), pp 239-40

২০ Levi-Strauss, *The Raw*, p 289

২১ Stevenson, p 352 W. Crooke, *The Popular Religion and Folklore of Northern India*, vol I (reprint, Delhi, 1968), p 22

২২ উদাহরণস্বরূপ দ্রষ্টব্য Briggs, পৃ. ২৬, ৬৬।

২৩ O'Flaherty, পূর্বোক্ত পৃ. ২২২, n. ৫৭।

২৪ এই প্রলয়ের আশঙ্কা *মহাভারতে* এইভাবে প্রতিফলিত: 'রাহু কেতু যথাকাশে উদিতৌ জগতঃ ক্ষয়ে' (কর্ণ পর্ব, ৪৭।৯২)

২৫ সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য সূত্রের মধ্যে আছে ব্রিগস-এর উপরোক্ত গ্রন্থটি, F Buchanan [Buchanan-Hamilton], *An Account of the District of Purnea in 1809-10* (Patna, 1928), Crooke, *Popular Religion*, Crooke, *The Tribes and Castes of the North-Western Provinces and Oudh*, vol II (Calcutta, 1896), E T Dalton, *Descriptive Ethnology of Bengal* (Calcutta, 1872); G A 'Note on Grierson, *Bihar Peasant Life* (rev 2nd ed Patna, 1926), Penzer 'Note on Rahu', H.H Risley, *The Tribes and Castes of Bengal*, vol I [এর পর থেকে Risley] (reprint, Calcutta, 1981), R.V Russell and H Lal, *Tribes and Castes of the Central Provinces*, vol 4 (London, 1916); Thurston, *Ethnographic Notes*.

২৬ M Kennedy, *Notes on the Criminal Classes in the Bombay Presidency* (Bombay, 1908), Briggs, p 147

২৭ উদাহরণস্বরূপ দ্রষ্টব্য Briggs, প্রথম পরিচ্ছেদ এবং ঐ গ্রন্থের অন্যত্র। রিসলির সময় ডোমদের প্রায়শই চণ্ডাল বলা হত, এখনও হয়তো ভারতের পূর্বাঞ্চলে তাই বলা হয়।

২৮ *Manu* 10, 51, 52 55

২৯ Kosambi, *Culture and Civilisation*, p 14

৩০ Risley, p 241, Kosambi, *Introduction*, p 41

৩১ Risley, pp 252-3 Crooke *Tribes and Castes*, pp 348-9, Briggs, p 97

৩২ Risley pp 250 257, Briggs, pp 197, 200

৩৩ Risley, p 241, Briggs pp 174-5

৩৪ Briggs, ষষ্ঠ, সপ্তম এবং বিংশ অধ্যায়ে এই সব গোষ্ঠীর অর্থনৈতিক অবস্থা এবং 'ক্রিমিনাল ট্রাইবস অ্যাক্ট'-এর প্রক্রিয়া বিষয়ে আলোচনা আছে।

৩৫ Russell and Lal. পূর্বোক্ত, পৃ. ১৮৯। বাল্মীকির সাহায্যে কেমনভাবে মেথরেরা ওই কলঙ্কচিহ্নের বাধা অতিক্রম করল, তার একটি আখ্যানের জন্য Briggs, পৃ. ৫৮-৯ দ্রষ্টব্য।

৩৬ Briggs, p 123

৩৭ Risley, p 241· Crooke *Tribes and Castes*, p 319

৩৮ এই তথ্য এবং অনুচ্ছেদে আরও যে-সব তথ্য আছে, তার জন্য Briggs পৃ ৬৩ ৪, ৬৫, ৭৬ দ্রষ্টব্য।

৩৯ Kosambi, *Culture and Civilisation*, p ৪৮

৪০ এই উপভোগের বিষয়ে দ্রষ্টব্য Briggs, পৃ ৪৬৫ ৭, Grierson, পূর্বোক্ত পৃ ৪০৬, ৪০৯, Buchanan পূর্বোক্ত, পৃ ৪৯ ৫০।

৪১ Briggs, পৃ ৪১, এই অনুচ্ছেদের বাকি অংশের তথ্য একই গ্রন্থের পৃ ৫২, ৫৪-৫৬, ৬০-৬২, ৬৪-৬৫ ভিত্তি করে।

৪২ *রামায়ণম্*, আদিকাণ্ড· II, ১৫-১৮। বলা হয়, কাব্যের অনুরূপ কাঠামো *রামায়ণ* এর থেকে পুরনো, কারণ এই ছন্দ বেদ-এও পাওয়া যায়। G Dowson, *A Classical Dictionary of Hindu Mythology* (London 1950) p 333

৪৩ এইসব কাহিনীর ভিন্ন পাঠের জন্য দেখুন Briggs, পৃ ৫৫, ৫৯, ৬১।

৪৪ Briggs, পৃ ৬৪-৫-তে এই কাহিনী আছে।

৪৫ বেণ সম্বন্ধে এই অনুচ্ছেদের কাহিনীর সূত্রগুলি হলো Briggs, পৃ. ২৬, ৬৬, ৬৭ এবং Dowson, পূর্বোক্ত, পৃ ৩৫৪।

৪৬ Buchanan, পূর্বোক্ত, পৃ ২৪৯-৫২।

৪৭ পরবর্তীকালের এই অনুষ্ঠানের বিবরণের জন্য Risley, পৃ. ২৫৫-৬ এবং Dalton, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩২৬ দ্রষ্টব্য।

৪৮ Buchanan, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৫২।

৪৯ Penzer, পূর্বোক্ত, পৃ ৮২।

৫০ Russell and Lal, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৩২।

৫১ A. Cunningham and H.B W. Garrick, *Report of Tours in North and South Bihar in 1880-81* (reprint, Delhi, 1969), p 28.

৫২ Crooke, *Tribes and Castes*, pp. 349-50.

৫৩ Briggs, pp. 543-4

৫৪ Karl Marx, *Grundrisse* (Harmondsworth, 1973), pp 331-2.

৫৫ Crooke, *Popular Religion*, p. 320.

৫৬ Risley, p 247.

৫৭ Russell and Lal, *Tribes* p 232.

৫৮ ঐ।

৫৯ কাণে-র মতে অশ্ব, রথ, গাভী, ভূমি, তিল, ঘৃত ইত্যাদি, এমন কি স্বর্ণমূর্তিও এই আচার-অনুষ্ঠানে নৈবেদ্যর অন্তর্ভুক্ত। এই অনুষ্ঠানে রাহুর উদ্দেশে যে দানমন্ত্র, তাতে রাহুকে শান্ত করার চেষ্টা স্পষ্ট:

তমোময় মহাভীম সোমসূর্যবিমর্দন
হেমতারাপ্রদানেন মম শান্তিপ্রদ ভব।

P V Kane, *History of Dharmasastras*, vol V, pt. II (Poona, 1962), p 766

৬০ M Mauss, *The Gift* (London, 1974), p 55

৬১ Risley, p 246

৬২ Briggs, p 546.

৬৩ ঐ, পৃ. ৫৪৫।

৬৪ Russell and Lal, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৩২।

৬৫ Penzer, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪২।

৬৬ W G. Griffiths, *The Kol Tribe of Central India* (Calcutta, 1946), p 131

৬৭ Briggs, p 187

৬৮ ঐ।

৬৯ K.N Thusu, *The Dhurwa of Bastar* (Calcutta, 1965), pp 219-২০.

৭০ P.C Dave, *The Gravas* (Delhi, 1960), p 65

৭১ হিন্দি এবং সংস্কৃতে এই দুটি কথা একে অপরের পরিবর্তে ব্যবহার করা যায় 'ভোগী' এবং 'অধমর্ণ' অর্থে। প্রসঙ্গত দ্রষ্টব্য রামচন্দ্র ভর্মা, *মনক হিন্দী* কোশ, দ্বিতীয় খণ্ড, এবং রাধাকান্ত দেব, *শব্দকল্পদ্রুম*, দ্বিতীয় পর্ব।

৭২ *মৎস্যপুরাণম্*, pt II ed B.D. Basu (Allahabad 1917), পৃ ২৯০।

দেবীর আবির্ভাব

ডেভিড হার্ডিম্যান

১

উনিশশো বাইশের নভেম্বর মাসের গোড়ার দিকে, দক্ষিণ গুজরাটে কাতারে কাতারে আদিবাসী বা উপজাতীয় কৃষকরা সলাহবাই নামে এক দেবীর উপদেশ শোনার জন্য জমায়েত হতে শুরু করে। এই 'দেবী' বা 'মাতা'-র কোনও মূর্তি নেই, ভক্তদের ধারণা তিনি পুবের পাহাড় থেকে আসেন আর লোকের ওপর 'ভর' করে তাঁর আদেশ জানান। এইরকম একএকটি জমায়েতে বেশ কতকগুলি গ্রামের আদিবাসীরা এসে জড়ো হত এবং সেখানে তাদের অনেকেরই ভর হত। ভরগ্রস্তরা প্রচণ্ড মাথা ঝাঁকাত আর সেই অবস্থায় যেসব কথা বলত, লোকের ধারণা ছিল সেসব হচ্ছে দেবীর প্রত্যক্ষ আদেশ। প্রধান আদেশগুলি ছিল, মাংস ও মদ বর্জন, প্রতিদিন স্নান, শৌচের জন্য পাতার পরিবর্তে জল ব্যবহার, ঘরদোর পরিচ্ছন্ন রাখা, খাওয়া বা বলিদানের জন্য পালিত ছাগল, মুরগি ইত্যাদি ছেড়ে বা বিক্রি করে দেওয়া, পারসি শুঁড়ি আর জোতদারদের বয়কট করা। সাধারণের বিশ্বাস ছিল, দেবীর এই সব আদেশ যে মানবে না, তার ওপর নানান বিপদ নেমে আসবে, সে পাগল হয়ে যেতে পারে এমনকী তার মৃত্যুও ঘটতে পারে। সাধারণত একনাগাড়ে বেশ কয়েকদিন এই রকম জমায়েত চলার পর দেবী সরে যেতেন আর এক গ্রামে এবং সেখানে একই ঘটনার পুনরাভিনয় হত।

দেবীর দ্বারা ভূতাবিষ্ট হওয়ার এই ঢেউ দ্রুত ছড়িয়ে পড়েছিল। বরোদা রাজ্যের শোনগড় (Songadh) ও ভিয়ারা (Vyara) মহকুমার পুরোটাই এর আওতায় চলে আসে। এই বিস্তৃত অঞ্চলের কোনও আদিবাসী গ্রামই এর আওতা থেকে মুক্ত ছিল না। নভেম্বর শেষ হওয়ার আগেই বারদোলি আর মাণ্ডবী (Mandvi) তালুকে এই হাওয়া ছড়িয়ে পড়ে, ২ ডিসেম্বরের মধ্যে পৌঁছে যায় জালালপুর তালুকে, আর ১৪ তারিখের মধ্যে সুরাট শহর এবং উপকূলবর্তী অঞ্চলগুলিতে। ডিসেম্বরে দেবীর নতুন কিছু কিছু আদেশ কানে আসতে শুরু করে। সলাহবাই এবার আদিবাসীদের বলছিলেন গান্ধীর নামে শপথ নিতে, খাদির কাপড় পরতে, আর জাতীয়তাবাদী স্কুলগুলিতে যোগ দিতে। গুজব শোনা গেল যে মাকড়সারা গান্ধীর নামের আদলে বুনছে তাদের জাল। এও শোনা গেল যে গান্ধী জেল থেকে পালিয়েছেন এবং এক পাতকুয়োর মধ্যে তাঁকে সলাহবাইয়ের পাশে বসে চরকা কাটতে দেখা যাবে।[১]

সরকারি কর্মচারীরা ভেবেছিল যে এই আন্দোলন হবে ক্ষণস্থায়ী। বারদোলির

মামলতদার মন্তব্য করে: 'আমার অভিজ্ঞতায় এই নিয়ে দশবার কালিপরজদের মধ্যে মদ্যপান বন্ধ করার গুজব ছড়াতে দেখলাম।[২] এসব গুজব ছড়ায় খুব তাড়াতাড়ি, কিন্তু এদের প্রভাব কখনই বেশিদিন টেঁকেনি।'[৩] মামলতদারের প্রত্যাশা অবশ্য ফলেনি, কারণ এই এলাকায় দেবী আন্দোলনের প্রভাব হয়েছিল দীর্ঘস্থায়ী। সুরাট জেলার কালেক্টর এ. এম. ম্যাকমিলানের ১৯২২-২৩ সালের বার্ষিক রিপোর্ট থেকে জানা যায় যে এই অঞ্চলে, বিশেষত চোধ্‌রী (Chodhri) আদিবাসী-অধ্যুষিত এলাকায়, দেবীর প্রভাব তখনও বজায় ছিল। এখানে মদ আর তাড়ি খাওয়া অনেকখানিই বন্ধ হয়েছিল, আর সেইসঙ্গে আদিবাসীদের অর্থনৈতিক অবস্থার ঘটেছিল উল্লেখযোগ্য উন্নতি। জনসাধারণের দাবিতে ম্যাকমিলান সাহেব মাণ্ডবী তালুকে তেরোটি, বারদোলি তালুকে একটি, এবং ভালোড় মহলে একটি মদের দোকান বন্ধ করে দেন।[৪] এর পরের বছরের রিপোর্টে তিনি লেখেন:

> আন্দোলন চালু থাকায় মাণ্ডবীর চৌধ্‌রা [চোধ্‌রী-অধ্যুষিত] এলাকাগুলি স্পষ্টতই উপকৃত হয়েছে। রাজস্বের কিস্তি মেটানোর জন্য লোকজনকে সাহুকারদের কাছে ধার করতে হয়নি—যা আগে সবসময়েই তাদের করতে হত, বছরটা ভাল বা মন্দ যাই হোক না কেন। উৎসব-অনুষ্ঠানের খরচাপাতি তারা কমিয়ে দিয়েছে, ফলে তাদের এর জন্য সাহুকারদের কাছ থেকে আগাম নেওয়ারও প্রয়োজন হয়নি। তাদের চেহারার স্পষ্টতই উন্নতি হয়েছে, যেমন হয়েছে তাদের ঘরদোর এবং গ্রামেরও। রান্নার জন্য পিতলের বাসনপত্র এখন তারা কিনতে পারছে, বউকেও কিনে দিতে পারছে ভাল কাপড়চোপড় এবং গয়নাগাঁটি।[৫]

উনিশ শতকের শেষ এবং বিশ শতকের গোড়ার ভারতবর্ষের অন্যান্য বিভিন্ন অঞ্চলের আদিবাসী আন্দোলনের সঙ্গে দক্ষিণ গুজরাটের এই দেবী আন্দোলনের অনেক মিল খুঁজে পাওয়া যাবে। মোটের উপর এই আন্দোলনগুলি পণ্ডিতদের মনোযোগ বিশেষ আকর্ষণ করতে পারেনি। প্রধান ব্যতিক্রম অবশ্য বিহারের ছোটনাগপুর অঞ্চলের ওরাওঁদের মধ্যে ১৯১৪ সালের টানা ভগৎ আন্দোলন, দেবী আন্দোলনের সঙ্গে অনেক বিষয়ে যার সাদৃশ্য চমকপ্রদ।[৬] সারা ভারতবর্ষের আদিবাসী-অধ্যুষিত অঞ্চলগুলি থেকে এই ধরনের আরও আন্দোলনের সংক্ষিপ্ত বিবরণ পাওয়া গেছে। পূর্ব তথা উত্তর-পূর্ব গুজরাট[৭] এবং উত্তর-পশ্চিম মহারাষ্ট্রের[৮] ভিলদের মধ্যে এই ধরনের আন্দোলন দেখা গেছে। দেখা গেছে মধ্যপ্রদেশ ও উত্তরপ্রদেশের খোন্দ[৯], বিহারের ওরাওঁ, সাঁওতাল ও ভূমিজ[১০], এবং উড়িষ্যার গোন্দ[১১] উপজাতির মধ্যেও। মোটামুটি একই ধরনের কার্যসূচি সম্বলিত বিভিন্ন আন্দোলনের এক মিলিত জোয়ার আশ্চর্যরকম দ্রুততা ও শক্তির সঙ্গে এই এলাকার আদিবাসী গ্রামগুলিকে গ্রাস করেছিল। আন্দোলনের চেহারা ছিল মোটামুটি শান্তিপূর্ণ, এবং বহুক্ষেত্রে তার প্রভাব হয়েছিল দীর্ঘস্থায়ী। এছাড়া ছিল অসংখ্য সহিংস আদিবাসী আন্দোলন, যেমন বিরসা মুণ্ডার বিদ্রোহ, যাতে স্থান পেয়েছিল সমাজসংস্কারের কর্মসূচি।[১২]

এই ধরনের আন্দোলনগুলিকে আরও ভাল করে বোঝার উদ্দেশ্যে এই প্রবন্ধে আমি

দেবী আন্দোলন সম্পর্কে বিশদ আলোচনা করব। আলোচ্য বিষয়গুলি হল, পর্যায়ক্রমে, সামাজিক অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক পটভূমি, আন্দোলনের যথাযথ ইতিহাস, এবং আদিবাসীদের গৃহীত সংস্কারসূচির নিহিতার্থ ও তাৎপর্য।

২

যাদের জীবন এই প্রবন্ধের বিষয়বস্তু, সেই আদিবাসীদের অধিকাংশই বাস করত 'রানিমহল' নামে পরিচিত দক্ষিণ গুজরাটের এক জঙ্গলাকীর্ণ এলাকায়। রানিমহল মোটামুটি সমতল এলাকা; সহ্যাদ্রি পর্বতশ্রেণীর খাড়া পাহাড়গুলি দাঁড়িয়ে আছে এর পূর্বসীমানার উপর। উনিশ শতকের গোড়ায় রানিমহলের অধিকাংশই ছিল জঙ্গলে ছাওয়া। অবশ্য এই এলাকার গাছপালা কেটে ফেলে মাঠ বানানো হয়েছিল এই শতকের মধ্যেই। ১৯২০ সাল নাগাদ ঘন জঙ্গল বলতে আর যেটুকু অবশিষ্ট ছিল তা এই এলাকার উত্তর এবং উত্তর-পূর্বাঞ্চলের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। রানিমহলের মাটি ছিল উর্বর, আর বৃষ্টিপাতও হত প্রচুর, ফলে একবার চাষের আওতায় এলে একই জমি থেকে বছরের পর বছর ভাল ফসল পাওয়া যেত।

'কালিপরজ' নামে পরিচিত প্রধান উপজাতিগুলি ছিল চোধ্‌রী (Chodhri), গমিৎ (Gamit), ধোড়িয়া (Dhodiya) আর কোঙ্কনী (Konkani)। এছাড়া নায়েক (Naikas), কোতওয়ালিয়া (Kotvaliya) আর কাঠোড়িয়ার (Kathodiya) মতো ছোটখাটো উপজাতিও ছিল। রানিমহলের যে অঞ্চলগুলিতে প্রধান চারটি উপজাতি বাস করত সেগুলি ছিল পরস্পরসংলগ্ন, এমন কী এক এলাকা আর-একটিতে উপচে পড়েছিল অনেকখানি। চোধ্‌রীদের বাস ছিল প্রধানত মাণ্ডবী, ভালোড়, ভিয়ারা আর মাহুবা (Mahuva) তালুকে। গমিৎরা আস্তানা গেড়েছিল ভিয়ারা আর সোনগড় তালুকে, আর পশ্চিম খান্দেশে। ধোড়িয়ারা থাকত দক্ষিণের দিকে, মাহুবা, পশ্চিম ভাঁসদা (Vansda), চিখ্‌লি (Chikhli), পূর্ব ভালসাদ (Valsad), পশ্চিম ধরমপুর আর পার্দিতে (Pardi)। আর কোঙ্কনীরা ছড়িয়ে পড়েছিল রানিমহল ছাড়িয়ে সহ্যাদ্রি পর্বতমালায়—ভাঁসদা, ধরমপুর, দাং (Dang), সুরগনা (Surgana) আর নাসিক জেলায় বাসা বেঁধেছিল তারা। পশ্চিম ভারতের আদিবাসী সম্প্রদায়গুলির মধ্যে যারা বৃহত্তম, সেই ভিলদের রানিমহলে খুঁজে পাওয়া যেত না বিশেষ; তাদের এলাকা শুরু হয়েছিল বাজপুর (Vajpur) আর রাজপিপলা (Rajpipla) রাজ্য থেকে। অবশ্য এর ব্যতিক্রম ছিল দাং—যেখানে প্রভুত্বকারী গোষ্ঠীনেতারা ছিল ভিল, আর চাষিদের অধিকাংশই কোঙ্কনী। ভিলদের সঙ্গে দক্ষিণ গুজরাটের আদিবাসী সম্প্রদায়গুলির কৃষ্টিগত তফাৎ ছিল অনেক; শেষোক্তদের কোনওমতেই এই প্রধান উপজাতিটির প্রশাখা বলা চলত না।

রানিমহলের আদিবাসীদের অধিকাংশই ছিল স্থায়ী কৃষক, যারা থাকত ছোট ছোট গ্রামে বা 'ফলিয়ায়' (faliya)। রাজস্ব আদায়ের একক হিসেবে পরিগণিত হত যে গ্রাম, তা গঠিত হত বেশ কয়েকটি 'ফলিয়া' নিয়ে। কারিগর বা অন্যান্য বিশেষ জীবিকানির্বাহী জাতির অস্তিত্ব না থাকায় এইসব গ্রামের কোনও নাভিকেন্দ্র ছিল না। এদিক থেকে বিচার করলে, ব্রাহ্মণ পুরোহিত, আধিপত্যশালী জাতি, অধস্তন শ্রমজীবী জাতি, বানিয়া

দোকানদার, কারিগর জাতি আর অস্পৃশ্যদের স্তরবিন্যাস নিয়ে গড়ে-ওঠা তথাকথিত 'সনাতন' ভারতীয় গ্রামের সঙ্গে এইসব আদিবাসী গ্রামের বৈপরীত্য সুস্পষ্ট। অধিকাংশ আদিবাসী ফলিয়ার সদস্যই ছিল একই উপজাতির লোক। হয় তারা ছিল নিজেরাই জমির মালিক, অথবা তারা জমি ভাড়া খাটাত, এবং সাধারণত তাদের নিজস্ব চাষবাসের সরঞ্জাম আর হালটানার বলদ থাকত।

আদিবাসী গ্রামের উদাহরণ হিসেবে মাণ্ডবী তালুকের সাতভাও (Sathvav)-কে বেছে নেওয়া যেতে পারে। তিরিশের দশকের প্রথমদিকে সমাজতত্ত্ববিদ বি. এইচ. মেহ্তা এই গ্রামটি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে নিরীক্ষণ করেন।[১৩] সেই সময়ে সাতভাও-এর জনসংখ্যা ছিল ৫৮৮, যা ১১৪টি পরিবারে বিভক্ত ছিল। এর মধ্যে ১০৬টি ছিল চোধ্‌রী আদিবাসী পরিবার, ৪টি ভিল, ২টি অস্পৃশ্য ঢের (Dhed) জাতের এবং ২টি পারসি। প্রত্যেক পরিবার কি পরিমাণ জমির মালিক ছিল এবং/অথবা কতটা জমি ভাড়া খাটাত সে সম্পর্কে মেহ্তার সংগৃহীত তথ্য থেকে নীচের সারণীটি তৈরি করা সম্ভব:

অধিকৃত জমির পরিমাণ (একর হিসেবে)	পরিবারের সর্বমোট সংখ্যা	পরিবারের শতাংশ
শূন্য	২১	১৮
৫-এর কম	২১	১৮
৫ থেকে ১০	১৪	১২
১০ থেকে ২০	৩৪	৩০
২০ থেকে ৩০	১২	১১
৩০ থেকে ৪০	৫	৪
৪০ থেকে ৫০	৩	৩
৫০-এর বেশি	৪	৪
মোট	১১৪	১০০

সবচেয়ে বেশি জমির মালিক ছিল এক পারসি, যার দখলে ছিল ১০৮ একর জমি। তিনজন চোধ্‌রী যথাক্রমে ৬৪, ৬০ এবং ৫২ একর জমির মালিক ছিল। মেহ্তার মতে একটি পরিবারের উপযুক্ত ভরণপোষণ যোগানোর জন্য দরকার তো অন্তত কুড়ি একর জমি।[১৪] এর চেয়ে কম জমির মালিক অথবা একেবারেই ভূমিহীন ছিল ৮৮টি (৭৭ শতাংশ) পরিবার। সুতরাং সাতভাওয়ের আদিবাসীদের একটি বৃহৎ অংশ যে বেশ দারিদ্র্যের মধ্যেই দিন কাটাচ্ছিল, এমন মনে করাটা অযৌক্তিক হবে না। এবং এর থেকে সিদ্ধান্তে আসা যেতে পারে, শুধু যে তারা দরিদ্র ছিল তাইই নয়, তিরিশের দশকের মধ্যেই গ্রামগুলিতে বৈষম্য ছড়িয়ে পড়েছিল ভালভাবেই। অবশ্য যেখানে অসংখ্য চুক্তিবদ্ধ শ্রমিক উচ্চবর্ণের ভূম্যধিকারীদের হয়ে কাজ করত, দক্ষিণ গুজরাটের সেই আদিবাসীহীন গ্রামগুলির তুলনায় আলোচ্য আদিবাসী গ্রামগুলিতে বৈষম্যের তীব্রতা ছিল

অনেক কম।

এইসব বৈষম্য সত্ত্বেও এক আদিবাসী আর এক আদিবাসীকে শোষণ করত সামান্যই। শোষণ তার চরমতম রূপ পরিগ্রহ করেছিল উচ্চবর্ণের মহাজন এবং পারসি সুরা-ব্যবসায়ীদের হাতে। বলপূর্বক শ্রম আদায় ছাড়াও বিভিন্ন আইনসম্মত ও বেআইনি কর আরোপ করার মাধ্যমে আদিবাসী শ্রমশক্তি শোষণের কাজে যোগ দিয়েছিল ঔপনিবেশিক আমলাতন্ত্র। পুলিশ, এবং রাজস্ব, আবগারি ও বনবিভাগের অফিসাররা প্রত্যেকেই এতে ভাগ বসাত। মহাজনদের অধিকাংশই ছিল বানিয়া, পারসি আর ব্রাহ্মণ। বানিয়া আর ব্রাহ্মণরা থাকত তালুকের সদর শহরগুলিতে। তারা টাকা ধার দিত হয় তাদের শহরের বাড়ি থেকে, অথবা সাপ্তাহিক হাট থেকে, যেগুলি বসত সমগ্র আদিবাসী-অধ্যুষিত অঞ্চল জুড়ে বিভিন্ন জায়গায়। যারা মহাজনী কারবার এবং মদের ব্যবসা দুইই একসঙ্গে চালাত, সেই পারসিরা সাধারণত থাকত বড় বড় আদিবাসী গ্রামগুলিতে। এই সব গ্রামে তাদের মদ বিক্রি করার একচেটিয়া অধিকার ছিল। মাণ্ডবী তালুকের ১৩৫টি গ্রামে ১৩টি, অর্থাৎ গড়পড়তা প্রতি দশটি গ্রামপিছু একটি মদের দোকান ছিল। এই তথ্য থেকে গ্রামবাসী পারসিদের সংখ্যা ও তাদের প্রভাব সম্বন্ধে খানিক ধারণা করা যায়। প্রায়ই তারা একাধিক গ্রামে জমির মালিকানা ভোগ করত। বিশ শতকের গোড়ার দিকের মধ্যেই তাদের কেউ কেউ বিশাল ভূসম্পত্তির মালিক হয়, এবং স্থানীয় গোমস্তাদের হাতে এগুলির ব্যবস্থাপনার ভার ছেড়ে দিয়ে শহরে বসবাস করতে শুরু করে। কিন্তু ছোটখাটো পারসি ভূস্বামীদের অনেকে আদিবাসী গ্রামগুলিতেই থেকে যায়। আদিবাসীদের খড়ে-ছাওয়া মাটির কুঁড়ের পাশাপাশি এদের বাড়ি হত দোতলা, ইঁট আর টালির তৈরি। সারা বছর ধরে এরা মদ আর তাড়ি ধার দিয়ে যেত, আর ফসল কাটার সময় আদায়ীকৃত শস্যের হিসেবে বহুগুণ বর্ধিত হারে ফিরে পেত তাদের দাম। ভূমিহীন আদিবাসীরা তাদের ধার শোধ দিত পারসিদের ক্ষেতে গায়ে খেটে।[১৫] আদিবাসীদের নিয়ন্ত্রণে রাখার জন্য পারসিরা যে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করত তার অসংখ্য বিবরণ মেলে।[১৬] শ্রম আদায় করা ছাড়াও, যৌন উদ্দেশ্যে আদিবাসী মেয়েদের অপব্যবহার করা হত।[১৭] গরিব আদিবাসীরা সবসময়েই ভয়ে সিঁটিয়ে থাকত। যে কোনও প্রতিবাদকে চটপট উত্তম-মধ্যম দিয়ে ঠাণ্ডা করে দিত পারসি মালিক নিজে অথবা তার পোষা গুণ্ডাবাহিনী। স্থানীয় সরকারি কর্মচারি এবং পুলিশ সবসময়েই পারসিদের পক্ষই অবলম্বন করত।

পারসিদের হাত শক্ত করেছিল মদব্যবসা-সংক্রান্ত সরকারি আইনকানুনও, যার মধ্যে মুখ্য ছিল ১৮৭৮ সালের বোম্বাই আবগারি আইন। ওই বছরের আগে মদ চোলাই এবং বিক্রি করার অধিকার ইজারা-বিলি করা মদের উপর শুল্কও ছিল কম। মদ (যা গুজরাটে 'দারু' নামে পরিচিত) চোলাই করা হত গ্রামে, আর এর প্রধান উপাদান হিসেবে ব্যবহৃত হত 'মহৌরা' (mhowra) গাছের শর্করাসমৃদ্ধ ফুল। তাড়ি ছিল গেঁজে-ওঠা তালের রস, যা প্রায় বিয়ারের মতোই কড়া। যেসব তালগাছের রস থেকে তাড়ি বানানো হত সেগুলির উপর সামান্য শুল্কের মাধ্যমে এর উপর কর আরোপ করা হয়েছিল। দারু এবং তাড়ি, উভয়ক্ষেত্রেই কর ফাঁকি দেওয়ার যথেষ্ট সুযোগ থাকায় এই ব্যবস্থা ব্রিটিশদের পছন্দসই

ছিল না। ১৮৭৮ সালের আইন স্থানীয় ভিত্তিতে মদ উৎপাদন পুরোপুরি নিষিদ্ধ করার পর কেবল জেলা সদরগুলিতে একটি করে কেন্দ্রীয় ভাটিখানা চালু রাখার অনুমতি দেয়। এই কেন্দ্রীয় ভাটিখানাগুলি চালাত জেলার একচেটিয়া ব্যবসাদারেরা, যাদের ফি বছর সরকারকে মোটা টাকা দিতে হত। কেন্দ্রীয় শুল্কব্যবস্থার আয়ত্তাধীন এই মদ যারা গ্রামে বিক্রি করত, পরওয়ানা বাবদ তাদেরও ফি বছর সরকারকে দিতে হত নির্দিষ্ট অঙ্কের টাকা। তাড়ির সঙ্গে দামের তারতম্যহেতু এই নতুন মহার্ঘ্য মদের ক্রয়যোগ্যতা হ্রাস পাওয়ার আশঙ্কা থাকায় তালগাছগুলির উপর কর প্রচুর বাড়িয়ে দেওয়া হয় এবং আরও নিখুঁতভাবে গাছগুলিকে তালিকাভুক্ত করা হয়।[১৮]

এমন নতুন ব্যবস্থায় আবগারি রাজস্বের যে বিপুল বৃদ্ধি হয়েছিল তা নীচের সারণী থেকেই স্পষ্ট হবে। বাঁ-দিকের স্তম্ভে প্রদত্ত সংখ্যাগুলির মাধ্যমে বোম্বাই প্রেসিডেন্সির সর্বমোট রাজস্বের শতাংশকে বোঝানো হয়েছে। সরকারি আয়ের প্রধান উৎস ভূমিরাজস্বের যে অনুরূপ শতাংশের হিসেব এই সারণীতে দেখানো হয়েছে, তার সঙ্গে একই সময়সীমার নিরিখে আগের সংখ্যাগুলির তুলনামূলক বিচার করা যেতে পারে।[১৯]

বছর	আবগারি	ভূমিরাজস্ব
১৮৬৫-৬৬	৪.৪	৪০.৩
১৮৭৫-৭৬	৪.২	৩৮.৮
১৮৮৫-৮৬	৮.২	৩৮.৭
১৮৯৫-৯৬	৭.৭	৩৪.৭
১৯০৫-০৬	৮.৯	২৪.২
১৯১৫-১৬	১৩.৭	৩১.৪
১৯২৫-২৬	২৯.৩	৩৮.১

আলোচ্য সময়সীমার মধ্যে একটি জেলায় (সুরাট) দেশি মদ ও তাড়ির উপর আবগারি শুল্কের পরিমাণ কিভাবে বৃদ্ধি পেয়েছিল তা নীচে টাকার অঙ্কের হিসেবে দেখানো হয়েছে।[২০]

রাজস্ব বছর	রাজস্ব (টাকার অঙ্কে)
১৮৭৭-৭৮	৩,৭০,৪২৩
১৮৮৫-৮৬	৭,৯৪,২২১
১৮৯৫-৯৬	১১,৬৪,৫৮৫
১৯০৫-০৬	১১,৬৭,৭১৮
১৯১৫-১৬	১৭,৪৪,৮৬৭
১৯২৫-২৬	৩৪,৩৬,২৯১

সুরাট জেলায় এই শুল্কবৃদ্ধির ভার নিচুজাতের লোকেদের, বিশেষত আদিবাসীদেরই

বহন করতে হয়েছিল। এই নতুন ব্যবস্থার মুনাফা ভালভাবেই লুটেছিল মদবিক্রেতারা। তাদের মদ চোলাইয়ের অধিকার চলে গেলেও, গ্রামকে গ্রাম জুড়ে কারখানায়-তৈরি মদ বিক্রি করার একচেটিয়া অধিকার ছিল। গ্রামে বাস করার দরুন মদবিক্রেতারা বেআইনি মদচোলাইয়ের বেশির ভাগটাই রুখতে পেরেছিল। কারখানায় তৈরি চড়াদামের মদের উপর লাভ করা হত ওজনে মেরে, জল মিশিয়ে বা চড়া সুদে এই মদ ধার দিয়ে। দোকানদারেরা ঠগবাজি আর জুলুমের মাধ্যমে তাদের পকেট ভারি করত, আর আবগারি বিভাগের কর্মচারীদের ঘুষ দেওয়া হত এ ব্যাপারে নাক না গলানোর জন্য।[১০] ১৯২৩ সালে বোম্বাই আবগারি কমিটির কাছে দেওয়া সুবাটের হরিভাই দেশাই-এর সাক্ষ্য থেকে জানা যায় যে কোনও মদের দোকান পরিদর্শনে যাবার আগে আবগারি অফিসাররা বেশ ভালরকমই আগাম হুঁশিয়ারি দিয়ে রাখত। দোকানদারেরা প্রায়ই অফিসারদের টাকা ধার দিত এবং অন্যান্যভাবেও তাদের ক্ষমতায় টিঁকে থাকতে সাহায্য করত। দেশাই আরও বলেন:

> বস্তুত বর্তমান ব্যবস্থায় একজন মদের দোকানি গ্রামের একজন অধিকর্তাবিশেষ, আগে যেখানে তাকে থাকতে হত 'পারিয়া' হিসেবে। সত্যিকথা বলতে কি, আমার দেখা অনেক গ্রামেই আবগারি দোকানদাররাই একমাত্র পয়সাওয়ালা লোক। আর্থিক স্বাচ্ছল্য আর সরকারি কর্মচারীদের সঙ্গে যোগাযোগ, এই দুইয়ে মিলে তাদের গ্রামের অভ্যন্তরীণ রাজনীতিতে একটি বিপজ্জনক শক্তিতে পরিণত করেছে। তারাই ঝগড়া বাধায়, আবার মেটায়, আর সরকারি প্রশ্রয় এবং অনুগ্রহের ছত্রচ্ছায়ায় থেকে অনেক মানী লোকের সম্মান নষ্ট করতেও দ্বিধা করে না। এইসব দোকানদারদের সম্পর্কে যত কম বলা যায় ততই ভাল।[১১]

মহাজনী কারবার এবং মদের ব্যবসা থেকে লব্ধ মুনাফার অনেকটাই জমিতে বিনিয়োগ করা হত। ১৮৬০-এর দশকের ভূমিরাজস্ব বন্দোবস্তগুলির আগে পর্যন্ত আদিবাসীরা তাদের চিরাচরিত রীতি অনুসারেই জমি ব্যবহার করত, অর্থাৎ কৃষিযোগ্য জমির সন্ধানে তারা প্রত্যেক বছরই সরে যেত এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায়। নিজেদের ব্যক্তিগতভাবে আলাদা আলাদা জমির মালিক হিসেবে ভাবার রেওয়াজ তাদের মধ্যে ছিল না। যাই হোক, ১৮৬০-এর দশকে দক্ষিণ গুজরাটের আদিবাসী কৃষকরা যে জমি চাষ করত, সেই জমির মালিকানাস্বত্ব তাদের দেওয়া হয়, এবং জমি এই প্রথম একটি বিপণনযোগ্য পণ্য হিসেবে পরিচিত হয়। কিন্তু আদিবাসীদের রাজনৈতিক প্রতিপত্তি না থাকায় এবং তারা তুলনামূলকভাবে বশংবদ হওয়ায় (কারণ নিজেদের জমিকে রক্ষা করার প্রয়োজনীয়তা অতীতে তাদের কোনওদিনই ছিল না) মহাজন এবং মদব্যবসায়ীরা শীঘ্রই তাদের মালিকানাস্বত্ব থেকে বঞ্চিত করতে শুরু করে। স্বভাবভীরু হওয়ার ফলে আদিবাসীদের এই রূপান্তর হয়েছিল অত্যন্ত অনায়াসসাধ্য।

সুতরাং জমির উপর মালিকানাস্বত্বের আবির্ভাব এবং সুরাসংক্রান্ত আইনকানুন এই নতুন শোষণব্যবস্থার ভিত্ত গড়ে দিয়েছিল। উনিশ শতকের শেষের দিকে বরোদা এবং তার সংলগ্ন নৃপতিশাসিত রাজ্যগুলি একই ধরনের ব্যবস্থা অবলম্বন করার ফলে অবস্থা

সেখানেও দাঁড়ায় প্রায় একই রকম। আদিবাসীদের উপর তাঁদের শাসনের ভয়ঙ্কর প্রভাব খুব তাড়াতাড়িই ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষের নজরে আসে, কিন্তু এই ব্যবস্থার যাথার্থ্য সম্পর্কে প্রশ্ন তোলার পরিবর্তে তাঁরা আদিবাসী কৃষকদের কল্পিত নৈতিক ভ্রষ্টতার উপরই দোষ চাপান। বিশেষভাবে তাঁরা দায়ী করেন আদিবাসীদের সুরাসক্তিকে। মাণ্ডবী তালুকের চোধ্‌রীদের সম্পর্কে লিখতে গিয়ে ১৮৮১ সালে সুরাট জেলার এক ডেপুটি কালেক্টর মন্তব্য করেন:

> এইসব কালিপরজরা সুরার প্রতি বেশ ভালরকমই আসক্ত। সত্যি বলতে কি, [মাণ্ডবী তালুকে] যে আবগারি শুল্কের মোট পরিমাণ পঁচিশ হাজার টাকারও বেশি, তার বেশির ভাগটাই ওঠে এদের কাছ থেকেই। মদের পিছনে খরচের অর্ধেকটাও যদি এরা জমিতে খাটাত অথবা চাষবাসের উন্নতমানের সরঞ্জাম কেনার জন্য ব্যয় করত তাহলে এদের অবস্থা আস্তে আস্তে ফিরে যেত। সে জায়গায়, সাহুকারদের ধার মেটাতে এখন তাদের চাল ইত্যাদি ভাল ভাল শস্যের পুরোটাই দিয়ে দিতে হয়। তাদের নিজস্ব খোরাকের জন্য পড়ে থাকে কৌ দ্‌রা নাগ্‌লী আর অন্যান্য নিকৃষ্ট শস্য।[২৩]

মনে করা হয়েছিল যে এই সমস্যার সমাধান হবে আদিবাসীদের লেখাপড়া শেখানো যাতে তারা পানাহারের ব্যাপারে মিতাচার ও সংযমের সুফলগুলি বুঝতে শেখে। সুরাটের এক সহকারী কালেক্টরের ভাষায়, 'যতদিন না তারা পর্যাপ্ত শিক্ষালাভ করছে এবং মিতাচারের নিয়মকানুন বোঝার মতো অবস্থায় পৌঁছচ্ছে, ততদিন কাল্পনিক দাসত্ব থেকে তাদের মুক্ত করার প্রচেষ্টা পণ্ডশ্রম মাত্র।'[২৪] একই সুর শোনা যাচ্ছে সাত বছর পর, আরেক সহকারী কালেক্টরের লেখাতেও:

> এটা আদৌ অত্যুক্তি নয় যে একজন গড়পড়তা চোধ্‌রা (আদিবাসী) দশের উপর গুনতে জানে না, এবং স্কুলকে ব্রাহ্মণ্যবাদের হাতিয়ার ভেবে ঘৃণা করে। তবে শত প্রচেষ্টাতেও তাকে কিছুই শেখানো যায় না—এমন ধারণাটা যে ভুল তা ভালোড়-এর দৃষ্টান্তই প্রমাণ করে। মাণ্ডবীর তুলনায় এই এলাকা [সরকারি] নজর পেয়েছে বেশি। এই মহলটিতে শুধুমাত্র চোধ্‌রাদের জন্যই নির্দিষ্ট দুই বা তিনটি স্কুল রয়েছে, এমনকি দু-তিনজন চোধ্‌রা স্কুলশিক্ষকও আছেন। আমি লক্ষ্য করেছি যে যেসব গ্রামে স্কুল রয়েছে, একমাত্র সেগুলিতেই এমন চোধ্‌রাদের খুঁজে পাওয়া যাবে যারা পাকা বাড়িতে বাস করে, কোদ্‌রা এবং নাগলী-র থেকে ভাল খাবার জোটাতে পারে, গ্রীষ্মের কথা ভেবে আগাম জমিয়ে রাখে গবাদি পশুর খাবার, এবং জানে যে পাওনা আদায়ের অজুহাতে হাল-বলদ কেড়ে নেওয়াটা বেআইনি।[২৫]

এইভাবে ঔপনিবেশিক সরকারের চোখে শিক্ষাই হয়ে দাঁড়ায় আদিবাসী দারিদ্রের সর্বরোগহর উপশমক।

আদিবাসী গ্রামগুলিতে প্রাথমিক স্কুল খোলা হয়েছিল। এই পরীক্ষা বড় একটা সফল হয়নি। উচ্চবর্ণের শিক্ষকরা দূরবর্তী আদিবাসী অঞ্চলগুলিতে কাজ করতে অনিচ্ছুক

ছিলেন, এবং খুব কমসংখ্যক আদিবাসীই ছিল শিক্ষকতার জন্য উপযুক্ত যোগ্যতাসম্পন্ন অথবা শিক্ষার উন্নয়নে আদৌ আগ্রহী। অনেকেই বিশ্বাস করত যে স্কুলে-পড়া ছেলেরা অল্পবয়সে মারা যায়।[২৬] স্কুলগুলিতে উপস্থিতির হার ছিল খুবই নগণ্য এবং বেশ কয়েকটিকে তো বন্ধই করে দিতে হয়েছিল। পরিস্থিতি অবশ্য সম্পূর্ণ নৈরাশ্যজনক ছিল না, কারণ বরোদা রাজ্য আদিবাসী প্রশিক্ষণে ছোটমাপের কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ সাফল্য অর্জন করেছিল। ১৮৮৫ সালে রানিমহল পর্যটনের পর সযাজীরাও গাইকোয়াড় আদিবাসী ছাত্রদের জন্য সোনগড়ে একটি ছাত্রাবাস নির্মাণের আদেশ দেন, যাতে তারা শহরের প্রাথমিক স্কুলে পড়াশোনার জন্য তাদের পূর্ণ সময় নিয়োজিত করতে পারে। প্রথম প্রথম আবাসিক খুঁজে পাওয়াই ছিল দুষ্কর। কিন্তু এর প্রথম সুপারিন্টেণ্ডেন্ট ফতেহ্‌খান পাঠান ছিলেন সাফল্য অর্জনে বদ্ধপরিকর, এবং তিনি গ্রামে গ্রামে ঘুরে ছাত্রসংগ্রহ করতে শুরু করেন। তাঁর দর্শনমাত্রেই আদিবাসীরা জঙ্গলে পালিয়ে যেত। এই অবস্থার পরিবর্তন হয় যখন ফতেহ্‌খান গমিৎ সম্প্রদায়ের এক চাঁইকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে তাঁর দুই ছেলেকে সোনগড়ের ছাত্রাবাসে পাঠানোর ব্যবস্থা করেন। এদের একজন, অমর সিং গমিৎ, পরে একজন অগ্রণী সমাজসংস্কারক হিসেবে পরিচিত হন।[২৭] ১৯০০ সালের মধ্যে এই ছাত্রাবাসের আবাসিকসংখ্যা সন্তোষজনকভাবে বৃদ্ধি পায় এবং এর আদিবাসী আবাসিকদের মধ্যে বেশ কয়েকজন প্রতিবছরই সপ্তম স্ট্যান্ডার্ডের গুজরাটি পরীক্ষায় পাশ করে শিক্ষকতার জন্য প্রয়োজনীয় যোগ্যতা অর্জন করে। ১৯০৪ সালে ব্রিটিশরা তাদের নিজস্ব উদ্যোগে মাণ্ডবী তালুকে একটি অনুরূপ ছাত্রাবাস খুলতে মনস্থ করে। গড়সাম্বা (Godsamba) বোর্ডিং হাউস নামে পরিচিত এই আবাসটিতে সারা সুরাট জেলা থেকে ছাত্ররা পড়তে আসে। এই হস্টেল থেকে পাশ-করা ছাত্রদের অনেকেই পরে রানিমহলের আদিবাসী সমাজ সংস্কারের কাজে অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করে।

এই সমাজসংস্কারকদের মধ্যে সর্বাগ্রগণ্য ছিলেন সোনগড়ের প্রাক্তন ছাত্র অমর সিং গমিৎ (১৮৭৩-১৯৪১)। ১৯০৫ সালে ফতেহ্‌খান পাঠানের সঙ্গে তিনি ভিয়ারা তালুকে তাঁর নিজস্ব গ্রামে একটি আদিবাসী সম্মিলনের আয়োজন করেন। এখানে আদিবাসীদের মদ্যপান ও কুসংস্কারভিত্তিক আচারপালন ছেড়ে দিতে, লেখাপড়া শিখতে, এবং মহাজনদের ঋণের কবল থেকে নিজেদের মুক্ত করতে উৎসাহিত করে কয়েকটি প্রস্তাবও পাশ করা হয়।[২৮] এর পরের কয়েকবছর অমর সিং গমিৎ গ্রামে গ্রামে ঘুরে আদিবাসীদের জীবনাচরণের বিধিগুলি পালটাতে উৎসাহিত করেন। তাদের মধ্যে রোজ স্নান করা, ঘরদোর পরিষ্কার রাখা এবং অসুস্থতার সময় ওঝা-ঝাড়ফুঁকের পরিবর্তে আধুনিক চিকিৎসাব্যবস্থার সাহায্য নেওয়ার প্রথা তিনি প্রচলন করতে চেয়েছিলেন।[২৯] একইসঙ্গে তিনি প্রচার অভিযান চালান রতনজী দাবু নামে এক বড় পারসি জমিদারের বিরুদ্ধেও, যে খোলাখুলিভাবেই আদিবাসীদের শোষণ করে যাচ্ছিল। অমর সিং-এর এই অভিযান অবশ্য নিষ্কণ্টক হয়নি, এবং এর সাফল্যও ছিল সীমিত।

ব্রিটিশ-অধিকৃত অঞ্চলগুলিতে, বিশেষত মাণ্ডবী তালুকে, গড়সাম্বা বোর্ডিং হাউসে শিক্ষাপ্রাপ্ত তরুণবয়স্ক চৌধ্‌রীরা 'ভজনমণ্ডলী' নাম দিয়ে ছোট ছোট গানের দল গড়তে শুরু করে। এগুলির উদ্দেশ্য ছিল সমাজসংস্কার সংক্রান্ত ধ্যানধারণার প্রসার। এর একজন

চাঁই ছিলেন মারবাড়ী মাস্টার নামে এক চোধ্‌রী যিনি ১৯০৯ সালে গড়সাম্বা থেকে গুজরাটির ফাইন্যাল পরীক্ষায় পাশ করেছিলেন। তাঁর বাবা ছিলেন মাণ্ডবী তালুকের এক গ্রামের কৃষক, প্রায় চল্লিশ একর জমির মালিক। অর্থাৎ বলা যেতে পারে যে মারবাড়ী ছিলেন মোটামুটি সম্পন্ন এক চোধ্‌রী পরিবারের প্রতিনিধি। পরে স্কুলশিক্ষক হয়ে তিনি মাণ্ডবী তালুকের বিভিন্ন গ্রামে পড়িয়েছিলেন। তিনি এবং গড়সাম্বার আরও কয়েকজন প্রাক্তন ছাত্র মিলে একটি গানের দল গড়ে তোলেন। ছুটির দিনে গ্রামে গ্রামে গান গেয়ে এরা ঘুরে বেড়াত। এইসব গানে সাধারণত মিতাচার ও আত্মনির্ভরতার গুণকীর্তন করা হত, আর বলা হত বিদেশী মহাজন আর পারসিদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর কথা। এমন একটি গান ছিল:

ও ভাইসকল! দারু বা তাড়ি খেওনা হে।
ও ভাইসকল! মদ খেলে যে লুটে নেবে পারসি তোমার জমিজিরেত।
তার কাছে যাও যদি তবে বিষয়-আশয় বেহাত হবে হে।
ও ভাইসকল! দারুর নেশা ছেড়ে দাও।
দারুর পিছে ছোটো যদি বানিয়া আর ঘাঁচী [তেলি] মিলে
তাবৎ বিষয় আশয় তোমার লুটে নেবে হে।[১০]

গান শোনার জন্য লোকজন জমায়েত হলেই সংস্কারকরা এইসব বিষয়ের উপর চোধ্‌রী উপভাষায় বক্তৃতা দিতে শুরু করত।

এইভাবে বিশ শতকের প্রথম দুই দশকে আদিবাসী তরুণরা তাদের সম্প্রদায়ের মধ্যে সমাজসংস্কারকের ভূমিকা গ্রহণ করতে শুরু করে। বহুক্ষেত্রেই এরা আসত অপেক্ষাকৃত বিত্তশালী আদিবাসী পরিবারগুলি থেকে, যাদের সঙ্গতি ছিল দু-একটি ছেলেকে চাষবাসের কাজ থেকে রেহাই দিয়ে স্কুলে পাঠানোর। বাইরের শোষণকারীদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে পারে এমন এক ধরনের নেতৃত্ব এই পরিবারগুলি থেকেই উঠে এসেছিল। শিক্ষিত হওয়ার ফলে এইসব সমাজসংস্কারকেরা তাদের সম্প্রদায়ের মধ্যে যথেষ্ট সম্মান ভোগ করত, এবং তাদের কয়েকজনের উদ্যোগপ্রসূত কয়েকটি আন্দোলন দেবী আন্দোলনের পথ প্রস্তুত করেছিল। যেমন ১৯০৫ সালে সুরাট জেলার সহকারী কালেক্টর লেখেন:

এই বছরের গত দুমাস ধরে কালিপরজদের মধ্যে এক চমকপ্রদ ও ব্যাপক সুরাবর্জন আন্দোলন লক্ষ কবা গেছে। এর সূত্রপাত হয় যখন বরোদার এক স্কুলমাস্টার বলে যে এক দেবতার কাছ থেকে সে উত্তেজক সুরা পানের বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞা পেয়েছে। এ-খবর প্রথম পৌঁছয় বালসারে (Bulsar) এবং সেখানে প্রচুর সংখ্যক নিষেধাজ্ঞাপক ইস্তাহার বিলি করা হয়। কোনও কোনও অনাভিল (Anavil) প্যাটেলও সোৎসাহে এই আন্দোলনকে সমর্থন করে। শোনা যায় অনেক গ্রামে 'দেবতার' রহস্যময় চিঠিপত্রও পাওয়া গেছে। বিরাট বিরাট জমায়েতে সম্মিলিত হয়ে কালিপরজরা

সিদ্ধান্ত নেয় যে শেষবারের মতো এক বড়মাপের আমোদপ্রমোদের পর তারা মদ্যপান পুরোপুরি ছেড়ে দেবে। এখন পর্যন্ত তাদের এই শপথ তারা কঠোরভাবে পালন করে এসেছে। আবগারি রাজস্বহানির আশঙ্কায় ত্রস্ত সরকার প্রতিবেশী দেশীয় রাজ্যে এই মিতাচারীদের কড়া ধরনের হুমকি দিয়েছে। কিন্তু লোকজন জবাব দিয়েছে যে সরকারি আদেশের চেয়ে দেবতার আদেশ বড়, এবং মিতাচার তারা ছেড়ে দেয়নি। আমার মনে হয় এই আন্দোলন কোনওমতেই মদের চড়া দামের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ নয়, এবং এর ভেতর রয়েছে এক নৈতিক ও ধর্মীয় চরিত্র।[১০]

এর পরের বছর আন্দোলন ঝিমিয়ে আসার খবর আসে। অবশ্য এই সময় দেখা দেয় একই ধরনের আরও বেশ কয়েকটি আন্দোলন, যার দরুন ১৯২২ সাল নাগাদ এই অঞ্চলে গড়ে ওঠে আন্দোলনের এক ঐতিহ্য।

৩

এইভাবে প্রস্তুত হয়েছিল দেবীর আগমনের পথ। অবশ্য এই আন্দোলন দক্ষিণ গুজরাটের রানিমহলে শুরু হয়নি, হয়েছিল বোম্বাই শহরের ঠিক উত্তরদিকে, বেসিনের উপকূলবর্তী গ্রামগুলিতে। এই আন্দোলনের উৎপত্তি অনথিবদ্ধ এবং ধোঁয়াশাচ্ছন্ন। আমার সমস্ত তথ্যই তাই সংগ্রহ করতে হয়েছে এই অঞ্চলের বৃদ্ধ জেলেদের সাক্ষাৎকার থেকে।[১১] মনে হয় ১৯২২-এর গোড়ার দিকে 'মাঙ্গেলা কোলি' জেলেদের মধ্যে এক গুটিবসন্তের মড়ক দেখা দেয়। এরা বিশ্বাস করেছিল যে এই মড়কের জন্য দায়ী এক দেবী, অতএব তাঁকে সন্তুষ্ট করা দরকার। এই সময়কার বিভিন্ন অনুষ্ঠানে মাঙ্গেলা কোলি মেয়েদের উপর এই দেবীর ভর হয়। ভরগ্রস্তাদের মাধ্যমে দেবী মাঙ্গেলা কোলিদের জানান যে তিনি খুশি হবেন একমাত্র তখনই, যদি তারা কিছুদিনের জন্য মাছমাংস এবং মদ বা তাড়ি খাওয়া ছেড়ে দেয়। মাঙ্গেলা কোলিরা এই আদেশ মেনে চলে। যেসব মেয়েদের উপর এই দেবীর ভর হয়েছিল তাদের নাম দেওয়া হয় 'সলাহ বাই', অর্থাৎ এমন মেয়ে (বাই) যারা পরামর্শ (সলা) দেয়। দেবীর সন্তোষবিধানের এই আন্দোলন উপকূলরেখা ধরে দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে উত্তরদিকে, থানা, দমন এবং সুরাট জেলার অন্যান্য ধীবর-অধ্যুষিত গ্রামে। দমন, পার্দি এবং ভালসাদ তালুকের উপকূলবর্তী গ্রামগুলি থেকে আবার তা ছড়িয়ে যায় ধোড়িয়া আদিবাসী-অধ্যুষিত অন্তবর্তী গ্রামগুলিতে। ইত্যবসরে দেবী নিজেই 'সলাহ বাই' নামে পরিচিতি পান, এবং নারী-পুরুষ উভয়েই ভরগ্রস্ত হতে শুরু করে। অবশ্য এই পর্যায়ে এই মাহাত্ম্যের প্রচারের গতি তুলনামূলকভাবে ধীর হয়ে আসে, কারণ ভর হওয়ার অনুষ্ঠানগুলি তখন হত লোকজনের বাড়িতে, স্বল্প উপস্থিতির ভিতর। তখনও এর উপর সরকারি কর্তৃপক্ষের নজর পড়েনি। ভালসাদ এবং পার্দি থেকে এই আন্দোলন পূর্বে ধরমপুর রাজ্যে ছড়িয়ে পড়ে, এবং কোঙ্কনী উপজাতির মধ্যে স্থিতি লাভ করে। তারপর তা ছড়িয়ে পড়ে পশ্চিমঘাটের গা বেয়ে সুরগনা রাজ্য এবং নাসিক জেলায় এবং একই সময়ে উত্তর-পূর্ব দাং-এ। শেষোক্ত জায়গায় এই আন্দোলন পৌঁছয় ১৯২২ সালের অগস্ট মাস নাগাদ।[১২]

দাং অঞ্চলে এই আন্দোলনের এক গুরুত্বপূর্ণ রূপান্তর ঘটে। এতদিন পর্যন্ত আন্দোলনের সুর ছিল নিচু পর্দায় বাঁধা, এবং এর মধ্যে এমন কিছুই ছিল না যাকে স্থানীয় স্থিতাবস্থার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ গণ্য করা যেতে পারত। দাং অঞ্চলের গ্রামগুলি থেকে লোকেরা সংঘবদ্ধভাবে সভায় যোগ দিতে শুরু করে। ফলত বনবিভাগের কর্মচারীদের পক্ষে কাঠ-কাটা ও পরিবহণের জন্য শ্রমিক খুঁজে পাওয়া দুষ্কর হয়ে পড়ে। আন্দোলনের সংগঠন আরও উন্নত হয়েছিল, কারণ দাঙ্গি ওঝারা—যারা 'গৌলা' (Gaula) নামেও পরিচিত ছিল—আন্দোলনকে নিয়ে যেত এক গ্রাম থেকে অন্য গ্রামে। দাং-এর অনেক আদিবাসী মদ খাওয়া ছেড়ে দেওয়ায় স্থানীয় পারসিরা চটপট কর্তৃপক্ষের কাছে অভিযোগ করে যে তাদের বিক্রিবাটা এবং মুনাফা গুরুতরভাবে হ্রাস পেয়েছে। দাং অঞ্চল থেকে গৌলারা নিজেরাই এই আন্দোলনকে নিয়ে যায় উত্তর-পূর্বে খান্দেশে এবং উত্তর-পশ্চিমে সোনগড় তালুকে। দাঙ্গি গৌলারাই এই অঞ্চলগুলিতে প্রথম দেবীর সমাবেশ সংগঠিত করতে শুরু করে।[২৭] কিন্তু কিছুদূর যাওয়ার পর আন্দোলনকে নিজের থেকে ছড়ানোর সুযোগ দিয়ে তারা সঙ্গে আসে। খান্দেশে যেসব অঞ্চলে গৌলারা গিয়েছিল তার বাইরে আন্দোলন বিস্তৃত হয়নি, কিন্তু দক্ষিণ গুজরাটের রানিমহলে এ আন্দোলন পশ্চিমমুখীভাবে আরব সাগর পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ার মতো যথেষ্ট শক্তি সঞ্চয় করেছিল।

আন্দোলনকে এক গ্রাম থেকে অন্য গ্রামে প্রসারিত করেছিল সেইসব লোকেরা যারা হয় দেবীর দ্বারা ইতিমধ্যেই আবিষ্ট হয়েছিল নয়তো দেবীকে নিয়ে যেতে চেয়েছিল নিজেদের এলাকায়। দেবী যে আসছেন তা স্থানীয় আদিবাসীরা ইতিমধ্যেই আঁচ করেছিল, কারণ এ ধরনের জনশ্রুতি কিছুকাল ধরেই ছড়াচ্ছিল। যখন কোনও সভা আহ্বান করা হত—সাধারণত কোনও গ্রামের নেতৃস্থানীয়দের দ্বারা—তখন আশপাশের পল্লীগুলি থেকে অনেকসংখ্যক মানুষ সেখানে জড়ো হত। একবার জমায়েত হলে যে কোনও পুরুষ বা স্ত্রীলোকই ভরগ্রস্ত হতে এবং দেবীর আদেশ উচ্চারণ করতে পারত। যাদের ভর হত তাদের অনেকেই ছিল সাধারণ চাষী। তাদের ভর হবার কোনও ব্যক্তিগত ইতিহাস ছিল না এবং পরে আর কখনওই তারা এইভাবে ভরগ্রস্ত হয়নি। সভাগুলি সাধারণত চলত বেশ কয়েকদিন ধরে, এবং অংশগ্রহণকারীরা হয় সভাস্থলেই থাকত অথবা প্রত্যেকদিন সকালে সমবেত হত। খাবার প্রলোভন এড়ানোর জন্য তারা তাদের মুরগি ও ছাগলগুলিকে ছেড়ে অথবা বিক্রি করে দিয়েছিল। এছাড়াও তারা প্রতিদিন স্নান করতে শুরু করে এবং যাতে এক ফোঁটাও দারু বা তাড়ি না ছুঁতে হয়, সেজন্য সতর্ক হয়। গোপনে 'অপবিত্র' অভ্যাসগুলি চালিয়ে যেতে গিয়ে অসংস্কৃত ব্যক্তিরা অলৌকিকভাবে দেবীর মাধ্যমদের দ্বারা উদ্ঘাটিত হয়েছে এবং সর্বসমক্ষে তাদের অপরাধ স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছে, এরকম অসংখ্য ঘটনার কথা শোনা গিয়েছিল। সভাগুলির সমাপ্তি সূচনা করেছিল এক গণভোজ এবং দেবীবন্দনার এক চূড়ান্ত অনুষ্ঠান।

এটি ছিল একটি রীতিমতো গণতান্ত্রিক আন্দোলন, যাতে যে কোনও আদিবাসী ভর-হওয়ার ফলে কিছু সময়ের জন্য একজন উচ্চকর্তৃত্বসম্পন্ন ও সম্মানীয় নেতা হয়ে উঠতে পারত। সুতরাং কাঠামোর দিক থেকে দেবী আন্দোলন ঠিক 'মেসায়ানিক'

আন্দোলন ছিল না।[৩৫] ঈশ্বরের দ্বারা আবিষ্ট হওয়াই ছিল এই পর্যায়ে আন্দোলনের কেন্দ্রীয় বৈশিষ্ট্য। সারা দুনিয়ার দরিদ্র ও নিম্নবর্গের মানুষেরা তাদের সমষ্টিগত ক্ষোভ ও আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করার জন্য প্রায়শই এই উপায়টিকেই বেছে নিয়েছে। আই. এম. লিউইস তাঁর দৈবাবেশ-সংক্রান্ত ধর্মাচরণ সম্পর্কে সমীক্ষায় দেখিয়েছেন যে যেসব উপজাতিরা গত শতাব্দীতে কঠিনতম ক্লেশের অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছিল তাদের মধ্যেই প্রেতাবেশের বহিঃপ্রকাশের প্রবণতা সবচেয়ে বেশি।[৩৬] এভাবেই তারা তাদের উৎপীড়কদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের শক্তি খুঁজে পায়। ভারত প্রসঙ্গে লিখতে গিয়ে রিচার্ড ল্যানয় বলেছেন যে 'দৈবাবেশ কেবল বিশৃঙ্খল একটি মূর্ছারোগমাত্র নয়, বরং কাঠামোবদ্ধ, এবং কিছু কিছু ক্ষেত্রে অত্যন্ত রীতিবদ্ধ একটি ঘটনা যা সংস্কৃতি-সৃষ্টিকারী হতে পারে এবং ব্যক্তির ও দলের চেতনাকে সমৃদ্ধ করতে পারে।'[৩৭] ১৯২২-২৩-এর সলাহ্ বাই-সংক্রান্ত ঘটনাসমষ্টিকে এই শর্তের নিরিখেই বোঝা প্রয়োজন। দক্ষিণ গুজরাটের আদিবাসী সাধারণের আকাঙ্ক্ষা ও তাদের চেতনার গভীরে প্রোথিত অন্যায়ের ধারণাকে ব্যক্ত করতে সাহায্য করেছিল দৈবাদেশের তরঙ্গ।

৪

প্রেতমাধ্যমের সাহায্যে উচ্চারিত দেবীর প্রত্যাদেশগুলি এক জমায়েত থেকে আর এক জমায়েতে রীতিমতো ভিন্নরকমের চেহারা নিত—একটি বিক্ষিপ্ত সংগঠনহীন আন্দোলনের ক্ষেত্রে যা প্রত্যাশিত। স্থানীয় পরিবেশ স্পষ্টতই এই প্রত্যাদেশগুলির কয়েকটিকে নির্দিষ্ট করেছিল। উদাহরণ হিসেবে, ভিয়ারা তালুকে দেবী আদিবাসীদের আদেশ দেন খ্রিস্টান না হবার জন্য।[৩৮] ভিয়ারা ছিল মিশনারি কার্যকলাপের একটি কেন্দ্র। যাই হোক, এই সমস্ত রকমফেরের মধ্যেও আদেশগুলির একটি সারাৎসার শনাক্ত করা, এবং সেটিকে নীচের শীর্ষকগুলির মাধ্যমে শ্রেণীবিভক্ত করা সম্ভব:

১. মাদক
(ক) সুরা বা তাড়ি খেয়ো না।
(খ) সুরা বা তাড়ির দোকানে কাজ কোরো না।
(গ) তাড়ি গাছ থেকে তাড়ি নিষ্কাশন কোরো না।

২. মাংস
(ক) মাংস বা মাছ খেয়ো না।
(খ) (খাওয়া বা বলির জন্য রেখে দেওয়া) সমস্ত জ্যান্ত মুরগি, ছাগল ও ভেড়া বিক্রি করে দাও।
(গ) মাংস রান্নার সমস্ত পাত্রগুলি নষ্ট করে ফেল।
(ঘ) বাড়ির চালগুলি (আদিবাসী গ্রামে সাধারণত খড়ে-ছাওয়া) সরিয়ে ফেল এবং পুড়িয়ে দাও, কারণ মাংস রান্নার জন্য ব্যবহৃত আগুনের ধোঁয়া এই চালগুলির মধ্যে দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে।

৩. পরিচ্ছন্নতা
(ক) প্রত্যেকদিন স্নান করো (কোনও কোনও ক্ষেত্রে দিনে দুবার বা তিনবার)।
(খ) মলত্যাগের পর শৌচকর্মের জন্য জল ব্যবহার করো।

(গ) বাড়ি ও উঠোনগুলি ঠিকঠাক পরিষ্কার রাখো।

৪. প্রতিপত্তিশালী শ্রেণী (ক) পারসিদের বয়কট করো।

(খ) মুসলমানদের বয়কট করো।

(গ) সুরাব্যবসার সঙ্গে জড়িত, এমন কারও জন্য কাজ কোরো না।

(ঘ) বেতনবৃদ্ধি দাবি করো।

(ঙ) কোনও পারসির ছায়া মাড়ালে স্নান করো।

এই আদেশগুলি আদিবাসীদের জীবনচর্চায় এক সার্বিক পরিবর্তন দাবি করেছিল। দারু ও তাড়ি খাওয়া ছিল এদের সংস্কৃতিরই এক সম্যক অঙ্গ। এই পানীয়গুলি মূল্যবান খাদ্যবস্তু হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ তো ছিলই—বিশেষত গ্রীষ্মকালে, যখন খাদ্যের ভাণ্ডারে টান পড়ত। উপরন্তু বিভিন্ন ধর্মীয় ও সামাজিক অনুষ্ঠানেও এগুলি ব্যবহৃত হত এবং অনেক ধর্মীয় উৎসবে তথা বিবাহে এবং অন্ত্যেষ্টিক্রিয়াতেও অবাধে পান করা হত।[৩৯] একই ভাবে আদিবাসী ক্রিয়াবিধির একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ ছিল বলি। বলির মাংস পরে খাওয়া হত। প্রাত্যহিক স্নানের প্রথা সেই সময়ে সাধারণভাবে প্রচলিত ছিল না, কেননা আদিবাসী গ্রামগুলিতে জল সরবরাহের ব্যবস্থা প্রায়শই শুধুমাত্র জলপানের উদ্দেশ্যেও যথেষ্ট ছিল না। অতএব, অনুগামীদের জীবনযাত্রাকে সহজতর করে তোলাই দেবীর যাবতীয় আদেশের উদ্দেশ্য ছিল না। এগুলির অন্তর্নিহিত যুক্তিগুলিকে আমাদের আরও ভাল করে পরীক্ষা করা দরকার।

সেই সময় বেশ কিছু পর্যবেক্ষক একে দেখেছিলেন আদিবাসীদের 'বিশুদ্ধীকরণ' আন্দোলন হিসেবে। যেমন, গান্ধীবাদী নেতা সুমন্ত মেহতা একে আদিবাসীদের 'আত্মশুদ্ধি' হিসেবে বর্ণনা করেন।[৪০] দেখা যাচ্ছে যে এই উপলব্ধিকে অবলম্বন করেই গড়ে উঠেছে 'সংস্কৃতায়ন' প্রক্রিয়াটি, যাকে এম. এন. শ্রীনিবাস বর্ণনা করেছেন এইভাবে:

> সংস্কৃতায়ন হল সেই প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে একটি 'নিচু' হিন্দু জাতি বা উপজাতি বা অন্য কোনও গোষ্ঠী তার লোকাচার, ক্রিয়াবিধি, মতাদর্শ ও জীবনচর্যাকে একটি উঁচু, এবং প্রায়শই 'দ্বিজ' জাতির আদলে পরিবর্তিত করে। বর্ণভিত্তিক স্তরকাঠামোয় ওই জাতির যে স্থান স্থানীয় সমাজের দ্বারা সনাতনভাবে স্বীকৃত। তার থেকে উচ্চতর স্থানের দাবি সাধারণত এই ধরনের পরিবর্তনের পরেই আসে। এই দাবির স্বীকৃতি পেতে লেগে যায় বেশ কিছু সময়, বলতে কি, দু-এক পুরুষও।[৪১]

এই প্রত্যয়টির নিরিখে ভারতীয় সমাজের গতিসূত্রগুলিকে সাপলুডো খেলার মতোই মন্থরতায় আক্রান্ত বলে দেখানো হয়েছে। এই খেলায় যোগদান করার সময় খেলুড়েরা থাকে অশুদ্ধ, এবং পুরুষানুক্রমে তারা ধীরে ধীরে ব্রাহ্মণ্য শুদ্ধতার পথে এগিয়ে যায়। এই অগ্রগতির পথে থাকে নানা খানাখন্দ, এবং বেশিরভাগ সম্প্রদায়ের পক্ষেই অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছানো সম্ভবই হয় না। এই অভীষ্ট লক্ষ্য অবশ্য অবিসংবাদিত : 'সংস্কৃতায়নের ব্রাহ্মণ্য, এবং মোটের উপর শুদ্ধাচারনিষ্ঠ পথটিই এযাবৎ সার্বিক প্রাধান্য পেয়ে এসেছে। এমনকি মাংসাশী এবং মদ্যপায়ী ক্ষত্রিয় তথা অন্যান্য গোষ্ঠীগুলিও অন্যান্য পথের

তুলনায় এই পথটির শ্রেষ্ঠত্বকেই পরোক্ষভাবে মেনে নিয়েছে।'[৩২]

শ্রীনিবাস আরও বলেন, 'সংস্কৃতায়ন শুধুমাত্র হিন্দু বর্ণগুলির মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। পশ্চিম ভারতের ভিল, মধ্যভারতের গোন্দ এবং ওরাওঁ এবং হিমালয়ের পাহাড়িদের মতো উপজাতি এবং আধা-উপজাতি গোষ্ঠীগুলির মধ্যেও এই প্রক্রিয়াটি লক্ষ করা যায়। এর ফলে সাধারণত যে উপজাতি সংস্কৃতায়নের সাহায্য নিচ্ছে তারা নিজেদের হিন্দু বর্ণপ্রথার অন্তর্ভুক্ত বলে দাবি করে।'[৩৩] বলা যেতে পারে যে দেবী আন্দোলনের ক্ষেত্রে সুরাবর্জন, নিরামিষাহার এবং পরিচ্ছন্নতার মতো নব্য শুদ্ধাচারগুলি পালনের মাধ্যমে দক্ষিণ গুজরাটের আদিবাসীরা শুদ্ধ বর্ণ হিসেবে হিন্দু বর্ণভিত্তিক সমাজকাঠামোর ভিতর অন্তর্ভুক্তির দাবি জানাচ্ছিল। অতএব এই আন্দোলনকে আদিবাসী সমাজে সংস্কৃতায়ন প্রক্রিয়ার একটি নাটকীয় উদাহরণ হিসেবে ধরা যেতে পারে।

অবশ্য এই প্রত্যয়টির ব্যবহারে কিছু অসুবিধা রয়েছে। শ্রীনিবাসের উপরোক্ত উক্তিটি ওরাওঁদের সম্বন্ধে। ওরাওঁ সমাজে সংস্কার আন্দোলন সম্পর্কে এস. সি. রায়ের উৎকৃষ্ট গ্রন্থটি পড়লে বোঝা যায় যে রায় নিজে এই ধরনের ব্যাখ্যাকে গ্রহণ করেননি। তিনি লেখেন যে আর্য সমাজ প্রভৃতি হিন্দু সংস্কারক গোষ্ঠীগুলি 'শুদ্ধি' প্রভৃতি অনুষ্ঠানের মাধ্যমে ওরাওঁদের হিন্দু সমাজের আওতার মধ্যে নিয়ে আসতে চেষ্টা করে, কিন্তু ব্যর্থ হয়। কারণ রায়ের মতে, 'আলোকপ্রাপ্ত ওরাওঁ নেতারা স্বভাবতই এই ধরনের প্রচারকদের এড়িয়ে চলত। কারণ তাদের ভয় ছিল (এবং এই ভয় আদৌ অমূলক ছিল না) যে দ্বিজ বর্ণগুলির ধর্মীয়-সামাজিক বিশেষ মর্যাদা নিয়ে গড়ে-ওঠা শাস্ত্রানুগ এবং প্রাতিষ্ঠানিক হিন্দুধর্ম বর্ণান্তরিত আদিবাসীদের স্থান দেবে হিন্দু বর্ণস্তর কাঠামোর একেবারে নীচে না হলেও বেশ নীচের দিকে।'[৩৪] অন্যান্য তথ্যসূত্র থেকেও অনুমান করা যায় যে মোটের উপর আদিবাসীরা বর্ণস্তরকাঠামোয় কোনও স্থান দাবি করেনি। অবশ্য একথা সত্যি যে ক্ষেত্রবিশেষে তারা নিজেদের ক্ষত্রিয় বলে দাবি করেছে।[৩৫] এই ব্যাপারটি তাৎপর্যপূর্ণ কারণ ক্ষত্রিয়রা মাংসাহার এবং সুরাপানের মতো 'অপবিত্র' ক্রিয়াকর্মের শরিক হয়েও উচ্চ সামাজিক মর্যাদা ভোগ করে থাকে। অন্যভাবে বলতে গেলে, ক্ষত্রিয়োচিত প্রতিষ্ঠার দাবিদার আদিবাসীরা চায় যে 'অপবিত্র' আচারবিধিতে অভ্যস্ত হওয়া সত্ত্বেও তাদের সামাজিক মর্যাদা বাড়ানো হোক। কিন্তু সম্প্রতিকালে এই ধরনের উদাহরণগুলি ব্যতিক্রমী হয়ে দাঁড়িয়েছে।[৩৬] দেবী আন্দোলনের মতো বিশুদ্ধিকরণ আন্দোলনগুলির কার্যপ্রণালীতে এসেছে পরিবর্তন। এই ধরনের আন্দোলনে আদিবাসীরা কিছু কিছু হিন্দু মূল্যবোধ গ্রহণ করেছে, কিন্তু একই সঙ্গে বর্ণপ্রথায় অন্তর্ভুক্তির দাবি থেকে বিরত থেকেছে। সুতরাং এই উদাহরণগুলি থেকে আদিবাসীরা যে বর্ণপ্রথাকে মেনে নিয়েছে, এমন মনে করে নেওয়াটা অযৌক্তিক হবে। বরং বলা যেতে পারে উচ্চবর্ণোচিত জীবনচর্যা গ্রহণের মাধ্যমে আদিবাসীরা উচ্চবর্ণের হিন্দুর সমমর্যাদার দাবিদার হয়ে দাঁড়িয়েছে।

সংস্কৃতায়ন তত্ত্বের আর একটি অসুবিধা হল এই যে, এই তত্ত্বে যথোচিত গুরুত্ব আরোপ করা হয়নি সেই সংঘাতময় প্রক্রিয়ার উপর, যার মাধ্যমে এইসব দাবিদাওয়াকে সাফল্যের পথে নিয়ে যেতে হয়। শ্রীনিবাসের তত্ত্ব আলোচনা প্রসঙ্গে লুই দুমঁ

দেখিয়েছেন, যেসব নিম্নবর্গের বর্ণ বা উপজাতি তাদের জীবনচর্যায় সংস্কার নিয়ে আসে তাদের পক্ষেও এই পদ্ধতির মাধ্যমে নিজেদের সামাজিক সংস্থানকে উন্নত করা খুবই কঠিন। রাজনৈতিক কার্যকলাপের মাধ্যমে উচ্চবর্ণগুলির কাছ থেকে বলপূর্বক এই সংস্থান আদায় করে নিতে হয়। এইভাবে কোনও সম্প্রদায়ের রাজনৈতিক ক্ষমতা এবং বর্ণকাঠামোয় তাদের অবস্থান পরস্পর সম্পর্কিত হয়ে পড়ে।" ফলত আদিবাসীদের পক্ষে উচ্চতর মর্যাদা বা সামাজিক সমস্থিতি দাবি করা বৃথা, যদি না একইসঙ্গে ক্ষমতাশালী সম্প্রদায়গুলির প্রতিপত্তির বিরুদ্ধে তারা একটা রাজনৈতিক চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিতে পারে। দেবীর আদেশগুলিকে বিশ্লেষণ করলে ঠিক এই জিনিসটিই চোখে পড়ে· এইজন্যই আদিবাসীরা উচ্চবর্ণোচিত মূল্যবোধ গ্রহণের কার্যসূচির সঙ্গে মিশিয়ে দেয় প্রতিপত্তিশালী পারসি ভূস্বামী ও সুরাব্যবসায়ীদের বিরুদ্ধে এক বয়কট আন্দোলন। প্রচলিত সমাজকাঠামোর উপর যে আক্রমণ এই ধরনের আন্দোলনের একটি অবশ্য প্রয়োজনীয় অঙ্গ, সংস্কৃতায়ণ তত্ত্বে তাকে এড়িয়ে গিয়ে শুধুমাত্র 'বিশুদ্ধীকরণের' দিকটির উপরেই গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে।

এছাড়াও, কোনও বিশ্বাসযোগ্য ঐতিহাসিক মাত্রা এই তত্ত্বে অনুপস্থিত। এতে মনে করা হয়েছে যে অনন্তকাল সবাই শুধুমাত্র ব্রাহ্মণ্য শুদ্ধতার লক্ষমাত্রায় পৌঁছানোর জন্যই চেষ্টা করে যাবে। শ্রীনিবাসের কথায়, '...সংস্কৃতায়নের সঙ্গে সম্পর্কিত যে সচলতা, তা প্রচলিত সমাজে শুধুমাত্র অবস্থিতিগত পরিবর্তন নিয়ে আসে, অবয়বগত পরিবর্তন নয়। অর্থাৎ একটি বর্ণ তার প্রতিবেশী বর্ণদের উপরে উঠে যায়, এবং আর একটি নেমে আসে; কিন্তু এই সমস্ত কিছুই ঘটতে থাকে একটি মূলত দৃঢ়বদ্ধ স্তরবিভাজিত সমাজকাঠামোর মধ্যে। এই সার্বিক প্রথার কোনও পরিবর্তন হয় না।'[৭৮] আমাদের পূর্বব্যবহৃত রূপকের নিরিখে বলা যায় যে সাপলুডো খেলা চলতে থাকে, কিন্তু এই খেলার ছক কখনওই পালটায় না। অথবা বিকল্প ঐতিহাসিক এবং দ্বান্দ্বিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে বলা যায় যে যে-কোনও সমাজব্যবস্থাই তার পূর্ববর্তী সমাজব্যবস্থাগুলি থেকে উদ্ভূত এক সংশ্লেষ। আদিবাসী ও হিন্দুসমাজের বহু বছরব্যাপী মিথস্ক্রিয়ার থেকে জন্ম নেয় এমন এক নতুন সংশ্লেষ যা পুরোপুরি উপজাতীয় বা বিশুদ্ধ ব্রাহ্মণ্য, কোনওটিই নয়। দেবী আন্দোলনের মতো আন্দোলনগুলি তাদের বিশিষ্টতা লাভ করে এমন এক বিশেষ ঐতিহাসিক সময়ের প্রেক্ষিতে, যখন উপজাতীয় এবং অনুপজাতীয় উপাদানগুলির তীব্র বৈপরীত্য সংশ্লেষের প্রয়োজনকে জোরালো করে তোলে।

তথ্যাদি থেকে জানা যায় যে এই ধরনের আদিবাসী আন্দোলনগুলি ব্যাপক মাত্রায় শুরু হয় উনিশ শতকের শেষের দিকে। আজ পর্যন্ত এগুলি চলে আসছে। অতীতে আদিবাসীরা ভারতীয় জনজীবনের মূলস্রোতটি থেকে নিজেদের অনেকখানিই বিচ্ছিন্ন করে রাখতে পেরেছিল। অনুপজাতীয় উচ্চবর্গের মূল্যবোধগুলি তারা আত্তীকৃত করবে এমন আশা করা হত না, এবং সেরকম করার কোনও পার্থিব তাগিদও তাদের ছিল না। আত্তীকরণ কখনও-সখনও ঘটলেও তা হত অতিমাত্রায় আংশিক, অথবা তা প্রভাবিত করত আদিবাসীদের একটি ক্ষুদ্রাকার উচ্চবর্গকে, যারা 'রাজপুত' ইত্যাদি প্রতিপত্তিসূচক উপাধি গ্রহণ করে স্বীয় সম্প্রদায় থেকে নিজেদের দূরে সরিয়ে রাখত। এই অবস্থার

পরিবর্তন আসে উনিশ শতকের মাঝামাঝি নাগাদ, যখন ব্রিটিশরা আদিবাসী-অধ্যুষিত অঞ্চলগুলিকে সম্পূর্ণভাবে বিজয় ও বশীভূত করতে সমর্থ হয়। এর সঙ্গে সঙ্গে সম্পত্তির অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়, ঔপনিবেশিক আইন বলবৎ হয়, এবং আদিবাসী অঞ্চলগুলি অর্থনৈতিক শোষণের সম্মুখীন হয়। এইভাবে আধুনিক ভারতীয় রাষ্ট্রের আবির্ভাব-প্রক্রিয়াই গড়ে দেয় এই আন্দোলনগুলির ঐতিহাসিক প্রেক্ষিত। এর থেকে আবির্ভূত আদিবাসী সংস্কারপ্রবক্তারা একটি কৃষ্টিগত সংশ্লেষ গড়ে তোলার জন্য বদ্ধপরিকর ছিলেন। তাঁরা বিশ্বাস করতেন যে এই সংশ্লেষ নতুন সমাজে তাঁদের সম্প্রদায়কে একটি সম্মানজনক স্থান এনে দেবে।

রাজনৈতিক ক্ষমতার অধিকারী শ্রেণীগুলির মূল্যবোধই আদিবাসীদের অনুমোদন লাভ করেছিল। তাদের কর্মপদ্ধতির মাধ্যমে আদিবাসীরা মূল্যবোধ ও ক্ষমতার সম্বন্ধ সম্পর্কে তাদের সচেতনতা প্রকাশ করেছিল। কেননা, মূল্যবোধের মধ্যেই নিহিত রয়েছে ক্ষমতার সেই উপাদান যার মাধ্যমে প্রতিপত্তিশালী শ্রেণীগুলি ন্যূনতম বলপ্রয়োগের সাহায্যে অধীনস্থ শ্রেণীগুলিকে বশীভূত করে। এর সুস্পষ্ট উদাহরণ, যেমন, 'শুদ্ধতা'-র ব্রাহ্মণ্য ধারণাটি ভারতের তথাকথিত 'অপবিত্র' অধীনস্থ শ্রেণীগুলির উপর একটি অত্যন্ত প্রভাবশালী নিয়ন্ত্রক শক্তি হিসেবে কাজ করেছে। আত্মসাৎকরণের মাধ্যমে এ-ধরনের মূল্যবোধগুলির উপর একটি গণতান্ত্রিক চরিত্র আরোপ করে আদিবাসীরা এদের নিরঙ্কুশ আধিপত্যশক্তি হরণ করতে চেষ্টা করেছিল।

অতএব ক্ষমতাকেন্দ্রিক সম্পর্কই আমাদের আলোচ্য বিষয়। বিভিন্ন মূল্যমান-ব্যবস্থা নয়। এই মোদ্দা কথাটি বুঝতে পারলেই নানা ক্ষেত্রে আদিবাসীদের গৃহীত বিভিন্ন কার্যসূচির কেন্দ্রীয় যুক্তিটিকে বোঝা সহজতর হয়ে ওঠে। দেশীয় জনসাধারণের মধ্যে স্থানীয় প্রতিপত্তিশালী শ্রেণীগুলির মূল্যবোধ অনেক ক্ষেত্রে আদিবাসীরা গ্রহণ করেছে। অন্যদিকে উত্তর-পূর্ব ভারতে আদিবাসীরা ব্যাপকভাবে খ্রিস্টধর্মে দীক্ষিত হয়েছে, কারণ তারা খ্রিস্টীয় মিশনারিদের মূল্যবোধকে ব্রিটিশদের ক্ষমতার সঙ্গে একাত্ম করে দেখেছিল। দক্ষিণ গুজরাটে তারা তাদের প্রত্যক্ষ শোষক পারসিদের মূল্যবোধগুলিকে বর্জন করেছিল কিন্তু ব্রাহ্মণ্য ও বানিয়াদের প্রতিপত্তিশালী আঞ্চলিক সংস্কৃতির অনুমোদন করে। যে মূল্যবোধগুলিকে আত্মসাৎ করা হত সেগুলি হয় ছিল ঔপনিবেশিক শাসকশ্রেণীর মূল্যবোধ, নতুবা কোনও আঞ্চলিক প্রতিপত্তিশালী দেশীয় শ্রেণীর, নয়তো আদিবাসীদের স্থানীয় শোষকদের। অনুমোদিত মূল্যবোধগুলির মধ্যে পার্থক্য ছিল বিস্তর, কিন্তু ক্ষমতাচর্চার অনুষঙ্গ ছিল তাদের সাধারণ ধর্ম।

আধিপত্যশালী মূল্যবোধ আত্তীকরণের এই কার্যসূচিগুলির একটি প্রধান শক্তি ছিল এই যে এগুলি আদিবাসী সম্প্রদায় এবং প্রতিপত্তিশালী শ্রেণীগুলির কিছু কিছু প্রগতিশীল সদস্যের মধ্যে এক ধরনের সংযোজক শক্তি হিসেবে কাজ করেছিল। এখানেই ছিল এদের সঙ্গে উচ্চশ্রেণীর মূল্যবোধ সরাসরি বর্জন করার কার্যসূচিগুলির মূল তফাৎ। উচ্চশ্রেণীর প্রগতিশীলদের মধ্যে কেউ কেউ উন্নত ধরনের উদারপন্থী মতামত পোষণ করতেন, অর্থাৎ জাতীয় সংহতি এবং একটি গণতান্ত্রিক ভারতীয় জাতিভিত্তিক রাষ্ট্র গড়ে তোলায় বিশ্বাস করতেন। এছাড়া ছিলেন সেইসব রাজনীতিকরা যাঁরা আদিবাসীদের

দেখতেন ক্ষমতার একটি সম্ভাব্য উৎস হিসেবে। উপজাতীয় জনসাধারণের দাবিদাওয়ার যৌক্তিকতা ও ন্যায্যতা সম্পর্কে ঔপনিবেশিক শাসকগোষ্ঠী এবং তাঁদের স্বীয় শ্রেণীর অন্যান্য সদস্যের বিশ্বাস উৎপাদনের ব্যাপারে এই মানুষগুলি একটি গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকা পালন করতে পারতেন। সুতরাং এই ধরনের আদিবাসী আন্দোলনগুলি উচ্চবর্গের অন্তর্বিভেদের সুযোগ নিয়েছিল।

এইবার যদি আমরা দেবীর প্রত্যাদেশগুলির দিকে ফিরে তাকাই তাহলে দেখব যে সেগুলি দুটি দিক থেকে আন্দোলনের শক্তিবৃদ্ধি করেছিল। একদিকে সেগুলি আঞ্চলিক প্রতিপত্তিশালী উচ্চবর্ণের হিন্দু মূল্যবোধগুলিকে আত্মসাৎ করতে চেয়েছিল। এই গণতন্ত্রীকরণ-প্রচেষ্টার মধ্যে অন্তর্নিহিত ছিল পরিবর্তনের আকাঙ্ক্ষা। এই প্রসঙ্গে যে ব্যাপারটি তাৎপর্যপূর্ণ তা হল, যদিও বানিয়া ও ব্রাহ্মণ বণিক এবং কুসীদজীবীরা আদিবাসীদের শোষণ করত, তৎসত্ত্বেও দেবীর প্রত্যাদেশগুলিতে কখনওই তাদের বয়কট করার কথা বলা হয়নি। এই বয়কট আরোপ করা হয়েছিল শুধুমাত্র পারসি এবং কয়েকটি ক্ষেত্রে মুসলমানদের উপর। এর যুক্তি ছিল এইরকম যে, যেখানে বানিয়া ও ব্রাহ্মণদের 'পবিত্র' জীবনাচরণ আদিবাসীদের মধ্যে আত্তীকরণের তাগিদ জাগিয়ে তুলেছিল, সেখানে পারসি এবং মুসলমানেরা ছিল 'অপবিত্র'। অন্যদিকে স্থানীয় শোষণকারীদের মধ্যে সবচেয়ে লোভী বলে পরিচিত পারসিদের বিরুদ্ধে দেবীর প্রত্যাদেশগুলি ছিল এক আত্মঘোষণা। সুরাপান থেকে বিরত হয়ে এবং সুরাব্যবসার সঙ্গে জড়িত যাবতীয় ব্যক্তির হয়ে কাজ করতে অস্বীকার করে আদিবাসীরা পারসিদের সঙ্গে তাদের অর্থনৈতিক বন্ধনসূত্রগুলি ছিন্ন করেছিল। এদিক থেকে সুরাপান ছেড়ে দেওয়া ছিল বেআইনি মদ-চোলাই প্রভৃতি ছলনামূলক কার্যকলাপের থেকে অনেক বেশি কার্যকর আত্মঘোষণা, কারণ এই বর্জনের পিছনে কাজ করেছিল এক বিরাট নৈতিক শক্তি।

সুতরাং এই বিশেষ অঞ্চলটিতে দেবীর প্রত্যাদেশগুলিকে নিয়েই গড়ে উঠেছিল আদিবাসী আত্মঘোষণার এক শক্তিশালী কার্যসূচি। রানিমহলে যারা স্থিতাবস্থা বজায় রাখতে চেয়েছিল তাদের সবাইকেই এই আন্দোলন বেশ ধাক্কা দেয়। বিশেষত পারসি সুরাব্যবসায়ী তথা ভূস্বামীদের প্রতি এটি ছুঁড়ে দেয় এক চ্যালেঞ্জ। আন্দোলন সম্পর্কে আদিবাসী সমাজ-বহির্ভূত অংশের প্রতিক্রিয়ার ব্যাপারটি এবার খতিয়ে দেখা যাক।

৫

ভূতাবেশ-সংক্রান্ত ধর্মীয় আচারবিধি অধিকাংশ ক্ষেত্রেই স্থিতাবস্থার বিরুদ্ধে কোনও বড় ধরনের আঘাতকে সূচিত করে না। আই. এম. লিউইস দেখিয়েছেন যে প্রতিপত্তিশালী শ্রেণীরা প্রায়শই এগুলিকে, অস্বস্তির সঙ্গে হলেও, মেনে নেয়। ভুতাবেশকে মনে করা হয় এমন এক চাপ-নিষ্কাশক যন্ত্র যা ন্যূনতম সামাজিক সম্ভোগের বিনিময়ে নিম্নবর্গের প্রচ্ছন্ন নাশকতামূলক অনুভূতিগুলিকে প্রশমিত করতে পারে।[১১] যাই হোক, প্রতিরোধের সম্পূর্ণ আচারভিত্তিক এবং অপেক্ষাকৃত স্পষ্টতর ধারাদুটির মধ্যে বিভাজক রেখাটি কিন্তু সহজেই অতিক্রম্য। এইজন্যই প্রতিপত্তিশালী শ্রেণীগুলি এ-ধরনের ধর্মাচরণবিধির উপর সতর্ক দৃষ্টি রাখে, যাতে কোনওরকম বাড়াবাড়ি ঘটলেই

তারা দ্রুত ব্যবস্থা নিতে পারে। দেবী আন্দোলনের ক্ষেত্রে প্রতিপত্তিশালী শ্রেণীগুলির টনক নড়েছিল তখনই যখন আদিবাসীরা দলে দলে জমায়েত হতে শুরু করে, কেননা এ ধরনের বিশাল জনসভার মধ্যেই নিহিত ছিল সক্রিয়তর প্রতিরোধ ও নাশকতামূলক কার্যকলাপের বীজ।

দেবী আন্দোলন যে এক দুর্ঘটনা তা পারসিরা তাড়াতাড়িই বুঝতে পেরেছিল। তাদের সুরাব্যবসা কমতে কমতে শূন্যে এসে দাঁড়ায়, আদিবাসীরা তাদের তাল গাছগুলি থেকে তাড়ি নিষ্কাশন করতে প্রত্যাখ্যান করে, প্রত্যেকেই তাদের জমিতে কাজ করতে অথবা বাড়ির চাকর হতে অস্বীকার করে, এবং তারা সামাজিক বয়কটের সম্মুখীন হয়। আরও অপমান করার উদ্দেশ্যে পারসিদের ছায়া মাড়ালেই আদিবাসীরা নিজেদের 'পবিত্র' করার জন্য স্নান করতে শুরু করে; কেউ কেউ এমনকি পারসিদের পারস্যে ফিরে যাওয়ার জন্যও উপদেশ দেয়। আন্দোলন সম্পর্কে পারসিদের প্রতিক্রিয়ার ধরন থেকেই বোঝা যায় যে তাদের সামাজিক অবস্থানের উপর এই আঘাতকে তারা কত গুরুতরভাবে দেখেছিল। কখনও কখনও আবগারি বিভাগের কর্মচারিদের সহায়তায় পারসিদের গুণ্ডাবাহিনী একজন আদিবাসীকে পাকড়াও করে জবরদস্তি মদ গিলিয়ে দিত। এইভাবে ওই আদিবাসীটির ব্রত ভঙ্গ করে তাকে আবার শাস্ত্রমতে অপবিত্র বানিয়ে দেওয়া হত। প্রতিরোধকারীদের মারধর করা হত, এমনকি সাজানো অভিযোগে গ্রেফতারও করা হত।[৫০] কোনও কোনও ক্ষেত্রে উপজাতীয়দের পানীয়জলের সঙ্গে মদ খেতে বাধ্য করার জন্য পারসিরা গ্রামের কুয়োগুলিতে তাড়ি ঢেলে দিত। এছাড়াও আদিবাসীদের নব্য 'শুদ্ধাচার'-কে উপহাস করার জন্য তারা তাদের মন্দির ও পবিত্র স্থানগুলিতে মলমূত্র ত্যাগ করত।[৫১]

দেবী আন্দোলন এমনকি বহু স্থানীয় কর্মচারীর কাছেও জনপ্রিয় ছিল না। তাদের কাছে আদিবাসীরা বরাবরই ছিল নিকৃষ্ট ও বশংবদ এক জনগোষ্ঠী যাকে অতি সহজে এবং কোনওরকম বিবেক দংশন ছাড়াই শোষণ করা যায়। কিন্তু এখন আত্মঘোষণার এই নতুন সুর তাদের বুঝিয়ে দেয় যে বিনামূল্যের জিনিসপত্র, পরিচর্যা এবং শ্রমের যোগান এখন থেকে আর সুনিশ্চিত থাকবে না। ঘুষ থেকে তাদের রোজগারের পথটি বন্ধ হয়ে যায়। সুতরাং আন্দোলনকে হীনবল করতে তারা যথাসাধ্য চেষ্টা করে, এবং বহু ক্ষেত্রে আদিবাসীদের মনোবল ভাঙার কাজে পারসিদের সঙ্গে হাত মেলায়। ব্রিটিশ-অধিকৃত অঞ্চলগুলিতে স্থানীয় কর্মচারীরা এ ব্যাপারে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে বিশেষ মদত পায়নি, কিন্তু পেয়েছিল বরোদা রাজ্যভুক্ত অঞ্চলগুলিতে। এর পরে আমাদের আলোচ্য বিষয় হবে যথাক্রমে বরোদা রাজ্যে এবং ব্রিটিশ-অধিকৃত অঞ্চলে আন্দোলন সম্পর্কে কর্তৃপক্ষের প্রতিক্রিয়ার রকমফের।

'বাইরে থেকে এসে যেসব লোক এ-ধরনের গুজব ছড়াচ্ছে, তাদের বেঁধে ফেলার জন্য'[৫২] পুলিশকে নির্দেশ দেওয়াই ছিল ভিয়ারা তালুকস্থিত বরোদার রাজকর্মচারীদের প্রথম প্রতিক্রিয়া। মদ ছেড়ে দিয়েছে, এমন আদিবাসীদের আর একবার সুরাপান করতে প্ররোচিত করার বেশ কয়েকটি প্রচেষ্টা হয়। মাদক-পরিহারের একজন সমর্থক, ভিয়ারা মিশনের রেভারেন্ড ব্লান্ট, এই ঘটনা শোনার পর বরোদার গাইকোয়াড়ের অন্যতম

প্রধানমন্ত্রী সি. এন. সেডনের কাছে প্রতিবাদ জানান। সেডন আদেশ জারি করেন যে কর্মচারীরা দেবী আন্দোলনে হস্তক্ষেপ করবে না এবং একে গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে ছড়িয়ে পড়ার অবকাশ দেবে।[৫৩] আন্দোলন রোধ করার জন্য জেলা কর্তৃপক্ষকে অনুরোধ করার উদ্দেশ্যে পঁচিশজন পারসির একটি প্রতিনিধিমণ্ডলী ১৯২২ সালের ডিসেম্বর মাসে নৌসারিতে যায়। কিন্তু পুলিশ-প্রধান অথবা সুবা-র (জেলা কালেক্টরের সমতুল) কেউই তাদের কথা শুনতে রাজি ছিলেন না।[৫৪]

এর অল্প কিছুকাল পরেই বরোদার দেওয়ান স্যার মনুভাই মেহতা সিদ্ধান্ত নিলেন আন্দোলন বন্ধ করতেই হবে। পরে তাঁর নিজের যুক্তিগুলি জানিয়ে তিনি গাইকোয়াড়কে (যিনি তখন ছিলেন ইউরোপে ভ্রমণরত) এক চিঠি দেন।[৫৫] তিনি জানান যে রাজনৈতিক বিক্ষোভকারীরা এবং অসহযোগীরা আন্দোলনকে নিজেদের স্বার্থে ব্যবহার করছে; পারসিদের ভয় দেখানো হচ্ছে এবং জাতিগত বিবাদের সূচনা হয়েছে; আন্দোলনকারীরা অনেকগুলি তালগাছ কেটে ফেলার ভয় দেখাচ্ছে, যা সরকারি আবগারি রাজস্বের ক্ষতি করবে; বহু স্কুলশিক্ষক আন্দোলনকে সমর্থন করছেন এবং বিভিন্ন জনসমাবেশে সরকারি আবগারি রাজস্ব-নীতির সমালোচনা করে ভাষণ দিচ্ছেন; ব্রিটিশ সরকার আন্দোলনের সঙ্গে জড়িত লোকজনের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে শুরু করেছে; বনবিভাগের কাজকর্মে বিঘ্ন ঘটছে; আদিবাসীরা তাদের জমি চাষ না করে এবং পারসিদের হয়ে কাজ করতে অস্বীকার করে (যার ফলে তারা বেতন হারাচ্ছে) অর্থনৈতিক দিক দিয়ে নিজেদেরই ধ্বংস করছে। আন্দোলনের লক্ষের প্রতি মনুভাই মেহতার সহানুভূতির অভাব এইভাবে স্পষ্ট ফুটে ওঠে। তাঁর বক্তব্যে একই সঙ্গে দেখা গিয়েছিল যে কোনও মূল্যে আবগারি রাজস্ব বজায় রাখার এক আমলাতান্ত্রিক ইচ্ছা, পারসিদের দৃষ্টিকোণের প্রতি প্রবল পক্ষপাতিত্ব, আন্দোলন সম্পর্কে অজ্ঞতা (আদিবাসীরা কখনোই নিজেদের জমিতে কাজ করতে অস্বীকার করেনি), এবং এক আশঙ্কা যে রাজ্যের জাতীয়তাবাদী নেতারা নৌসারি জেলার আদিবাসীদের মধ্যে একটি জোরদার ঘাঁটি গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে আন্দোলনটিকে ব্যবহার করতে পারে।

রানিমহলে জনসমাবেশ অনুষ্ঠান নিষিদ্ধ করে আদেশ জারি করা হয়। দেবীর সঙ্গে সম্পর্কিত কার্যকলাপে অংশ না নেওয়ার জন্য সরকারি চাকুরে এবং স্কুলশিক্ষকদের নির্দেশ দেওয়া হয়। গোটা নৌসারি জেলা জুড়ে তালগাছ কাটা নিষিদ্ধ হয়।[৫৬] পারসি ও আদিবাসীদের মধ্যে সংঘর্ষ যেখানে সবচেয়ে তীব্র ছিল, সেই মাহুবা তালুকে পাঠানো হয় বাড়তি পুলিশ।[৫৭]

বরোদা রাজ্যের জাতীয়তাবাদীরা এসব ব্যাপার-স্যাপার শান্তভাবে সহ্য করতে প্রস্তুত ছিলেন না। বিগত তিন বছর ধরেই নৌসারি শহরে গান্ধীবাদী আন্দোলন বেশ জোরদার সমর্থন পেয়ে আসছিল।[৫৮] ১৯২৩ সালের গোড়ার দিকে এই শহরের মুখ্য জাতীয়তাবাদীরা 'কালিপরজ সংকট নিবারণমণ্ডল' নামে একটি প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেন। বরোদা শহরের নেতা সুমন্ত মেহতা এর সভাপতি হতে রাজি হন। সমিতির সদস্যরা কর্তৃপক্ষের হাতে হয়রানি থেকে আদিবাসীদের রক্ষা করার জন্য গ্রামে যেতে শুরু করেন। আদিবাসীদের বিরুদ্ধে সরকারি অত্যাচার সম্পর্কে স্বয়ং তদন্ত করার উদ্দেশ্যে

সুমন্ত মেহতা ১৯২৩ সালের মার্চ মাসে নৌসারিতে যান। বরোদায় ফেরার পর তিনি দেখা করেন দেওয়ানের সঙ্গে, যিনি আবার তাঁর এক আত্মীয়। এঁর কাছে তিনি দাবি করেন যে নৌসারি জেলায় মদ্যপান ও সুরাব্যবসা নিষিদ্ধ করা হোক। সুরার উপর নিষেধাজ্ঞা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ব্যর্থ হয়েছে, এই যুক্তিতে মনুভাই মেহতা এই অনুরোধ খারিজ করে দেন, কিন্তু যে অঞ্চলে আন্দোলন ছিল সবচেয়ে বেশি জোরদার সেখানে কয়েকটি মদের দোকান বন্ধ করে দেবার আদেশ দিতে তিনি রাজি হন।[৫৯]

রানিমহলে সমাবেশ করার অভিযোগে বরোদা সরকার ১৯২৩ সালের মার্চ মাসে কালিপরজ সংকট নিবারণমণ্ডলের পাঁচজন প্রধান সদস্যের বিরুদ্ধে নালিশ আনে। এই মোকদ্দমার শুনানি হয় আগস্ট মাসের গোড়ায়, এবং গোপানজী দেশাই নামে ভিয়ারার এক প্রসিদ্ধ আইনজ্ঞ অভিযুক্ত নেতাদের পক্ষে সওয়াল করেন। তিনি প্রমাণ করতে সক্ষম হন যে নৌসারির নেতাদের সঙ্গে আদিবাসীদের কথাবার্তা ছিল একান্তই অনিয়মিত, এবং দু পক্ষের মধ্যে সে অর্থে কোনও সমাবেশ হয়নি। ফলত এই নেতাদের উপর থেকে অভিযোগ তুলে নেওয়া হয়।[৬০] শহরের নেতাদের নিবৃত্ত করতে ব্যর্থ হয়ে নৌসারির সুবা অতঃপর কয়েকজন শীর্ষস্থানীয় আদিবাসীর বিরুদ্ধে এক মামলা শুরু করেন। পারসি এবং অন্যান্য মালিকদের খামারে কাজ করা থেকে স্বীয় সম্প্রদায়ের লোকেদের বলপূর্বক নিবৃত্ত করার দায়ে এদের অভিযুক্ত করা হয়। তাদের জন্য বিভিন্ন সময়সীমা বেঁধে দিয়ে বলা হয় যে ওই সময়ের মধ্যে তাদের শান্তিপূর্ণ অবস্থা বজায় রাখতে হবে, এবং তা করতে ব্যর্থ হলে আবার আদালতে হাজির হতে হবে।[৬১] এই দমননীতি সত্ত্বেও সুরাবর্জন ও পারসি-বয়কট আন্দোলন বরোদার রানিমহলে, বিশেষত মাহুভা তালুকে, বেশ ভালভাবেই চলতে থাকে।[৬২] এতেই বোঝা যায় যে বাইরের জাতীয়তাবাদী নেতাদের প্রচেষ্টা আন্দোলনের ক্ষেত্রে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ছিল না। হতাশ হয়ে মনুভাই মেহতা ১৯২৩ সালের ১ নভেম্বর এক আদেশ জারি করে রানিমহলে সভাসমাবেশের উপর নিষেধাজ্ঞার মেয়াদ আরও ছ'মাস বাড়িয়ে দেন, এবং দেবীমাহাত্ম্য সংক্রান্ত যাবতীয় সমাবেশও নিষিদ্ধ করে দেন।[৬৩] এইভাবে অবশেষে বরোদা সরকার দেবীকে নিষিদ্ধ করেন। মেহতার বিজ্ঞপ্তিতে (যা জারি-করা হয়েছিল নৌসারির সুবার নামে) প্রকাশিত কিছু কিছু ধারণা আন্দোলন সম্পর্কে বরোদা সরকারের মনোভাব সম্বন্ধে চিত্তাকর্ষক আলোকপাত করে। এতে এরকম ইঙ্গিত ছিল যে শহরের গোলযোগকারীরাই দেবীকে সৃষ্টি করেছে :

> কোনও কোনও ষড়যন্ত্রকারী লোক শাসক এবং শাসিতের কিসে মঙ্গল হবে তা না জেনেই কালিপরজদের কাছে ব্যাপারটা ভুলভাবে সাজিয়েছে, তাদের ভয় দেখিয়েছে, এবং তাদের বড় বড় জমায়েত ডাকতে প্ররোচিত করেছে...এইসব লোকেরা রাজকর্মচারীদের বিরুদ্ধে কালিপরজদের ক্ষেপিয়ে তোলার চেষ্টা করে, এবং ফলত সরকারের প্রতিষ্ঠিত কর্তৃত্বকে ক্ষুণ্ণ করে। এছাড়াও তারা সরকারি বিচারব্যবস্থার উপর কালিপরজদের আস্থা ভাঙতে চায়, এবং তাদের বোঝাতে চেষ্টা করে যে সরকার তাদের সম্প্রদায়ের প্রকৃত মঙ্গল সম্পর্কে উদাসীন।[৬৪]

এই আদেশ কিছুটা অসংলগ্নভাবেই দেখানোর চেষ্টা করেছিল যে দেবী জনগণের ভ্রান্তদিশারী এক অশুভ শক্তিমান এবং এই দেবীর 'দুষ্ট ক্রিয়াকলাপ' সহ্য করা যায় না। এই বক্তব্যগুলি যে শুধু পরস্পরবিরোধী তাই নয়, পরিষ্কার বোঝা যায় যে এই তথাকথিত 'প্রগতিশীল' দেশীয় রাজ্যগুলি আদিবাসীদের আত্মঘোষনাকে মেনে নিতে পারছিল না। উনিশ শতকের শেষভাগে যে রাজ্য আদিবাসী-প্রশিক্ষণের পথিকৃৎ হিসাবে কাজ করেছিল, এক প্রজন্মের ব্যবধানে সেই রাজ্যই আর ওই নীতির পরিণাম গ্রহণ করতে প্রস্তুত ছিল না।

গাইকোয়াড় স্বয়ং তাঁর দেওয়ানের চেয়ে বেশি বদান্য বলে প্রমাণিত হয়েছিলেন। ইউরোপের বিভিন্ন স্বাস্থ্যকর জায়গায় দীর্ঘ প্রবাসের পর ১৯২৩ সালের ২৩ নভেম্বর তিনি ভারতে ফিরে আসেন। ডিসেম্বর মাসে মাহুভা, ভিয়ারা এবং সোনগড় তালুক থেকে দুশোরও বেশি আদিবাসীর এক প্রতিনিধিবর্গ মহারাজকে তাদের বিক্ষোভ সম্পর্কে জানাতে বরোদায় এসে উপস্থিত হয়।[৮৫] এর কিছুদিন পরেই নৌসারির সুবাকে তার চাকরি থেকে ছাড়িয়ে দেওয়া হয়, এবং এক আদেশ জারি করে রানিমহলে মিতাচার এবং মদ্যপান নিবারণ সংক্রান্ত কাজকর্মের উদ্দেশ্যে সমাবেশের অনুমতি দেওয়া হয়। স্থানীয় কর্মচারীদের এইসব কাজকর্মে সহযোগিতা করতে আদেশ দেওয়া হয়।[৮৬] এই নতুন আবহাওয়ার প্রতি সাড়া দিয়ে সুমন্ত মেহতা ১৯২৪ সালের জানুয়ারি মাসে একটি প্রতিনিধিদলের নেতা হিসেবে রানিমহল সফর করেন, যে সফরে তিনি আদিবাসীদের কয়েকটি বৃহৎ গোষ্ঠীর উদ্দেশে ভাষণ দেন। সাম্প্রতিক আদেশের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে এই জমায়েতগুলি কেবলমাত্র মিতাচারের প্রতিই মনোযোগী ছিল। কিন্তু এর বিশেষ কোনও তাৎপর্যই ছিল না। আদিবাসীদের কাছে অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার ছিল এই যে, ভূস্বামী ও সুরাব্যবসায়ীদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে তাদের ঐক্যকে জোরদার করার উদ্দেশ্যে তাদের আবার জমায়েত হবার অনুমতি দেওয়া হয়েছিল। সুমন্ত মেহতা দেখেছিলেন যে বিগত বছরের দমননীতি আন্দোলনকে ভাঙতে ব্যর্থ হয়েছে। আদিবাসীরা তাঁর কাছে আত্মোন্নতি ও সমাজসংস্কারের এক তীব্র বাসনা প্রকাশ করেছিল। এই সফরের সময়ই সুমন্ত মেহ্তা প্রথম 'কালিপরজ' শব্দটির ব্যবহার সম্পর্কে প্রশ্ন তোলেন। ব্রিটেনে লোকেরা যখন তাঁকে 'নিগার' বা 'ব্ল্যাকি' বলে ডাকতে তখন যে তিক্ত যন্ত্রণা তিনি ভোগ করেছিলেন, তা তাঁর মনে ছিল। রানিমহলের আদিবাসীদের উল্লেখ করার জন্য এরপর থেকে তিনি 'রানিপরজ' (জঙ্গলের মানুষ) শব্দটি ব্যবহার করা স্থির করেছিলেন।[৮৭] আত্মঘোষণার মাধ্যমে আদিবাসীরা দক্ষিণ গুজরাটের মধ্যবিত্ত শ্রেণীর অপেক্ষাকৃত প্রগতিশীল সদস্যদের কাছ থেকে যে বাড়তি শ্রদ্ধা আদায় করে নিতে পেরেছিল, এই শব্দটি ছিল তারই একটি তাৎপর্যপূর্ণসূচক।

দেবী আন্দোলনের প্রতি ব্রিটিশদের প্রতিক্রিয়া ছিল গুণগত বিচারে বরোদা রাজ্যের থেকে আলাদা। এর আগে সুরাবিরোধী গণ-আন্দোলনগুলির প্রতি তারা প্রায়ই বেশ কড়া নীতি অবলম্বন করে এসেছিল। উদাহরণস্বরূপ, ১৮৮৬ সালে যখন থানা ও কোলাবা জেলার প্রচুরসংখ্যক কৃষক সুরাপান বর্জন করতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয় তখন স্থানীয় কর্তৃপক্ষ চটপট এই আন্দোলনের নেতাদের কারাবন্দী করে ফেলে। বোম্বাই প্রেসিডেন্সির

আবগারী কমিশনার তাঁর এই আচরণের সাফাই গেয়েছিলেন এই ভাষায়: 'যে প্রশ্নের সমাধান আবশ্যক তা হল এই যে, আমরা কি চুপচাপ বসে থেকে আন্দোলনকে চলতে এবং ছড়াতে দিয়ে বেশ মোটা টাকার রাজস্ব জলাঞ্জলি দেব, নাকি লোকজনের বিচারবুদ্ধি যাতে ফিরে আসে সেরকম ব্যবস্থা অবলম্বন করব?'[৬৮]

১৯২২-২৩ সাল নাগাদ এই ধরনের প্রতিক্রিয়া আর প্রত্যাশিত ছিল না। মণ্টেগু-চেম্‌স্‌ফোর্ড সংস্কার অনুযায়ী আবগারি শুল্ক একটি 'হস্তান্তরিত' বিষয় হয়ে দাঁড়ায়। প্রথম গণনির্বাচিত মন্ত্রী ছিলেন স্যার চুনিলাল মেহ্‌তা, যিনি পুনর্গঠিত পরিষদের সর্বপ্রথম অধিবেশনেই 'সুরারূপ শয়তানের' বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করেন।[৬৯] মদের দোকানগুলিতে সুরাসরবরাহের উপর উত্তরোত্তর কঠোরতর বিধিনিষেধ আরোপেব মাধ্যমে তিনি ক্রমিক ভিত্তিতে মদ্যপান-নিবারণ নীতির প্রচলন করেছিলেন। বোম্বাই প্রেসিডেন্সিতে মদ্যপান সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধকরণের প্রশ্নটি বিবেচনা করার জন্য তিনি একটি কমিটিও নিযুক্ত করেন। ফলত, সুরাটের কালেক্টর এ. এম. ম্যাকমিলানের পক্ষে দেবীর মিতাচার-সংক্রান্ত কার্যসূচির প্রতি সহানুভূতিশীল মনোভাব প্রদর্শন করা ছাড়া উপায় ছিল না।

যেহেতু ব্রিটিশরা ছিল বিদেশি, সে জন্য স্থানীয় সমাজস্তর-কাঠামোয় এই ওলটপালটের থেকেও তারা বেশি চিন্তিত ছিল আদিবাসী সম্প্রদায় এবং গুজরাটের গান্ধীবাদী জাতীয়তাবাদীদের মধ্যে আপাতনির্মীয়মান এক মৈত্রীকে নিয়ে। প্রথমদিকে এই আন্দোলনকে 'রাজনৈতিক' এই আখ্যা না দিয়ে 'ধর্মীয়', অতএব সহনীয়, বলে চিহ্নিত করা হয়। কিন্তু পাছে এর মধ্যে রাজনীতির দিকে মোড় নেবার কোনও ইঙ্গিত দেখা দেয়, সেজনা এর উপর সতর্ক নজর রাখার নির্দেশ ছিল[৭০] বারদোলির জাতীয়তাবাদীরা এই আন্দোলনকে প্ররোচিত করেছে কিনা তা অনুসন্ধান করার জন্য ম্যাকমিলান একবার রানিমহল সফর করেন। সফরশেষে তিনি এই সিদ্ধান্তে আসেন যে আন্দোলনটি ছিল বাস্তবিকই 'স্বতঃস্ফূর্ত', এবং তা 'জনসাধরণের বিশেষ কোনও ক্ষতিসাধন করছিল না।'[৭১] যাই হোক, ডিসেম্বরের শেষের দিকে রিপোর্ট আসতে থাকে যে দেবী বিদেশি বস্ত্র পোড়ানোর এবং সরকারি স্কুল বয়কটের ডাক দিয়েছেন। দুটিই ছিল অসহযোগ কর্মসূচির মূল বৈশিষ্ট্য। অতএব ১৯২৩-এর জানুয়ারির মধ্যেই ম্যাকমিলান বিষয়টি পুনর্বিবেচনা করতে শুরু করেন:

> আমি ভাবছি প্রভাবশালী লোকেদের সাহায্যে 'মাতা' আন্দোলনের গতিরোধ করার এটাই উপযুক্ত সময় কিনা, কারণ এই আন্দোলন আপত্তিজনক চেহারা নিতে শুরু করেছে। এর জন্য দায়ি স্বার্থান্বেষী ব্যক্তিদের হস্তক্ষেপ, এবং এই ধরনের আন্দোলনের অত্যন্ত মোটাদাগের উদ্ভট চেহারা নেবার সেই সাধারণ প্রবৃত্তি যা বাইরের সমালোচনার সংযতকারী প্রভাব এবং সাধারণ বিচারবুদ্ধির প্রয়োগের সম্পূর্ণ অনুপস্থিতিতে দেখা যায়।[৭২]

একজন পারসি তাড়ির দোকানের মালিককে একটি স্থানীয় জাতীয়তাবাদী স্কুলে ১২০ টাকা জরিমানা দিতে বাধ্য করার অভিযোগে জালালপুর তালুকে দেবীর মাধ্যম হিসাবে

কার্যরত এক ব্যক্তির বিরুদ্ধে মোকদ্দমা আনা হয়।[৭৪] অবৈধ জুলুমের দায়ে দোষী সাব্যস্ত এই ব্যক্তির শাস্তি হয় পনেরো দিনের হাজতবাস এবং তিনশো টাকা জরিমানা।[৭৫] জালালপুর তালুকে দেবী আন্দোলন ছিল দুর্বল (এটি আদিবাসী এলাকা ছিল না), এবং ১৯২৩ সালের ফেব্রুয়ারি মাসের গোড়াব দিকেই স্থানীয় পুলিশপ্রধান এই মর্মে রিপোর্ট দিতে সক্ষম হন যে এই মোকদ্দমার ফলে আন্দোলন ক্ষীণ হয়ে এসেছে।

রানিমহলে অবশ্য এই আন্দোলনকে অত সহজে দমানো সম্ভব হয়নি। এক্ষেত্রে ম্যাকমিলান সাহেব হস্তক্ষেপ না করাই যুক্তিযুক্ত স্থির করেন। বরং তিনি ভেবেছিলেন যে আদিবাসীদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে চলাই ভাল, যাতে তারা জাতীয়তাবাদীদের দলে গিয়ে না ভেড়ে। এই নীতি অনুসারে তিনি আবগারি কমিশনারের কাছ থেকে রানিমহলে ষোলোটি মদের দোকান বন্ধ করে দেবার অনুমতি আদায় করেন। পরে ম্যাকমিলান তাঁর বার্ষিক রিপোর্টে দাবি করেন যে তাঁর নীতি সফল হয়েছে: 'অসহযোগ আন্দোলনের স্থানীয় নেতারা তাঁদের রাজনৈতিক উদ্দেশ্যর কারণে আন্দোলনটিকে করায়ত্ত করতে চেয়েছিলেন। যেখানে যেখানে এই আন্দোলন ছিল কমজোরী, যেমন জালালপুরে, সেখানে সেখানে এটি চলাকালীন তাঁরা ভালরকমই সাফল্য অর্জন করেছেন। কিন্তু মাণ্ডবীর মতো জায়গায়. যেখানে আন্দোলন ছিল তীব্র এবং অকৃত্রিম, তাঁদের চেষ্টা খুব বেশি পাত্তা পায়নি।'[৭৬] এই রায় কি গ্রহণযোগ্য? কেবলমাত্র আংশিকভাবে, কারণ গান্ধীবাদীরা অতীব দক্ষতার সঙ্গে দেবী আন্দোলনের সঙ্গে সংযোগস্থাপন করে। এটা করার জন্য তারা কার্যসূচির সেই সেই অংশগুলির উপর ঝোঁক দেয়, যেগুলি তাদের নিজস্ব পরিকল্পনার সঙ্গে খাপ খেয়েছিল। যে অংশগুলি এভাবে মেলেনি, সেগুলিকে তারা তুচ্ছতাচ্ছিল্য করেছিল।

১৯২১-এর শেষের দিক থেকেই গান্ধীবাদীরা বারদোলি তালুক এবং ভালোড় মহলের আদিবাসীদের মধ্যে তাদের কাজকর্ম চালাচ্ছিল। ঐ বছর গান্ধী জোর দিয়ে বলেন যে এই দুই মহকুমায় আইন অমান্য অভিযান শুরু করার আগে আদিবাসীদের জাতীয় আন্দোলনের মধ্যে টেনে নেওয়া দরকার। সেই সময় অবধি আদিবাসীরা জাতীয়তাবাদী আন্দোলন সম্পর্কে কোনও আগ্রহ দেখায়নি। আদিবাসী গ্রামগুলিতে কংগ্রেস নেতা কুঁয়ারজী মেহ্‌তার এক চমকপ্রদ অভিযানের ফলে আদিবাসীরা শুধু গান্ধীর নামের সঙ্গে পরিচিতই নয়, আন্দোলনের প্রতিও অনেক বেশি সহানুভূতিশীল হয়ে ওঠে।[৭৭] সুতরাং পরের বছর দেবীর মাধ্যমরা যখন চটপট দেবীর নামের সঙ্গে গান্ধীর নামকে জড়িয়ে ফেলে, তখন সেটা আদৌ বিস্ময়কর ছিল না। অনেক গান্ধীবাদীর কাছে দেবী আন্দোলন এক দৈব বিধানের মতো ঠেকেছিল, কারণ মনে হয়েছিল আদিবাসীরা যেন এক লহমায় গান্ধীর আদেশবাণীর সঙ্গে সঙ্গতি রেখে তাদের জীবনচর্যাকে শুদ্ধিকৃত করে নিয়েছে। এই ব্যাপারটি শুরু হওয়ার অল্প কিছুদিন পরেই বারদোলি তালুকের কয়েকজন গান্ধীবাদী নেতা আদিবাসী অঞ্চলগুলি পরিদর্শন করেন এবং দেবীর কয়েকটি জনসভায় উপস্থিত হন। দেবীর মাধ্যম হিসেবে কার্যত কয়েকজন ব্যক্তির কাছে তারা প্রস্তাব দেন যে খদ্দর পরিধানের প্রয়োজনীয়তা প্রভৃতি প্রচারের মাধ্যমে দেবীর আজ্ঞাসূচিটিকে আরও জোরদার করা যেতে পারে। মাধ্যমদের অনেকেই এই

প্রস্তাবগুলিকে মেনে নিয়েছিলেন।[৭৮]

বারদোলির কংগ্রেসিরা একটি কালিপরজ সম্মেলন করার সিদ্ধান্ত নেয়, যেখানে বল্লভভাই প্যাটেলের সভাপতিত্ব করার কথা ছিল। তারা আদিবাসীদের জানায় যে গান্ধী নিজে এখন জেলে, কিন্তু তাঁর অনুপস্থিতিতে বল্লভভাই প্যাটেল তাঁর গদিতে আসীন রয়েছেন। আদিবাসীদের তারা সম্মিলনে উপস্থিত হয়ে বল্লভভাই এবং গান্ধীপত্নী কস্তুরবার বক্তব্য শোনার জন্য আমন্ত্রণ জানায়। দলে দলে আদিবাসী আসার প্রতিশ্রুতিও দেয়। এইভাবে ১৯২৩ সালের ২১ জানুয়ারি বরোদা রাজ্যের মাহুভা তালুকের শেখপুরে অনুষ্ঠিত হয় প্রথম কালিপরজ সম্মিলন। এতে আদিবাসী উপস্থিতি ছিল প্রায় কুড়ি হাজার—যা তাদের বিক্ষিপ্ত এবং নাতিবৃহৎ জনসমষ্টির তুলনায় বেশ বড় সংখ্যাই ছিল (উদাহরণস্বরূপ, ভালোড়ো চোধ্‌রীদের মোট জনসমষ্টি ছিল মাত্র আট হাজার)। এটা খুবই তাৎপর্যপূর্ণ যে সম্মিলনটিকে ভাগ করা হয়েছিল দুটি পৃথক অংশে। এর একটি নির্দিষ্ট ছিল সম্মিলনের আনুষ্ঠানিক কার্যাবলির জন্য, যার মধ্যে ছিল এক সুশৃঙ্খল শ্রোতৃমণ্ডলীর প্রতি গান্ধীবাদী নেতাদের ভাষণ। আদিবাসীদের অবস্থার উন্নতিকল্পে এক জোরদার অভিযানের প্রতি জাতীয়তাবাদীরা তাঁদের পূর্ণ সমর্থন কবুল করেন। তাল গাছ কেটে ফেলা, মদের দোকান বন্ধ করে দেওয়া, এবং খাদির প্রসারের ডাক দিয়ে বিভিন্ন প্রস্তাব পাশ করা হয়।[৭৯] সম্মিলনের অন্য অংশটিকে দেবীর মাধ্যম হিসেবে কার্যরত অনেকসংখ্যক ব্যক্তিকে একত্রিত করা হয়। তাদের পৃথক করে রাখা হয়েছিল এই আশঙ্কায় যে তারা সম্মিলনের আনুষ্ঠানিক কার্যকলাপে বিঘ্ন ঘটাতে পারে। আনুষ্ঠানিক সম্মিলনটি শেষ হলে বল্লভভাই এবং কস্তুরবা দেবী মাধ্যমদের উদ্দেশে ভাষণ দেবার জন্য আসেন। তাঁরা প্রবেশ করার সঙ্গে সঙ্গে মাধ্যমরা একযোগে ভরগ্রস্ত হয়ে প্রচণ্ডবেগে মাথা ঝাঁকাতে এবং হাতে লাল কাপড় ওড়াতে থাকে। দশ মিনিট পরে তারা কিছুটা শান্ত হলে বল্লভভাই বলতে শুরু করেন, কিন্তু তাঁর গলার আওয়াজ শোনামাত্র তারা আবার আবিষ্ট হয়ে পড়ে, এবং 'গরম, গরম, গরম' বলে চেঁচাতে থাকে। উপস্থিত সকলেই এই সভাটিকে এক বিরাট সাফল্য বলে বিবেচনা করেছিলেন।[৮০]

পুরনো থেকে নতুন কায়দায় রাজনীতিতে রূপান্তরের এক চমকপ্রদ প্রতীকী ব্যঞ্জনা প্রথম কালিপরজ সম্মিলনে পাওয়া গিয়েছিল। এর পর থেকে রানিমহলের আদিবাসী জনসমাবেশগুলি ক্রমেই ধর্মনিরপেক্ষ চরিত্র ধারণ করতে থাকে। কর্তৃত্বের উৎস হিসেবে দৈবী সমাধিদশার শক্তি ক্রমশই দুর্বল হতে থাকে, এবং ক্রমে তার স্থান দখল করে গণভোটের মাধ্যমে গৃহীত প্রস্তাব। এছাড়া এই সন্ধিক্ষণে আদিবাসীদের মধ্যে এক নতুন নেতৃত্বের উদ্ভবও লক্ষ করা যায়। অতীতের তিক্ত অভিজ্ঞতা তাদের বহিরাগত নেতৃত্বের সম্পর্কে সন্দিহান করে তোলে, কারণ বহুবার তারা বিশ্বাসঘাতকতার শিকার হয়েছিল। যাই হোক, এই সময় থেকে তারা গান্ধীবাদী নেতাদের উপর আস্থা স্থাপন করতে এবং তাদেব সভাসমিতিতে এই নেতাদের অগ্রণী ভূমিকা দান করতে থাকে।

আদিবাসীদের কাছে একবার গৃহীত হওয়ার পর গান্ধীবাদীরা দেবী আন্দোলনের তীব্রতাকে প্রশমিত করার আরও চেষ্টা করেন। তাঁদের বিশ্বাস অনুযায়ী আন্দোলনটির প্রধান মূল্য আদিবাসীদের আত্মশুদ্ধির মধ্যে নিহিত ছিল। ভাবা হয়েছিল যে এইভাবে

এক নতুন জীবনের প্রতি পা বাড়িয়ে আদিবাসীরা স্বাধীন ভারতের যোগ্য নাগরিক হয়ে উঠবে। এরকম শুদ্ধিকরণ নিজে থেকেই নিম্নবর্গের উন্নয়ন নিয়ে আসবে এমন ধারণা যদি গান্ধীবাদীদের মনে কাজ করে থেকে থাকে, তবে এই অর্থে তাঁদের সংস্কৃতায়ন-তাত্ত্বিকদের পূর্বদিশারী বলে মনে করা যেতে পারে। সুতরাং আন্দোলনের যে দিকটিকে তাঁরা কম গুরুত্বপূর্ণ ও সামাজিক বিভেদসৃষ্টিকারী, অতএব জাতীয় সংহতির পক্ষে প্রতিকূল, বলে মনে করতেন—যেমন পারসি আধিপত্যের প্রতি আদিবাসীদের চ্যালেঞ্জ—সেটির উপর তাঁরা ঠাণ্ডা জল ঢেলে দেন। কয়েকজন পারসি যখন বয়কটের বিরুদ্ধে অভিযোগ তোলে তখন গান্ধীবাদীরা আদিবাসীদের বলেন যে যদিও পারসিদের হয়ে মদের দোকানে খাটা, তাল গাছ থেকে তাড়ি নিষ্কাশন ইত্যাদি অপবিত্র কাজ বন্ধ করে তারা ঠিকই করেছে, তবুও পারসিদের জমিতে কাজ করতে অস্বীকার করার সিদ্ধান্তটি ভুল। ১৯২৩ সালের ২৫ ফেব্রুয়ারি যখন সোনগড় তালুকের দোসওয়াড়ায় (Dosvada) দ্বিতীয় কালিপরজ সম্মিলন অনুষ্ঠিত হয় তখন বল্লভভাই প্যাটেল নিম্নলিখিত বার্তাটি পড়ে শোনানোর জন্য পাঠান:

> তোমাদের সমাজে জাগরণ প্রত্যেককেই বিস্মিত করেছে। কিন্তু তোমাদের খুব সাবধান হতে হবে। বেশি তাড়াহুড়ো করলেই আছাড় খাবার সম্ভাবনা। পারসি ও মুসলমানদের শ্রমিক হিসেবে কাজ না করার যে সিদ্ধান্ত তোমার নিয়েছ, তা অতীব গুরুত্বপূর্ণ। যে পদক্ষেপ তোমরা নেবে তা সুচিন্তিত হওয়া দরকার।[৮১]

সম্মিলনের সভানেত্রী কস্তুরবা গান্ধীর বক্তব্য ছিল আরও খোলামোলা: তিনি আদিবাসীদের বলেন যে পারসিদের হয়ে কাজ করার জন্য তাদের ফিরে যাওয়া উচিত।[৮২] আদিবাসীরা এই পরামর্শ গ্রহণ করেনি। প্রত্যুত্তরে তারা বলে যে পারসিরা অত্যন্ত ধূর্ত, এবং অতীতে বহুবারই মদ ছেড়ে দিতে গিয়ে তারা তাদের ফাঁদে পা দিয়েছে। তাদের ভয় ছিল এই যে একবার শ্রমদানের মাধ্যমে পারসিদের কবলে পড়লেই তারা আবার মদ ধরতে বাধ্য হবে। তাদের প্রলুব্ধ করার জন্য পারসিরা তাদের মধ্যে বিনামূল্যে মদ বিতরণ করতেও প্রস্তুত ছিল। কিন্তু আদিবাসীরা আর পারসিদের প্রতি সদয় হতে রাজি ছিল না। সুতরাং পরিপূর্ণ বয়কট চলতে থাকে।[৮৩]

গান্ধীবাদী এবং আদিবাসীদের মধ্যে এই ধরনের মতভেদের কথাই সম্ভবত কালেক্টর ম্যাকমিলানের স্মরণে এসে থাকবে যখন তিনি রিপোর্ট লেখেন যে আদিবাসীরা গান্ধীবাদীদের নেতৃত্ব গ্রহণ করেননি। অবশ্য অন্যান্য বিষয়ে আদিবাসীদের বেশ বড় একটা অংশ গান্ধীর অনুগামীদের এবং গান্ধীবাদী কর্মসূচির প্রতি তাদের আগ্রহ প্রদর্শন করতে থাকে। খাদির প্রতি তাদের আগ্রহ ছিল সর্বাধিক। খাদির উৎপাদন শুধুমাত্র অর্থনৈতিক দিক থেকেই আকর্ষণীয় ছিল না, আদিবাসীদের কাছে তার তাৎপর্য ছিল কিছুটা ঐন্দ্রজালিক। স্মরণ করা যেতে পারে যে তাদের দেখা স্বপ্নদৃশ্যে কুয়োতে উপবিষ্ট গান্ধীকে চরকা কাটতে দেখা গিয়েছিল। আদিবাসীদের বিশ্বাসোৎপাদন হয়েছিল যে চরকার সুতোকাটাটা এমন এক ধর্মীয় আচার যা জাতির স্বাধীনতা এবং তাদের নিজেদের মুক্তিকে ত্বরান্বিত করবে।

চরকার প্রতি এরকম আগ্রহ থেকেই আদিবাসীরা এমন প্রশিক্ষকের জন্য প্রার্থনা করে, যে তাদের সুতো কাটা এবং চরকার রক্ষণাবেক্ষণ শেখাতে পারে। ১৯২৪ সালে একজন সর্বক্ষণের জন্য নিযুক্ত খাদি কর্মচারীকে রানিমহলে পাঠানো হয়। নির্বাচিত ব্যক্তিটি ছিলেন চুনিলাল মেহ্‌তা, আহ্‌মেদাবাদের কাছের এক গ্রামের জনৈক ব্রাহ্মণ। তিনি ভালোড় তালুকস্থিত বেদ্‌ছি গ্রামের একজন উৎসাহী চোধ্‌রী সমাজসংস্কারক জীবন চোধ্‌রীর সঙ্গে বসবাস করতে শুরু করেন।[৮৪] তিনি বেদ্‌ছিতে একটি ট্রেনিং ক্লাস শুরু করেন, এবং খাদির প্রচলন ব্যাপকতর করার উদ্দেশ্যে পার্শ্ববর্তী গ্রামগুলি পরিভ্রমণ করেন।[৮৫] ১৯২৫ সালের জানুয়ারি মাসে বেদ্‌ছিতে অনুষ্ঠিত হয় তৃতীয় রানিপরজ সম্মিলন (ব্রিটিশ-অধিকৃত অঞ্চলের গান্ধীবাদীরা তার মধ্যে আদিবাসীদের সম্পর্কে সুমন্ত মেহ্‌তার ব্যবহৃত অভিধাটি পরিগ্রহণ করেছে)। কারামুক্ত গান্ধী ছিলেন সভাপতি। প্রচুরসংখ্যক আদিবাসীকে খদ্দরের সুতো কাটতে দেখে তিনি বিশেষ প্রীত হন।[৮৬] জীবন চোধ্‌রী ছিলেন অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি, এবং তাঁর ভাষণে তিনি গান্ধীর প্রতি তাঁর সম্প্রদায়ের মনোভাব বিবৃত করেন: 'জগদ্‌গুরু ভগবান মহাত্মা গান্ধীকে আমাদের সঙ্গে পেয়ে আমরা সন্তুষ্ট এবং প্রীত হয়েছি। সর্বগুণান্বিত ভগবানকেই আমাদের ভজনা করা উচিত। এই ভগবান আমাদের যতখানি প্রজ্ঞা দিয়েছেন, এখন থেকে আর কোনও ভগবানই তা পারবেন না।'[৮৭]

পরবর্তী দুই দশকের মধ্যে ১৯২৮, ১৯৩০-১, এবং ১৯৪২ সালে বহু চোধ্‌রী গান্ধীবাদী আন্দোলন এবং ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে ভারতীয় জাতীয় সংগ্রামের প্রতি দৃঢ় সমর্থন জানিয়ে তাঁদের এই প্রতিশ্রুতির সারবত্তা প্রমাণ করেন। সুতরাং আদিবাসীরা গান্ধীবাদীদের মোটের উপর উপেক্ষাই করেছে, ম্যাকমিলানের এই বক্তব্য ছিল ভুল। এই দুই গোষ্ঠীর মধ্যে মৈত্রী সমস্যাকণ্টকিত হলেও যথেষ্ট বাস্তব ছিল।

৬

বছরখানেক বাদে বহু আদিবাসীই তাদের মিতাচার এবং নিরামিষাহারের প্রতিজ্ঞা থেকে সরে আসতে শুরু করে। ১৯২৪ সালের মাঝামাঝি নাগাদ কালেক্টর ম্যাকমিলান রানিমহল অঞ্চলে সুরার চাহিদা বৃদ্ধির কথা রিপোর্ট করেন। মাণ্ডবী তালুকে চারটি, ভালোড়ে একটি এবং বারদোলিতে একটি মদের দোকান তিনি আবার খুলে দেন।[৮৮] মিতাচার আন্দোলনের শক্তিহ্রাসের জন্য শুধুমাত্র পারসি এবং রাজকর্মচারীরাই নয়, আদিবাসী সম্প্রদায়ের ভিতরের লোকও দায়ী ছিল। প্রতিজ্ঞা রক্ষা করতে যারা ব্যর্থ হয়েছিল এমন অনেকে ছাড়াও এই আন্দোলনের বিরোধিতা করেছিল আদিবাসী ওঝারা, সনাতন সমাজে যাদের সম্মানিত অবস্থানকে বিপন্ন করেছিল এই সংস্কারমুখী তাগিদ। বর্ণহিন্দুর জীবনচর্চা এবং নেতৃত্বের উপর আস্থা রাখার সম্পর্কে অনেকেই তখনও সন্দিহান ছিল। বছর দুয়েকের মধ্যেই সম্প্রদায়ের অন্তর্বিরোধ তীব্র হয়ে দাঁড়ায়। 'বরজেলা', অর্থাৎ যারা দেবীর নির্দিষ্ট নব্য জীবনধারাকে অনুসরণ করেছিল, এবং 'সরজেলা', অর্থাৎ যারা তাদের প্রাক্তন অভ্যাসে প্রত্যাবর্তন করেছিল, তাদের মধ্যে বিভেদের সূচনা হয়। 'বরজেলা'-রা ছিল গান্ধীবাদী কংগ্রেসের দৃঢ় সমর্থক। কোনও

কোনও ক্ষেত্রে তারা অন্যান্য গ্রামবাসীদের দ্বারা বর্জিত একটি বিচ্ছিন্ন ও সংখ্যালঘু গোষ্ঠী হয়ে থাকলেও বেদ্ছির মতো অন্যান্য জায়গায় তারাই ছিল সংখ্যাগরিষ্ঠ। সামগ্রিক বিচারে বরজেলারা ছিল সংখ্যালঘু। কখনও কখনও দুই গোষ্ঠীর মধ্যে বিরোধ তীব্র হয়ে দাঁড়াত। উদাহরণস্বরূপ, ১৯২৯ সালের ডিসেম্বর মাসে কয়েকজন চোধরী সরজেলা চোধরী দেবতা আহ্বানের উদ্দেশে পশুবলি দেবার উদ্যোগ করলে মাণ্ডবী তালুকের পিপলওয়াড়ায় (Phipalvada) সরজেলা এবং বরজেলাদের মধ্যে এক তুমুল সংঘর্ষ হয়।[১] আদিবাসীদের সকলেই অবশ্য শুদ্ধিকরণ সম্পর্কে দেবীর কয়েকটি প্রত্যাদেশ মেনে চলতে থাকে। প্রত্যেকদিন স্নান করা, মলত্যাগের পর পরিষ্কৃত হবার জন্য জল ব্যবহৃত করা, এবং বাড়িতে অধিকতর পরিচ্ছন্নতার অভ্যাসগুলি ঐ অঞ্চলের আদিবাসীদের মধ্যে সাধারণভাবে প্রচলিত হয়েছিল।

যদিও কৃষ্টিগত সংস্কার আন্দোলন হিসাবে এর সীমাবদ্ধতাগুলি অনস্বীকার্য, তবুও ভূস্বামী, মহাজন এবং সুরাব্যবসায়ীদের বিরুদ্ধে আত্মনির্ঘোষ হিসাবে এই আন্দোলন যথেষ্ট সাফল্য লাভ করেছিল বলা যেতে পারে। দেবী আন্দোলনের পর ঐ অঞ্চলের পারসিদের অবস্থা কখনওই ঠিক আর আগের মতো হয়নি। কেননা, যেমনভাবে জাতীয়তাবাদী আন্দোলন ব্রিটিশদের সম্বন্ধে জনগণের ভয় কমিয়েছিল, ঠিক তেমনই পারসিদের সম্পর্কে আদিবাসীদের ভীতিতে ঘুণ ধরিয়ে দিয়েছিল দেবী আন্দোলন। সংগ্রাম যে সম্পূর্ণ শেষ হয়ে গিয়েছিল তা নয়, পরবর্তী দশকগুলিতে পারসিরা আবার পুনরুত্থানের চেষ্টা করে। কিন্তু জাতীয়তাবাদীরা আদিবাসীদের ভালরকমই মদত দিয়েছিল; এবং তাছাড়া ভারতের স্বাধীনতা যেসব ভূমিসংস্কারের সূচনা করেছিল তাদের শক্তি দেশের অন্যান্য অংশের থেকে গুজরাটে ছিল বেশি। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই পারসি এবং উচ্চবর্ণের হিন্দু ভূস্বামীদের জমি রানিমহলের আদিবাসী কৃষক সমাজের কাছে হস্তান্তরিত হয়।[২০] ১৯৩৮ সালে বারদোলি এবং ভালোড় তালুকে এবং ১৯৫০ সালে দক্ষিণ গুজরাটের অন্যান্য অঞ্চলে মদ্যপানের উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ পারসিদের দুর্দশা আরও বৃদ্ধি করেছিল। এর ফলে তাদের মদ ও তাড়ির ব্যবসা ধ্বংস হয়ে যায়। তারপর থেকে আদিবাসীরা খেয়ে এসেছে তাদের বাড়িতে বেআইনিভাবে চোলাই-করা শস্তা দারু। এই পানীয় স্বাস্থ্যের পক্ষে যতই বিপজ্জনক হোক না কেন, শোষণের হাতিয়ার হিসাবে সুরার দিন যে শেষ হয়ে গেছে, তা নিশ্চিতভাবে বলা যায়।

সুতরাং দক্ষিণ গুজরাটের আদিবাসী এবং তাদের শোষণকারীদের মধ্যে সংগ্রামের ইতিহাসে দেবী আন্দোলনকে একটি দিক্‌চিহ্ন হিসেবে দেখা যেতে পারে। একই সঙ্গে এই আন্দোলন আদিবাসী সমাজের মধ্যে এক বিত্তশালী কৃষক শ্রেণীর বিকাশের একটি স্তরকে সূচিত করেছিল। দেবী আন্দোলনের আগেই শুরু হলেও এই প্রক্রিয়াটি শক্তি সঞ্চয় করেছিল আন্দোলন থেকেই, কেননা এর সাহায্যেই অপেক্ষাকৃত সম্পন্ন আদিবাসীরা গুজরাটি সমাজে অর্থনৈতিক স্বাধীনতা তথা মর্যাদা অর্জন করতে সক্ষম হয়েছিল। তারপর থেকে পারসিদের ক্রমাবনতির সঙ্গে তাল রেখে সম্পন্ন আদিবাসী কৃষকেরা রানিমহল অঞ্চলের অন্যতম প্রধান শোষণকারী গোষ্ঠী হয়ে দাঁড়িয়েছে। সুতরাং এই আন্দোলনকে মহিমামণ্ডিত করার কোনও প্রয়োজন নেই। বরং এর প্রকৃত চরিত্রটিই

স্বীকৃতির দাবি রাখে—একদিকে যেমন এটি এনে দিয়েছিল মুক্তি, অন্যদিকে তেমনি এই আন্দোলন নব্য আঙ্গিকের শোষণের ভিত্তিস্থাপন করেছিল।

অনুবাদ: জয়ন্ত সেনগুপ্ত

টীকা

১ বি পি বৈদ্য, *বেড়িয়া বাহন* (গুজরাটি) (আমেদাবাদ, ১৯৭৭) পৃ ১৭৭, সুরাটের কালেক্টরের রিপোর্ট, 14 ডিসেম্বর 1922, Maharashtra State Archives, Bombay (এরপর থেকে BA বলে উল্লিখিত), Home Department (Special) (এরপর থেকে H D Sp), 1922 সালের 637 নং।

২ 'কালিপরজ'—অর্থাৎ 'কালা আদমি'—ছিল একটি অবজ্ঞাসূচক অভিব্যক্তি, যার মাধ্যমে দক্ষিণ গুজরাটের আদিবাসীদের বোঝানো হত।

৩ বারদোলির মামলতদারের রিপোর্ট, 15 নভেম্বর 1922, BA, H D, (Sp), 1922 সালের 637 নং।

৪ *Land Revenue Administration Report of the Bombay Presidency, including Sind, for 1923 24* (Bombay 1925), p 39 গুজরাটের কালেক্টরের অফিসের রেকর্ড রুম থেকে প্রাপ্ত ১৯১৪ সালের একটি তালিকা থেকে দেখা যায় মাণ্ডবীতে তেরোটি এবং ভালোড়ে আটটি সুরার দোকান ছিল, এর থেকে মনে হয় যে মাণ্ডবীর সবকটি দোকানই বন্ধ হয়ে গিয়েছিল।

৫ তদেব, পৃ ৩৯-৪০।

৬ টানা ভগৎদের বিষয়ে সর্বোত্তম গ্রন্থটি হল S. C Roy, *Oraon Religion and Customs* (1928, পুনর্মুদ্রিত, Calcutta, 1972), p 246-97.

৭ Stephen Fuchs, *Rebellious Prophets* (Bombay, 1965), p. 240, T B. Naik, *The Bhils* (Delhi, 1956), p 324

৮ BA, H. D (Sp.), 1938-42 সালের 982 নং।

৯ Fuchs, p 79 L K Mahapatra & C Tripathy, 'Raj Mohini Devi A Social Reformer among Tribals of North Central India', *Vanyajati*, 4 . 4 (October 1956)

১০ Fuchs, p 57, p 68, Surajit Sinha, 'Bhumij-Kshatriya Social Movement in South Manbhum', *Bulletin of the Department of Anthropology*, 8 . 2 (July 1959), p 16-19

১১ *Report of the Excise Committee Appointed by Government of Bombay, 1922-23*, vol. I (Bombay, 1924), p 32-3

১২ Suresh Singh, *Dust-Storm and Hanging Mist · A Study of Birsa Munda and his Movement in Chhotanagpur (1874-1901)* (Calcutta, 1966).

১৩ B. H Mehta, 'Social and Economic Conditions of the Chodhras, an Aboriginal Tribe of Gujarat (M. A. thesis, University of Bombay, 1933) ভূমিস্বত্ব সংক্রান্ত পরিসংখ্যানগুলি পরিশিষ্ট খণ্ডের পরিবার-তালিকা থেকে সংকলিত হয়েছে।

১৪ তদেব, পৃ. ৪৭০, সাতভাও-এ সেচের কোনও সুবিধা না থাকায় এই অঞ্চলে জীবিকানির্বাহের জন্য প্রয়োজনীয় জমির পরিমাণ অন্যান্য অনেক অঞ্চলের তুলনায় বেশি ছিল।

১৫ *Gazetteer of the Bombay Presidency*, volume II, 'Surat and Broach' (Bombay, 1877), p 190

১৬ উদাহরণ হিসেবে দেখুন, সুমন্ত মেহতা, *সমাজ দর্পণ* (গুজরাটি) (আমেদাবাদ, ১৯৬৪), পৃ ৩৪০।

১৭ Dr I L Desai of Vyara to A D C to Gaikwad of Baroda, 5 December 1923, Baroda Records Office (এরপর থেকে BRO), Confidential Department, File 301

১৮ *Report of the Excise Committee Appointed by the Government of Bombay, 1922-3*, vol I, p 43, vol II p. 301

১৯ পরিসংখ্যানগুলি বার্ষিক *Reports on the Administration of the Bombay Presidency* থেকে গৃহীত।

২০ পরিসংখ্যানগুলি বার্ষিক *Reports on the Administration of the Abkari Department in the Bombay Presidency, Sind, and Aden* থেকে গৃহীত।

২১ *Reports of the Excise Committee Appointed by the Government of Bombay*, 1922-23, vol I, p 49

২২ তদেব, vol. II, p 526

২৩ ডিস্ট্রিক্ট ডেপুটি কালেক্টরের রিপোর্ট, 1880-1, BA Revenue Department, (এরপর থেকে R D) 1881, vol 22 Comp 1435

২৪ অ্যাসিস্ট্যান্ট কালেক্টরের রিপোর্ট, 1886-7, BA, R D 1887, vol 26, Comp 1548

২৫ অ্যাসিস্ট্যান্ট কালেক্টরের রিপোর্ট, 1893-4, BA R D 1894 vol 36, Comp 1305

২৬ আই আর দেশাই, *রানিপরজমা জাগ্রতি* (গুজরাটি) (সুরাট, ১৯৭১), পৃ ৯।

২৭ গ্রন্থে পূর্বে উদ্ধৃত।

২৮ তদেব, পৃ. ১০।

২৮ তদেব, পৃ ১১।

৩০ মারবাড়ী মাস্টারের গানের দলের একজন প্রাক্তন সদস্য—মাণ্ডবী তালুকের শলাইয়ের দলুভাই চোধ্রী-- আমাকে গানটি শুনিয়েছিলেন। এই গানটি আমি সুরাটের অধ্যাপক আই পি. দেশাইয়ের সহায়তায় চোধ্রী উপভাষা থেকে অনুবাদ করেছি। এতে 'পারসি'দের বোঝাতে 'পাব্হা' এবং 'বানিয়া'দের বোঝাতে 'ভাঙ্গি' শব্দ দুটি ব্যবহার করা হয়েছে। অধ্যাপক দেশাইয়ের মতে এই শব্দ দুটি পারসি এবং বানিয়াদের কাছে অত্যন্ত অপমানজনক বলে গণ্য হত।

৩১ অ্যাসিস্ট্যান্ট কালেক্টরের রিপোর্ট, 1904-5, BA R D 1906, vol II, Comp 511 Pt VI

৩২ এই প্রসঙ্গে বোম্বাইয়ের এস. এন. ডি টি বিশ্ববিদ্যালয়ের সুধা মোকাশি আমাকে যে সাহায্য করেছেন তার জন্য আমি কৃতজ্ঞ। ইনি আমাকে থানা জেলার বাসিন এবং পালঘাট তালুকের ধীবর গ্রামগুলিতে নিয়ে যান।

৩৩ আন্দোলনের যাত্রাপথটিকে অনুসন্ধান করা আমার পক্ষে একটি চিত্তাকর্ষক কিন্তু শ্রমসাধ্য কাজ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। বিষয়টি সম্বন্ধে সমসাময়িক নথিপত্রের বক্তব্য খুবই ধোঁয়াটে যে জন্য খান্দেশ থেকে শুরু করে গ্রামকে গ্রাম ধরে পিছিয়ে আসার প্রয়োজন ছিল। এই প্রক্রিয়ার সাহায্যে কালক্রম নির্ধারণ করা কঠিন, কিন্তু সুরাটের তৎকালীন কালেক্টরের মতে দেবী দাং-এ ছিলেন ১৯২২ সালের অগাস্ট ও সেপ্টেম্বর মাসে। *Land Revenue Administration Report of the Bombay Presidency for 1922-3*, p 43

৩৪ এই ধরনের সমাবেশের বর্ণনার জন্য দেখুন, *রানিপরজমা জাগ্রতি* পৃ ১৩৮-৪১।

৩৫ মাইকেল অ্যাডাস দেখিয়েছেন যে 'মেসায়ানিক' আন্দোলনের সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হল একজন ত্রাতারূপী অথবা সত্যদ্রষ্টা নেতার অস্তিত্ব। দ্র Michael Adas, *Prophets of Rebellion, Millenarian Protest Movements Against the European Colonial Order* (Chapel Hill, 1979), pp. 92-3 & 115 এখানে অ্যাডাস যে প্রবন্ধটির উপর নির্ভর করেছেন সেটি হল Norman Cohn, *Medieval Dreams in Action* (New York, 1970), pp 32-43 ভারতবর্ষের বেশ কয়েকটি আদিবাসী আন্দোলন, যাদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য বিরসা মুণ্ডার আন্দোলন, ত্রাতাধর্মী নেতাদের দ্বারা পরিচালিত হয়েছিল। কিন্তু দেবী ইত্যাদি বহু আন্দোলনে যে এই ধরনের নেতৃত্ব অনুপস্থিত ছিল, এই ঘটনা থেকে মনে হয় যে এরকম আন্দোলনের একমাত্র ব্যাখ্যা হিসেবে এই প্রত্যয়টিকে গ্রহণ করার যাথার্থ্য প্রশ্নসাপেক্ষ। এই প্রসঙ্গে স্টিফেন ফুক্‌সের বক্তব্যও প্রণিধানযোগ্য। *Rebellious Prophets* গ্রন্থে তিনি ভারতীয় আদিবাসীদের মধ্যে বেশ কয়েকটি সংস্কারকামী আন্দোলনের (যদিও দেবী আন্দোলনের নয়) বর্ণনা করেছেন, এবং সেগুলিকে 'ত্রাতামুখাপেক্ষী' বলে অভিহিত করেছেন। তাঁর প্রারম্ভিক অধ্যায়ে তিনি 'ত্রাতামুখাপেক্ষী' আন্দোলনের চোদ্দোটি বৈশিষ্ট্য লিপিবদ্ধ করে বলেছেন যে এধরনের আন্দোলনে এই বৈশিষ্ট্যগুলি হয় একত্রে নয়তো খণ্ডিতভাবে পরিলক্ষিত হয়। এই তালিকাটি পূর্ণাঙ্গ, এবং একটি আন্দোলনের ভিতর সবকটি বৈশিষ্ট্যকে দেখতে পাওয়াটা অসম্ভব। অতএব ফুক্‌স্ এ-ধরনের আন্দোলনগুলিকে ব্যাখ্যা করার জন্য কোনও তত্ত্ব পেশ করেননি, কেননা কোনও তত্ত্বের সারকথাই হল এই যে, খণ্ডগুলির পরস্পর জোড়া লাগা উচিত। সুতরাং এটি একটি দুর্বল প্রত্যয়, যেটি কোনও কোনও আদিবাসী আন্দোলনের নেতৃত্বের প্রকৃতিকে বর্ণনা করার পর আর আমাদের বোধকে খুব বেশি দূর এগিয়ে নিয়ে যায় না।

৩৬ এর একটি উদাহরণ জিম্বাবোয়ের 'শোনা', দ্র. I M Lewis, *Ecstatic Religion: An Anthropological Study of Spirit of Possession and Shamanism* (Harmondsworth, 1978), pp 141 3

৩৭ Richard Lannoy, *The Speaking Tree: A Study of Indian Culture and Society* (New York, 1975), pp 198-9

৩৮ 1922 সালের 28 নভেম্বর পুলিশ রিপোর্ট, BRO. Confidential Department. 327

৩৯ *Papers Relating to the Revision Survey Settlement of the Mandvi Taluka of the Surat Collectorate Selection from the Records of the Bombay Goveranment*, No. CCCCXXVI—New Series

(Bombay, 1904), p 41 F S P. Lely to J G Moore, 22 May 1886, BA, R D 1887, vol 7, Comp 264 অ্যাসিস্ট্যান্ট কালেক্টরের রিপোর্ট 1885-6, BA, R D 1886, vol 32, Comp 1548

৪০ এস মেহতা, 'কালীপরজ', *যুগধর্ম* (গুজরাটি), 2 3 (1923), p 220

৪১ M N Srinivas, *Social Change in Modern India* (Bombay 1972), p 6 এটি হল সংস্কৃতায়ন সম্পর্কে শ্রীনিবাসের সংশোধিত সংজ্ঞা। *Caste in Modern India* (Bombay 1962) গ্রন্থের A Note on Sanskritization and Westernization' প্রবন্ধে শ্রীনিবাস যে আদি বক্তব্য রেখেছিলেন, তার বিবিধ সমালোচনার প্রতি এখানে নজর দেওয়া হয়েছে। শ্রীনিবাসের তত্ত্ব এবং তাঁর বক্তব্যের ক্রমপরিবর্তন সম্বন্ধে একটি বিশ্লেষণাত্মক সমীক্ষার জন্য দ্র Yogendra Singh, *Modernization of Indian Tradition A Systematic Study of Social Change* (Delhi, 1973), p 7-12

৪২ Srinivas, *Social Change*, p 26

৪৩ তদেব, পৃ. ৭।

৪৪ Roy, p 9 সুরেশ সিং বিরসা মুণ্ডার আন্দোলন সম্পর্কে একই কথা বলেছেন, পৃ. ১৯৮-৯।

৪৫ *Rebellious Prophets* গ্রন্থে ফুক্‌স্ অনেকগুলি আদিবাসী আন্দোলনের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস দিয়েছেন। শুধু দুটি ক্ষেত্রে (পৃ. ৬৭ এবং ৬৯-এ উল্লিখিত) আদিবাসীরা বর্ণীয় মর্যাদার দাবি করে, এবং উভয় ক্ষেত্রেই তা ছিল ক্ষাত্র-মর্যাদার জন্য।

৪৬ সুরজিৎ সিংহ যাকে আদিবাসীদের 'রাজপুতায়ন' (Rajputization) —অর্থাৎ রাজপুত বা ক্ষাত্র-মর্যাদার জন্য দাবি—বলছেন, তা সম্ভবত মধ্যযুগে যথেষ্ট পরিমাণেই ছিল ('Bhumij-Kshatriya Social Movement in South Manbhum')। বহু শতাব্দী ধরে রাজপুত শক্তির পতনের সঙ্গে সঙ্গে এই ছকটিও মনে হয় ক্রমান্বয়ে তার জনপ্রিয়তা হারিয়েছে।

৪৭ Louis Dumont, *Homo Hierarchicus* (London, 1972), pp 244 & 283.

৪৮ Srinivas, *Social Change*, p 7

৪৯ I M Lewis, *Ecstatic Religion* p. 128.

৫০ মেহতা, *সমাজ দর্পণ*, পৃ. ৩৪১-২।.

৫১ মেহতা, 'কালীপরজ', পৃ. ২২২।

৫২ Report by Police Naib Suba, Navsari, 13 November 1922, BRO, Confidential Department, 327

৫৩ Manubhai Mehta to Gaikwad, 7 June 1923 BRO, Confidential Department, 273

৫৪ Report by Police Commissioner, Baroda, 16 December 1922, BDO, Confidential Department, 327.

৫৫ Manubhai Mehta to Gaikwad, 7 June 1923, BRO, Confidential Department 273.

৫৬ গ্রন্থে পূর্বে উদ্ধৃত।

৫৭ এস. মেহতা, 'কালীপরজ কে রানিপরজ', *যুগধর্ম* (গুজরাটি) 3 (1924), 444.

৫৮ *Bombay Chronicle*, 27 April 1922

৫৯ Manubhai Mehta to Gaikwad, 7 June 1923, BRO, Confidential Department 273

৬০ *Times of India*, 4 August 1923; *Servant of India*, 30 August 1923, p. 363.

৬১ *Times of India*, 18 September 1923.

৬২ Manubhai Mehta to Gaikwad, 5 October 1923, BRO, Confidential Department 273.

৬৩ *Bombay Chronicle*, 30 November 1923

৬৪ গ্রন্থে পূর্বে উদ্ধৃত।

৬৫ *Bombay Chronicle*, 11 December 1923

৬৬ *Bombay Chronicle*, 28 January 1924.

৬৭ মেহতা, 'কালীপরজ কে রানিপরজ', পৃ. ৪৪৬।

৬৮ *Reports of the Excise Committee Appointed by the Government of Bombay*, 1922-23, vol. I, p 45.

৬৯ তদেব, পৃ. ৫০।

৭০ M S Jayakar to Macmillan, 16 November 1922, BA H. D. (Sp.), 1922 সালের 637 নং।

৭১ Macmillan to Crerar, 1 December 1922, তদেব।

৭২ Report by Macmillan, 19 January 1923, তদেব।

৭৩ Reports of 12 and 13 January 1923, তদেব।

৭৪ Report by Macmillan, 20 January 1923, তদেব।

৭৫ Report of 10 February 1923, তদেব।

৭৬ *Land Revenue Administration Report of the Bombay Presidency for 1922-3*, p 43

৭৭ বিশদ আলোচনার জন্য দ্র বি পি বৈদ্য রচিত কুঁয়ারজী মেহতার জীবনী, *রেত্তিমা বাহন*, পৃ ১৬৫-৭৭।

৭৮ তদেব, পৃ. ১৭০।

৭৯ *Bombay Chronicle* 7 February 1923 বরোদার পুলিশ কমিশনারের রিপোর্ট, 25 January 1923, BRO, Confidential Department 327

৮০ *রেত্তিমা বাহন*, পৃ. ১৭১। *রানিপরজমা জাগ্রতি*, পৃ. ২৫ ৬।

৮১ *রানিপরজমা জাগ্রতি*, পৃ. ৭০।

৮২ গ্রন্থে পূর্বে উদ্ধৃত।

৮৩ তদেব, পৃ ২৯।

৮৪ জগৎরাম দাভে, *খাদিভক্ত চুনিভাই* (গুজরাটি) (আমেদাবাদ, ১৯৬৬), পৃ ১৩-২০।

৮৫ *রানিপরজমা জাগ্রতি*, পৃ. ৫২ ৩।

৮৬ তদেব, পৃ. ৫৩-৪, ঐ সময়ের মধ্যে চুনিলাল মেহ্তা ঐ অঞ্চলের আদিবাসীদের কাছে ৫২০টি চরকা বিক্রি করে ফেলেছেন। তদেব, পৃ ৭২।

৮৭ তদেব, পৃ ৭১।

৮৮ *Land Revenue Administration Report of the Bombay Presidency for 1923-4*, pp 39-40

৮৯ B H. Mehta, 'Social and Economic Conditions of the Chodhris', p 178 সংস্কার আন্দোলনের ফলে মাঝে মাঝেই আদিবাসীদের মধ্যে গড়ে উঠেছে এই ধরনের বিভেদ। কোনও কোনও ক্ষেত্রে সংস্কারপ্রাপ্ত গোষ্ঠীটি একটি পৃথক জাতি হয়ে দাঁড়িয়েছে। উদাহরণের জন্য দ্র Roy, পূর্বোক্ত, pp 286-90.

৯০ এই জমি যে সুষমভাবে বণ্টিত হয়েছিল, তার কোনও মানে নেই; বৃহৎ আদিবাসী ভূস্বামীদের সুবিধেই হয়েছিল বেশি, যার ফলে স্বাধীনতা-উত্তর বছরগুলি সম্পন্ন এবং দরিদ্র আদিবাসীদের মধ্যে মেরুপ্রমাণ ব্যবধান গড়ে দেয়। Ghanshyam Shah, 'Tribal Identity and Class Differentiations. A Case Study of the Chodhri Tribe', *Economic and Political Weekly*, Annual Number, February 1979, pp 459-65

ইতিহাসের উত্তরাধিকার

পার্থ চট্টোপাধ্যায়

১

সম্প্রতি উগ্রহিন্দুর আক্রমণে সেকুলার মতাবলম্বীরা কিছুটা দিশেহারা হয়ে পড়েছেন। ভারতবর্ষ যে নানা ভাষা, ধর্ম, বর্ণ, গোষ্ঠীর মিলনভূমি, ভারতের জাতীয়তা যে ধর্মীয় চেতনার ঊর্ধ্বে, সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দুদের স্বার্থ যে আসলে সাম্প্রদায়িক স্বার্থ যা জাতীয় স্বার্থের পরিপন্থী—এসব কথা এখনও বলা হচ্ছে ঠিকই, কিন্তু কোথায় যেন একটা দ্বিধাগ্রস্ত ভাব এসে পড়েছে। ওদিকে উগ্রহিন্দুরা চেঁচিয়ে যাচ্ছেন, গণতান্ত্রিক ভারতে সংখ্যাগরিষ্ঠ হয়েও হিন্দুর স্বার্থ কেন স্বীকৃত হবে না, অথচ সংখ্যালঘুর স্বার্থ কেন মর্যাদা পাবে? রাষ্ট্রের আইনে ধর্মীয় সংখ্যালঘুকে স্বতন্ত্র স্বীকৃতি দেওয়াটাই তো সাম্প্রদায়িকতা, তা তুলে দেওয়ার দাবিই যথার্থ সেকুলার রাষ্ট্রের দাবি। উগ্রহিন্দু আরও বলছেন, বিদেশি আক্রমণের সমস্ত চিহ্ন মুছে দিয়ে প্রকৃত জাতীয়তার হৃত সম্মান পুনরুদ্ধার করতে হবে; এক্ষেত্রে ইংরেজ যে-অর্থে বিদেশি, পাঠান বা মুঘল শাসকেরাও সেই অর্থেই বিদেশী। উগ্রহিন্দুর অভিযোগ, এই দাবির বিরোধিতা করে সেকুলাররা প্রকৃত জাতীয়তারই বিরোধিতা করছেন।

প্রকৃত জাতীয়তার সংজ্ঞা নির্ণয় করার ক্ষেত্রে ইতিহাসের সাক্ষ্য একটা বিরাট ভূমিকা নিয়ে ফেলেছে। অযোধ্যায় মসজিদের ব্যাপারে সেকুলার ঐতিহাসিকেরা প্রমাণ করার চেষ্টা করছেন যে সেখানে আদৌ কোনও মন্দির ছিল না। একাধিক রাজনৈতিক দল, এমন কি সরকারের পক্ষ থেকেও প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে যে প্রত্নতত্ত্ব আর ইতিহাসের সাক্ষ্য বিচার করে স্থির হোক, বাবরি মসজিদ তৈরি হওয়ার আগে সেখানে কোনও মন্দির ছিল কি না। যেন মন্দির থেকে থাকলে উগ্রহিন্দুর দাবি যথার্থ বলে প্রমাণিত হবে। সেকুলার ইতিহাসচর্চার সংকট এইখানেই—আজকের রাষ্ট্রনীতির সঙ্গে জাতীয়তার ইতিহাসের সামঞ্জস্য আনা। সংকট এইজন্য যে জাতীয়তার যে ইতিহাস গত শতাব্দী থেকে লেখা হয়ে এসেছে, তার রন্ধ্রে রন্ধ্রে ঢুকে রয়েছে এমন সব কাহিনী, ধারণা, ব্যাখ্যা যা আজকের উগ্রহিন্দু প্রচারের প্রধান উপাদান। সত্যি বলতে কি, বিষয়টা একটু তলিয়ে দেখলে একটা সাংঘাতিক সত্য বেরিয়ে আসবে। সেটা হল যে হিন্দু সাম্প্রদায়িকতা আসলে ভারতীয় জাতীয়তাবাদেরই প্রতিচ্ছবি, আয়নায় মুখ দেখার মতো—তার রূপ, আকৃতি, গড়ন, অবিকল এক।

অন্য অঞ্চলের কথা বলতে পারব না, বাংলার ইতিহাসচর্চার ইতিহাস থেকে এরকমই দেখতে পাচ্ছি।

২

বঙ্কিম যে অত ক্ষোভ করে বলেছিলেন 'বাঙালীর ইতিহাস নাই', তাঁর ক্ষোভের অনেক কারণ ছিল বটে, কিন্তু কথাটা তিনি সম্পূর্ণ সত্যি বলেননি। ইতিহাস যথেষ্টই ছিল। রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের *প্রথম শিক্ষা বাঙ্গালার ইতিহাস* সমালোচনা করতে গিয়ে বঙ্কিম ঐ প্রবন্ধেই বলেছেন, 'বালকশিক্ষার্থে যে সকল পুস্তক বাঙ্গালা ভাষায় নিত্য নিত্য প্রণীত হইতেছে...' ইত্যাদি। ইতিহাসের বই লেখা হচ্ছিল অনেক। বঙ্কিমের আপত্তি, তাতে বাঙালির প্রকৃত ইতিহাস থাকছিল না। এই প্রকৃত ইতিহাস কী, তা নিয়েও বঙ্কিমের মত ছিল স্পষ্ট। প্রকৃত ইতিহাস হল পূর্বপুরুষের গৌরবের স্মৃতি। 'এমন দুই এক হতভাগ্য জাতি আছে যে, কীর্ত্তিমন্ত পূর্ব্বপুরুষগণের কীর্ত্তি অবগত নহে। সেই হতভাগ্য জাতিদিগের মধ্যে অগ্রগণ্য বাঙ্গালী।' কথাটা যে কতটা লজ্জার তা বোঝাবার জন্য বঙ্কিম তারপর জুড়ে দিয়েছেন, 'উড়িয়াদিগেরও ইতিহাস আছে'। মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন।

আসলে তাঁর ক্ষোভ হল, বাঙালির স্বরচিত বাংলার ইতিহাস নেই। 'আমাদিগের বিবেচনায় একখানি ইংরেজি গ্রন্থেও বাঙ্গালার প্রকৃত ইতিহাস নাই।' কেন? কারণ সাহেবরা কেবল বিজাতীয় মুসলমানদের সাক্ষ্য অবলম্বন করে বাংলার ইতিহাস লিখেছেন, তাতে বাঙালির সাক্ষ্য নেই। বাঙালির কাছে এই ইতিহাস গ্রহণীয় নয়। 'আত্মজাতি গৌরবান্ধ, মিথ্যাবাদী, হিন্দুদ্বেষী মুসলমানের কথা যে বিচার না করিয়া ইতিহাস বলিয়া গ্রহণ করে, সে বাঙ্গালী নয়।' তার পর এই 'স্বকপোলকল্পিত' ইতিহাসের মুসলমান লেখকদের ওপর বঙ্কিমের উষ্মা—'গোহত্যাকারী, ক্ষৌরিতচিকুর' ইত্যাদি—তৎসম শব্দের গাম্ভীর্য সত্ত্বেও এগুলো নিছকই গালাগাল, সুতরাং উদ্ধৃতি না বাড়ানোই ভাল।

বিদেশি শাসকের লেখা ইতিহাসে পরাধীন জাতি তার নিজের কথা খুঁজে পাবে না, নিজেদের ইতিহাস নিজেদেরই লিখতে হবে—জাতীয়তাবাদের এ হল প্রাথমিক শ্লোগান। স্বরচিত ইতিহাসের অভাব নিয়ে বঙ্কিমের ক্ষোভ নিঃসন্দেহে তাঁর জাতীয়তাবাদেরই প্রকাশ।[১] কিন্তু এখানে প্রথম যা লক্ষণীয় তা হল, পরাধীন স্বজাতির কথা বলতে গিয়ে বঙ্কিম যদিও কখনও বলছেন 'বাঙ্গালী', কখনও বলছেন 'ভারতবর্ষীয়', উভয় ক্ষেত্রেই কিন্তু মুসলমান শাসক বিদেশী, আক্রমণকারী। (বাংলার স্বাধীন সুলতানদের নিয়ে অবশ্য কিছুটা দোটানা আছে বঙ্কিমের ভাবনায়, সে প্রসঙ্গে পরে আসব।) দ্বিতীয় লক্ষণীয়: 'হায়! বাঙ্গালীর ঐতিহাসিক স্মৃতি কই?' বলে তিনি যখন আক্ষেপ করছেন, তখন যে-ইতিহাসবোধ তাঁর কাম্য তা কিন্তু কোনও 'দেশী' ইতিহাসবোধ নয়। এই ঐতিহাসিক স্মৃতির কাঠামো সম্পূর্ণ আধুনিক এবং ইউরোপীয়। তৃতীয়, ১৮৮০ সালে বঙ্কিম যখন আহ্বান জানাচ্ছেন, 'বাঙ্গালার ইতিহাস চাই, নহিলে বাঙ্গালার ভরসা নাই। কে লিখিবে? তুমি লিখিবে, আমি লিখিব, সকলেই লিখিবে। যে

বাঙ্গালী, তাহাকেই লিখিতে হইবে', ততদিনে কিন্তু অনেক বাঙালি লেখকই বাংলা এবং ভারতবর্ষের ইতিহাস লিখেছেন। সে-সব বই বিস্তর লোক পড়ত। প্রতি বছর নতুন সংস্করণ বেরোত, এমন বইও ছিল তার মধ্যে। বঙ্কিম সেগুলিকে 'বালপাঠ্য' বলে অবজ্ঞা করলেও আশ্চর্যের কথা হল এইসব বই-এর লেখকদের ইতিহাসবোধ কিন্তু বঙ্কিমেরই অনুরূপ। তৎকালীন ইংরেজি-শিক্ষিত বাঙালি ইতিহাস-লেখকদের মধ্যে বঙ্কিম মোটেই ব্যতিক্রম ছিলেন না।[২]

৩

এই ইতিহাসবোধ কিন্তু প্রতিষ্ঠিত হয় উনিশ শতকের দ্বিতীয় ভাগে। উনিশ শতকের গোড়ায় লেখা ইতিহাসের বই সম্পূর্ণ অন্য ঐতিহাসিক স্মৃতি ধারণ করে আছে। ঐ গোড়ার যুগের সবচেয়ে সুলিখিত বইটির কথাই ধরা যাক—মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারের *রাজাবলি* (১৮০৮)।[৩] সাহেবদের ফরমায়েশে লেখা কিন্তু বাংলা ছাপা বই-এর মধ্যে প্রথম ভারতবর্ষের ইতিহাসটি লিখতে গিয়ে মৃত্যুঞ্জয়কে (আনুমানিক ১৭৬২-১৮১৯) যে নতুন করে গবেষণা করতে হয়েছিল, এমন মনে হয় না। তাঁর রচনার একটি প্রধান বৈশিষ্ট্যই হল, ইতিহাসের ঘটনা এবং তার পারম্পর্য সম্পর্কে তাঁর পরিপূর্ণ নিশ্চিতি। দিল্লি ও বাংলার সিংহাসনে 'যে যে রাজা ও বাদশাহ ও নবাব হইয়াছেন', তার একটা প্রচলিত বিবরণই মৃত্যুঞ্জয় লিপিবদ্ধ করেছেন। বাংলার পণ্ডিতসমাজ, বিশেষ করে কুলগ্রন্থ-রচয়িতাদের মহলে যে এ-রকম একটা ইতিহাস সুপ্রচলিত ছিল, তাতে বিশেষ সন্দেহ নেই।[৪] বাঙালির ঐতিহাসিক স্মৃতি অবশ্যই ছিল।

এই স্মৃতিকথনে কালপরিমাপের ব্যবস্থা ছিল নিশ্ছিদ্র। মৃত্যুঞ্জয়ের ইতিহাস শুরু হচ্ছে এইভাবে:

> পিতৃকল্পাদি ত্রিংশত কল্পের মধ্যে ঘটীযন্ত্রের ন্যায় কালচক্রের ভ্রমণবশতো বর্ত্তমান শ্বেতবরাহ কল্প যাইতেছে একৈক কল্পেতে চতুর্দ্দশ মনু হয় তাহাতে শ্বেতবরাহ কল্পের মধ্যে বৈবস্বত নামে সপ্তম মনু যাইতেছে। একৈক মনুতে ২৮৪ দুই শত চৌরাশি যুগ হয়। তাহার মধ্যে বৈবস্বত নামে সপ্তমে মনুতে ১১২ এক শত বার যুগের যুগ এই কলিযুগ যাইতেছে। ইহার পরিমাণ ৪৩২০০০ চারি লক্ষ বত্রিশ হাজার বৎসর ইহার মধ্যে ১৭২৬ সতের শত ছাব্বিশ শকাব্দ পর্য্যন্ত গত ৪৯০৫ চারি হাজার নয় শত পাঁচ বৎসর। বাকি ৪২৭০৯৫ চারি লক্ষ সাতাইশ হাজার পঁচানব্বুই বৎসর। (পৃ. ৩-৪)

বছর গোনার হিসেবও একই রকম সুনিশ্চিত—কলিযুগের শুরু থেকে শেষ অবধি কোনও ফাঁক নেই। প্রথম ৩০৪৪ বছর ধরে প্রচলিত ছিল যুধিষ্ঠির রাজার শক। তার পরের ১৩৫ বছর বিক্রমাদিত্য রাজার শক। এই দুই শক গত।

> বর্ত্তমান নর্মদা নদীর দক্ষিণ তীরে শালিবাহন নামে রাজার শক যাইতেছে এ শক বিক্রমাদিত্য রাজার শকের পর ১৮০০০ আঠার হাজার বৎসর থাকিবে তাহার পর বিজয়াভিনন্দন নামে রাজা চিত্রকূট পর্বত প্রদেশে হইবেন তাহার শক শালিবাহন

> রাজার শকের পর ১০০০০ দশ হাজার বৎসর পর্য্যন্ত হইবে।
>
> তাহার পর পরিনাগার্জুন নামে এক রাজা হইবেন তাহার শক এই কলির ৮২১ আট শত একুশ বৎসর শেষ থাকা পর্য্যন্ত থাকিবে তাহার পর সম্ভল দেশে গৌতব্রাহ্মণের ঘরে কল্কিদেবের অবতার হইবে এই মতে ৬ ছয় শককর্ত্তা রাজারদের মধ্যে ১ এক গত ১ এক বর্ত্তমান ৩ তিন ভাবী। (পৃ. ৮)

এই কালগণনা পদ্ধতির আর যাই দোষ থাক, অনিশ্চয়তার অভিযোগ নিশ্চয় আনা যাবে না এর বিরুদ্ধে।

কালের মতো স্থানের ব্যাপারেও মৃত্যুঞ্জয় সমান সতর্ক। এই ইতিহাস কোথাকার ইতিহাস?

> আকাশ বায়ু তেজো জল ভূমি এই পঞ্চভূতের মধ্যে পৃথিবীর আট আনা অন্য অন্য আকাশাদি চারিভূতের দুই দুই আনা...এই ভূমিপিণ্ডের অর্দ্ধেক লবণ-সমুদ্রের উত্তর এই জম্বুদ্বীপ। ...এই পৃথিবী সপ্তদ্বীপা। এ সপ্তদ্বীপের মধ্যে জম্বুদ্বীপ নামে এই দ্বীপ। এই জম্বুদ্বীপ নয় খণ্ড...এই নববর্ষের মধ্যে ভারতবর্ষ নামে পৃথিবীর নব ভাগের এক ভাগ এই। ভারতবর্ষের নব ভাগ সে সকল ভাগের নাম এই ঐন্দ্র কসেরু তাম্রপর্ণ গভস্তিমত নাগ সৌম্য বারুণ গন্ধর্ব কুমারিকা এই নবখণ্ডের মধ্যে বর্ণাশ্রম ব্যবস্থা যাহাতে আছে সে কুমারিকা খণ্ড এই।
>
> আর আর খণ্ড সকলের মধ্যে অন্ত্যজ লোকের বসতি। (পৃ. ৪-৬)

এহেন যে সপ্তদ্বীপা পৃথিবী, তার মধ্যে জম্বুদ্বীপ, তার আবার নয় বর্ষ ইত্যাদি, সেই পৃথিবীর শাসনকর্তাদের ইতিহাস *রাজাবলি।* ইতিহাসের শুরু কোথায়?

> পরেমশ্বর এই পৃথিবীর পালন নিমিত্ত ইক্ষ্বাকু নামে অশ্বত্থ বৃক্ষরূপ রাজাকে সত্যযুগে প্রথমত আরোপিত করিয়াছিলেন ঐ রাজার স্কন্ধ শাখাদ্বয় রূপ সূর্য্যবংশ ও চন্দ্রবংশ এই দুই বংশের ধারাবাহিক সন্তান-পরম্পরাতে চারি যুগে এই পৃথিবী মণ্ডল অধিকৃত ছিলেন। এই উভয়বংশীয় রাজারদের মধ্যে মহত্তম ধর্ম্ম তপোবল প্রভাবে কেহ কেহ সপ্তদ্বীপ পৃথিবীর শাসন করিয়াছেন কেহ কেহ মহত্তর ধর্ম্ম তপস্যা বল ও প্রতাপে জম্বুদ্বীপ মাত্রের অধিকার করিয়াছেন। কেহ কেহ মহাধর্ম্ম তপোবল বশতঃ ভারতবর্ষ মাত্রের অধিকার করিয়াছেন কেহবা কুমারিকা খণ্ড মাত্রের রাজা ছিলেন এই দুই বংশের রাজারদের মধ্যে একতর সম্রাট হইলে অন্যতর মণ্ডলেশ্বর হইতেন। ইহারদের বিবরণ পুরাণেতিহাসাদি শাস্ত্রে বিস্তারিত আছে। (পৃ. ৬-৭)

কয়েকটা কথা এখানে পরিষ্কার বলে রাখা যাক। মৃত্যুঞ্জয়ের ধারণায় পৃথিবীর প্রতিপালক শাসনকর্তারা পরমেশ্বর প্রেরিত। ধর্মের তপস্যাবলে তাঁরা এই অধিকার ভোগ করেন। সেই তপস্যা শুধু মহৎ, না মহত্তর, না মহত্তম, তার ওপর নির্ভর করছে এঁদের আধিপত্যের সীমানা। মহত্তম ধর্মতপস্যার প্রভাবে সমগ্র পৃথিবীর অধিপতি হওয়াও সম্ভব ছিল। এমন ধারণার ওপর প্রতিষ্ঠিত রাজবংশের ইতিহাসকে আমরা

অনেকেই হয়তো ইতিহাস বলে মানতে রাজি হব না, যদিও একটু পরেই দেখা যাবে যে নিঃসন্দেহে ঐতিহাসিক ঘটনার স্মৃতিও এই ধারণার সঙ্গেই গ্রথিত হয়ে রয়েছে। যাই হোক, অকারণ ভুল বোঝাবুঝি এড়াতে মৃত্যুঞ্জয়ের কাহিনীগুলিকে ওঁরই সূত্র অনুসারে বলা যাক—'পুরাণেতিহাস'।

তবে পুরাণ হোক আর যা-ই হোক, *রাজাবলি*-র হিসেবে কোনও ফাঁক নেই। 'এই কলির আরম্ভ অবধি ৪২৬৭ চারি হাজার দুই শত সাতষট্টি বৎসর পর্য্যন্ত ১১৯ এক শত উনিশ জন নানাজাতীয় হিন্দু দিল্লীর সিংহাসনে সম্রাট হন।' (পৃ. ১০) গণনা শুরু হচ্ছে রাজা যুধিষ্ঠির থেকে—হ্যাঁ, সেই মহাভারতের রাজা যুধিষ্ঠির। তাঁর রাজত্বের শুরু থেকে ২৮ জন ক্ষত্রিয় রাজা ১৮১২ বছর শাসন করেন। 'এই পর্য্যন্ত কলিতে বাস্তব ক্ষত্রিয় জাতির বিরাম হইল।' তার পর এল 'মহানন্দ নামে ক্ষত্রিয়ের ঔরসেতে শূদ্রা গর্ভজাত' নন্দবংশীয় ১৪ জন রাজার ৫০০ বছরের শাসন। 'এই নন্দ অবধি রাজপুত জাতির সৃষ্টি হয়।' এর পর বৌদ্ধ রাজাদের পালা—'গৌতম বংশজাত বীরবাহু অবধি আদিত্য পর্য্যন্ত নাস্তিক মতাবলম্বি ১৫ পনের জনেতে ৪০০ চারি শত বৎসর। এই সময়ে নাস্তিক মতের অত্যন্ত প্রচার হওয়াতে বৈদিক ধর্ম্ম উচ্ছিন্ন প্রায় হইয়াছিল।' তার পর বিচিত্র সব রাজবংশের তালিকা—ময়ূর বংশীয় নয় জন, ষোল জন যোগী, চার জন বৈরাগী ইত্যাদি। অবশ্য 'বিক্রমাদিত্যেরা পিতাপুত্রে দুই জনেতে ৯৩ বৎসর' আছেন। আর আছেন 'ধী সেন অবধি দামোদর সেন পর্য্যন্ত বঙ্গদেশীয় বৈদ্য জাতি ১৩ তের জনেতে ১৩৭ এক শত সাইত্রিশ বৎসর এক মাস।' সেনেরা বঙ্গদেশীয় বৈদ্য জাতি এবং দিল্লির সিংহাসনে! তার পর 'চোহান রাজপুত জাতি'-র রাজত্বের শেষে

> পৃথোরায় এক জনেতে ১৪ চৌদ্দ বৎসর সাত মাস।...এই পর্য্যন্ত হিন্দু রাজারদের সাম্রাজ্য ছিল।
>
> তাহার পর মুসলমানেরদের সাম্রাজ্য হইল। যবনদের সাম্রাজ্য হওয়া অবধি ১৭২৬ শকাব্দ পর্য্যন্ত ৫১ জনেতে ৬৫১ ছয় শত একান্ন বৎসর তিন মাস আটাইশ দিন গত হইয়াছে। (পৃ. ১২-৩)'

পরিপূর্ণ নিশ্চয়তা ছাড়াও এই তালিকার বৈশিষ্ট্য হলো বংশানুক্রমিক পারম্পর্যে মহাভারতের চরিত্র থেকে মগধের সম্রাট পর্যন্ত অনায়াসে চলে আসা। এবং রাজবংশের পারম্পর্যে 'আমীর তৈমুরের সন্তান' মুঘল সম্রাট দ্বিতীয় শাহ আলম পর্যন্ত এসে তালিকা শেষ করা। পুরাণ, ইতিহাস এবং সমসাময়িক, সবটাই একই কালানুক্রমিক ছকে বাঁধা, একটার সঙ্গে আর-একটার কোনও বিরোধ নেই, একটা থেকে আর-একটাতে যেতেও তাই কোনও অসুবিধা নেই। বঙ্কিমের যুগে এসে পৌরাণিক আর ঐতিহাসিক কালের মধ্যে যে তফাৎ করা হবে, পৌরাণিক বিবরণের থেকে ইতিহাসের মালমসলা বের করার পদ্ধতি নিয়ে যে-সব আলোচনা হবে, মৃত্যুঞ্জয়ের চিন্তায় তার আভাসটুকুও নেই। ইংরেজের ফরমায়েশে লেখা হলেও *রাজাবলি*-র ইতিহাসবোধ সম্পূর্ণ প্রাক-ঔপনিবেশিক।

তাই হিন্দু রাজবংশের অবসান আর 'যবন সম্রাট'-দের অভ্যুত্থানের বিষয়ে মৃত্যুঞ্জয়

বিদ্যালঙ্কারের মতো এক ব্রাহ্মণ পণ্ডিত কী বলেন, তা জানতে কৌতূহল হয়। আরও কৌতূহল হয় যখন দেখি যে শিহাবুদ্দিন মুহম্মদ ঘুরি-র হাতে পৃথ্বীরাজ চৌহানের পরাজয়ের বিবরণ জড়িয়ে রয়েছে এক পৌরাণিক কাহিনীর সঙ্গে। কাহিনীটা এইরকম।

পৃথ্বীরাজের পিতার দুই স্ত্রী ছিল। এক স্ত্রী মানুষের মাংস খেত। স্বামীকেও সে নরমাংস খাওয়া অভ্যেস করায়। অপর স্ত্রীর পুত্রকে একদিন সেই রাক্ষসী খেয়ে ফেলে। অপর স্ত্রী তখন পালিয়ে ভাইয়ের আশ্রয়ে যায় এবং সেখানে এক পুত্রসন্তান প্রসব করে। তার নাম হয় পৃথু। পৃথু বড় হয়ে তার পিতাব সঙ্গে মিলিত হয়। পিতার অনুরোধে পৃথু তার পিতার শিরচ্ছেদ করে একুশ জন স্বজাতীয় স্ত্রীলোককে সেই মাংস খাওয়ায়। পরে রাজা হয়ে পৃথু সেই একুশ জনের পুত্রকে তার সামন্ত করে। 'এইরূপে পৃথুরাজার পিতৃহত্যা করাতে পূর্ব্ব হইতেও অধিক অখ্যাতি দিনে দিনে বাড়িতে লাগিল ও পূর্ব্বে যে রাজারা কর দিত তাহারা কেহ কর দিল না।' মোট কথা রাজা হিসেবে পৃথ্বীরাজ বড় একটা লোকমান্য ছিলেন না।

এমন সময় শিহাবুদ্দিন ঘুরির আক্রমণ উপস্থিত হলো।

> রাজা যবনদের প্রাগল্‌ভা শুনিতে পাইয়া অনেক বেদজ্ঞ পণ্ডিতেরদিগকে আনাইয়া কহিলেন হে পণ্ডিতেরা এমন কোনহ যজ্ঞের আরম্ভ কর যাহাতে যবনেরদের প্রতিভা ও প্রাগল্‌ভা উৎরোত্তর হ্রাস হয়। পণ্ডিতেরা আজ্ঞা করিলেন হে মহারাজ এমন যজ্ঞ আছে আমরা কহিতেও পারি কিন্তু আমরা যে সময়ে অবধারণ করিব সে সময়ে যজ্ঞের যূপস্থাপন যদি হয় তবে সে যূপ যাবৎ থাকিবে তাবৎ যবনেরা এ দেশে কখনও আসিতে পারিবে না। রাজা পণ্ডিতেরদের এই বাক্যে অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়া বড় সমারোহ করিয়া যজ্ঞের আরম্ভ করিলেন। যূপস্থাপনের সময় হইলে পণ্ডিতেরদের অনুমতি মাত্রে যূপস্থাপন করিতে যূপ উঠাইতে নানা যত্ন করিলেন যূপ কদাচ উঠিল না। তদনন্তর পণ্ডিতেরা কহিলেন হে মহারাজ ঈশ্বরের যে ইচ্ছা সেই হয় পুরুষ ঈশ্বরেচ্ছার ওপর প্রবল নয় কিন্তু তাহার সহকারী বটে ঈশ্বরেচ্ছা সহকৃত পুরুষ কার্য্যসাধক হয় অতএব নিবৃত্ত হও বুঝি এ সিংহাসন যবনাক্রান্ত হইবে।

পণ্ডিতদের কথায় পৃথ্বীরাজ 'যুদ্ধে শৈথিল্য করিলেন'। শিহাবুদ্দিন শত্রুসৈন্য ধ্বংস করে দিল্লি পৌঁছে গেলেন। পৃথ্বীরাজ তখন

> অন্তঃপুর হইতে নির্গত হইয়া শাহাবুদ্দীনের সহিত ঘোরতর রণ করিলেন কিন্তু ঈশ্বরেচ্ছাতে শাহাবুদ্দীন যবন ঐ রঙ্গভূমিতে পৃথুরাজাকে ধরিয়া পৃথুরাজা জয়চন্দ্র রাজার জামাতা হন [স্মরণীয়, জয়চাঁদ ইতিমধ্যেই মুহম্মদ ঘুরির সহায়তা করেছেন] এই অনুরোধে তাহাকে নষ্ট করিলেন না কিন্তু কএদ করিয়া খাড়া খাড়া আপন দেশে গজনেনে পাঠাইয়া দিলেন। (পৃ. ১০৯-১০)

আবার মনে করিয়ে দিই, রাজবংশের পত্তন হয় ঈশ্বরেচ্ছায়। ধর্মের প্রতি বিশ্বস্ত থাকলে তবেই সেই রাজত্ব বজায় থাকে। নরমাংস ভক্ষণ এবং পিতৃহত্যার মতো চরম পাপাচারের দোষ লেগেছিল চৌহান রাজবংশে। পৃথ্বীরাজ যে ঈশ্বরের বিরাগভাজন

হয়েছেন তার প্রমাণ পাওয়া গেল যজ্ঞের আসরে। সুতরাং মুহম্মদ ঘুরির যুদ্ধজয় এবং 'যবন রাজত্ব'-র প্রতিষ্ঠা একান্তই ঈশ্বরের ইচ্ছায় সম্পন্ন ঘটনা: 'পুরুষ ঈশ্বরেচ্ছার ওপর প্রবল নয় কিন্তু তাহার সহকারী বটে ঈশ্বরেচ্ছা সহকৃত পুরুষ কার্য্যসাধক হয়।' মৃত্যুঞ্জয়ের অর্ধশতাব্দী পর যখন পুরাণেতিহাস বর্জন করে দস্তুরমতো ইতিহাস লেখা হবে, তখন কিন্তু থানেসরের যুদ্ধের এই বিবরণ আপাদমস্তক বদলে যাবে। ইংরেজি-শিক্ষিত ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরা ঈশ্বরেচ্ছাকে অত সহজে মেনে নেবেন না।

তবে রাজার অধর্মাচরণের কারণ সম্বন্ধে মৃত্যুঞ্জয় এর পর আরও দু-একটা কথা বলেছেন। সে আলোচনাটা মৃত্যুঞ্জয় শুরু করছেন এই বলে: 'শাহাবুদ্দীন যবনের দিল্লীর সিংহাসন অধিকার হওয়ার বিষয়ে যবনেরা যে রূপ বলে তাহা লিখি।' (পৃ. ১১২-৩) বলতে গিয়ে তিনি ফিরে যাচ্ছেন মাহমুদ গজনভির পিতা নাসরুদ্দিন সবুক্তগিনের হিন্দুস্থান আক্রমণের সময়ে।

> এই নাসরুদ্দীন হিন্দুস্থানে যে সময়ে আইল তখন হিন্দুস্থানের রাজা সকলের পরস্পর একবাক্যতা কাহারও ছিল না এবং যে যে দেশের রাজা সে সে দেশের বাদশাহ করিয়া আপনাকেই জানিত কেহ কাহারও আয়ত্ত ছিল না। এবং এমন রাজা একও ছিল না যে স্বপরাক্রমে অন্য অন্য রাজারদিগকে স্বাধীন করে ইহা অনুসন্ধান করিয়া এ হিন্দুস্থানে যবনেরদের সঞ্চার হইল। কেননা শত্রুসঞ্চারের ও রাষ্ট্র বিভ্রাটের প্রধান কারণ পরস্পর অনৈক্য ও স্ব স্ব প্রাধান্য ও যখন সেকন্দর শাহ যবনস্থানে বাদশাহ হইয়াছিলেন তখন তিনি এ হিন্দুস্থানে একবার আসিয়া দেশের ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরদের ধার্ম্মিকতা ও পাণ্ডিত্যাদি দেখিয়া কহিলেন যে এ দেশে এ রূপ হকিমেরা আছেন সে দেশের রাজারদের পরাজয় কখনও অন্য দেশীয় রাজারদের হইতে হইতে পারে না। এই কহিয়া স্বদেশে গেলেন আর কখনও এ হিন্দুস্থানে আইলেন না। সম্প্রতি তাদৃশ ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের অভাব প্রযুক্ত এ দেশীয় রাজারা দৈববলেতে হীন হইয়া যবন হইতে ক্রমে ক্রমে সকলেই পরাজিত হইলেন। (পৃ. ১২১-২)

সুলতানী ও মুঘল রাজত্বের বিবরণ মৃত্যুঞ্জয় মোটামুটি-প্রচলিত ফারসি গ্রন্থ থেকেই নিয়েছেন। হিন্দুস্থানের রাজাদের অনৈক্য কিংবা ব্রাহ্মণ সম্বন্ধে আলেকজান্ডারের মন্তব্য ফেরিশ্‌তা বা অন্য কোনও ফারসি ইতিহাসে থেকে থাকতে পারে। কিন্তু রাজারা ধর্মের পথ থেকে বিচ্যুত হলেন এবং দৈববলে হীন হয়ে পড়লেন, তার কারণ যে ব্রাহ্মণদের ব্যর্থতা, এই যুক্তি বলা বাহুল্য ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরই যুক্তি। ধর্মরক্ষা এবং রাজাকে সৎপথে চালিত করা ব্রাহ্মণের কর্তব্য। সেই কর্তব্য তারা পালন করেনি, তাই দেবরোষে হিন্দু রাজত্বের পতন ঘটল এবং দৈব ইচ্ছায় যবনদের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হল। ব্রাহ্মণের অধঃপতনের জের হিসেবে ঈশ্বরের কৃপাদৃষ্টি অন্যের ওপর গিয়ে পড়ল। পরে দেখব, ইতিহাস-রচনায় দৈব হস্তক্ষেপের ভূমিকা যত ক্ষীণ হয়ে আসবে, এই অধঃপতনের গল্পটা ততই এক সামগ্রিক সামাজিক অবক্ষয়ের কাহিনীতে পরিণত হবে।

মৃত্যুঞ্জয়ের বিবরণে গজনির মাহমুদ কর্তৃক সোমনাথ মন্দির ধ্বংসের ঘটনার কথা এখানে বলে রাখা যাক। তা হলে পরবর্তীকালের ইতিহাস-রচনার সঙ্গে এর তুলনা করা

যাবে। মন্দির ধ্বংসের বর্ণনা মোটামুটি আমাদের পরিচিত বর্ণনাই—ফারসি সূত্র থেকে নেওয়া। কিন্তু সোমনাথ মন্দিরের বিগ্রহ সম্বন্ধে মৃত্যুঞ্জয় একটি কথা বলছেন যা পরবর্তীকালে আর কোথাও পাব না। 'সোমনাথ নামে অতি বড় এক দেব প্রতিমা ছিলেন সে প্রতিমা পূর্ব্বে মক্কাতে ছিলেন যবনেরা যে অবধি মনুষ্য সৃষ্টি বলে তদবধি চারি হাজার বৎসর যখন গত হইয়াছিল তখন হিন্দুস্থানের এক রাজা মক্কা হইতে সে প্রতিমা উঠাইয়া আনিয়া ঐ স্থানে স্থাপন করিয়াছিলেন...।' (পৃ. ১২৯) সোমনাথের মূর্তি আদিতে মক্কায় ছিল, কোনও হিন্দু রাজা তা গুজরাটে নিয়ে আসেন, মাহমুদ আবার সেই মূর্তি দখল করে গজনিতে নিয়ে যান—এরকম কাহিনী কোনও ফারসি বইতে আছে কি না বলতে পারব না, কিন্তু পরবর্তীকালে কোনও বাঙালি ঐতিহাসিক যে এ-কথা আর লেখেন নি, তা প্রায় নিশ্চিত।

এই পরের যুগের জাতীয়তাবাদী ইতিহাসে দু-জন মুঘল সম্রাটকে নিয়ে খুব উত্তেজনা সৃষ্টি হবে, তাই এঁদের বিষয়ে মৃত্যুঞ্জয় কী বলছেন, সেটা একবার দেখে নেওয়া যাক। আকবর সম্বন্ধে মৃত্যুঞ্জয় উচ্ছ্বসিত। 'শ্রীবিক্রমাদিত্যের পর এই হিন্দুস্থানে এখন পর্য্যন্ত গুণেতে অকবর শাহের সম সম্রাট আর কেহ হয় নাহি।' (পৃ. ১৯৫) ধর্মরক্ষা ও প্রজার প্রতিপালনে আবশ্যক সবরকম গুণ ছাড়াও আকবরের চরিত্রের যে-দিকটি মৃত্যুঞ্জয় বিশেষভাবে লক্ষ্য করেছেন, সেটা হল যে আকবর 'নানাবিধ শাস্ত্রজ্ঞান জন্য পারমার্থিক বুদ্ধি প্রতিভাতে মহম্মদের মতে অনাস্থা করিয়া মনে মনে হিন্দুরদের মতেই আস্থা করিতেন অতএব ইরান ও তুরানের রাজারা ইহাকে অনুযোগ করিয়া লিখিতেন।' (পৃ. ১৯১) এমন কি 'ইনি গোমাংস ভক্ষণ করিতেন না এবং কিল্লার মধ্যেতেও গোবধ বারণ করিয়া দিয়াছিলেন তৎপ্রযুক্ত তদবধি এখনও তাঁহার কিল্লাতে গোবধ হয় না।' (পৃ. ১৯৪) অপর পক্ষে আওরঙজেব সম্বন্ধে মৃত্যুঞ্জয় লিখছেন:

> ইনি মহম্মুদী মতে অতি বড় তৎপর হইলেন। আর প্রধান প্রধান অনেক দেবস্থান নষ্ট করিলেন। হিন্দুরদের মতে সূর্য্যার্ঘ্য ও গণেশপূজাদি দেবকৃত্য সকল বাদশাহি কিল্লাব মধ্যে অকবর অবধি নিয়মিত ছিল যে সকল আইনের মধ্যে অনেক আইনের অন্যথা করিয়া স্বকপোলরচিত অনেক আইন জারি করিলেন। (পৃ. ২১৪)

কিন্তু সেইসঙ্গে আবার এ-কথাও লিখছেন:

> ইনি প্রধান প্রধান অনেক দেবস্থানের ব্যাঘাত করিয়াছিলেন কিন্তু জ্বালামুখী ও লছমনবালাতে বিলক্ষণ প্রতিফল পাইয়া তাঁহারদিগকে মানিয়া সেবার্থে অনেক টাকার ভূমি নিযুক্ত করিয়া দিয়াছিলেন। পরে ঐ আওরঙ্গাবাদে ১২ বার বৎসর থাকিয়া এক ব্রাহ্মণের শাঁপে বিকৃত শব্দ কবিতে করিতে মরিলেন। (পৃ. ২২১)

রাজা যেখানে ঈশ্বরপ্রেরিত, ঈশ্বরের অনুগ্রহেই যেখানে তাঁদের রাজ্যপাটে অধিকার, সেখানে রাজচরিত্রের মতিগতি বিচার করা মোটামুটিভাবে ঈশ্বর আর রাজাদের মধ্যেকার ব্যাপার। সাধারণ প্রজার সেখানে একমাত্র ফলভোগ করা ছাড়া কোনও ভূমিকা নেই। অবশ্য ভাল রাজা আর মন্দ রাজার প্রভেদ প্রজা জানে, কারণ সুশাসন কিংবা

অপশাসনের ফল সে-ই ভোগ করে। সুতরাং আকবরের মতো মহান সম্রাটের সে গুণগান করে। আবার আওরঙজেব যখন তাঁর দুষ্কর্মের ফলস্বরূপ 'ব্রাহ্মণের শাপে বিকৃত শব্দ করিতে করিতে' মারা যান, সে-গল্প বলতে বলতে প্রজা যেন দেলরোয়ের কঠোরতায় খানিক শিউরে উঠে শেষ পর্যন্ত ধর্মের জয় সম্বন্ধে আশ্বস্তই হয়। কিন্তু শাসনকার্যের অনুষ্ঠানের সঙ্গে সে কখনও নিজেকে জড়ায় না, রাজার জায়গায় নিজেকে বসাবার কথা ভাবতেই পারে না। রাজতন্ত্রের ইতিহাসে সে নিজের ইতিহাস খোঁজে না। 'কীর্ত্তিমন্ত পূর্ব্বপুরুষগণের কীর্ত্তি' বর্ণনা করার মধ্য দিয়ে যে সমগ্র জাতির ইতিহাস প্রকাশ করা যায়, এমন কথা মৃত্যুঞ্জয়ের আদৌ বোধগম্য হত বলে মনে হয় না। কয়েক হাজার বছরের রাজপুরুষদের বিবরণ দিতে গিয়ে তাঁর নিজের অবস্থান একটিই—স্থির এবং অপরিবর্তনীয়। সে অবস্থান প্রজার অবস্থান। সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে তিনি পৃথ্বীরাজের অপকর্মের প্রতিফল যেমন বর্ণনা করেছেন, তেমনি আকবরের গুণপনাকে ধন্য ধন্যও করেছেন। কিন্তু স্বজাতীয় অথবা বিজাতীয় বলে পৃথ্বীরাজ কিংবা আকবরের কৃতকর্মের ঐতিহাসিক দায় তাঁর ওপর এসে বর্তাতে পারে, এমন সম্ভাবনা তাঁর চিন্তাতেও আসেনি। *রাজাবলি* জাতীয় ইতিহাস নয়, কারণ ইতিহাসের কর্তা এখানে রাজা এবং দৈবশক্তি; কোনও জাতীয় ঐক্যবন্ধনের সূত্র ধরে ঐতিহাসিকের নিজস্ব চৈতন্য ইতিহাসের কর্তার স্থানটি এখানে দখল করে নিতে পারে নি। বঙ্কিম যে জাতীয় ইতিহাসের কথা বলবেন, তার রচয়িতা যেমন 'তুমি, আমি, সকলে', সে-ইতিহাসের কর্তাও তেমনি 'তুমি, আমি, সকলে'। এই নতুন ইতিহাসবোধে আলোকপ্রাপ্ত হওয়ার সৌভাগ্য মৃত্যুঞ্জয়ের হয়নি। তাই বাঙালি ব্রাহ্মণ প্রজার একান্ত বিশিষ্ট অবস্থান থেকেই তিনি রাজারাজড়ার কাহিনী বলে গেছেন।

বাংলার সাম্প্রতিক ইতিহাসের গল্প শোনাবার সময়ই মৃত্যুঞ্জয়ের অবস্থানটি সব চেয়ে স্পষ্ট হয়ে ফুটে ওঠে। মৃত্যুঞ্জয়ের জন্ম পলাশির যুদ্ধের সামান্য পরে, সুতরাং সেই সময়কার ইতিহাস তাঁর বাল্য-যৌবনের জনশ্রুতি। সিরাজউদ্দৌলার অত্যাচার সম্বন্ধে তাঁর ঘৃণা প্রবল। 'বিশিষ্ট লোকেরদের ভার্য্যা ও বধূ ও কন্যা প্রভৃতিকে জোর করিয়া আনাইবাতে ও কৌতুক দেখিবার নিমিত্তে গর্ভিণী স্ত্রীরদের উদর বিদারণ করানেতে ও লোকেতে ভরা নৌকা ডুবাইয়া দেওয়ানেতে দিনে দিনে অধর্ম্ম-বৃদ্ধি হইতে লাগিল।' (পৃ. ২৬৮-৯) সিরাজ যখন রাজা রাজবল্লভের 'জাতিধ্বংস করিতে উদ্যত হইলেন', তখন রাজবল্লভ কলকাতায় ইংরেজদের শরণাপন্ন হলেন। ইংরেজরা তাঁকে নবাবের হাতে তুলে দিতে রাজি হল না। তখন 'নবাব সিরাজদ্দৌলা কম্পানি বাহাদুরের কুঠী ও কলিকাতা শহর লুট করিয়া আপন সর্ব্বনাশের হেতু করিয়া মুরশিদাবাদে [গেলেন]।' (পৃ. ২৭০) ইংরেজরা সাময়িকভাবে কলকাতা ত্যাগ করতে বাধ্য হল। এর পরের কাহিনী মৃত্যুঞ্জয়ের কথাতেই শুনুন:

> [সাহেব লোকেরা] পুনরায়...আসিয়া কলিকাতা শহরের লূটেতে মহাজন ও মুদি বকালি গৃহস্থ প্রভৃতি লোকেরদের মধ্যে যাহার যে ক্ষতি হইয়াছিল তাহার যে যেমন

> জায় করিয়া দিলেক তাহাকে তেমনি বেবাক দিয়া খ্বাজে পিৎরুস আরমানি দ্বারা মহারাজ দুর্লভরাম ও ফৌজ বকসী জাফরালী খাঁ ও জগৎ সেঠ মহতাবরায় ও তাঁহার ভ্রাতা মহারাজ স্বরূপচন্দ্র প্রভৃতি কথক প্রধান লোকেরদের সহিত সাহিত্য করিয়া অর্থ ও কিঞ্চিৎ সৈন্য সংগ্রহ করিয়া শরণাগত প্রতিপালনরূপ ধর্ম্মপতাকা উঠাইয়া যুদ্ধার্থে পলাশিতে গিয়া উপস্থিত হইলেন। (পৃ. ২৭১)

যুদ্ধে যা হবার তা তো হল। সিরাজ যুদ্ধক্ষেএ ছেড়ে পালালেন। পরে ধরা পড়লেন।

> তাহার পর ঐ জাফরালী খাঁর পুত্র মীরণ সাহেব লোকেরদিগকে ও মহারাজ দুর্লভরাম প্রভৃতিকে সম্বাদ না দিয়াই নবাব সিরাজদ্দৌলার মৃত্যু ভয়েতে নানাপ্রকার কাতরোক্তি না শুনিয়া আপন হস্তে নবাব সিরাজদ্দৌলাকে খণ্ড খণ্ড করিয়া ঐ ছিন্ন-শরীর হাতির ওপর চড়াইয়া শহর ভ্রমণ করাইয়া ঈশ্বরেচ্ছামতে নবাব মহাবৎজঙ্গের আপন মুনিবের পুত্র অথচ আপন মুনিব নবাব সরফরাজ খাঁকে কপটে মারিয়া নবাব হওয়ার ও অলীভাস্কর প্রভৃতি মহারাষ্ট্রেরদের সরদার লোকেরদিগকে কপটে কাটাইবার ও স্বয়ং সিরাজদ্দৌলার বলাৎকারে পরস্ত্রীদিগের আনয়ন প্রভৃতি দৌরাত্ম্যের প্রতি ফল লোকতঃ প্রকাশ করিল। (পৃ. ২৭৬)

ঈশ্বরেচ্ছার সহকারী হলেন মীরন, সিরাজ তাঁর দুষ্কর্মের ফল ভোগ করলেন। কিন্তু মীরনের পরিণাম কী হল?

> তদনন্তর নবাব মীরণ আজীমাবাদ হইতে মুরশিদাবাদে আসিতেছেন পথে রাজমহল মোকামে নবাব সিরাজদ্দৌলার সঙ্গে নিমখারামী করার ফলস্বরূপ বজ্রাঘাতে মরিলেন। এইরূপে নবাব মীরণ মরিলে পর তাহার কবরের ওপরেও দুইবার বজ্রাঘাত হইল। (পৃ. ২৮১)

আর মীরজাফর? 'এইরূপে নবাব জাফরালী খাঁ পুনর্বার দুই বৎসর সুবেদারী করিয়া সিরাজদ্দৌলার সঙ্গে নিমখারামীর ফল গলৎকুষ্ঠ রোগে অতিশয় ব্যামোহ পাইয়া মরিলেন।' (পৃ. ২৮৯)

ইতিহাসের প্রধান শক্তি দৈব। তার ক্রিয়ায় শেষ পর্যন্ত জয় হয় ধর্মের। এই বিশ্বাস নিয়েই মৃত্যুঞ্জয় বাংলার ইতিহাসের সাম্প্রতিকতম পর্বের কথা বলে তাঁর কাহিনী শেষ করছেন। তখন তাঁর অবস্থান কোম্পানিরূপ বৃক্ষের একেবারে নীচে আলবালের ভেতর—সেই কোম্পানি যে শরণাগতের প্রতিপালনের দায় কাঁধে নিয়ে ধর্মপতাকা উড়িয়ে পলাশির যুদ্ধ জিতেছে।

> এইরূপে নন্দবংশজাত বিশারদ অবধি শাহ আলম বাদশাহ পর্য্যন্ত ও মুনইম খাঁ নবাব অবধি নবাব কাসমলী খাঁ পর্য্যন্ত কোন কোন সম্রাট রাজারদের ও নবাবদের ও তাঁহারদের চাকর লোকেরদের স্বামিদ্রোহাদি নানাবিধ পাপেতে এই হিন্দুস্থানের বিনাশোন্মুখ হওয়াতে পরমেশ্বরের ইচ্ছামতে ঐ হিন্দুস্থানের রক্ষার্থ আরোপিত

কম্পানি বাহাদুরের অধিকার রূপ বৃক্ষের পুষ্পিতত্ত্ব ও ফলতত্ত্বের সমাবধায়ক যে বড় সাহেব তৎকর্ত্তৃক ঐ কম্পানি বাহাদুরের অধিকার রূপ বৃক্ষের আলবালতে নিরূপিত পাঠশালার পণ্ডিত শ্রীমৃত্যুঞ্জয় শর্ম্মাকর্ত্তৃক গৌড়ীয় ভাষাতে রচিত রাজতরঙ্গ নামে গ্রন্থ সমাপ্ত হইল। (পৃ. ২৯৪-৫)

মনে রাখা যাক, ঈশ্বরেচ্ছায় কোম্পানির অধিকার লাভ। উদ্দেশ্য প্রজার প্রতিপালন। সেই উদ্দেশ্য সাধিত না হলে, প্রজাপালনের পরিবর্তে উৎপীড়ন হলে, দৈবশক্তির ক্রিয়ায় রাজ্যাধিকার আবার অন্যের হাতে ন্যস্ত হবে, আবার ধর্মের জয় হবে।

৪

আধুনিক ইউরোপীয় ইতিহাসবোধ শিক্ষিত বাঙালির মনে গেঁথে যাওয়ার আগে পর্যন্ত এরকমই ছিল ঐতিহাসিক স্মৃতির গড়ন। মৃত্যুঞ্জয়ের রচনায় এই স্মৃতির একটা বিশেষ ধরনের প্রকাশ ঘটেছে যা অষ্টাদশ শতাব্দীর বাঙালি ব্রাহ্মণ-সমাজে প্রচলিত ধ্যানধারণার সঙ্গে সংগতিপূর্ণ। প্রশ্ন উঠতে পারে, প্রাক-ব্রিটিশ যুগের মুসলমান লেখকদের ইতিহাসচিন্তাও কি একই রকম ছিল? পাঠান বা মুঘল শাসকশ্রেণীর সঙ্গে যুক্ত দরবারের ঐতিহাসিকদের কথা এখানে উঠছে না, কারণ সে-সব তারিখ-সাহিত্য বাংলায় লেখা হতো না। বাঙালি মুসলমান লেখকদের মধ্যে ভারতবর্ষ বা বাংলার রাজারাজড়ার ইতিহাস নিয়ে যে-ধরনের রচনা প্রচলিত ছিল, তার একটা নমুনা দিলে দেখা যাবে যে ইতিহাসে দৈবশক্তির প্রভাব, কৃতকর্মের প্রতিফল এবং পরিশেষে ধর্মের জয়, এই লক্ষণগুলি সেখানেও সমানভাবেই উপস্থিত। নমুনাটির ছাপার সময় অবশ্য অনেক পরে, ১৮৭৫ সালে, কিন্তু পূর্ববঙ্গের গ্রামীণ কবিদের লেখা পুঁথিসাহিত্যের আদলটি এখানে এতই স্পষ্ট এবং ইউরোপীয় ইতিহাসশিক্ষার প্রভাব এমনই অনুপস্থিত যে ধরে নিতে অসুবিধা নেই, বরিশালের কবির ব্যবহৃত 'দীল্লির রাজাদির নাম' বিবৃত করার ছকটি অনেক দিনের প্রচলিত একটি ছক।[৫] 'শ্রীযুক্ত মুন্সী আলিমদ্দিন দ্বারায় বিরচিত নিবাস রুকন্দী থানে মেহেন্দিগঞ্জ' এই তালিকাটি শুরু হচ্ছে এইভাবে :

দীল্লিনাম কিহেতু হইল হিন্দুস্থান।
আদ্যন্ত নৃপতি গণ নির্ণয় বিধান ॥

এই নির্ণয় কিন্তু হিন্দু লেখকের পক্ষে করা সম্ভব নয়:

হিন্দুগণ চৌযুগী যে, কহয় তাহারে।
সর্ব্বত্রে মরম এরা বুঝিবারে নারে ॥
সত্য ত্রেতা দ্বাপরাদি কলি চারিযুগ।
হিন্দুতে রাজত্ব তথা করে সুখভোগ ॥

এই মুখবন্ধের পর 'সাহাআলম বাহাদুর বাদসাহেগাজী' পর্যন্ত ৫৯ জন বাদশাহের নামের তালিকা। কেবল নামেরই তালিকা; কোনও ঐতিহাসিক ঘটনা বা বাদশাহ

সম্পর্কে কোনও মন্তব্য, কিছুই নেই। তারপর ঘটল দৈবের এক আশ্চর্য কাণ্ড।

দৈবেতে ইংরাজ আইলেন এ আলয়।
করিলেন নবাবেরে যুদ্ধে পরাজয় ॥
ইংরাজ লইল রাজ্য বেশির পাইয়া।
তদবধি রাজত্ব মহারাণী ভিক্টোরিয়া ॥
কুমার সিংহের দফা সারিয়ে কোম্পানি।
ইজারা বর্খাস্তে এসে খাস মহারাণী ॥

১৮৫৭-র সব চেয়ে উল্লেখযোগ্য ঘটনা কুঁয়ার সিং-এর বিদ্রোহ দমন, এটাও বেশ আশ্চর্যের। এর পর মহারাণীর রাজত্বের স্তুতি এবং আধুনিক শিল্পের অদ্ভুত সব কাণ্ড-কারখানার ফিরিস্তি।

সাশিতের সীমা বিচারের একশেষ।
যাঁহার আমলে নাহি প্রজাদের ক্লেশ ॥
আছিল কড়ির চল দিল উঠাইয়া।
পয়সা হতে যথা যেই লইছে কিনিয়া ॥
ডাকেতে চালায় লোকে খবরাখবর।
গ্যাসের বাতিতে আলো করিল সহর ॥
আগ্বোটে মানিল হারি পিনিস্ আর নায়।
রেলেতে সপ্তাহ পথ দণ্ডকেতে যায় ॥
কলিকাতা বসিয়ে বিলাতে কে কি করে।
পলকেতে পায় তত্ত্ব তারের নির্ভরে ॥
ন্যায় বিচারে কার অন্যায় যদি হয়।
অপর আফিসে তাহা শুধরিয়ে লয় ॥

কিন্তু এমন যে সুশাসিত মহারাণীর রাজত্ব, তার পরমায়ু কতদিন?

প্রজাদের সুভাগ্যে রাজত্ব মহারাণী।
পরেতে প্রজার ভাগ্যে কি হয় না জানি ॥

বিশেষ করে ইংরেজরা যদি তুরস্ক অধিকার করে বসে, তা হলে এক সাংঘাতিক কাণ্ড ঘটবে।

যবে রূম আমল করিবেন সে রাণি।
মক্কা ও মদিনা বাকি রহিবেক জানি ॥
হাহাকার রাজ্যেতে হইবে উৎপাত।
সবজাত ভাঙিয়ে হইবে এক জাত ॥

কিন্তু তার পর নানা প্রলয়ংকর ঘটনার মধ্য দিয়ে আবার সুধর্মের প্রতিষ্ঠা হবে।

উত্তরিবে ইসানবি হইতে আকাশ।
পুনঃ মুসলমানি মত পাইবে প্রকাশ ॥
পূর্ব্ব কি পশ্চিম আদি উত্তর দক্ষিণ।
তবেসে হইবে খণ্ড প্রলয়ের চিন ॥
আয়াত কুদ্দিয়াতে এহেন নিরূপণ।
হাদিস হইতে যাহা উত্তম গণন ॥
পশ্চিমেতে উদয় হইলে দিবাকর।
তোবাদ্বার আবদ্ধ জানহ তদন্তর ॥
হাতেক দো উপরে উঠিয়া দিনমণি।
অস্ত হইবেক দীর্ঘ হইবে রজনি ॥
হবে রাত্র ছ সাত রাত্রের পরিমিত।
জাগিয়া ভাবিয়া লোক হইবে নিদ্রিত ॥...
হিজিরি সন তেরশত হইলে পূরণ।
চৌদ্দশত না পূরিতে জান সর্ব্বজন ॥
দেখিবেক যে সকল রহিবে জীবিত।
অধিক আশ্চর্য্যকাণ্ড হবে পৃথিবীত ॥

এর সঙ্গে তুলনীয়: 'তাহার পর পরিনাগার্জুন নামে এক রাজা হইবেন তাহার শক এই কলির ৮২১ বৎসর শেষ থাকা পর্য্যন্ত থাকিবে তাহার পর সম্ভল দেশে গৌত-ব্রাহ্মণের ঘরে কল্কিদেবের অবতার হইবে...' ইত্যাদি। ইতিহাসবোধের খুব একটা পার্থক্য আছে কি?

৫

পার্থক্যটা তা হলে এল কখন? স্বভাবতই ইংরেজি শিক্ষা, এবং আরও বিশেষ করে ইউরোপের ইতিহাস, রাষ্ট্রনীতি, সমাজনীতি ইত্যাদির চর্চা শিক্ষিত বাঙালির মধ্যে যখন চালু হল, তখনই ইতিহাসের গল্প বলার পুরনো ছকটা ভেঙে একটা নতুন ছক তৈরি হতে শুরু করল। তা ছাড়া আধুনিক ইউরোপীয়ের ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে ভারতবর্ষের ইতিহাসটা কেমন দেখাবে, সেটা ইউরোপীয় লেখকরা নিজেরাই ততদিনে আঁকতে শুরু করে দিয়েছেন। আঠারো-উনিশ শতকের সন্ধিক্ষণ থেকে যখন ইউরোপীয় পণ্ডিতদের মধ্যে প্রাচ্যবিদ্যা চর্চা চালু হল, তখন থেকেই আধুনিক বৈজ্ঞানিক প্রকরণ অবলম্বন করে ভারতবর্ষের সমাজ ও সভ্যতার ইতিহাস পুনরুদ্ধার করার কাজ শুরু হয়ে গেল।

ইংরেজি-শিক্ষিত বাঙালি প্রাচ্যবিদ্যা চর্চায় গোড়া থেকেই উৎসাহী ছিল। কলকাতার এশিয়াটিক সোসাইটি থেকে শুরু করে বহু প্রতিষ্ঠান সেই উৎসাহের সাক্ষ্য বহন করে চলেছে। কিন্তু মজার কথা হল, ইংরেজের লেখা ভারতবর্ষের ইতিহাস কিন্তু শিক্ষিত বাঙালি মনেপ্রাণে গ্রহণ করতে পারল না। প্রাচ্যবিদ্যার ফসল সে কিছু কিছু নিল, অনেক কিছুই নিল না। যা নিল, তাও সে সাজাবার চেষ্টা করল সম্পূর্ণ নতুন একটা ছকে। সেই ছকের সে নাম দিল 'জাতীয় ইতিহাস'। এই জাতীয় ইতিহাস রচনার প্রচেষ্টার সঙ্গে

জড়িয়ে রয়েছে আমাদের জাতীয়তাবোধেরও ইতিহাস।

এই প্রসঙ্গে উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধের দিকপাল ব্যক্তিদের রচনার সঙ্গে আমরা যথেষ্ট পরিচিত। অপেক্ষাকৃত অল্পখ্যাত লেখকদের কিছু উদাহরণ দেব এখানে। এঁদের লেখায় মৌলিকতা কম। বরং পণ্ডিতদের মধ্যে প্রচলিত ধারণাগুলিকে বৃহত্তর পাঠকগোষ্ঠী, বিশেষ করে বিদ্যালয়ের ছাত্রদের মধ্যে ছড়িয়ে দেওয়ার কাজটিই এঁরা আরও ভাল পারতেন। সুতরাং ব্যাপক অর্থে শিক্ষিত বাঙালির ধ্যানধারণার একটা ছবি এই জাতীয় বই থেকে পাওয়া যাবে, এটা মনে করা অসঙ্গত নয়।

১৮৫৭-৫৮ নাগাদ অনেকগুলো স্কুলপাঠ্য বাংলা ইতিহাসের বই প্রকাশিত হয়। সম্ভবত নবপ্রতিষ্ঠিত কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এনট্রান্স পরীক্ষার পাঠ্যসূচীর দিকে দৃষ্টি রেখে স্কুলের মাঝারি ক্লাসের জন্য লেখা হয়ে থাকবে এই বইগুলো। ততদিনে মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারের *রাজাবলি* প্রকাশিত হবার পর অর্ধশতাব্দী পেরিয়ে গেছে। ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের সাহেব ছাত্রদের বাংলা ভাষা ও সেইসঙ্গে দেশীয় ইতিহাস শেখাবার জন্য লেখা হয়েছিল সেই বই। এখন লেখা হতে লাগল বাঙালি ছাত্রদের শেখাবার জন্য সাহেবদের লেখা ভারতবর্ষের ইতিহাসের বঙ্গানুবাদ।

মার্শম্যানের বাংলার ইতিহাসের একটি খণ্ড অনুবাদ করেছিলেন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। অপর অংশটি বিদ্যাসাগরের অনুরোধে অনুবাদ করেন রামগতি ন্যায়রত্ন।[৮] মূল ইংরেজি বই-এর প্রভাব ফুটে উঠেছে এর ভাষাতেও। 'সুলতান সুজা বাঙ্গালার গভর্ণর হইয়া আগমন করিলেন', 'মুরশিদ জামাতাকে আপনার ডেপুটি করিয়া উড়িষ্যাতে পাঠাইয়া দেন'—প্রশাসনিক শব্দের ব্যবহারই জানিয়ে দিচ্ছে যে এই ইতিহাসের রচয়িতা ইংরেজ। কিন্তু তা সত্ত্বেও আলিবর্দি খাঁ-র আমলে মারাঠা আক্রমণের বিবরণ দিয়ে বই যেখানে শেষ হচ্ছে, সেখানে কিন্তু রামগতি পরবর্তী ইতিহাসের আকস্মিকতার কিছুটা আভাস দিয়ে রাখা প্রয়োজন বলে মনে করছেন।

> তৎকালে [মহারাষ্ট্রীয়দিগের] এতাদৃশ প্রাদুর্ভাব হইয়াছিল যে তাঁহারাই এই দেশের অধীশ্বর হইবেন বলিয়া সকলে সম্ভাবনা করিত। কিন্তু দৈবের কি অনির্ব্বচনীয় মহিমা! যাঁহারা এই দেশে কেবল সামান্য রূপ বাণিজ্য করিতে আসিয়াছিলেন; মধ্যে মধ্যে যাঁহাদের এদেশ পরিত্যাগ করিয়া যাইবার সম্পূর্ণরূপ সম্ভাবনা হইত; যাঁহাদের এদেশের রাজা হওয়া স্বপ্নেরও অগোচর ছিল সেই ইঙ্গরেজরা আলীবর্দ্দির সিংহাসনারূঢ় সিরাজউদ্দৌলাকে রাজ্যভ্রষ্ট করিয়া ক্রমে ক্রমে ভারতবর্ষের প্রায় একেশ্বর হইয়া উঠিয়াছেন। (পৃ. ১৭৯-৮০)

১৮৫৯-এ যা দৈবের মহিমা, তার দু-বছর আগেই এক চরম সংকটমুহূর্তে যে ইংরেজ রাজত্বের প্রতি শিক্ষিত বাঙালি জানিয়েছিল পরিপূর্ণ আস্থা, ১৮৬৯-এ এক 'মেড ইজি' গোছের বইতে দেখছি[৯] সেই ইংরেজ রাজত্ব প্রতিষ্ঠার উপায় সম্বন্ধেই সন্দেহ প্রকাশ করা হচ্ছে। 'ক্লাইব কিরূপে জয়ী হল?—যদি মীরজাফর কৃতঘ্নতা পূর্ব্বক ক্লাইবকে বঞ্চনা না করিতেন, তাহা হইলে ক্লাইবের জয়লাভ সহজ হইত না।' (পৃ. ১১০-১) অথবা পরবর্তী ইংরেজ শাসনকর্তাদের ন্যায়নিষ্ঠা নিয়ে প্রশ্ন: 'নন্দকুমারের প্রাণবধ কি ন্যায়ানুসারে বিহিত

হইয়াছিল?—তাঁহার অপরাধ কোন মতেই প্রাণদণ্ডের উপযুক্ত নহে, কেবল দুরাচার হেস্টিংসের অন্যায় অনুরোধে প্রধান জজ ইলাইজা ইম্পি ঐ মহাপাপের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন।' (পৃ. ১২৬-৭)

১৮৭২-এর এক *শিশুপাঠ বাঙ্গালার ইতিহাস*-এ আবার পাচ্ছি সেই ষড়যন্ত্র আর বিশ্বাসঘাতকতার কাহিনী। লেখক ক্ষেত্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিচারে সিরাজ অত্যাচারী ছিলেন ঠিকই, কিন্তু অন্ধকূপ হত্যার জন্য তিনি দায়ী ছিলেন না। অথচ তাঁরই বিরুদ্ধে পাতা হল ষড়যন্ত্রের জাল। মীরজাফর সম্বন্ধে সিরাজ সন্দিহান ছিলেন। 'তিনি সেনাপতি মীরজাফরকে কোরাণ স্পর্শ করাইয়া দিব্য করান। তাহাকে সেনাপতি "আমি কখন কৃতঘ্ন হইব না" এই কথা বলেন।' (পৃ. ২০) মীরজাফর প্রতিশ্রুতি রাখলেন না, যুদ্ধক্ষেত্রে বিশ্বাসঘাতকতা করলেন।

> মোহনলাল নামক নবাবের অন্য একজন সেনাপতি ঘোরতর যুদ্ধ করিয়াছিলেন। যদি এই যুদ্ধ আর কিছুক্ষণ চলিত, তাহা হইলে ক্লাইবকে নিশ্চয় হারিতে হইত। কিন্তু তৎকালে রাজলক্ষ্মী ইংরাজদিগের ভাগ্যে প্রসন্ন থাকায়, মীরজাফরের বিশ্বাসঘাতকতায় নবাব পরাজিত ও ক্লাইব জয়ী হইলেন। (পৃ. ২২)

ক্ষেত্রনাথের ঘৃণা প্রধানত মীরজাফর ও মীরণের প্রতি। 'মীরজাফর নিষ্ঠুর, নির্ব্বোধ, অর্থলোভী ও অকর্ম্মণ্য ছিলেন। তিনি নবাব হইয়া প্রধান প্রধান হিন্দুদিগের সর্ব্বস্ব হরণ মানস করেন।' (পৃ. ২৭) 'মীরণ অতি নরাধম ও নির্ব্বোধ এবং নিষ্ঠুর, সে এরূপ দুরাত্মা ছিল যে তার অত্যাচারে লোকেরা, সিরাজের সমুদায় কুব্যবহার ভুলিয়া যায়।' (পৃ. ৩১)

মীরকাসিমের বেলাতেও সেই একই বিশ্বাসঘাতকতার কাহিনী। মীরকাসিম যেমন

> সকল জিনিষের মাশুল উঠাইয়া দিলেন। ইহাতে কি ইংরাজ, কি বাঙ্গালী সকলকেই সমান করা হইল, এবং পূর্ব্বে ইংরাজ ভিন্ন অপরাপর লোকদের ব্যবসাতে অনেক হানি হইত, এরূপ হওয়াতে তাহাদের লাভ হইতে লাগিল। ইহাতে ইংরাজেরা তাঁহার উপর রাগিয়া উঠিলেন ও যুদ্ধ করিতে ইচ্ছুক হইলেন।...মীরকাসিমের যে সৈন্য বাঙ্গালার সমুদায় রাজার সৈন্য অপেক্ষা উৎকৃষ্ট, তাহারা যে কোন যুদ্ধে জয় লাভ করিতে পারিল না, অবশ্যই ইহার কোন গুপ্ত কারণ ছিল, তাহার কোন সন্দেহ নাই। গার্গিনের বিশ্বাসঘাতকতাই তাহার প্রধান কারণ। (পৃ. ৩৪-৫)

ওদিকে দিল্লির সম্রাটের অবস্থা তখন করুণ।

> সম্রাট এই সময়ে বড় দুরবস্থায় পড়িয়াছিলেন, এমনকি, তাঁহার নিজের রাজধানী পর্য্যন্ত পরের হস্তগত ছিল। বসিবার সিংহাসন ছিল না। ইংরাজদিগের খানা খাইবার টেবেল এক্ষণে তাঁহার সিংহাসন হইল। সমুদায় ভারতবর্ষের সম্রাট তাহাতে বসিয়া ইংরাজদিগকে তিন প্রদেশের দেওয়ানীর সহিত তিন কোটি প্রজা অর্পণ করিলেন। যে দিল্লীর সম্রাটের জাঁকজমকের পরিসীমা ছিল না, যাঁহার প্রতাপে সমুদায় ভারতবর্ষ

কম্পিত হইয়াছিল, এক্ষণে সেই সম্রাটের এরূপ অবস্থা অবশ্যই দুঃখজনক তাহার আর সন্দেহ নাই। (পৃ. ৪১)

শুধু রাজ্য দখলেই নয়, রাজ্যচালনাতেও ইংরেজরা প্রায়শই চক্রান্ত আর বলপ্রয়োগের রাস্তা নিত।

ক্লাইব এইরূপে রাজ্যে সুনিয়ম স্থাপন করায়, দেশীয় দিগের উপর যে দৌরাত্ম্য হইতেছিল তাহার অনেক কম হইয়া আসে। ইহার পূর্ব্বে ইংরাজেরা দেশীয় লোকদিগের উপর এমনি অত্যাচার করিয়াছিলেন যে, তাহাতে সমুদায় বাঙালিরা ইংরাজদের নাম শুনিয়া ঘৃণা করিতেন।...ক্লাইব চলিয়া গেলে, কোম্পানির কার্য্যের আবার গোলযোগ ঘটিতে লাগিল। (পৃ. ৩৯)

নন্দকুমারের বিরুদ্ধে চক্রান্তের জন্য হেস্টিংস 'সকলেরই নিকট এবং ইতিহাস মধ্যে অতিশয় ঘৃণিত হইয়া রহিয়াছেন।' (পৃ. ৫৯) ১৮৫৭-তে সিপাহিরা যেমন ইংরেজদের ওপর অত্যাচার করেছিল, 'বিদ্রোহ শান্তির সমকালে খ্রীষ্টধর্ম্মাভিমানী ইংরাজেরাও বিপক্ষদিগের অপকারের প্রতিশোধ ও আপনাদের হিংসাবৃত্তি চরিতার্থ করিবার জন্য ফাঁসী কাষ্ঠে বদ্ধ মৃতদেহের অভ্যন্তর হইতে যকৃত বাহির করিয়া অগ্নিতে দগ্ধ করেন।' (পৃ. ৯৮)

কিন্তু সিপাহিদের বিদ্রোহ দমন করার পরেও যে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হল, তা নয়।

কোন কালেই গরিবের ও দুর্ব্বলের মা বাপ নাই। সকল স্থানের গোলযোগ চুকিয়া গেলে, বাঙ্গালায় একটী হুলস্থুল কাণ্ড ঘটিয়া উঠিল। ঐ সময়ে বাঙ্গালার নীল প্রধান দেশে নীলকর সাহেবদের কার্দ্দানী বাড়িতে লাগিল। তাহারা গরিব প্রজাদিগের প্রতি যেরূপ নিষ্ঠুর ব্যবহার করিয়াছিল, তাহাতে তাহাদিগকে কখনোই মানুষের মধ্যে গণনা করা যাইতে পারে না। (পৃ. ১০০)

সত্যি কথা বলতে কি, ইংরেজ রাজত্বের ইতিহাস লিখতে গিয়েই কিন্তু ইংরেজিশিক্ষিত বাঙালির ইতিহাসচিন্তা থেকে ঈশ্বর, ধর্ম, ন্যায়নীতি ইত্যাদি মাপকাঠিগুলো লোপ পেয়ে গেল। চূড়ান্ত নীতিহীনতার আশ্রয় নিয়েও যে ক্ষমতা দখল এবং ভোগ করা যায়, বাংলার সাম্প্রতিক ইতিহাস যেন সেই সত্যটাকেই হাজির করে দিল ইউরোপীয় শিক্ষায় আলোকপ্রাপ্ত বাঙালির কাছে।

১৮৭০-এ প্রকাশিত কৃষ্ণচন্দ্র রায়-এর জনপ্রিয় পাঠ্যবই-এর[*] নবম সংস্করণে দেখছি ইংরেজের রাজত্ব লাভের কাহিনীটিকে সম্পূর্ণ নীতিবিগর্হিত ক্ষমতার লড়াই হিসেবে উপস্থিত করা হয়েছে। যেমন উমিচাঁদের সঙ্গে ক্লাইভের প্রতারণা: 'ক্লাইবের এই কার্যটী অতিশয় গর্হিত বলিয়া সকলেই তাঁহার নিন্দা করিয়া থাকেন। কিন্তু তাঁহার মতে শঠের সহিত শঠ্যতা করায় কোন পাতিত্য নাই "শঠে শাঠ্যং সমাচরেৎ"।' (পৃ. ৪৩-৪)

অথবা ১৭৭২ সালে সরাসরি গভর্নর কর্তৃক রাজস্ব আদায়ের ব্যবস্থার প্রবর্তন :

'জোর যার মুলুক তার'। এই অবধি কোম্পানির দেওয়ানত্ব গিয়া প্রকৃত পক্ষে রাজত্ব আরম্ভ হইল। সম্রাট সবল থাকিলে এই কর রহিত করা উপলক্ষে তুমুল কাণ্ড ঘটিত। কিন্তু এখন আর তাঁহাতে কিছুই ছিল না; সুতরাং হেস্টিংস যাহা মনে করিলেন তাহাই হইল। (পৃ. ৭০)

সিরাজউদ্দৌলার রাজত্ব সম্বন্ধে মৃত্যুঞ্জয়ের লেখায় যে সুস্পষ্ট ঘৃণার ভাব ছিল, কৃষ্ণচন্দ্রে তার কিছুই নেই। বরং সিরাজের কার্যকলাপের একটা রাজনৈতিক ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে। যেমন ইংরেজরা যখন কলকাতার দুর্গ সংস্কার শুরু করল, সিরাজ তা ভেঙে ফেলার আদেশ দিলেন।

কোন্ রাজাই বা বিদেশীয় লোককে আপনার অধিকার মধ্যে দুর্গ নির্ম্মাণ করিতে দেন?...কোথা হইতে কতগুলা বণিক আসিয়া তাঁরই অধিকার মধ্যে থাকিয়া তাঁহারই আদেশ অমান্য করিতেছে, এ অবমাননা আর সহ্য হইল না; ক্রোধ উদ্বেল হইয়া উঠিল। (পৃ. ৩৮)

কিংবা অন্ধকূপ হত্যা।

সিবাজউদ্দৌলা কি অশুভক্ষণেই কলিকাতায় পদার্পণ করিয়াছিলেন, তিনি এই অন্ধকূপ-হত্যার বিন্দু বিসর্গও জানিতেন না, তাঁহার আজ্ঞানুসারে কিছু ইংরেজ বন্দী দিগের ঐ কারাবাস নির্দ্দিষ্ট হয় নাই, অথচ ইহা হইতেই তাঁহার সর্বনাশ উপস্থিত হইয়াছিল। নিতান্ত মদমত্ততা প্রযুক্ত তিনি মার্জ্জার ভ্রমে ব্যাঘ্র শরীরে হস্তার্পণ করিয়াছিলেন। শেষে সেই অজ্ঞানতাদোষে স্বয়ং রাজ্যভ্রষ্ট ও প্রাণে নষ্ট হইয়া আপন বংশের দুর্দ্দশার একশেষ ঘটাইলেন। বলিতে কি. কলিকাতার এই অন্ধকূপ হত্যা ঘটাতেই ভারতভূমিতে ইংরেজ অভ্যুদয়ের সূত্রপাত হইয়াছিল। (পৃ. ৪০)

সিরাজের পতনের কারণ অধর্মাচরণ নয়, নিছক অজ্ঞানতা। আর সে অজ্ঞানতা কী? বেড়াল ভেবে বাঘের গায়ে হাত দেওয়া।

ইতিহাস এখন দৈবশক্তির লীলাক্ষেত্র কিংবা ধর্মাধর্মের যুদ্ধ থেকে নিছক ক্ষমতার লড়াইয়ে পরিণত হয়েছে। ইংরেজ রাজত্বের সূত্রপাত এখন আর দৈবের অনির্বচনীয় মহিমা নয়। কোন রাজনৈতিক অবস্থায় ইংরেজের জয়লাভ অসম্ভব করে তোলা যেত, শিক্ষিত বাঙালি এখন তাই নিয়েও প্রশ্ন তুলছে।

যদি এদেশ এক জন প্রবল অধিপতির অধীন থাকিত, অথবা স্থানে স্থানে যাঁহারা প্রভু ছিলেন, তাঁহাদের পরস্পর একতা এবং প্রণয় থাকিত, তাহা হইলে ইংরেজরা এদেশে কদাপি ঈদৃশ প্রভাবশালী হইতে পারিতেন না, তাহা হইলে এদেশ অদ্যাপি মুসলমান রাজাদিগেরই অধিকৃত থাকিত। হয়ত এদেশে কেহই ইংরেজদিগের নামও শুনিতে পাইত না। (পৃ. ২১৯)

বই শেষ হচ্ছে ইংরেজ রাজত্বের সুফলের একটা ফিরিস্তি দিয়ে, কিন্তু তাতে যে

রাজত্বলাভের নৈতিক দাবি প্রতিষ্ঠিত হয় না, সে ইঙ্গিতও কৃষ্ণচন্দ্র দিচ্ছেন বেশ খোলাখুলিই। 'সে যাহা হউক, যে উপায়ে ইংরেজদিগের এই সুবিস্তীর্ণ রাজ্য উপার্জিত হইয়া থাকুক না কেন, বস্তুত তাঁহাদের দ্বারা এদেশের অশেষবিধ হিত সম্পাদিত হইয়াছে একথা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবেক।' (পৃ. ২৩৮) জাতীয়তাবাদী ইতিহাসের দোরগোড়ায় পৌঁছে গিয়েছি আমরা।

১৮৭৬ সালে প্রকাশিত ক্ষীরোদচন্দ্র রায় চৌধুরির বই-এর[১১] বিজ্ঞাপনেই লেখা থাকছে: 'ইংরাজী ইতিহাসের অনুবাদ পাঠ করিয়া যাঁহাদিগের ভ্রান্তি জন্মিয়াছে তাঁহাদিগের জন্য এই পুস্তকখানা লিখিয়াছি।' আধুনিক ইউরোপীয় জাতীয় ইতিহাস-রচনার সারমর্মটি ক্ষীরোদচন্দ্রের মনে কতটা দাগ কেটেছে তার প্রমাণ ইউরোপীয় ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রগুলির পারস্পরিক সম্পর্ক নিয়ে তাঁর এই মন্তব্যটি:

ফরাসি ও ইংরাজেরা চিরদিন পরস্পরের বিদ্বেষী। ভারতবর্ষে মোগল পাঠানের কলহ যেমন প্রবাদ মধ্যে পরিগণিত হইয়া পড়িয়াছে, ইয়োরোপে ইংরাজ ও ফরাসির বিদ্বেষ সেই রূপ গণ্য হয়। সুতরাং ভারতবর্ষেও যে তাহারা পরস্পরকে পীড়ন না করিয়া নির্ব্বিবাদে এক স্রোতের জলপান করিবে কেহ বিশ্বাস করে নাই। (পৃ. ১১৫)

বই শেষ হচ্ছে এই মন্তব্য দিয়ে:

> সামান্য বণিকভাবে ভারতবর্ষে বাণিজ্য করিতে আসিয়া ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি ঘটনা স্রোতে বিংশতি কোটী প্রজার অধীশ্বর হইয়া উঠেন, এবং কোম্পানির অংশীদারেরা লক্ষপতি ও ক্রোরপতি হইয়া বিদেশীয় বিভিন্ন জাতির রীতি নীতির স্থাপয়িতা হইয়া দাঁড়ান। পৃথিবীর অন্য কোন দেশে এরূপ অমানুষী ঘটনা আর হয় নাই। (পৃ. ২১১)

৬

মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারের লেখা আলোচনা করতে গিয়ে বলেছিলাম, তাঁর অবস্থান প্রজার অবস্থান। ক্ষেত্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্বন্ধেও একই কথা বলা যায়। কিন্তু এই দুই প্রজা সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকৃতির। সত্তর বছরের মধ্যে শিক্ষিত বাঙালি নামক জীবটি অনেক বদলে গেছে। ক্ষেত্রনাথের সময় সে নিজেকে ইউরোপের 'মিডল ক্লাস'-এর অনুকরণে 'মধ্যবিত্ত' বলে পরিচয় দিতে শুরু করেছে। শুধু যে বিত্তের দিক দিয়েই সে মধ্যবর্তী, তাই নয়। সামাজিক কর্তৃত্বের ক্ষেত্রেও সে এখন মধ্যস্থের ভূমিকা নিয়েছে। যারা বিত্তশালী, সমাজের মাথা হিসেবে স্বীকৃত, তারা যে কর্তৃত্ব করার পক্ষে অযোগ্য—নতুন মধ্যবিত্ত এই অভিযোগ এনে হাজির করেছে সমাজের সামনে। অন্যদিকে যারা দরিদ্র, অত্যাচারিত, তাদের হয়ে বলার দায়িত্বটাও সে তুলে নিয়েছে নিজের ঘাড়ে। এখন মধ্যস্থ হওয়ার অর্থ, একদিকে শাসকবর্গের বিরোধিতা, অন্যদিকে প্রজাবর্গের নেতৃত্ব। প্রজা হয়েও ক্ষেত্রনাথের সমসাময়িক শিক্ষিত মধ্যবিত্ত কিন্তু চৈতন্যের স্তরে অন্তত নিজেকে রাষ্ট্র চালনার উপযুক্ত বলে ভাবতে শুরু করেছে।

সেই সঙ্গে আধুনিক রাষ্ট্রব্যবস্থার মূল নীতিগুলিও গভীর ভাবে গেঁথে গেছে তার মনে। দেশের পুরনো সমাজব্যবস্থা যে কাম্য নয়, তার আমূল পরিবর্তন প্রয়োজন, এই

বিশ্বাস ইংরেজি-শিক্ষিত বাঙালি মধ্যবিত্তের মধ্যে ততদিনে প্রায় সর্বজনীন হয়ে গিয়েছিল। কথাটা মনে রাখা দরকার, কারণ উনিশ শতকের শেষদিকে এসে সমাজচিন্তার যে ধারাটিকে 'সনাতনপন্থী' বা 'রক্ষণশীল' বলা হয়, হিন্দুধর্মের পুনর্জাগরণ আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত যে ধারা, তার নেতারাও যে প্রবলভাবে সংস্কারপন্থী এবং হিন্দুসমাজের আধুনিকীকরণের প্রবক্তা, এ-কথাটা আমরা প্রায়ই ভুলে যাই। তথাকথিত 'উদারপন্থী' আর 'রক্ষণশীল'দের মধ্যে অন্য যা-ই তফাত থাকুক, পুরনো সমাজকে বদলে আধুনিক জগতের উপযোগী করে তুলতে হবে, এ-বিশ্বাস দুজনের মনেই সমান দৃঢ় ছিল।

উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধের অসংখ্য গৌণ লেখকদের নিতান্ত মামুলি রচনা পড়লেও এই নতুন মূল্যবোধের কথা পাওয়া যাবে। সামাজিক কর্তৃত্বের বেলায় যেমন একটা নতুন ধারণা চালু হয়ে গিয়েছিল—সমদর্শিতা। ১৮৬৬ সালে তারাকৃষ্ণ হালদার নামে একজন বারাণসী থেকে নানা সামাজিক বিষয়ে একটি প্রবন্ধের বই লেখেন।[১১] নিঃসন্দেহে রক্ষণশীল হিন্দু। 'যুবতীগণের প্রতি ব্যবহার বিষয়ক' প্রবন্ধে তিনি লিখছেন, 'কি গৃহমধ্যে কি অন্য স্থানে, কোন খানেই কোন যুবতী যেন একাকিনী অবস্থান করিতে না পান।' (পৃ. ৬৯) অথচ তিনি পণপ্রথার বিরোধী, কুলীনবিবাহের বিরোধী। এই তারাকৃষ্ণ 'রাজভক্তি বিষয়ক' প্রবন্ধে লিখছেন,

> পূর্ব্বকালে যখন এই দেশ হিন্দুজাতির শাসনাধীন ছিল তখন রাজগণের পক্ষপাতিতা দোষে জাতি বিশেষ অপর সমস্ত জাতির উপর সম্পূর্ণ প্রভুত্ব করিতেন, ঐ সকল জাতিকে স্বর্গ বা নরকগামী করণের কর্ত্তা ছিলেন। ...যখন এই রাজ্য যবনদিগের হস্তে ছিল তখন তাঁহারা হিন্দুবর্গকে নাস্তিক ও অধার্ম্মিকের শেষ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন। স্বজাতি প্রজাবর্গের প্রতি যাবতীয় বিষয়েই অনুগ্রহ, হিন্দু প্রজাদিগের প্রতি সর্ব্বতোভাবেই নিগ্রহ করিতেন। ...ব্রিটিস জাতির রাজনিয়মাবলীতে এ সকল দোষের লেশও নাই, তাঁহারা আপন জাতীয় ধর্ম্মোপদেষ্টাকে এবং এ দেশস্থ ডোমপ্রভৃতি যৎপরোনাস্তি নীচ ব্যক্তিকে বিচারকালে সমান দেখেন। ...ঐ জাতির পক্ষপাতশূন্যতা গুণের অধিক প্রশংসা কি করিব? (পৃ. ১৩৪-৬)

এখান থেকে এক ধাপ এগিয়ে গেলেই পরের কথাটা পেয়ে যাচ্ছি। বর্তমান হিন্দু সমাজের যে জীর্ণ অধঃপতিত অবস্থা, তার কারণই মুসলমান শাসন। ১৮৭৬-এ ভোলানাথ চক্রবর্তী নামে একজন বক্তৃতা দিচ্ছেন:[১১]

যে দিন যবনের উষ্ণীষ বঙ্গ রাজ্যে প্রবেশ করে, সেই দিন হইতেই এদেশের দুর্ভাগ্য ও অবনতির সূত্রপাত হয়। নিষ্ঠুর যবনশাসনে এদেশ ক্রমশঃ উৎসন্ন হইয়া যায়। যেমন এক প্রবল বাত্যা আসিয়া বন উপবন ভগ্ন ও হতশ্রী করে, সেই রূপ নৃশংস দুরাচার যবন জাতি আসিয়া আমাদের জন্মভূমি বঙ্গভূমির সমুদায় সুখসৌভাগ্য বিনষ্ট করিয়াছিল। অজস্র অত্যাচার স্রোত সহ্য করিয়া—নিরন্তর নিপীড়িত হইয়া বঙ্গ সন্তানেরা নিতান্ত নির্বীর্য ও হীনসাহস হইয়া পড়ে। ধর্ম্ম বিকৃত ভাব ধারণ করে। স্ত্রীশিক্ষা একেবারে রহিত হয়। যবনাক্রমণ নিবারণ জন্য স্ত্রীজাতিকে নিভৃত নির্জ্জন গৃহে রুদ্ধ করিয়া রাখা হইতে

লাগিল। এক সময় দেশের এমনি দুরবস্থা ঘটিয়াছিল, যে, ধনীর ধন, মানীর মান ও সতীর সতীত্ব সমূহ বিপদের কারণ হইয়া উঠিয়াছিল। (পৃ. ১০)

জাতীয়তাবাদী ইতিহাসের কাঠামোর অর্ধেকটা পেয়ে গেলাম এখানে। আদিতে জাতির ইতিহাস ছিল গৌরবের আলোয় উজ্জ্বল—ধন, বল, বিদ্যা, ধর্ম, সব দিক দিয়েই সভ্যতার চরম উৎকর্ষে পৌঁছেছিল সে। এখানে জাতি বলতে কখনো বাঙালি, কখনো হিন্দু, কখনো আর্য, কখনো ভারতবর্ষীয়, যে-কোনও একটা বলা যেতে পারত, কিন্তু যুক্তিব কাঠামোটা একই। তার পর এল জাতির অবক্ষয়ের যুগ। অবক্ষয়ের কারণ মুসলমান শাসন, অর্থাৎ জাতির পরাধীনতা। জাতীয়বাদী ইতিহাসের এই কাঠামোর বাকি অংশটা ভোলানাথ চক্রবর্তীর লেখায় পাচ্ছি না। কারণ জাতীয় সমাজের সংস্কার এবং পুনরুজ্জীবনের কথা বললেও, এই সংস্কারের সম্ভাবনা তাঁর মতে একান্তভাবেই ইংরেজ শাসনের ওপর নির্ভরশীল।

> সকল বিষয়েরই সীমা আছে। যখন মুসলমানদিগের অত্যাচার নিতান্ত অসহ্য হইয়া উঠিল, তখন জগদীশ্বর তাহা হইতে পরিত্রাণের উপায় বিধান করিলেন। ...যে দিন এদেশে বৃটিশ পতাকা প্রথম উড্ডীন হয়, সেই দিন হইতেই এদেশের পুনঃ সৌভাগ্যের সূত্রপাত হইয়াছে। বলুন দেখি, যদি এ পর্য্যন্ত যবনাধিকার অব্যাহত থাকিত, তবে আজ দেশের কি দশা ঘটিত? অতএব একথা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতে হইবে যে পরমেশ্বরের মঙ্গলের জন্য ইংরাজ জাতিকে এদেশে আনয়ন করিয়াছেন। বৃটিশ অধিকারে যবনদিগের অত্যাচার নিবারিত হইয়াছে। ...যবন শাসনের সহিত বৃটিশ শাসনের তুলনাই হইতে পারে না। অন্ধকার ও আলোকে যত অন্তর, দুঃখ ও সুখে যত প্রভেদ, যবন শাসন ও বৃটিশ শাসনে তদপেক্ষাও অধিক প্রভেদ প্রতীয়মান হয়। (পৃ. ১১-২)

অবশ্য ভোলানাথ চক্রবর্তী না মানলেও, ১৮৭০-এর দশকে জাতীয়তাবাদী ইতিহাসের যুক্তির বাকি অংশটুকুও যথেষ্ট চালু হয়ে গিয়েছে। তারিণীচরণ চট্টোপাধ্যায়ের *ভারতবর্ষের ইতিহাস*-এর অষ্টাদশ সংস্করণ বেরোয় ১৮৭৮ সালে।[১৩] তারিণীচরণ (১৮৩৩-১৮৯৭) ছিলেন কৃষ্ণনগর কলেজের ছাত্র, সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপক এবং সমাজ-সংস্কারক। তাঁর লেখা স্কুলপাঠ্য ইতিহাস আর ভূগোলের বই অত্যন্ত জনপ্রিয় ছিল। *সংক্ষিপ্ত ইতিহাস, ইতিহাসের প্রশ্নোত্তর* ইত্যাদি নামে সমসাময়িক অন্য অনেক স্কুলপাঠ্য বই-এ দেখা যাচ্ছে তারিণীচরণেরই সংক্ষিপ্তসার। অনেক সময় হুবহু উদ্ধৃতি। এই বইটি থেকে ভারতবর্ষের ইতিহাসের নানা কাহিনী একটু বিস্তারিতভাবে উপস্থিত করতে চাই। তা হলে আজকের উগ্রহিন্দু প্রচারের মালমসলা জাতীয়তাবাদী ইতিহাস রচনার ভেতর তার জন্মলগ্ন থেকেই কীভাবে সঞ্চিত হয়ে এসেছে, তার একটা পরিচয় পাওয়া যাবে।

৭

প্রথম বাক্যেই চমক লাগে। 'ভারতবর্ষ ক্রমান্বয়ে হিন্দু, মুসলমান ও খৃস্টানদিগের অধিকৃত হইয়াছে, এবং তদনুসারে এদেশের ইতিবৃত্ত হিন্দু, মুসলমান ও খৃস্টান এই তিন রাজত্বকালে বিভক্ত।' (পৃ. ১) *রাজাবলি* থেকে *দেশের ইতিহাস* এ উদ্ধরণটি লক্ষণীয়। 'রাজাবলি' আর লেখা হবে না, এখন থেকে যা লেখা হবে সবই 'দেশের ইতিবৃত্ত'। কিন্তু এই যে দেশের ইতিবৃত্ত, তার পর্ব ভাগ করা হল রাজত্বের চরিত্র অনুযায়ী। আর রাজত্বের চরিত্র নির্ধারিত হচ্ছে শাসকের ধর্ম অনুসারে। দেশ আর রাজত্বের মধ্যে সম্বন্ধ এখানে নিত্য এবং অভেদ্য। শুধু তাই নয়, আপাতদৃষ্টিতে নানা সময় নানা রাজ্য আর রাজা দেখতে পাওয়া গেলেও, প্রকৃত অর্থে রাজত্ব একটিই। তা দেশেরই সমব্যাপী। তার চিহ্ন রাজধানী অথবা সিংহাসন। অন্যভাবে বলতে গেলে, রাজত্ব হল দেশের সার্বভৌমত্বের প্রকাশ; রাজধানী বা সিংহাসন সেই সার্বভৌম রাষ্ট্রক্ষমতার কেন্দ্র। দেশটা যেখানে ভারতবর্ষ, তার সমব্যাপী 'সার্বভৌমত্ব' তাহলে একটিই। সেই সার্বভৌমত্বের চিহ্নস্বরূপ কেন্দ্রও একটিই। তা না হলে মুহম্মদ ঘুরি পৃথ্বীরাজকে পরাজিত করে দিল্লি দখল করলেন, তাতে সমগ্র ভারতবর্ষের ইতিহাসের পর্ব বদলে যাবে কেন? অথবা পলাশির যুদ্ধকে মুসলমান রাজত্বের অবসান এবং খ্রিস্টান রাজত্বের সূত্রপাত বলব কেন? দেশ বা জাতি, সার্বভৌমত্ব, রাষ্ট্র—আধুনিক ইউরোপের ইতিহাসে এই তিনটি ধারণার মধ্যে যে অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক ইতিমধ্যেই প্রতিষ্ঠিত হয়ে গিয়েছে, ইংরেজি-শিক্ষিত বাঙালির মনেও তা এবার আশ্রয় পেল।

ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গির আধুনিকতার আর-একটি দৃষ্টান্ত পরের পৃষ্ঠাতেই পাওয়া যাবে। 'অধুনা যে সকল সংস্কৃত গ্রন্থ পাওয়া যায়, তাহার অধিকাংশই কাব্য ও কল্পিত উপন্যাসে পূর্ণ; *রাজতরঙ্গিনী* ভিন্ন একখানিও প্রকৃত পুরাবৃত্ত দেখা যায় না।' (পৃ. ২) প্রকৃত পুরাবৃত্ত কাকে বলে, তা অবশ্য ততদিনে ইউরোপীয় ইতিহাসবিদেরা স্থির করে দিয়েছেন। 'ভারতের প্রকৃত পুরাবৃত্ত নাই', এটা সাহেবদের ভারতবিদ্যাচর্চার একটা বিশেষ আবিষ্কার। মৃত্যুঞ্জয়ের এমন কথা কখনো মনে হয় নি। তারিণীচরণ কিন্তু নিঃসঙ্কোচে মেনে নিয়েছেন কথাটা।

এর পর ভারতবর্ষের অধিবাসীদের কথা।

> অতি প্রাচীন সময়ে ভারতবর্ষে, পরস্পর অতিশয় বিভিন্ন, দুই সম্প্রদায়ের লোকের বসতি ছিল। তন্মধ্যে এক সম্প্রদায় শরীরের দৈর্ঘ্য ও গঠন প্রভৃতি বিষয়ে আমাদের অনেক অনুরূপ। অধুনা সেই সম্প্রদায়ের সন্ততি হিন্দু নামে খ্যাত। অন্য সম্প্রদায়ের লোকেরা খর্ব্বাকার, কৃষ্ণবর্ণ ও অতিশয় অসভ্য ছিল। ইদানীং ইহাদের সন্ততি খস, ভিল্ল, পুলিন্দ, সাঁওতাল প্রভৃতি জঙ্গলা জাতি নামে পরিচিত। (পৃ. ২)

আদিতে ভিন্ন, কিন্তু পরে মিশে গেছে, এমন সম্প্রদায়ও ছিল। হিন্দুদের মধ্যে প্রথম তিন বর্ণ দ্বিজ নামে পরিচিত, কিন্তু শূদ্রেরা ঐ নামে অধিকারী নয়। 'ইহাতেও প্রতীয়মান হইতেছে যে, আদৌ প্রথমোক্তেরা শেষোক্তদিগের হইতে স্বতন্ত্র সম্প্রদায় ছিলেন। পরে

শেষোক্তরা সেই সম্প্রদায়ে গৃহীত, কিন্তু সর্ব্ব-নিকৃষ্ট শ্রেণীতে গণিত হয়।' (পৃ. ৪)

তা ছাড়া ভারতের উত্তর ভাগ থেকে ক্রমশ দক্ষিণের দিকে হিন্দু ধর্মের প্রসারের একটি ধারণাও তারিণীচরণে আছে। সেই প্রসার স্পষ্টতই রাজত্বের প্রসার।

> আদৌ দক্ষিণাবর্ত্ত জঙ্গলময় এবং অহিন্দু অসভ্য জাতিদিগের নিবাসস্থল ছিল। রামচন্দ্র সর্ব্বপ্রথম ভারতবর্ষের ঐ ভাগে হিন্দু পতাকা উড্ডীন করেন। ...অদ্যাপি দক্ষিণাবর্ত্তে হিন্দুদিগের আদিম উপনিবেশ সংস্থাপনের অনেক জনশ্রুতি শুনিতে পাওয়া যায়। (পৃ. ২৭)

রাষ্ট্রীয় সার্বভৌমত্বের আধুনিক চিহ্ন রামচন্দ্রের হাতে পত্‌পত্‌ করে উড়ছে, এ-ছবি একশো বছর আগের ইংরেজি-শিক্ষিত বাঙালি ব্রাহ্মণের কল্পনায় সহজেই এসে গিয়েছিল। তবে এ-হেন রামচন্দ্র যে দক্ষিণ ভারতের অধিবাসীদের দমন করে উপনিবেশ স্থাপন করেছিলেন, এ-কথায় আজকের উগ্রহিন্দু বোধ হয় বিব্রতই হবেন।

প্রকৃত পুরাবৃত্তের অভাবে ইতিহাসের কাহিনী নির্মাণে বড় বড় ফাঁক থেকে যাবে, এটাই স্বাভাবিক। মৃত্যুঞ্জয়ের ইতিহাসভাবনা থেকে আমরা কত দূর সরে এসেছি, তার প্রমাণ পাওয়া যাবে তারিণীচরণের এই মন্তব্যে :

> ইয়ুরোপীয় পুরাবিদেরা, বিবিধ যুক্তি দ্বারা প্রতিপন্ন করিয়াছেন, কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ খৃষ্টীয়-শকারম্ভের চতুর্দ্দশ শতাব্দীর পূর্ব্বে ঘটিয়াছিল। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের পর বহুকাল পর্য্যন্ত ভারতবর্ষের ইতিবৃত্ত এরূপ অপরিজ্ঞেয়, অসম্বন্ধ ও গোলযোগে আবৃত যে তাহা হইতে কোনরূপ বিবরণ সঙ্কলন করা দুঃসাধ্য। (পৃ. ১৬-৭)

যেটুকু বিবরণ তারিণীচরণ সংগ্রহ করেছেন, তাতে খুব উল্লেখযোগ্য কিছু নেই। মোটামুটিভাবে ইংরেজদের লেখা প্রাচীন ভারতের ইতিহাস যে সময় যেমন প্রচলিত ছিল, সেরকমই লিখেছেন তিনি। শুধু বৌদ্ধধর্মের বিষয়ে একটি কৌতূহল জাগাবার মতো মন্তব্য করেছেন।

> [বুদ্ধ] হিন্দুধর্ম্মের পরম শত্রু হইয়া উঠেন; এ জন্য হিন্দুরা তাঁহাকে নাস্তিক ও ধর্ম্মলোপক বলিয়া বর্ণনা করিয়া থাকেন। সে যাহা হউক, তাঁহার প্রণীত ধর্ম্মে অতি পবিত্র বিবিধ উপদেশ প্রাপ্ত হওয়া যায়। তিনি যুক্তিহীন কিছুই মান্য করিতেন না। কোন জাতি যতই কেন প্রাচীন সংস্কারের পরতন্ত্র হউক না, চিরাগত মতের বিরুদ্ধে প্রবলতর যুক্তি প্রদর্শন করিতে পারিলে পরিণামে অবশ্যই অন্ততঃ কিয়দংশেরও মত পরিবর্ত্তন ঘটিয়া উঠে। (পৃ. ১)

এখানে লক্ষণীয়, বৌদ্ধ ধর্মমতের যৌক্তিকতা অস্বীকার করা হচ্ছে না। বরং হিন্দুধর্মের আভ্যন্তরীণ একটি যুক্তিবাদী সমালোচনা হিসেবেই তাকে উপস্থিত করা হচ্ছে। তা না হলে, পর্বভাগের প্রথম সূত্র অনুসারে বৌদ্ধ রাজাদের আমলটিকে প্রাচীন ভারতের ইতিহাসের স্বতন্ত্র একটি পর্ব বলতে হত। তার আর প্রয়োজন হচ্ছে না; হিন্দু রাজত্বকালের মধ্যেই তাকে জায়গা করে দেওয়া যাচ্ছে।

প্রাচীন ভারতের রাজনৈতিক ইতিবৃত্ত বহুলাংশে অস্পষ্ট হলেও একটি বিষয়ে ঐতিহাসিক সাক্ষ্যের কোনও অভাব নেই। সেটি হল 'আদিম ভারতবর্ষীয়দিগের সভ্যতা ও পাণ্ডিত্য'। তারিণীচরণের ষষ্ঠ অধ্যায়ের এই হল বিষয়। মূল প্রতিপাদ্য এইরকম:

> প্রাংশু ও বামনে, বলী ও ক্ষীণে যা বৈলক্ষণ্য, আদিম ও আধুনিক হিন্দুতে তদপেক্ষাও অধিক। পূর্ব্ব পূর্ব্বকালে বৈদেশিক ভ্রমণকারীরা ভারতবর্ষে আসিয়া আর্য্যবংশের সাহসিকতা, বাঙ্‌নিষ্ঠা, সারল্য প্রভৃতি সদ্‌গুণের পরাকাষ্ঠাদর্শনে বিস্মিত ও চমৎকৃত হইতেন, অধুনা ঐ সকল গুণের অভাবই প্রধানরূপে কীর্ত্তিত হইয়া থাকে। তখন হিন্দুরা দিগ্বিজয়ে নির্গত হইয়া সময়ে সময়ে তাতার চীন প্রভৃতি দেশে আপনাদিগের পতাকা উড্ডীন করিতেন; অধুনা বহুদূর হইতে এক ক্ষুদ্র দ্বীপের কতিপয় সৈনিক আসিয়া ভারতভূমির উপরে কর্ত্তৃত্ব করিতেছে। তখন হিন্দুরা স্বজাতীয় ভিন্ন সকলকে ম্লেচ্ছ বলিয়া অবজ্ঞা করিতেন: অধুনা সেই ম্লেচ্ছেরা আসিয়া আর্য্যসন্তানগণের উপরে নিয়ত অবজ্ঞা বর্ষণ করিতেছে। তখন হিন্দুদিগে· অর্ণবতরী সুমাত্রা প্রভৃতি দ্বীপে নিয়ত যাতায়াত করিত, অদ্যাপিও তাহার সন্নিহি· বালিদ্বীপে তাহার ভূরি নিদর্শন প্রাপ্ত হওয়া যায়; অধুনা সমুদ্রগমণের নামেই হিন্দুদিগের হৃৎকম্প উপস্থিত হয়, এবং কেহ কোনরূপে যাইলে তিনি সমাজ হইতে বহিষ্কৃত হইয়া আইসেন। (পৃ. ৩২)

প্রাচীন গৌরব, বর্তমান অধঃপতন। পুরো গল্পটা কিন্তু আমাদের নিয়ে। প্রাচীন ভারতের শৌর্যবান নায়কেরা আমাদেরই পূর্বপুরুষ। আর আজকের হীনবল ভারতীয় বলা বাহুল্য আমরা। প্রাচীন ভারতবর্ষীয়েরা যে 'তাতার চীন প্রভৃতি দেশ' জয় করেছিলেন, সমুদ্র পেরিয়ে তাঁরা যে বিদেশে বাণিজ্য করতে যেতেন এবং ভিন্ন জাতীয়দের 'ম্লেচ্ছ বলিয়া অবজ্ঞা করিতেন', এ আমাদেরই গৌরব। আর আজকে 'আর্যসন্তানেরা' যে নিজেরাই অপরের পদানত, অন্য জাতির অবজ্ঞার পাত্র, তা আমাদের কলঙ্ক। ক্ষমতার মাপকাঠিতে বিশ্বের বিভিন্ন জাতির মধ্যে ভারতবাসীর স্থান আজ নেমে গেছে বহু নীচে, কিন্তু এককালে সেই স্থান ছিল ওপরে।

কেবল বীরত্বই নয়, বিদ্যাচর্চার ক্ষেত্রেও প্রাচীন ভারতের কৃতিত্ব সারা বিশ্বে স্বীকৃত।

> পূর্ব্বকালে যখন প্রায় সমুদয় মেদিনী ঘোর মূর্খতা-রজনীতে আচ্ছন্ন ছিল, তখনও ভারতবর্ষে বিদ্যার নির্ম্মল আলোক কোনরূপেই নিষ্প্রভ ছিল না। তীক্ষ্মমণীষা-সম্পন্ন হিন্দুরা দর্শনশাস্ত্রে অতি আদিম কালে যে সকল মত উদ্ভাবিত করিয়া গিয়াছেন, এখনও ইয়ুরোপীয় পণ্ডিতেরা তৎসমুদায় লইয়া আন্দোলন করিতেছেন। (পৃ. ৩৩)

লক্ষণীয়, এই বিষয়ে ইউরোপীয় পণ্ডিতদের সাক্ষ্য তারিণীচরণের কাছে খুব গুরুত্বপূর্ণ। বস্তুত প্রাচীন ভারতে বিদ্যাচর্চার উৎকর্ষের যে-কটি দৃষ্টান্ত তিনি দিচ্ছেন— জ্যোতির্বিদ্যা, গণিত, তর্কশাস্ত্র, আর ভাষা-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে—তার সব ক-টিই উনিশ শতকের প্রাচ্যবিদ্যাবিৎ সাহেবদের আবিষ্কার। যুক্তিটা যেন এই রকম : আজকের ভারতবাসীদের হীন অবস্থা দেখে ইউরোপীয়েরা তাদের অবজ্ঞা করে বটে, কিন্তু চিরকাল

ভারতীয়রা এরকম ছিল না; ইউরোপীয় পণ্ডিতেরাই স্বীকার করছেন যে প্রাচীন ভারতে জ্ঞানবিজ্ঞানচর্চা উৎকর্ষের শিখরে পৌঁছেছিল। জাতীয়তাবাদী ইতিহাসের পুরো কাহিনীটা সাজানোর ক্ষেত্রে প্রাচ্যবিদ্যাচর্চার এই অবদান বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ।

তারিণীচরণের ইতিহাসটি যে জাতীয়তাবাদী, তার আরও একটি প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে। প্রাচীন গৌরব আর পরবর্তী অবক্ষয়ের এই কাহিনীটির শেষে নীতিকথার গল্পের মতো একটি উপদেশ আছে। সেটি হল, সমাজের সংস্কার করো, অবক্ষয়ের চিহ্ন এইসব কুসংস্কার মুছে ফেলে প্রাচীন আদর্শের পুনরুদ্ধার করো। যে-সব ভ্রান্ত আচার আর বিশ্বাসের জন্য ভারতবাসী আজ সকলের ঘৃণার পাত্র, প্রাচীনকালে তার কিছুই ছিল না, কারণ ইউরোপীয়েরাই স্বীকার করেছেন প্রাচীনকালে আমরা অতি সভ্য ছিলাম।

> অধুনা হিন্দু সীমন্তিনীগণ দাসীর ন্যায় ব্যবহৃত, বন্দীর ন্যায় অবরুদ্ধ ও ইতর জন্তুর ন্যায় নিরক্ষর দৃষ্ট হয়। কিন্তু সার্দ্ধ সহস্র বর্ষ পূর্বে অবলোকন করিলে স্ত্রীদিগকে আদরণীয়, শিক্ষণীয় ও অনেক পরিমাণে অনবরুদ্ধ দেখা যায়। তখন বাল্যবিবাহ কোথায়? কেহই চতুর্ব্বিংশতি বর্ষের ন্যূন বয়সে দারপরিগ্রহ করিতেন না। (পৃ. ৩৩)

জাতীয়তাবাদীর কাছে প্রাচীন ভারত হয়ে উঠল তার ক্লাসিকাল আদর্শ। আর প্রাচীন থেকে বর্তমানের মাঝের অংশটা হল তমসাবৃত মধ্যযুগ। বলা বাহুল্য এই ছকও ইউরোপীয় ইতিহাসে অনুমোদিত। উনিশ শতকের সুট-বুট পরা ইংরেজ যদি প্রাচীন গ্রিসকে তার ক্লাসিকাল উত্তরাধিকার বলে দাবি করতে পারে, তা হলে উনিশ শতকের ইংরেজি শিক্ষিত বাঙালিই বা 'ব্যাদে আছে' বলে গর্ব করবে না কেন?

আধুনিক ইউরোপের আদলে ইতিহাসচর্চা চালু হওয়ার পর ঐতিহাসিক স্মৃতির গড়নে পরিবর্তনগুলো কোথায় এল, সেটা একটু লক্ষ করা উচিত। *রাজাবলি*-র কালক্রম ছিল নিশ্ছিদ্র; এখন বিশ্বাসযোগ্য পুরাবৃত্তের অভাবে সেখানে অনেক ফাঁকফোকর দেখা দিয়েছে। অন্যদিকে, আগে যা ছিল কেবল রাজারাজড়ার ইতিবৃত্ত, এখন তা হয়ে গিয়েছে 'আমাদের' ইতিহাস—পুরাবৃত্তের শুরু থেকে বর্তমান পর্যন্ত সমগ্র জাতির অখণ্ড ইতিহাস। রাজত্ব হস্তান্তর আগে যেখানে ছিল দৈবের ইচ্ছা, এখন তা সমগ্র সমাজনীতির উৎকর্ষ বা অপকর্ষের সূচক। সেই উৎকর্ষ বা অপকর্ষ আবার বিচার করতে হচ্ছে বিশ্বের অন্যান্য জাতির সঙ্গে তুলনার মধ্যে দিয়ে। মৃত্যুঞ্জয়ের সপ্তদ্বীপা পৃথিবী, তার মধ্যে জম্বুদ্বীপ, ইত্যাদি পৌরাণিক কল্পনা এখন বাতিল; এখন ভারতবর্ষের ইতিহাসকে তার জায়গা খুঁজে নিতে হচ্ছে অন্যান্য জাতির ইতিহাসের প্রতিযোগী হিসেবে।

এই যে নতুন এক বিশ্ব ইতিহাস, তা বিভিন্ন জাতির স্বতন্ত্র ইতিহাসের যোগাযোগে উৎপন্ন। এর প্রমাণ তারিণীচরণের কাহিনীর পরের অংশেই পাওয়া যাচ্ছে। 'আদিম ভারতবর্ষীয়দিগের সভ্যতা ও পাণ্ডিত্য', এই অধ্যায়ের সঙ্গে প্রাচীন ভারতের ইতিহাস শেষ। এর পর তারিণীচরণ পাঠককে নিয়ে যাচ্ছেন ভারতবর্ষের বাইরে, সপ্তম শতাব্দীর আরবে। প্রশ্ন করতে পারি, দ্বাদশ শতকে ভারতবর্ষে রাজত্বের পরিবর্তনের গল্পই যদি বলতে হয়, তবে সপ্তম শতকের আরবে গিয়ে সে-গল্প শুরু করতে হবে কেন? উত্তরটা

অবশ্য আমরা সকলেই জানি, অত্যন্ত সহজ উত্তর সেটা। কিন্তু এই সহজ উত্তরের পেছনে উনিশ শতকের ইউরোপীয় ইতিহাসবিদ্যার অনেক গূঢ় রহস্য লুকিয়ে আছে।

> মহম্মদ স্বীয় শিষ্যদিগের নাম মুসলমান অর্থাৎ ভক্ত এবং তদ্ভিন্ন যাবতীয় মনুষ্যের নাম কাফর অর্থাৎ ধর্ম্মভ্রষ্ট রাখিলেন। ...স্বীয় শিষ্যগণকে কাফরদিগের বিনাশের জন্য তরবারি ধারণের আজ্ঞা দিয়া [মহম্মদ] কহিলেন, পরমেশ্বর সম্প্রতি আদেশ করিয়াছেন ভ্রান্তির উচ্ছেদ জন্য যে সকল মুসলমান সমরশায়ী হইবেন, তাঁহারা বিবিধ বিলাসবস্তু-সমন্বিত স্বর্গধামে যাইয়া, কজ্জলনয়না অপ্সরাগণের সহবাসে, পরমসুখে কালহরণ করিবেন; কিন্তু রণে ভঙ্গ দিয়া পলায়ন করিলে, পরকালে নরকে পতিত ও দুঃসহ দুঃখ-দাবদাহে অজস্র দগ্ধীভূত হইতে থাকিবেন। আরব জাতি স্বভাবতই নির্ভীক ও সমরপ্রিয়; তাহাতে ইহলোকে শত্রুর ধন-লুণ্ঠন ও পরলোকে প্রাগুক্তরূপ সুখভোগের প্রত্যাশা পাওয়াতে মুসলমানদিগের খড়্গ সর্ব্বত্রই অনিবার্য হইয়া উঠিতে লাগিল, সমস্ত আরব মহম্মদের অধীন হইল এবং তাঁহার মৃত্যুর অল্পকাল পরেই কাবুল হইতে স্পেন পর্য্যন্ত তাবৎ দেশে মুসলমান পতাকা উড্ডীন হইয়া উঠিল। যেরূপ স্বল্পকালের মধ্যে এক রাজ্যের পরেই অন্য রাজ্য, এক দেশের পরেই অন্য দেশ, মুসলমানদিগের পদানত হইয়াছিল, পুরাবৃত্তে সেরূপ আর কখনই দেখা যায় নাই। ঈদৃশ দিগ্বিজয়োন্মত্তেরা যে নতুন সম্পদের আকর ভারতবর্ষ লাভে লোলুপ হয় নাই ইহা কখনই সম্ভব নহে। (পৃ. ৩৬-৭)

গল্পের শুরুতেই যতগুলো কথা বলে নেওয়া হল, তাতেই পাঠককে পরের ঘটনার জন্য প্রস্তুত করে দেওয়া হচ্ছে। ভারতবর্ষের ইতিহাসের ধারায় এবার সম্পূর্ণ ভিন্ন একটি জাতির ইতিহাস এসে মিশবে। সেই ভিন্ন ইতিহাসের উৎপত্তি মুহম্মদের সময়। অর্থাৎ ত্রয়োদশ শতাব্দীর গোড়ায় দিল্লিতে যে নতুন রাজবংশ প্রতিষ্ঠিত হবে, এবং পরের সাড়ে তিনশো বছরে যে-রাজত্বে একাধিক পরিবর্তন হবে, তার পরিচয় শুধু তুর্কো-আফগান বা মুঘল রাজত্ব নয়, সামগ্রিকভাবে তা ইসলামের ইতিহাসের অংশ। এই ইতিহাসের যারা নায়ক, তাদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যও বলে দেওয়া হচ্ছে এখানে। তারা সমরপ্রিয় এবং বিশ্বাস করে যে বিধর্মীদের বিনাশ করা তাদের ধর্মীয় কর্তব্য। ধনলুণ্ঠন আর স্বর্গে অপ্সরাদের সঙ্গে সহবাসের লোভে তারা যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণত্যাগ করতেও প্রস্তুত। তারা দিগ্বীজয়ী নয়, 'দিগ্বিজয়োন্মত্ত'। ভারতবর্ষের ঐশ্বর্যের আকর্ষণে তারা স্বভাবতই লোলুপ।

উনিশ শতকের ইংরেজ ঐতিহাসিকদের লেখা ভারতবর্ষের ইতিহাসচর্চার সঙ্গে যাঁরা পরিচিত, তাঁরাই জানবেন যে একদিকে যেমন উইলিয়াম জোনস প্রভৃতি প্রাচ্যবিদ্যাবিৎদের গবেষণায় প্রাচীন ভারতের কাব্য-দর্শন নিয়ে উৎসাহের সৃষ্টি হয়েছিল, ঠিক তেমনি প্রাক্-ব্রিটিশ পর্বে মুসলিম রাজত্বের অপদার্থতা সম্বন্ধেও ইংরেজ লেখকেরা মোটামুটি একমত ছিলেন। এই অপদার্থতার কাহিনী বলা বাহুল্য ব্রিটিশ শাসনের সপক্ষে যুক্তি হিসেবেই উপস্থিত করা হত। জেমস মিল-এর অবশ্য প্রাচীন ভারত এবং মুসলিম শাসন, উভয় পর্ব সম্বন্ধেই সমান অশ্রদ্ধা ছিল। তা ছাড়া সুলতানী এবং মুঘল

সাম্রাজ্যের রাষ্ট্রতত্ত্ব আদতে ইসলামী, সুতরাং তার গুণাগুণ ইসলামের ইতিহাসের পরিপ্রেক্ষিতেই বিচার্য, এ-ধারণাও ইংরেজ ঐতিহাসিকরাই চালু করেন। তার সঙ্গে যুক্ত হয় এডওয়ার্ড গিবনের সময় থেকে সুপ্রচলিত ইসলাম সম্বন্ধে ইউরোপীয়দের যাবতীয় প্রেজুডিস।[illegible] আধুনিক ইতিহাসবিদ্যার জাদুদণ্ডের ছোঁয়ায় এ-দেশেও যখন জাতীয় ইতিহাস লেখা শুরু হল, তখন একদিকে যেমন প্রাচীন ভারতকে কল্পনা করে নেওয়া হল সমস্ত আধুনিকতার ক্লাসিকাল সূত্র হিসেবে, তেমনি মুসলিম শাসনকে ঠেলে দেওয়া হল মধ্যযুগীয় অন্ধকারে। এবং আলোকপ্রাপ্ত ইউরোপের ইসলাম সম্বন্ধে সবরকম কুসংস্কার আরোপ করা হল 'মুসলিম জাতীয় চরিত্র' নামক একটি কাল্পনিক ধারণার ওপর। দ্বাদশ শতাব্দীর পরবর্তী অধ্যায়ের ভারতের ইতিহাসে এই চরিত্রটিকে এবার সর্বত্র ঘুরে বেড়াতে দেখা যাবে। এই মুসলমানের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য হল, সে ধর্মান্ধ, অসহিষ্ণু, যুদ্ধপ্রিয়, দুর্নীতিপরায়ণ এবং নিষ্ঠুর।

আরবে ইসলাম ধর্মের প্রতিষ্ঠা থেকে যে নতুন কাহিনী শুরু হল, তারিণীচরণ তাকে ভারতবর্ষের রঙ্গমঞ্চে নিয়ে আসছেন ধীরে ধীরে। ত্রয়োদশ শতাব্দীর গোড়ায় তথাকথিত দাস রাজবংশ প্রতিষ্ঠিত হওয়ার অনেক আগে আরবদের সিন্ধ আক্রমণ, মাহমুদ গজনভির দফায় দফায় পঞ্জাব, সিন্ধ, গুজরাট আক্রমণ—এই সব ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ দিয়েছেন তারিণীচরণ। প্রতিটি কাহিনীর মোটামুটি একই ছক। মুহম্মদ ইব্‌ন-কাসিমের সিন্ধ আক্রমণ, মাহমুদ গজনভির পঞ্জাব আক্রমণ এবং মুহম্মদ ঘুরির যুদ্ধ জয়—এই তিনটি দৃষ্টান্ত দিলে ছকটি পরিষ্কার হয়ে যাবে।

মুহম্মদ কাসিম ৭১২ খ্রিস্টাব্দে 'সিন্ধুরাজা ডাহিরের বিরুদ্ধে' যুদ্ধে নামলেন।

> দৈব তাঁহার অনুকূল হইল। তাঁহার সেনাদিগের নিক্ষিপ্ত একটা জ্বলৎ গোলক আসিয়া রাজার হস্তীকে আহত করাতে হস্তী একান্ত ভীত হইয়া রণস্থল হইতে ঊর্ধ্বশ্বাসে পলায়ন করিল। রাজসেনারা, রাজা পলায়ন করিলেন ভাবিয়া, চতুর্দ্দিকে ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়িল। পরে দৃষ্ট হইবে যে, এইরূপ দুর্দ্দৈব হেতু ভারতবর্ষীয়েরা জয়লাভের সম্পূর্ণ সম্ভাবনা সত্ত্বেও, অনেকবার মুসলমানদিগের
> ৮ নিকট পরাভূত হইয়াছেন। (পৃ. ৩৮)

বলে রাখা দরকার, এই 'দৈব' কিন্তু মৃত্যুঞ্জয়ের দৈব নয়। দুর্দৈব এখানে নিছকই দুর্ঘটনা, অধর্মাচরণের প্রতিফলস্বরূপ দৈবরোষ নয়। 'ভারতবর্ষীয়দের' দুর্ভাগ্য যে জয়লাভের সম্পূর্ণ যোগ্য হওয়া সত্ত্বেও শুধুমাত্র দুর্ঘটনার জন্য তারা বারে বারে যুদ্ধে পরাজিত হয়।

> অবশেষে, প্রচুর সাহসিকতা প্রকাশ করিয়া [সিন্ধুরাজা] শত্রুহস্তে নিধন প্রাপ্ত হইলেন। পরে রাজধানী আক্রান্ত হইল; কিন্তু ডাহিরের পত্নী স্বামীর অনুরূপ সাহস অবলম্বন করিয়া নগর-রক্ষার চেষ্টা পাইতে লাগিলেন। পরিশেষে আহারসামগ্রীর অপ্রতুল হইয়া উঠিল। তখন শত্রুহস্তে পতনের অপেক্ষা মরণ শ্রেয়ঃ জ্ঞান করিয়া তিনি নগরবাসীদিগকে তাহার আয়োজন করিতে কহিলেন। সকলে সম্মত হইল;

সর্ব্বত্র চিতা প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠিল। তদনন্তর পুরুষেরা স্নানাদি সমাপন করিয়া, অসিহস্তে বহির্গত হইয়া, অনতিদীর্ঘকাল-মধ্যেই মুসলমানদিগের কর্ত্তৃক নিহত হইল। (পৃ. ৩৮)

যুদ্ধে পরাজয়ের এই গল্পটি পরে আবার পাব। তার দুটি উপাদান বিশেষভাবে লক্ষ করার মতো। এক, শত্রুর আক্রমণ প্রতিরোধে হিন্দু রমণীর সাহস। আর দুই, যুদ্ধে প্রাণত্যাগ হিন্দু পুরুষের কাছে একটি যজ্ঞ—আত্মাহুতির অনুষ্ঠান: 'সর্ব্বত্র চিতা প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠিল', 'স্নানাদি সমাপন করিয়া...নিহত হইল'। এর সঙ্গে তুলনীয়, 'কজ্জলনয়না অপ্সরাগণের সহবাসে' প্রলুব্ধ মুসলমান সৈন্যের যুদ্ধলিপ্সা।

কাসিম প্রসঙ্গে আরও একটি গল্প বলছেন তারিণীচরণ, সেটিও এই ছকেরই অংশ।

সিন্ধুদেশের জয়াবসানে কাসিম ভারতবর্ষের অভ্যন্তরে প্রবেশের উদ্‌যোগ পাইতেছিলেন, এমন সময়ে, এক স্ত্রীর চাতুর্য্যজাল তাঁহার কাল হইয়া উঠিল। সমরশেষে সিন্ধুদেশে যে সমস্ত স্ত্রী বন্দী হয়, তন্মধ্যে রাজা ডাহিরের দুই দুহিতা ছিল। উহারা যেমন উচ্চকুলজাতা তেমনি অসাধারণ রূপলাবণ্যসম্পন্না ছিল। কাসিম ইহাদিগকে খলিফার উপযুক্ত উপঢৌকন জ্ঞান করিয়া তৎসন্নিধানে প্রেরণ করিলেন। মুসলমানপতি জ্যেষ্ঠার রূপে মোহিত হইয়া তাহার প্রতি সতৃষ্ণ দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন। অমনি সে বিগলিত অশ্রুধারা বর্ষণ করিয়া কহিল, হায়! আমি এক্ষণে ভবৎসদৃশ জনের অনুরাগের যোগ্য নহি, কাসিম পূর্ব্বেই আমার ধর্ম্ম নষ্ট করিয়াছে। খলিফা ভৃত্যের ঈদৃশ ব্যবহার শ্রবণমাত্র, ক্রোধান্ধ হইয়া আজ্ঞা করিলেন, কাসিমকে চর্ম্মে বদ্ধ করিয়া আমার সন্নিধানে আনয়ন কর। আজ্ঞা সম্পন্ন হইলে, খলিফা রাজকুমারীকে কাসিমের শব প্রদর্শন করাইলেন। তখন সে হর্ষোৎফুল্ল নয়নে কহিল, কাসিম সম্পূর্ণ নির্দ্দোষী; জনকজনকীর মৃত্যু ও তাঁহাদের প্রজাবর্গের অবমাননার প্রতিশোধ দিবার জন্যই আমি তাহার এরূপ মিথ্যাপবাদ করিয়াছিলাম। (পৃ. ৩৯)

হিন্দুনারীর সাহসিকতার সঙ্গে আরও একটি বৈশিষ্ট্য যোগ হল—উপস্থিত বুদ্ধি। আর যুদ্ধে আত্মাহুতির পাশাপাশি আরও একটি কাহিনীরও সৃষ্টি হল—আত্মীয়-স্বজন-স্বজাতির মৃত্যুর শোধ নেওয়ার জন্য শত্রুর বিরুদ্ধে প্রতিহিংসা।

একাদশ শতাব্দীর গোড়ায় মাহমুদ গজনভির সময়ে চলে আসা যাক। 'মুসলমানদিগের মধ্যে ইহারই দৌরাত্ম্যে সর্ব্বপ্রথম ভারতবর্ষ বিপর্য্যস্ত ও ব্যতিব্যস্ত হইয়া উঠে, এবং ইঁহারই পর হইতে হিন্দুদিগের স্বাধীনতা, কৃষ্ণপ্রতিপচ্চন্দ্রমার ন্যায়, ক্রমশই ক্ষয়গ্রস্ত ও বিলুপ্ত হইয়া আইসে।' (পৃ. ৪১) মাহমুদের কয়েকটি গুণ তারিণীচরণ স্বীকার করছেন, যেমন সাহস, বিচক্ষণতা, যুদ্ধকুশলতা এবং অধ্যবসায়। অবশ্য মাহমুদ যে জ্ঞান-বিজ্ঞান-কাব্য-শিল্পচর্চার একজন প্রধান পৃষ্ঠপোষক ছিলেন, সে-কথা বলছেন না।

কিন্তু তিনি যেমন ঐ সকল গুণান্বিত ছিলেন তেমনি, অন্ততঃ লোকতঃ মুসলমান-ধর্ম্মে

> একান্ত ভক্ত, দেবদেবীর অর্চ্চনার দারুণ বিদ্বেষী, এবং যৎপরোনাস্তি অর্থপিশাচ ও গৌরবাকাঙ্ক্ষীও ছিলেন। ভারতবর্ষ তাঁহার তাবৎ আকাঙ্ক্ষা পরিপূরণের প্রকৃত ক্ষেত্র ছিল। (পৃ. ৪২)

তথ্যকথিত 'মুসলমান চরিত্রের' এ আর-একটি বৈশিষ্ট্য। ইসলামের প্রতি অনুরাগ যেখানে যুদ্ধের কারণ, সেখানেও তা প্রকৃত ভক্তি নয়, লোকদেখানো ধার্মিকতা।

মাহমুদ শাহিয়া বংশের রাজা আনন্দপালের বিরুদ্ধে অগ্রসর হলেন (তারিণীচরণ লিখছেন অনঙ্গপাল)।

> 'মুসলমানেরা সমগ্র ভারতবর্ষের স্বাধীনতা ধ্বংস ও হিন্দুধর্ম্মের বিলোপ সঙ্কল্প করিয়াছে এবং লাহোর গ্রহণ করিতে পারিলেই অমনি অন্যান্য ভাগ আক্রমণ করিবে, সুতরাং সকলে একযোগ হইয়া ম্লেচ্ছদিগের দমন করা নিতান্ত আবশ্যক হইয়াছে' এই বলিয়া [অনঙ্গপাল] সুমুদয় প্রধান প্রধান হিন্দু রাজার নিকট দূত প্রেরণ করিয়াছিলেন। তাঁহার আবেদনও নিষ্ফল হয় নাই। দিল্লী, কনোজ, উজীন, গোয়ালিয়ার, কালিঞ্জর প্রভৃতির রাজারা অনঙ্গপালের সহিত একযোগ হইলেন: রাশি রাশি সেনা আসিয়া পাঞ্জাবে উপস্থিত হইল। মামুদ তাদৃশ আকস্মিক বলোপচয়ে ভীত হইয়া আত্মরক্ষার উদ্দেশেই পেশোয়ারের সন্নিধানে অবস্থিত রহিলেন। দিন দিন হিন্দুসৈন্য বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। দূরদেশ হইতেও হিন্দু মহিলাগণ, হীরকাদি বিক্রয় ও স্বর্ণালঙ্কার দ্রবীভূত করিয়া, যুদ্ধের সংস্থান পাঠাইতে লাগিলেন...। (পৃ. ৪৩-৪)

মাহমুদ লাহোর দখল করলে 'সমগ্র ভারতবর্ষের স্বাধীনতা' ধ্বংস হবে, এই ইতিহাস-জ্ঞান বলা বাহুল্য রাজা আনন্দপালের থাকা সম্ভব ছিল না। এ তারিণীচরণেরই কথা। কিন্তু কথাগুলিকে তাঁর সৃষ্ট 'অনঙ্গপাল' চরিত্রটির মুখে বসিয়ে দিয়ে তিনি কিন্তু এই কাহিনীটিকে সমগ্র হিন্দু জাতির যুদ্ধে পরিণত করে ফেলতে পারছেন: 'রাজারা একযোগ হইলেন', 'রাশি রাশি সেনা আসিয়া পাঞ্জাবে উপস্থিত হইল', 'দূরদেশ হইতে হিন্দু মহিলাগণ যুদ্ধের সংস্থান পাঠাইলেন' ইত্যাদি। কিন্তু তার পরেই এল দুর্দৈব। 'অতঃপর মুসলমান-শিবির হইতে একটা জ্বলৎ-বন্দুক অথবা তীক্ষ্ণশর আসিয়া হিন্দু-সেনানায়ক অনঙ্গপালের হস্তীর অঙ্গে বিদ্ধ হইল। মাতঙ্গ রণক্ষেত্র হইতে রাজাকে পৃষ্ঠে করিয়া পলায়ন করিল। অমনি হিন্দুসৈন্য ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়িল।' (পৃ. ৪৪)
এ-গল্পের শেষেও আছে প্রতিহিংসার ঘটনা, তবে এবারে একটু অন্য ধরনের।

> মামুদের সহিত মৈত্রীনিবন্ধন কনোজরাজ হিন্দুভূপাল সমাজে ঘৃণা ও নিগ্রহের ভাজন হইয়াছিলেন; তচ্ছ্রবণে গজনিপতি শরণাগতের প্রতিপালন সঙ্কল্পে দশম বার ভারতবর্ষে উপস্থিত হন। কিন্তু তিনি পহুঁছিবার পূর্ব্বেই কালিঞ্জরধিপতি কনোজ-রাজের প্রাণসংহার সম্পন্ন করেন। (পৃ. ৪৬)

বলা বাহুল্য, এটিও একটি অনুষ্ঠান, সুতরাং ' প্রাণসংহার করেন' নয়, 'প্রাণসংহার সম্পন্ন করেন'।

মুহম্মদ ঘুরির সেনারা ছিলেন

> পর্ব্বতবাসী, কষ্টসহ ও সমরচতুর; এ দিকে হিন্দু রাজারা পরস্পর অনৈক্যদূষিত, তাঁহাদের সৈন্যকুল অপেক্ষাকৃত শান্ত ও বিশৃঙ্খলা: সুতরাং মহম্মদ অনায়াসেই জয়লাভ করিবেন আপাতত এরূপ বোধই হইতে পারে, কিন্তু বস্তুতঃ তাহা হয় নাই। প্রায় কোন হিন্দু রাজাই ঘোর সংগ্রাম বিনা স্বাধীনতা বিসর্জ্জন করেন নাই। বিশেষ রজঃপূতেরা কখনই পরাভূত হয় নাই। মুসলমান রাজত্বের উৎপত্তি, স্থিতি ও বিনাশ সম্পন্ন হইয়াছে, রজঃপূতেরা অদ্যাপিও স্বাধীন রহিয়াছে। (পৃ. ৫৩)

হিন্দু রাজারা শুধু যে বিনা যুদ্ধে আত্মসমর্পণ করেন নি, তাই নয়, মুহম্মদের প্রথম আক্রমণের পর 'হিন্দুরা বিংশতি ক্রোশ পর্য্যন্ত মুসলমানদিগের পশ্চাৎ পশ্চাৎ তাড়াইয়া গিয়া প্রতিনিবৃত্ত হইলেন।' (পৃ. ৫৪) দ্বিতীয় বার জয়চাঁদের বিশ্বাসঘাতকতা এবং মুহম্মদের কপটাচারের ফলে পৃথ্বীরাজের পরাজয় ঘটে। মৃত্যুঞ্জয়ের কাহিনীর সঙ্গে তারিণীচরণের এই বিবরণের কোনওই মিল নেই। শেষে প্রতিহিংসার গল্পও আছে। 'গোক্ষুর' নামে এক পার্বত্য জাতি মুহম্মদের হাতে পরাস্ত হয়েছিল। তাদের কয়েকজন সুযোগ পেয়ে রাত্রে মুহম্মদের তাঁবুতে প্রবেশ করে নিদ্রিত সুলতানকে হত্যা করে প্রতিহিংসা চরিতার্থ করে।

এর পর ভারতে সুলতানদের শাসন সুপ্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর ধর্মান্ধ শাসকদের হিন্দুদের ওপর অত্যাচারের কাহিনী একাধিকবার আসবে। যেমন সিকন্দর লোদি।

> সেকেন্দর তীর্থ-পর্য্যটন ও পর্ব্বাহ্নে গঙ্গা প্রভৃতি পবিত্র সরিতে স্নান নিষেধ এবং নানাস্থানের দেবালয় চূর্ণ করিলেন। একদা কোন ব্রাহ্মণ ঘোষণা করেন 'কায়মনোবাক্যে অনুষ্ঠান করিলে সকলপ্রকার ধর্ম্মই পরমেশ্বরের সমান গ্রাহ্য'। সেকেন্দর তাঁহাকে ধরিয়া আনিলেন, এবং তিনি আপনার অনন্যবিদ্বেষী মত পরিত্যাগে অস্বীকৃত হইলে, নিষ্ঠুর নৃপতি তাঁহার প্রাণসংহার করিলেন। কোন ইষ্টনিষ্ট মুসলমান তীর্থযাত্রা প্রতিষেধ অন্যায় বলাতে 'পাষণ্ড! পৌত্তলিকদিগের পোষকতা করিতেছিস' বলিয়া রাজা কর্ত্তৃক ভর্ৎসিত হইলে, তিনি উত্তর করিলেন,"না, আমি তাহা করিতেছি না, আমি বলিতেছি রাজাদিগের প্রাজাপীড়ন অতিশয় অন্যায়'। তচ্ছ্রবণে সেকেন্দর ক্ষান্ত হইলেন। (পৃ. ৮৩)

অওরঙজেবের প্রতি তারিণীচরণের লেখনীর খোঁচা বলা বাহুল্য সব চেয়ে তীক্ষ্ণ। 'আরাঞ্জিব প্রতারক, পরস্বাপহারক ও মনুষ্যঘাতক ছিলেন।' (পৃ. ২২০) 'মুসলমান ধর্ম্মে আস্থাপ্রকাশ তাঁহার স্বার্থসাধনের পক্ষে উপকারীই হইয়াছিল।...বস্তুতঃ আরাঞ্জিব ধর্ম্ম বা সন্নীতি কিছুরই অনুরোধে আপন স্বার্থ পরিত্যাগ করিতেন না।' (পৃ. ১৭৩)

অপর পক্ষে আকবর সম্বন্ধে তারিণীচরণ প্রশংসার কথাই বলেছেন, তবে প্রশংসার কারণটি তাৎপর্যপূর্ণ।

> আকবর মুসলমান ধর্ম্ম-নির্দ্দিষ্ট কতিপয় অযৌক্তিক কর্ম্ম-কলাপের বিলোপ সাধনের

> চেষ্টা পাইয়াছিলেন। হিন্দুদিগের পক্ষেও তিনি অনেক অযৌক্তিক পদ্ধতি রহিত করিবার প্রয়াস পান। তিনি অগ্নি-পরীক্ষা, বিধবাদিগের অমতে তাহাদিগকে স্বামীর চিতায় আরোপণ এবং বাল্য বিবাহ নিষেধ করেন। বিধবাদিগের পুনর্ব্বার বিবাহ করিতেও অনুমতি দেন।...ধর্ম্ম বিষয়ে আকবরের প্রাগুক্তরূপ উদার মত দেখিয়া গোঁড়া মুসলমানেরা তাঁহার অত্যন্ত বিদ্বেষী হইয়াছিল। অনেকেই তাঁহাকে নাস্তিক বলিত। (পৃ. ১৪১)

ধর্ম সম্বন্ধে নিরপেক্ষতা নয়, রাষ্ট্রের ক্ষমতা ব্যবহার করে হিন্দু-মুসলমান উভয় ধর্মেরই অযৌক্তিক আচারের সংস্কার করতে চেয়েছিলেন বলে আকবর প্রশংসনীয়।

মুসলমান রাজার ছলনার সাহায্যে যুদ্ধজয়ের কাহিনীও আরও আছে। যেমন শের শাহ-র রাইসিন দুর্গদখল। দুর্গে অবরুদ্ধ 'হিন্দু রাজা'-র সঙ্গে আক্রমণকারীদের চুক্তি হয়েছিল। কিন্তু

> মুসলমানেরা পূর্ব্বকৃত নিয়ম অসিদ্ধ, এই ভান করিয়া, তাহাদিগকে আক্রমণ করিল। তাহারা অতিশয় সাহসের সহিত আত্মরক্ষা করিতে লাগিল, কিন্তু অবশেষে পরাস্ত ও মুসলমানদিগের নিষ্ঠুর হস্তে নিহত হইল। ...সেরের এই বিশ্বাসঘাতকতা ও ক্রূরতার বিশেষ উদ্দেশ্য কি ছিল জানা যায় না। যাহা হউক, পরিণামে তাঁহাকে এই ঘোর অপরাধের জন্য বিলক্ষণ শাস্তি ভোগ করিতে হইয়াছিল। (পৃ. ১০৪)

মুসলমান শাসকদের সঙ্গে কোনো কোনো হিন্দু রাজার মৈত্রীর বিষয়টিও আবার এসেছে। যেমন মুঘলদের সঙ্গে রাজপুতদের বৈবাহিক সম্পর্ক।

> যে সকল রজঃপূত রাজারা এইরূপ বিবাহদানে সম্মত হইতেন, তাঁহারা সম্রাটের বিলক্ষণ অনুরাগভাজন ও অনুগৃহীত হইয়া উঠিতেন। তন্নিবন্ধন তাদৃশ বিবাহ জাতিভ্রংশক ও অবমানকর জ্ঞান করা দূরে থাকুক, উদয়পুরের অধিপতি ভিন্ন, সমুদয় রজঃপূত রাজারাই তদ্দ্বারা আপনাদিগকে কৃতার্থ ও সম্মানিত বোধ করিতে লাগিলেন। কিন্তু উদয়পুরপতি সেই সমুদয় যবনাক্ত রাজাদিগের সহিত আদান-প্রদান পর্য্যন্তও পরিত্যাগ করিলেন। সেই হেতু অধুনা উদয়পুরের রাজবংশ জাত্যাংশে রজঃপূতদিগের মধ্যে সর্বাপেক্ষা পবিত্র বলিয়া সম্মানিত হইয়া থাকে। তাঁহার সহিত আদান প্রদানে অন্যান্য রাজারা অতিশয় শ্লাঘা জ্ঞান করেন। (পৃ. ১২৫-৬)

৮

আগেই বলেছি, তারিণীচরণের ইতিহাস বই-এর শুধু যে প্রতি বছর নতুন সংস্করণ বেরোত তাই নয়, অন্য অনেক পাঠ্যবই-ই তারিণীচরণকে মডেল ধরে নিয়ে লেখা হত।[১৫] এরকম বেশ কয়টি বই-এর মধ্যে একটি হল *ভারতবর্ষের ইতিহাসের প্রশ্নোত্তর*, 'বরিশাল জিল্লার অন্তর্গত গোপালপুরে নিবাসী শ্রীছৈয়দ আবদুল রহিম দ্বারা সংগৃহীত'।[১৬] অধিকাংশটাই তারিণীচরণ অবলম্বনে লেখা। কিন্তু অল্প কয়টি জায়গায় পরিবর্তন আছে:

সেগুলি লক্ষ্য করার মতো।

প্রথমেই আর্যদের কথা। আবদুল রহিম কথাটা অন্যভাবে লিখছেন। 'হিন্দুরা ভারতবর্ষের আদি নিবাসী নহেন, ইহারা সিন্ধু নদের পশ্চিম তীর হইতে আসিয়া, বাহুবলে ভারতবর্ষের অধিবাসী হইয়াছেন।' (পৃ. ২) তারিণীচরণ লিখেছিলেন, 'অনার্যেরা আর্যসম্প্রদায়ে গৃহীত হয়', 'আর্যেরা উপনিবেশ স্থাপন করে', 'হিন্দুপতাকা উড্ডীন করে' ইত্যাদি। আবদুল রহিম লিখছেন, 'বাহুবলে ভারতবর্ষের অধিবাসী হইয়াছেন'।

এর পর ইতিহাসের ঘটনার বর্ণনায় কিন্তু মোটামুটি তারিণীচরণকেই অনুসরণ করছেন তিনি। যেমন, মহম্মদ গজনবী ও মহম্মদ গোরী এতদুভয়ের মধ্যে মহম্মদ গোরীই হিন্দুদিগের প্রধান অপকারী, কারণ মহম্মদ গজনবী কেবল ভারতবর্ষে উপস্থিত হইয়া লুঠপাঠ পূর্ব্বক ডাকাইতি করিতেন, আর মহম্মদ গোরী হিন্দুদিগের পরম স্বাধীনতা-রত্ন হরণ করেন।' (পৃ. ১৬)

অথবা, 'মহাত্মা আকবর জিজিয়া কর উঠাইয়া দিয়াছিলেন, দুরাত্মা আরঞ্জিব তাহা পুনঃ সংস্থাপিত করিলেন।' (পৃ. ৭৮) এমন-কি, 'মোগল সাম্রাজ্যের পতনের কারণ আরঞ্জিবের গোঁড়ামি ও দৌরাত্ম্য', এই বিষয়ে তারিণীচরণের প্রতিধ্বনি করে একটি প্রশ্নের উত্তরও আছে।

পরিবর্তন আবার আসছে একেবারে শেষ প্রশ্নে এসে। প্রশ্নটা এই: 'শিক্ষক। তুমি মুসলমান রাজত্বের বিবরণ পাঠ করিয়া কি উপদেশ পাইলে?' এর উত্তরে সৈয়দ আবদুল রহিম লিখছেন :

> ছাত্র। আর্য্য! আমি মুসলমান রাজত্বের ইতিবৃত্ত পাঠ করিয়া নিশ্চয় জানিয়াছি। রাজত্ব ইহকাল ও পরকালের ভয়ানকাস্পদ। ইহাতে ঈশ্বর দত্ত ক্ষমা ও দয়াবৃত্তি এককালীন বিসর্জ্জন দিতে হয়। হায়! কি আক্ষেপের বিষয়, যাহার সঙ্গে একত্র আহার বিহার ও শয়ন উপবেশন করিয়া বহুদিন অতিক্রম করা হইয়াছে। ...ভয়ঙ্কর রাজত্বের নিমিত্ত এমন স্নেহাস্পদ সহোদরের শোণিত পাত পূর্ব্বক অম্লানবদনে মেদিনীকে রঞ্জিত করিতেছে। রাজত্ব তুমি মনুজ নিকরের মনকে কিরূপ পাষাণময় কর, তাহা আমি মুসলমান রাজত্বের ইতিহাস পাঠ করিয়া সুন্দররূপ বুঝিয়াছি। তোমার জন্য পিতা মাতা ভ্রাতা ভগ্নীর ও অন্য অন্য মানব কুলের শিরোচ্ছেদ এমন কি, স্থায়ীধন ধর্ম্মও তুচ্ছ বলিয়া গণিত হয়। হায় রাজত্ব! ধন্য তোমার প্রলোভন শক্তি। (পৃ. ১০০-১)

তারিণীচরণের কাছে পাঠ নেওয়া সত্ত্বেও আধুনিক ইতিহাসবিদ্যার সারমর্ম এই ছাত্রটির মনে মোটেই প্রবেশ করে নি। সৈয়দ আবদুল রহিমের নিজস্ব বয়ানে আমরা সেই মৃত্যুঞ্জয়ের প্রজার কথাই এখনও শুনতে পাচ্ছি।

এখনও পাচ্ছি, কিন্তু বেশিদিন আর পাব না। ভারতীয় সমাজসংস্কৃতির ক্লাসিকাল সূত্রগুলির মধ্যে যদি ইসলামের কোনও জায়গা না থাকে, তা হলে বিকল্প ঐতিহ্য হিসেবেই ইসলামকে ভাবা হবে। ১৮৮৬ সালে শেখ আবদর রহিম হজরত মহম্মদের জীবনী[১১] লিখতে গিয়ে ঠিক তারিণীচরণেরই মতো ইংরেজ পণ্ডিতদের উদ্ধৃত করে দাবি করছেন :

> ইসলাম ঈসায়ী ধর্ম্ম অপেক্ষা মানবজাতির বিশেষ কল্যাণ সাধন করিয়াছে। দর্শন ও বিজ্ঞান শাস্ত্র প্রভৃতি এসিয়া মহাদেশের মোসলমান ও স্পেনদেশীয় মুরগণ কর্ত্তৃক ইউরোপ মহাদেশে আনীত হইয়াছিল।...স্পেনদেশীয় মোসলমানগণ ইউরোপের দর্শন শাস্ত্রের জন্মদাতা। (পৃ. ১৭৩)

কিন্তু তার পরই ইসলাম সম্বন্ধে ইউরোপীয়দের মিথ্যা অপবাদের প্রতিবাদ:

> ইতিপূর্ব্বে বঙ্গভাষায় হজরত মহম্মদের যে কয়খানি জীবনী বাহির হইয়াছে, তাহা প্রায় সমস্তই অসম্পূর্ণ বিশেষতঃ ঐ সকল পুস্তক ইংরাজী গ্রন্থাবলম্বনে লিখিত বলিয়া কোন কোন বিষয় মোসলমানদিগের উপযোগী হয় নাই। হজরতমহম্মদ তরবারি বলে স্বীয় ধর্ম্ম প্রচার করিয়াছেন বলিয়া ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বীগণ তাঁহার নামে যে বৃথা দোষারোপ করিয়া থাকেন, এই পুস্তক পাঠ করিলে তাহা কতদূর সত্য, সকলেই সহজে বুঝিতে পারিবেন। (ভূমিকা)

এর পর আরও সরাসরি ভারতে মুসলিম শাসন সম্বন্ধে প্রচলিত মতের—বলা উচিত হিন্দু লেখকদের দ্বারা প্রচলিত মতের—খণ্ডন করা হচ্ছে :

> যদিও কোন কোন মোসলমান শাসনকর্ত্তা ধর্ম্ম সম্বন্ধে লোকের ওপর অত্যাচার করিয়াছেন, কিন্তু তাহা ধর্ম্মবিগর্হিত কার্য্য, তথাপিও তাহা দেখিয়া যে, ইসলামের উপর উক্তরূপ দোষারোপ করা উচিত নহে। (পৃ. ১৭৮)

উনবিংশ শতাব্দীর শেষ দশকে এই আবদর রহিম সম্পাদিত *মিহির ও সুধাকর* পত্রিকাতে প্রায় বঙ্কিমের সুরেই 'বঙ্গীয় মুসলমানদিগের উপযোগী জাতীয় ইতিহাস' লেখার আহ্বান জানানো হবে।[১৮] সেই আহ্বানে সাড়া দিয়ে শতাব্দীর শেষ বছরগুলিতে আবদুল করিম লিখবেন *ভারতবর্ষে মুসলমান রাজত্বের ইতিহাস* (১৮৯৮) কিংবা ইসমাইল হোসেন সিরাজী লিখবেন ইতিহাসাশ্রিত কাব্য *অনল প্রবাহ* (১৮৯৯)।[১৯] এঁদের চেতনা বাংলার আধুনিক ইংরেজি-শিক্ষিত মধ্যবিত্তের চেতনা। প্রজাবর্গের নেতা, এইক্ষেত্রে বাংলার মুসলমান প্রজার নেতা হিসেবে তাঁদের অবস্থান সম্বন্ধে তাঁরা সম্পূর্ণ সচেতন। 'হায় রাজত্ব! ধন্য তোমার প্রলোভন শক্তি!' বলে আর তাঁরা বই শেষ করবেন না।

৯

একদিকে আধুনিক ইতিহাসবিদ্যা, রাষ্ট্র আর জাতির সমীকরণ, জাতীয় একাত্মবোধ এবং জাতির স্বাধীনতারক্ষায় বাহুবলের ভূমিকা, আর অন্য দিকে জাতীয় ইতিহাস বলতে কেবল হিন্দুর স্মৃতি, হিন্দুর ঐক্য, হিন্দুর বাহুবল—বিশেষ করে বঙ্কিমের রচনায় এই দু-টি ধারণার পারস্পরিক সম্পর্ক প্রসঙ্গে আলোচনা করতে গিয়ে রণজিৎ গুহ বলেছেন, এখানে একটা স্वবিরোধ আছে। বঙ্কিম আহ্বান জানাচ্ছেন বটে যে নিজেদের ইতিহাস নিজেদেরই লিখতে হবে, এবং এ-ও দাবি করছেন যে সে ইতিহাস হবে বাহুবলের

ইতিহাস, কারণ বাহুবলে প্রতিষ্ঠিত পরতন্ত্র একমাত্র বাহুবলের সাহায্যেই ধ্বংস করা যায়, কিন্তু এই বাহুবলের ইতিহাস বঙ্কিম খুঁজেছেন প্রাক-ব্রিটিশ যুগে। উপনিবেশের পর্বে পরাধীন জাতির ঐতিহাসিক মুক্তির যে আধুনিক চেতনা, তার শর্তগুলো উপস্থিত করেও বঙ্কিম কিন্তু ঔপনিবেশিক শাসনের বিরুদ্ধে বাহুবল প্রয়োগের কথা বলছেন না। তিনি শোনাচ্ছেন কেবল মুসলিম শাসকদের বিরুদ্ধে হিন্দু জাতির বাহুবলের কাহিনী। এর ফলে বঙ্কিম তাঁর নিজের প্রস্তাবটি নিজেই ভেস্তে দিচ্ছেন।

বঙ্কিমকে যদি তাঁর সমসাময়িক ইতিহাস-রচয়িতাদের পাশে দাঁড় করিয়ে দেখি, তাহলে প্রথমেই দেখতে পাব যে সে-সময়কার নগণ্য পাঠ্যপুস্তক লেখকদের মধ্যে অনেক কম পরিশীলিত হলেও মোটামুটি একই ধরনের ইতিহাসবোধ প্রচলিত ছিল। দ্বিতীয়ত, এই নতুন ইতিহাস-রচনার সব চেয়ে প্রভাবশালী ধারাটির মধ্যেও ঠিক একই স্ববিরোধ উপস্থিত। তৃতীয়ত, এই স্ববিরোধের কারণ বোঝাতে গিয়ে বঙ্কিমের ক্ষেত্রে যদিও বা বলি—রণজিৎ গুহ যেমন বলেছেন—যে চেতনার অন্তরালে স্বাধীনতার আসল লড়াই ব্রিটিশের বিরুদ্ধেই ছিল কিন্তু প্রস্তাবটা তখনও প্রকাশ্যে হাজির করা যায়নি, অন্য লেখকদের ক্ষেত্রে কিন্তু সে-কথাটা বলতে পারব না। কারণ ইতিহাস লেখার স্বাধীনতা আর রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা, এই দুই সংগ্রামই যে উপনিবেশবাদের বিরুদ্ধে, এ-কথা ১৮৮০-র দশকে একাধিক বাঙালি লেখক বেশ সরাসরিই বলেছেন। সমস্যা হল, ব্রিটিশ শাসন এবং মুসলিম শাসন, দুটোকেই তাঁরা বলেছেন পরতন্ত্র। উভয় ক্ষেত্রেই জাতীয় স্বাধীনতার লক্ষ ঔপনিবেশিক শাসনের অবসান। উভয় ক্ষেত্রেই স্বাধীনতা রক্ষার একমাত্র উপায় বাহুবল। কোনও স্ববিরোধ নেই এখানে।

উনিশ শতকের শেষ দিকে ইংরেজি-শিক্ষিত মধ্যবিত্তের নতুন বাংলা সাহিত্য এবং নতুন শিক্ষাব্যবস্থায় জাতীয় ইতিহাসের এই ছকটির যে কী-একচ্ছত্র প্রভাব ছিল তা আবিষ্কার করলে একটু চমকেই যেতে হয়। আধুনিক রাষ্ট্রকেন্দ্রিক ইতিহাস-রচনা চালু হওয়ার পর থেকে বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিক পর্যন্ত এর প্রায় কোনও ব্যতিক্রম নেই। জাতীয়তাবোধের ইতিহাসের এই দিকটা নিয়ে কিছুটা অস্বস্তি আছে বলেই বোধ হয় কথাটা ভুলে যাওয়ার একটা ঝোঁক আছে আমাদের মধ্যে। তাতে কিন্তু উগ্রহিন্দু প্রচারের সব চেয়ে জোরাল উপাদানটিকেই হিসেবের বাইরে রেখে দেওয়া হয়।

বস্তুত জাতীয়তার অর্থ হিন্দু জাতীয়তা, এই ধারণাটিকে কোনও প্রাক-আধুনিক ধর্মীয় মতাদর্শের ভগ্নাবশেষ বলে ভাবলে মারাত্মক ভুল করা হবে। ধারণাটি সম্পূর্ণ আধুনিক। আধুনিক অর্থেই তা যুক্তিবাদী; অযৌক্তিক আচার-ব্যবহার কুসংস্কার বিরোধী। আধুনিক অর্থেই তা রাষ্ট্রকেন্দ্রিক; রাষ্ট্রের অখণ্ডতা এবং সার্বভৌমত্বের ব্যাপারে কট্টরপন্থী এবং সমাজনীতি নির্ণয় ও সংস্কারের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপে বিশ্বাসী। এই মতবাদের মূল আবেদন ধর্মীয় নয়, রাষ্ট্রীয়। সেই অর্থে এর যুক্তির কাঠামো সম্পূর্ণ সেকুলার। একটু ভাবলেই দেখা যাবে মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারের ইতিহাসবোধ কোনও অর্থেই সেকুলার ছিল না। তুলনায় তারণীচরণ আদ্যোপান্ত সেকুলার।

সত্যি কথা বলতে কি, এই মতবাদে 'হিন্দুত্ব' ধারণাটির আদপেই কোনো ধর্মীয় অনুষঙ্গ নেই। 'হিন্দু' হওয়ার জন্য কোনও বিশেষ ধর্মীয় আচার বা বিশ্বাস বা চিহ্নের

প্রয়োজন নেই। হিন্দুদের মধ্যে অজস্র সাম্প্রদায়িক পার্থক্য এই মতবাদের কাছে অপ্রাসঙ্গিক। এমন-কি বৌদ্ধ বা জৈন ধর্মের মতো বেদবিরোধী ব্রাহ্মণবিরোধী ধর্মকেও অনায়াসে হিন্দু বলে চালিয়ে দেওয়া যায়। একই ভাবে ব্রাহ্মণ্যধর্ম এবং বর্ণসমাজের বাইরে বিভিন্ন জনগোষ্ঠীগুলিকেও হিন্দুজাতির অংশ বলে দাবি করা চলে; কিন্তু ইসলাম বা খ্রিস্টান ধর্ম নিশ্চিতভাবে এই জাতীয়তার বাইরে।

অন্তর্ভুক্তি এবং বহিষ্কারের যুক্তিটা তাহলে কী? যুক্তিটা আসলে ঐতিহাসিক উৎপত্তির যুক্তি। বৌদ্ধ বা জৈনধর্ম 'হিন্দু', কারণ তা ভারতে উদ্ভূত। ইসলাম বা খ্রিস্টানধর্ম ভারতীয় নয়, বিদেশি। এখানে 'ভারত' বলতে সম্পূর্ণ আধুনিক অর্থে নির্দিষ্ট ভৌগোলিক সীমানাবিশিষ্ট সার্বভৌম রাষ্ট্রই বোঝাচ্ছে। আগেই দেখেছি, জাতীয়তাবোধের জন্ম থেকেই আমাদের ইতিহাসকল্পনায় এই সার্বভৌমত্বের ধারণা এসে গেছে। আধুনিক রাষ্ট্রচিন্তার বৈশিষ্ট্যই এই যে সার্বভৌমত্বের ভৌগৌলিক সীমা আর নাগরিকত্বের পরিচয় নিয়ে কোনও দ্বিধা বা অসঙ্গতি সে বরদাস্ত করতে পারে না। হিন্দু জাতীয়তাবাদ গত একশো বছর ধরে এই আধুনিক ঐতিহাসিক যুক্তি ব্যবহার করেই নিজেকে প্রকৃত ভারতীয় জাতীয়তাবাদ বলে দাবি করে চলেছে।

তাহলে হিন্দু নয় অথচ ভারতের অধিবাসী, এমন জনগোষ্ঠীর স্থান কোথায়? এর একাধিক উত্তর আছে। রাষ্ট্রের কেন্দ্রত্ব মেনে নিয়ে যে-উত্তর, তাতে বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর সংখ্যাই হল প্রধান নির্ণায়ক। সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায় হিন্দু, বাকিরা সংখ্যালঘু। উগ্রহিন্দুর বক্তব্য, রাষ্ট্রীয় নীতিনির্ধারণে সংখ্যালঘুদের কর্তব্য সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায়ের নেতৃত্ব এবং প্রাধান্য মেনে নেওয়া। এই উত্তরটি আধুনিক জাতীয়তাবাদের আদিপর্ব থেকেই পাওয়া যাচ্ছে। ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের *স্বপ্নলব্ধ ভারতবর্ষের ইতিহাস* (১৮৭৬) মনে করুন।[২০] পানিপতে আহমদ শাহ আবদালির সঙ্গে মারাঠাদের যুদ্ধ চলেছে। এমন সময় মারাঠা সেনাপতির দূত আহমদ শাহ-র কাছে গিয়ে বললেন যে যদিও মুসলমানেরা চিরকাল হিন্দুদের প্রতি অন্যায় করে এসেছে, তবু হিন্দুরা ক্ষমাশীল।

> ...আপনি নিজ দলবল সহিত নির্ব্বিঘ্নে স্বদেশ গমন করুন। ভারতবর্ষনিবাসী যদি কোন মুসলমান আপনার সমভিব্যাহারে যাইতে ইচ্ছা করেন, তাহাতেও কোন প্রতিবন্ধকতা নাই। তবে তাদৃশ মুসলমানের পক্ষে পাঁচ বৎসর পর্য্যন্ত এ দেশে প্রত্যাগমন নিষিদ্ধ।

কাল্পনিক ইতিহাস। তাই আহমদ শাহ বললেন,

> তুমি মহারাষ্ট্র-সেনাপতিকে গিয়া বল...আর কখনও ভারতবর্ষ আক্রমণে উদ্যম করিব না।
>
> এই কথা শুনিয়া দূত অভিবাদনপূর্ব্বক কহিল, মহারাজের আজ্ঞা শিরোধার্য্য। আমার প্রতি আর একটি কথা বলিবার আদেশ আছে। এ দেশীয় যে সকল মুসলমান নবাব, সুবাদার, জমিদার, জায়গীরদার প্রভৃতি আপনার সমভিব্যাহারী না হইবেন, তাহারা অবিলম্বে যে যাঁহারা আপনাপন অধিকার এবং আবাসে প্রতিগমন করুন।

> মহারাষ্ট্রীয় সেনাপতি বলিয়াছেন 'ঐ সকল লোকের পূর্ব্বকৃত সমস্ত অপরাধ মার্জ্জনা হইল'। (পৃ. ৩৪৪)

এর পর ভারতের সমস্ত প্রান্তের শাসকবৃন্দের সভা বসল। 'একজন গম্ভীর প্রকৃতির মধ্যবয়স্ক পুরুষ' বললেন:

> 'ভারতভূমি যদিও হিন্দুজাতীয়দিগেরই যথার্থ মাতৃভূমি, যদিও হিন্দুরাই ইহার গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, তথাপি মুসলমানেরাও আর ইহার পর নহেন, ইনি উহাদিগকেও আপন বক্ষে ধারণ করিয়া বহুকাল প্রতিপালন করিয়া আসিতেছেন। অতএব মুসলমানেরাও ইহার পালিত সন্তান।
>
> 'এক মাতারই একটি গর্ভজাত ও অপরটি স্তন্যপালিত দুইটি সন্তানে কি ভ্রাতৃত্ব সম্বন্ধ হয় না? অবশ্যই হয়—সকলের শাস্ত্র মতেই হয়। অতএব ভারতবর্ষ-নিবাসী হিন্দু এবং মুসলমানদিগের মধ্যে পরস্পর ভ্রাতৃত্ব সম্বন্ধ জন্মিয়াছে...
>
> 'এক্ষণে সকলকে সম্মিলিত হইয়া মাতৃদেবীর ভার গ্রহণ করিতে হইবে। কিন্তু সকলের কর্ত্তা একজন না থাকিলেও সম্মিলন হয় না। কোন্ ব্যক্তি আমাদিগের সকলের অধিনায়ক হইবেন? দৈবানুকুলতায় এ বিষয়েও আর বিচার করিবার স্থল নাই। রাজাধিরাজ রামচন্দ্রের নিমিত্ত এই যে সিংহাসন প্রস্তুত হইয়াছে,...পৃথিবী টলিলেও আর ইহা টলিবে না—আর ঐ দেখ, মহামতি সাহ আলম বাদশাহ স্বেচ্ছাতঃ রাজা রামচন্দ্রকে আপন শিরোভূষণ মুকুট প্রদান করিয়া তাঁহার হস্তে সাম্রাজ্য পালনের ভার সমর্পণ করিবার নিমিত্ত আসিতেছেন।' (পৃ. ৩৪৫-৬)

মুঘল বাদশাহ মারাঠা রাজা রামচন্দ্রের হাতে শাসনভার তুলে দিলেন।

> নিমেষ মধ্যে সকলের গাত্রোত্থানের আজ্ঞা হইল: উঠিয়া আর কেহই সাহ আলমকে দেখিতে পাইলেন না। দিল্লীর সিংহাসনোপরি শিবাজী বংশ-সম্ভূত রাজা রামচন্দ্র একাকী উপবিষ্ট—তাঁহার শিরোদেশে সাহ আলম প্রদত্ত সেই রাজমুকুট। (পৃ. ৩৪৬-৭)

যাঁরা ভূদেবের এই আশ্চর্য রচনাটি পড়েননি, তাঁদের জানাই যে এর পর একটি ব্যবস্থাপক সভায় ভারতবর্ষের নতুন শাসনতন্ত্র গৃহীত হয়। সম্পূর্ণ আধুনিক শাসনতন্ত্র, নিঃসন্দেহে ভূদেবের সমসাময়িক নবপ্রতিষ্ঠিত জার্মান রাষ্ট্রের অনুপ্রেরণায় রচিত। তাতে এমনই শক্তিশালী এক সার্বভৌম আধুনিক রাষ্ট্র গড়ে ওঠে যে ইউরোপীয় রাষ্ট্রগুলির সঙ্গে শিল্প-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে সমান তালে পাল্লা দিয়ে ভারতবর্ষ ঔপনিবেশিক শক্তিকে চিরতরে ঠেকিয়ে রাখতে সক্ষম হয়।

সংখ্যাগুরু-সংখ্যালঘুর হিসেব করে অন্য যে-উত্তরটি আমরা পাই, তাকেই স্বাধীন ভারতে 'সেকুলার' বলা হয়ে থাকে। এই মতটির বক্তব্য, সংখ্যাগুরুর উৎপীড়ন থেকে বাঁচাবার জন্য রাষ্ট্রের উচিত সংখ্যালঘু সম্প্রদায়কে আলাদাভাবে রক্ষা করা। সমস্যা হল, রাষ্ট্রব্যবস্থায় ধর্মীয় সম্প্রদায় অনুযায়ী প্রতিনিধিত্বের কোনও ব্যবস্থা নেই, অথচ সংখ্যালঘু

সম্প্রদায়ের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব রাষ্ট্রকে স্বীকার করতে হচ্ছে। ফলে স্বাতন্ত্র্যের সব চেয়ে প্রকট চিহ্নধারী ব্যক্তি বা সংগঠনই সংখ্যালঘুর প্রতিনিধি হিসেবে স্বীকৃত হয়। স্বাধীনতার পর ভারতের মুসলিম সমাজে সংস্কার-আন্দোলন যতটা হতোদ্যম হয়ে পড়েছে, পৃথিবীর কোনও মুসলিম দেশে তা হয়নি।

তৃতীয় একটি উত্তরও অবশ্য আছে। তবে সেটি সমাজ জীবনে রাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় ভূমিকা স্বীকার করে না। বাংলায় এই মতটির একাধিক প্রবক্তা ছিলেন। স্বদেশী-পরবর্তী যুগে রবীন্দ্রনাথের লেখায় এই মতটির প্রতিফলন সুপরিচিত। রাষ্ট্রনীতির সংকীর্ণ সীমা ছাড়িয়ে বৃহত্তর জনজীবনে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের পারস্পরিক আদানপ্রদান ও সৌহার্দ্যের যে অসংখ্য নিদর্শন রয়েছে, এই মতের প্রবক্তারা সেদিকেই দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। তাঁরা বলেন, রাজারাজড়ার যুদ্ধবিগ্রহে নয়, এই লোকাচার-দেশাচারের জগতেই ভারতবর্ষের প্রকৃত ইতিহাস খুঁজে পাওয়া যাবে। এই ইতিহাস, বিভিন্নতার মধ্যে ঐক্যের ইতিহাস। ভারতীয় জনজীবনের বিভিন্নতা সবরকম ধর্মবিশ্বাসকেই ধারণ করতে পারে; রাষ্ট্রের ক্ষমতা থেকে উদ্ভূত বিবাদ তাকে স্পর্শ করে না।

এই উত্তরটা নিয়েও অবশ্য মুশকিল আছে। প্রথম অসুবিধা হল, আধুনিক ইতিহাসবোধের সঙ্গে একে কিছুতেই খাপ খাওয়ানো যায় না। এর যুক্তিটা আসলে ইতিহাসের ঊর্ধ্বে অবস্থিত। ইতিহাসে যা-ই পরিবর্তন ঘটে থাকুক না কেন, ভারতের সমাজজীবনের অন্তর্নিহিত সত্য এক এবং অপরিবর্তিত—এই হল এর বক্তব্য। ফলে কোথাও না কোথাও আধুনিক ইউরোপের দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে ভারতীয় সমাজদর্শনের একটা মৌলিক পার্থক্য এখানে তুলে ধরার প্রয়োজন হয়ে পড়ে। রবীন্দ্রনাথ *ন্যাশনালিজম* নামে ইংরেজি বক্তৃতায় যেমন সরাসরিই বলেছিলেন, জাতীয়তাবাদ আধুনিক ইউরোপের এক মারাত্মক আবিষ্কার, ওটা আমাদের ঘাড়ে না চাপলেই আমাদের মঙ্গল। দ্বিতীয় অসুবিধা, উৎপত্তির সমস্যাটা এখানেও এড়ানো যাচ্ছে না। লোকাচারের ঢিলেঢালা ঐক্যের কাঠামোয় ইসলামকে সেই ভূদেবের মতো 'পালিত সন্তান' হিসেবেই একমাত্র জায়গা দেওয়া যায়। ফলে এই ধরনের ইতিহাসে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে ধর্মীয় 'সমন্বয়'-এর উদাহরণ—ইসলাম যেখানে দেশীয় জল-হাওয়ার প্রভাবে 'ভারতীয়' চেহারা ধারণ করেছে। তৃতীয় অসুবিধা, লৌকিক আচার-বিশ্বাসকে যতই খাতির করা হোক না কেন, উচ্চমার্গের সংস্কৃতির সঙ্গে তার মৌলিক বিরোধ মুছে ফেলা যায় না। লোকসমাজের স্বাতন্ত্র্য সত্যি সত্যি স্বীকার করে নিলে আধুনিক সংস্কার-আন্দোলনের যৌক্তিকতাই হারিয়ে যায়। 'বিভেদের মাঝে ঐক্য'-র এইসব নিদর্শনকে আধুনিক জাতীয় জীবনের মঞ্চে হাজির করতে হলে তাকে রীতিমতো সাবান ঘষে সাফসুতরো করে নিতে হয়। রবীন্দ্রনাথ নিজেও তাই করেছিলেন। আজকালকার 'ফেস্টিভাল অফ ইণ্ডিয়া' বা 'অপনা উৎসব' অন্যভাবে তাই করছে। তাতে লোকজীবনের নিজস্বতা বজায় থাকছে কি?

এই তিনটে উত্তরের কোনওটাতেই কিন্তু ইসলামের উত্তরাধিকারে সমগ্র ভারতীয় জাতির কোনো দাবি থাকতে পারে, এ সম্ভাবনাকে স্বীকার করা হয় নি। জাতীয় ইতিহাসের অখণ্ডতার ধারণা অনিবার্যভাবে টেনে নিয়ে গেছে একটিমাত্র সূত্রের দিকে, যেখানে ভারতীয় ঐতিহ্যের উৎপত্তি এবং যার নাম প্রাচীন হিন্দু সভ্যতা। ইসলাম

এখানে হয় বিদেশী আক্রমণের ইতিহাস, না হলে দেশজ লোকাচারের অন্তর্গত। ইসলামের নিজস্ব ক্লাসিকাল ঐতিহ্যের স্থান ভারতের ইতিহাসের বাইরে।

মজার কথা হল, ইউরোপের ক্লাসিকাল ঐতিহ্যকে কিন্তু আমাদের আধুনিকতা অনায়াসেই আপন করে নিয়েছে। ইউরোপের ঐতিহ্য বিশ্বজনীন, এটাই বোধ হয় যুক্তি। এতে যে ইউরোপীয় উপনিবেশবাদের প্রধান লক্ষণটি প্রকাশ পাচ্ছে, সেটা অবশ্য আমরা স্বীকার করি না। ইউরোপ যত আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে আমাদের পরাধীন করতে পেরেছে, পাঠান-মুঘল সৈন্যেরা তার ধারে কাছেও কোনওদিন পৌঁছতে পারে নি। কিন্তু আমাদের স্বাদেশিকতা ইউরোপীয় ঐতিহ্যকে আজও অনুকরণীয় মনে করে।

১০

চতুর্থ একটি উত্তরও অবশ্য ছিল। সেটি এতই অস্পষ্ট এবং অসম্পূর্ণ যে তাকে উত্তর না বলে বলা উচিত উত্তরের সম্ভাবনা। তাতে ভারতের ইতিহাসের অখণ্ডতা সম্বন্ধে একটা সন্দেহ প্রকাশ করা হয়েছে। উৎপত্তির প্রশ্নটাও সেখানে অনিশ্চিত। এই ইতিহাসকে রাষ্ট্রীয় না বলে বলা যেতে পারে যুক্তরাষ্ট্রীয়।

বঙ্কিমের লেখাতেই এই আভাস রয়েছে।[১১] 'রাজা ভিন্ন-জাতীয় হইলেই রাজ্যকে পরাধীন বলিতে পারা যায় না।' বাংলার স্বাধীন সুলতানদের আমলকেই বঙ্কিম প্রকৃত রেনেসাঁসের যুগ মনে করতেন।

> পরাধীনতার একটি প্রধান ফল ইতিহাসে এই শুনা যায় যে, পরাধীন জাতির মানসিক স্ফূর্ত্তি নিবিয়া যায়। পাঠানশাসনকালে বাঙ্গালীর মানসিক দীপ্তি অধিকতর উজ্জ্বল হইয়াছিল। ...এই দুই শতাব্দীতে বাঙ্গালীর মানসিক জ্যোতিতে বাঙ্গালার যেরূপ মুখোজ্জ্বল হইয়াছিল, সেরূপ তৎপূর্ব্বে বা তৎপরে আর কখনও হয় নাই। (পৃ. ৩৩২)
>
> আমাদের এই Renaissance কোথা হইতে? কোথা হইতে সহসা এই জাতির এই মানসিক উদ্দীপ্তি হইল? ...এ আলোক নিবিল কেন? (পৃ. ৩৩৯)
>
> যে আকবর বাদশাহের আমরা শতমুখে প্রশংসা করিয়া থাকি, তিনিই বাঙ্গালার কাল। তিনিই প্রথম প্রকৃতপক্ষে বাঙ্গালাকে পরাধীন করেন। ...মোগলই আমাদের শত্রু, পাঠান আমাদের মিত্র।' (পৃ. ৩৩২)

ভারতের ইতিহাস আর বাংলার ইতিহাস, দুই ধারায় ঘোর অসংগতি এসে যাচ্ছে এখানে। রাষ্ট্র বা জাতির সার্বভৌম কেন্দ্র কোনটা, তাও আর স্থির থাকছে না। একদিকে দেখা যাচ্ছে, আর্যদের বাংলায় অনুপ্রবেশ অপেক্ষাকৃত দেরিতে। তা হলে আর্যসভ্যতার উত্তরাধিকারী হিসেবে বাঙালির দাবি কি দুর্বল হয়ে পড়ে?

> অনেকেই মনে করিবেন যে, বাঙ্গালার ও বাঙ্গালীর বড় লাঘব হইল। আমরা আধুনিক বলিয়া বাঙ্গালীজাতির অগৌরব করা হইল; আমরা প্রাচীন জাতি বলিয়া আধুনিক ইংরেজদিগের সম্মুখে স্পর্দ্ধা করি—তা না হইলে আমরাও আধুনিক হইলাম।

> আমরা দেখিতেছি না যে, অগৌরব কিছু হইল। আমরা সেই প্রাচীন আর্য্যজাতিসম্ভূতই রহিলাম—বাঙ্গালায় যখন আসি না কেন, আমাদিগের পূর্ব্বপুরুষগণ সেই গৌরাবান্বিত আর্য্য। বরং গৌরবের বৃদ্ধিই হইল। আর্য্যগণ বাঙ্গালায় তাদৃশ কিছু মহৎ কীর্ত্তি রাখিয়া যান নাই—আর্য্যকীর্ত্তিভূমি উত্তর পশ্চিমাঞ্চল। এখন দেখা যাইতেছে যে, আমরা সে কীর্ত্তি ও যশেরও উত্তরাধিকারী। সেই কীর্ত্তিমন্ত পুরুষগণই আমাদিগের পূর্ব্বপুরুষ। দোবে, চোবে, পাঁড়ে, তেওয়ারীর মত আমরাও ভারতের আর্য্যগণের প্রাচীন যশের ভাগী বটে। (পৃ. ৩২৬)

কিন্তু অন্য দিকে প্রশ্ন উঠছে, বাঙালিদের মধ্যে আর্য কারা? জাতি হিসেবে বাঙালির উৎপত্তি কোথায়? সাতটি পরিচ্ছেদে বিভক্ত এক দীর্ঘ প্রবন্ধে বঙ্কিম ভাষাতত্ত্ব-নৃতত্ত্বের নানা আবিষ্কার জড়ো করে এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজেছিলেন। সেইসব বৈজ্ঞানিক সাক্ষ্যের অধিকাংশই এখন মনে হবে সম্পূর্ণ আষাঢ়ে। এই প্রবন্ধটিও বঙ্কিমের অন্যান্য লেখার তুলনায় এখন প্রায় বিস্মৃতই বলা চলে। কিন্তু প্রবন্ধের সিদ্ধান্তটি অখণ্ড জাতীয় ইতিহাস লেখার পক্ষে খুব স্বস্তিজনক ছিল না।

> ইংরেজ একজাতি, বাঙ্গালীরা বহুজাতি। বাস্তবিক এক্ষণে যাহাদিগকে আমরা বাঙ্গালী বলি, তাহাদিগের মধ্যে চারি প্রকার বাঙ্গালী পাই। এক আর্য্য, দ্বিতীয় অনার্য্য হিন্দু, তৃতীয় আর্য্যানার্য্য হিন্দু, আর তিনের বার এক চতুর্থ জাতি বাঙ্গালী মুসলমান। চারি ভাগ পরস্পর হইতে পৃথক থাকে। বাঙ্গালীসমাজের নিম্নস্তরেই বাঙ্গালী অনার্য্য বা মিশ্রিত আর্য্য ও বাঙ্গালী মুসলমান; উপরের স্তরে প্রায় কেবলই আর্য্য। এই জন্যে দূর হইতে দেখিতে বাঙ্গালীজাতি অমিশ্রিত আর্য্যজাতি বলিয়াই বোধ হয় এবং বাঙ্গালার ইতিহাস এক আর্য্যবংশীয় জাতির ইতিহাস বলিয়া লিখিতে হয়। (পৃ. ৩৬৩)

শুধু বঙ্কিমেই নয়, অন্য লেখকদের রচনাতেও এই সম্ভাব্য স্বতন্ত্র ইতিহাসের উপাদান খুঁজে পাওয়া যাবে। রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের যে-বইটিকে বঙ্কিম 'সুবর্ণের মুষ্টিভিক্ষা' বলেছিলেন, তাতে দেখছি বলা হচ্ছে যে ভারতের অন্যত্র যা ই ঘটে থাকুক, বাংলায় অন্তত বাহুবলের কারণে মুসলমান ধর্মের প্রসার ঘটেনি।[২২] কৃষ্ণচন্দ্র রায় ইংরেজ আমলের সঙ্গে তুলনা করে বলেছেন যে মুসলমান সুলতান বা নবাবদের সময় বাংলায় 'এদেশীয়দিগের উচ্চ রাজ কর্ম্ম প্রাপ্তির কোন বাধা ছিল না।'[২৩] আর বাংলার শেষ স্বাধীন নবাব সিরাজউদ্দৌলার 'জাতীয়করণ' প্রক্রিয়াটা আমরা আগেই লক্ষ করেছি।

কথা হলো, দুটি স্বতন্ত্র 'জাতীয়' ইতিহাস—একটি আর্য্য-সভ্যতা-উদ্ভূত, প্রধানত উত্তরভারত কেন্দ্রিক, 'ভারতবর্ষীয়দিগের' ইতিহাস, অন্যটি অনিশ্চিত সূত্র থেকে উদ্ভূত, 'বহুজাতিক' বাঙালির ইতিহাস—এই দুই ইতিহাসের ক্রমপর্যায়, গতিপথ, ছন্দের যে বৈসাদৃশ্য, তাদের পারস্পরিক সম্পর্কের যে জটিলতা, তাতে ভিন্নতর কোনও ইতিহাসবোধের সম্ভাবনা নিহিত ছিল কি? এ-প্রশ্নের বিশদ আলোচনার জায়গা এই প্রবন্ধে আর নেই। বাংলায় ইতিহাস রচনার এই ধারাটি অন্তঃশীলা। গত একশো বছর ধরেই আর্য হিন্দু-ভারতবর্ষের পর্বতপ্রমাণ ভারে তা সম্পূর্ণ চাপা পড়ে গিয়েছে। তবে

সামান্য যে কটি উদাহরণ দিলাম, তা থেকেই তো দেখা যাচ্ছে যে এই ভিন্ন ইতিহাসে পাঠান আর মুঘলকে একত্র করে 'মুসলমান শাসনকাল' নাম দিয়ে পর্ব ভাগ করা সম্ভব হচ্ছে না। পাঠানপর্ব আর মুঘলপর্বের মধ্যে মৌলিক প্রভেদ এসে যাচ্ছে। অথবা বাংলায় মুসলমান ধর্মের প্রসারের কথা বলতে গিয়ে 'মুহম্মদ বলিলেন, তরবারি লইয়া কাফেরদের নির্মূল করো', এইভাবে গল্প শুরু করা যাচ্ছে না।

ভাবা যেতে পারে, এরকম স্বতন্ত্র ইতিহাস যদি ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে লেখা হয়, তাহলে সামগ্রিকভাবে 'ভারতবর্ষের ইতিহাস'-এর ভারকেন্দ্রটা আর্যাবর্তে কিংবা আরও নির্দিষ্টভাবে দিল্লির সিংহাসনে আর বেঁধে রাখা যাবে না। ইতিহাসের কেন্দ্রিকতার প্রশ্নটাই অনেক অনিশ্চিত হয়ে পড়বে। বিষয়টা তখন আর 'জাতীয়' ইতিহাস আর 'আঞ্চলিক' ইতিহাসের ব্যাপার থাকবে না। কোনটা সমগ্র আর কোনটা অংশ, কে অবয়ব কে অবয়বী, এ-প্রশ্নও নতুন করে বিচার করতে হবে। তাই বলছিলাম, এই বিকল্প ইতিহাসের সামগ্রিকতা যদি কিছু থাকে, তবে তা রাষ্ট্রীয় নয়, যুক্তরাষ্ট্রীয়।

কিন্তু এই বিকল্প ইতিহাস রচনার জন্য প্রস্তুতি এখনও পর্যন্ত আমাদের নেই। ভারতের ইতিহাসের অখণ্ডতার ধারণাটাই যে আজ পর্যন্ত ভারতের অধিবাসীদের খণ্ডিত করে চলেছে, এই সত্যটা না বুঝতে পারলে বিকল্প ইতিহাস খোঁজার পথ প্রশস্ত হবে না।

টীকা

১ উনিশ শতকে বাঙালির ইতিহাসচিন্তা এবং সেই পটভূমিতে বঙ্কিমের ইতিহাস-বিষয়ক রচনাব তাৎপর্য নিয়ে সম্প্রতি উল্লেখযোগ্য আলোচনা করেছেন Ranajit Guha, *An Indian Historiography for India: A Nineteenth-Century Agenda and its Implications* (Calcutta, 1988)

২ 'বিবিধ প্রবন্ধ' দ্বিতীয় খণ্ডে অন্তর্ভুক্ত বাংলার ইতিহাস সংক্রান্ত বঙ্কিমের প্রবন্ধগুলি সুপরিচিত। এখানে শুধু 'বাঙ্গালাব ইতিহাস' এবং 'বাঙ্গালার ইতিহাস সম্বন্ধে কয়েকটি কথা' প্রবন্ধ দুটি থেকে উদ্ধৃতি দিলাম। *বঙ্কিম রচনাবলী*, দ্বিতীয় খণ্ড (কলকাতা: সাহিত্য সংসদ, ১৯৫৪), পৃ. ৩৩০-৩, ৩৩৬ ''।

৩ মৃত্যুঞ্জয় শর্মণঃ, *রাজাবলি* (শ্রীরামপুর, ১৮০৮)।

৪ অষ্টাদশ শতাব্দীতে বাংলার সম্ভ্রান্ত পরিবারে প্রচলিত রাজবংশের তালিকা সম্বন্ধে রমেশচন্দ্র মজুমদারের একটি আলোচনা আছে। 'সংস্কৃত রাজাবলী গ্রন্থ', *সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা*, ৪৬, ৪ (১৩৪৬), পৃ. ২৩২-৯। গৌতম ভদ্র আমায় এই সূত্রটির খোঁজ দিয়েছেন।

৫ মুন্সী আলিমদ্দিন, *দীল্লিশ্ব রাজাদির নাম* (বরিশাল, ১৮৭৫)।

৬ রামগতি ন্যায়রত্ন, *বাঙ্গালার ইতিহাস*, প্রথম ভাগ, 'হিন্দু রাজাদিগের চরমাবস্থা অবধি নবাব আলীবর্দ্দি খাঁর অধিকার কাল পর্য্যন্ত' (হুগলি, ১৮৫৯)।

৭ বামসদয় ভট্টাচার্য, *বাঙ্গালা ইতিহাসের প্রশ্নোত্তর* (কলকাতা, ১৮৬৯)।

৮ ক্ষেত্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, *শিশুপাঠ বাঙ্গালার ইতিহাস, বর্গীর হাঙ্গাম হইতে লার্ড নর্থব্রুকের আগমন পর্য্যন্ত* (কলকাতা, ১৮৭২)।

৯ কৃষ্ণচন্দ্র রায়, *ভারতবর্ষের ইতিহাস, ইংরেজদিগের অধিকারকাল* (কলকাতা, ১৮৭০; প্রথম প্রকাশ, ১৮৫৯)।

১০ ক্ষিরোদচন্দ্র রায়চৌধুরী, *সমগ্র ভারতের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস* (কলকাতা, ১৮৭৬)।

১১ তারাকৃষ্ণ হালদার, *চমৎকার স্বপ্নদর্শন* (কলকাতা, ১৮৬৮)।

১২ ভোলানাথ চক্রবর্ত্তী, *সেই একদিন আর এই একদিন*, অর্থাৎ *বঙ্গের পূর্ব্ব ও বর্ত্তমান অবস্থা* (কলকাতা, ১৮৭৬)।

১৩ তারিণীচরণ চট্টোপাধ্যায়, *ভারতবর্ষের ইতিহাস*, প্রথম ভাগ (কলকাতা, ১৮৭৮; প্রথম প্রকাশ ১৮৫৮)।

১৪ এই প্রসঙ্গে দ্রষ্টব্য, J.S. Grewal, *Muslim Rule in India: The Assessments of British Historians* (Calcutta, 1970)

১৫ একটি বই দেখেছি যা সম্পূর্ণভাবেই তারিণীচরণের সংক্ষিপ্ত সংস্করণ—গোটা গোটা অনুচ্ছেদে হুবহু এক। জীবনকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়, *ভারতবর্ষের পুরাবৃত্ত* (কলকাতা, পঞ্চম সংস্করণ, ১৮৭৫, প্রথম প্রকাশ ১৮৬৮)।

১৬ ছৈয়দ আবদুল রহিম, *ভারতবর্ষের ইতিহাসের প্রশ্নোত্তর* (ঢাকা, ১৮৭০)।

১৭ শেখ আবদর রহিম, *হজরত মহম্মদের জীবন চরিত ও ধর্ম্মনীতি* (কলকাতা, ১৮৮৬)।

১৮ এই প্রসঙ্গে দ্রষ্টব্য Rafiuddin Ahmed *The Bengal Muslims 1871-1906, A Quest for Identity* (Delhi 1981), p 93-7

১৯ Guha, *An Indian Historiography* p. 62-67

২০ *ভূদেব রচনা সম্ভার*, প্রমথনাথ বিশী সম্পাদিত, (কলকাতা, ১৯৬২), পৃ. ৩৪১-৭৪।

২১ *বিবিধ প্রবন্ধ* দ্বিতীয় খণ্ডের এই প্রবন্ধগুলো থেকে উদ্ধৃতি দিলাম এখানে: 'বঙ্গে ব্রাহ্মণাধিকার', 'বাঙ্গালার ইতিহাস', 'বাঙ্গালার ইতিহাস সম্বন্ধে কয়েকটি কথা', 'বাঙ্গালীর উৎপত্তি'। *বঙ্কিম রচনাবলী*, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ. ৩১৯-২৭, ৩৩০-৩, ৩৩৬-৪০, ৩৪৪-৬৩।

২২ রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, *প্রথম শিক্ষা বাঙ্গালার ইতিহাস* (কলকাতা, ১৮৭৫), পৃ. ৬১ ২।

২৩ কৃষ্ণচন্দ্র রায়, *ভারতবর্ষের ইতিহাস, ইংরাজদিগের অধিকারকাল* (কলকাতা, চতুর্দশ সংস্করণ, ১৮৭৫), পৃ ২৪৫।

শরীর, সমাজ ও রাষ্ট্র : ঔপনিবেশিক ভারতে মহামারি ও জনসংস্কৃতি

দীপেশ চক্রবর্তী

গৌরচন্দ্রিকা

সাম্প্রতিককালে ভারত-বিশেষজ্ঞ কয়েকজন মহামারি, মড়ক, বন্যা, দুর্ভিক্ষ ইত্যাদির সামাজিক ইতিহাস রচনায় মন দিয়েছেন। বিষয়টির গুরুত্ব এঁদের রচনায় ক্রমশ স্পষ্ট হয়েছে। বর্তমান প্রবন্ধের অন্যতম উদ্দেশ্য এঁদের গবেষণালব্ধ তথ্যসমূহের পুনর্বিবেচনা করা। আমার বৃহত্তর উদ্দেশ্য ভারতবর্ষে তথা সাধারণভাবে আধুনিক রাষ্ট্রের চরিত্র ও ক্ষমতার কয়েকটি দিক তুলে ধরা। এই চেষ্টার সপক্ষে দু-একটি কথা বলা প্রয়োজন মনে করি।

আধুনিক রাষ্ট্র যেভাবে অন্যান্য সামাজিক বন্ধনকে আত্মসাৎ, দমন বা শিথিল করে বা প্রয়োজনবোধে হটিয়ে দিয়ে—নাগরিকের ওপর নিজের দাবিকে প্রতিষ্ঠিত করেও অগ্রাধিকার দেয়—ভারতীয় ইতিহাস রচনায় সে আলোচনা শুরু হয়নি বললেই চলে। 'শান্তি বজায় রাখা' বা 'আইন-শৃঙ্খলা' রক্ষা করা, 'আর্থিক উন্নতি' ও 'জনস্বাস্থ্য' রক্ষা করা রাষ্ট্রব্যবস্থার মুখ্য কর্তব্য বলে ধরা হয়। এগুলো যেমন রাষ্ট্রের কর্তব্য, তেমনি তার মতাদর্শগত হাতিয়ারও বটে। এই রাষ্ট্রিক মতাদর্শের একটি ভান থাকে—যা সংবাদপত্র থেকে ইস্কুলের পাঠ্যপুস্তক পর্যন্ত ছড়ানো—যেন রাষ্ট্রের স্বনির্বাচিত কর্তব্যগুলি ইতিহাস-বহির্ভূত কোনও 'প্রাকৃতিক' বিধানের অংশ, যেন রাষ্ট্রীয় উদ্দেশ্যের মূল মতাদর্শগত সূত্রগুলি (যেমন, প্রগতি, উন্নতি, স্বাস্থ্য) মানুষের স্বাভাবিক ও আদিমতম আকাঙ্ক্ষার প্রকাশ। যদি কোনও প্রতিষ্ঠান ও মানুষ মৌলিকভাবে 'প্রগতি', 'উন্নতি' ইত্যাদির মূলমন্ত্রের বিরোধিতা করে, তাঁদেরই বর্ণনা করা হবে 'কুসংস্কারাচ্ছন্ন' বা 'মূর্খতার অন্ধকারে' নিমজ্জিত বলে। পশ্চিমবঙ্গের ইতিহাসচর্চার ক্ষেত্রে সম্প্রতি এমন কথাও পড়েছি যে রাষ্ট্রের অস্তিত্বের মৌলিক সমালোচনা হয় এমন ইতিহাস রচনা করা নাকি দেশদ্রোহিতারই নামান্তর।

এ-প্রবন্ধের কেন্দ্রে আছে শরীর, সমাজ ও ব্যাধি। মহামারি বিষয়ক কতগুলো ধারণা ও ঐতিহাসিক ঘটনাবলী। শরীরের সঙ্গে আধুনিক রাষ্ট্রের সম্পর্ক কী? একটু ভাবলেই বোঝা যাবে সম্পর্কটি জটিল ও গভীর। পরিবার-পরিকল্পনা থেকে শুরু করে মহামারি নিয়ন্ত্রণ পর্যন্ত সর্বত্রই দেখা যায় আমাদের এই তথাকথিত নিতান্ত 'ব্যক্তিগত' বস্তুটির সঙ্গে সরকারের সম্বন্ধের নজির। বুর্জোয়া সভ্যতা মানুষের শরীরকে যেভাবে ব্যবহার

করে ও যে তাৎপর্য দেয়, তা প্রাক-ধনতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় শরীরের যে অবস্থান থাকে তার থেকে আলাদা। 'কৃষক-শরীর', 'আদিবাসী-শরীর'কে ভেঙে-চুরে, দুমড়ে-মুচড়ে, নতুন অভ্যাসের ফাঁদে ফেলে, নতুন রুটিনের ছাঁচে ঢেলে তবে তো তৈরি হয় শ্রমিকের শরীর, বিপণন সমাজের অসংখ্য ভোগ্যবস্তুর ক্রেতার শরীর, ফ্যাশন-ম্যাগাজিনের স্বাস্থ্য-পত্রিকার শরীর।

এই পরিবর্তন এক দিনে হয় না। পুরোপুরিও ঘটে না কোনও সময়। পরিবর্তনের পথটিও সর্বত্র মসৃণ নয়। স্থান-কালভেদে জনগোষ্ঠীর সঙ্গে সরকারের সংঘর্ষ দেখা যায়। যেমন জরুরি অবস্থা চলাকালীন সাধারণ মানুষের 'নাসবন্দি'-বিরোধিতা। এই অসম ও বন্ধুর পরিবর্তন-প্রক্রিয়ার ইতিহাসে রাষ্ট্রের হাতে 'অস্ত্র' থাকে নানা ধরনের— আইনব্যবস্থা, সেনাবাহিনী, আর্থনীতিক ব্যবস্থা। কিন্তু একটি বিরাট 'অস্ত্র' আধুনিক শারীরবিদ্যা ও চিকিৎসাবিজ্ঞান-ভিত্তিক 'জনস্বাস্থ্য' নীতি।

আমাদের দেশে উনিশ শতকের শেষ দিকে বোম্বাই ও অন্যান্য শহরে সরকারের প্লেগ-নীতির বিরুদ্ধে দাঙ্গা হয়, এ খবর অনেকেরই জানা আছে। এ ছাড়া বসন্ত, কলেরা ইত্যাদি মহামারি নিয়ন্ত্রণ-বিষয়ে অনেক সময়ই সরকার, জাতীয়তাবাদী নেতৃত্ব ও সাধারণ মানুষ যে একমত হননি এ-ও সুবিদিত। হাসপাতাল সম্বন্ধে সাধারণ মানুষের ভীতি, 'সুঁই' নিতে অনিচ্ছা, এ সব হয়তো আমাদের মধ্যবিত্ত অনেকেরই ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার অংশ। এ বিষয়ে কিছু কিছু ঐতিহাসিক তথ্য আমরা প্রবন্ধের পরবর্তী অংশগুলিতে আলোচনা করব। তা থেকেই বেরিয়ে আসবে শাসনের সঙ্গে শরীরের, রাষ্ট্রের সঙ্গে সমাজের দ্বন্দ্বমূলক সম্পর্কের ইতিহাস। আলোচনার বৃহত্তর পটভূমিতে আমরা আবার ফিরে আসব বর্তমান নিবন্ধের শেষে।

জনস্বাস্থ্য ও ভারতশাসন

জনস্বাস্থ্য, সংক্রামক ব্যাধি, স্বাস্থ্যকর পরিবেশ, ব্যক্তিগত স্বাস্থ্যবিজ্ঞান ইত্যাদি 'আধুনিক' ধারণা এদেশে আমদানি করে ইংরেজ। জনস্বাস্থ্যের প্রশ্নটির সঙ্গে ঔপনিবেশিক ও আধুনিক রাষ্ট্রব্যবস্থায় দেশশাসনের প্রশ্নটি অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। সাম্রাজ্যবাদের গর্ভে যেমন নৃতত্ত্ববিদ্যার জন্ম ঘটে, চিকিৎসাশাস্ত্রেরও অনেক শাখাপ্রশাখা বিস্তৃত হয়েছে উপনিবেশের কাণ্ডটিকে বেষ্টন করে।

এর একটা ভাল উদাহরণ 'ট্রপিক্যাল মেডিসিন' বিষয়টি। ১৮৯০-এর দশকে এটি একটি স্বতন্ত্র বিষয় হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। লন্ডন স্কুল অব ট্রপিক্যাল মেডিসিন স্থাপিত হয় ১৮৯৯ সালে। সেই বছরই প্রথম প্রকাশিত হয় *জার্নাল অফ ট্রপিক্যাল মেডিসিন*। একটি সাম্প্রতিক গবেষণাধর্মী প্রবন্ধে দেখতে পাই যে, যে-আলোচনা-বিতর্ক ইত্যাদির মধ্য দিয়ে এই বিষয়টির জন্ম, তার মূল ছিল একটি নিতান্তই সাম্রাজ্যবাদী ও রাজনীতিক প্রশ্নে: শ্বেতাঙ্গ প্রভুরা কি গ্রীষ্মপ্রধান দেশগুলিতে উপনিবেশ গড়তে পারবেন? অষ্টাদশ শতকের ইউরোপীয় চিকিৎসাবিদরা অনেক রোগের ব্যাখ্যা দিতেন 'মায়াস্‌মা' বা 'পূতিবাষ্প'র তত্ত্বের মাধ্যমে। ওয়রবয়স দেখাচ্ছেন যে, উনিশ শতকের প্রথমার্ধেও এই ধারণা খুব চালু ছিল—জে. লিন্ড রচিত ১৭৬৮ সালের বই *এসে অন*

ডিসিসেস ইন্সিডেন্ট অফ ইউরোপিয়ানস ইন হট ক্লাইমেটস-এর সপ্তম সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছে গত শতাব্দীর গোড়ায়, ১৮০৮ সালে।[২] ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির মেডিকাল সার্ভিস চালু হয় ১৭৬৪ সালে।[২] ১৮১৯ সালেও তাদের ভারতগামী কর্মচারীদের 'ডিসিসেস অফ হট ক্লাইমেটস' বিষয় অধ্যয়ন করতে হত।[২] পূতিবাষ্পের তত্ত্বে বিশ্বাসীরা বলতেন, গরম দেশগুলি স্বভাবতই শ্বেতাঙ্গ মানুষদের পক্ষে অস্বাস্থ্যকর, তাই সেখানে দীর্ঘস্থায়ী রাজত্ব বা উপনিবেশ চালানো মুশকিল। এই তত্ত্বের বিরোধী যে গবেষণা চলে চিকিৎসাবিদ্যায় তারই ফল ট্রপিক্যাল মেডিসিন। ১৮৬০-এর পর থেকে পাস্তুর প্রমুখের গবেষণায় প্রতিষ্ঠিত হয় জীবাণু তত্ত্ব। বিভিন্ন রোগের মূল বিভিন্ন জীবাণুতে, এবং এই জীবাণু সনাক্ত করা ও তদনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়াটাই চিকিৎসাশাস্ত্রের মূল দায়িত্ব—এটাই ছিল এই তত্ত্বের মূলকথা। এর সঙ্গে সাম্রাজ্যবাদের সম্পর্ক যে কত ঘনিষ্ঠ তা বোঝাতে গিয়ে এক উদ্ধৃতি দিয়েছেন ওয়রবয়স। উদ্ধৃতিটির উৎস ১৮৯৮ সালের *ব্রিটিশ মেডিকাল জার্নাল*, এবং উক্তিটি করেছিলেন প্যাট্রিক ম্যানসন যাঁকে ট্রপিক্যাল মেডিসিনের জনক বলে অনেক সময় ভাবা হয়। ম্যানসন বলেছিলেন:

> আমি এখন এ বিষয়ে স্থিরনিশ্চিত যে, শ্বেতাঙ্গদের পক্ষে গ্রীষ্মপ্রধান দেশগুলিতে উপনিবেশ স্থাপনা করা সম্ভব। শুধু তাপ বা বাষ্পই যে গরম দেশে সমস্ত অসুখের উৎস, তা নয়। এইসব অসুখের শতকরা নিরানব্বই ভাগের কারণ হল বিভিন্ন ধরনের জীবাণু।...তাদের বিনাশ করা হল জ্ঞানার্জন ও জ্ঞানের প্রয়োগের প্রশ্ন।[৪]

চিকিৎসাবিজ্ঞানের বিতর্কে যার অস্তিত্ব প্রতিফলিত, সেই সাম্রাজ্যবাদ তো আর সঠিক স্বাস্থ্যতত্ত্বের আশায় বসে থাকেনি। ট্রপিক্যাল মেডিসিন যতদিনে একটি স্বতন্ত্র বিষয় হিসেবে পরিগণিত হয়েছে তার আগেই ভারতে ব্রিটিশ শাসন ও নতুন রাষ্ট্র কায়েম হয়ে বসেছে। পাঠককে মনে করিয়ে দিতে হবে না যে এই নতুন রাষ্ট্রের জন্ম হিংসার ভেতর দিয়ে। পরে 'শান্তি স্থাপনা'র নাম করে যতই বাহাদুরি নিতে চান না কেন ইংরেজ, অষ্টাদশ শতকের মাঝামাঝি থেকে একশো বছর ধরে ছোট-বড় লড়াই চালিয়েছে কোম্পানি। এই নতুন রাষ্ট্রের ক্ষমতার অন্যতম উপাদানই ছিল এর শৃঙ্খলাবদ্ধ, নিয়মাশ্রিত সেনাবাহিনী। একচেটিয়া সামরিক শক্তি আধুনিক রাষ্ট্র গঠনের একটি প্রাথমিক শর্ত।

সাম্প্রতিক গবেষণায় এটি পরিষ্কার যে, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের ইতিহাসের গোড়ার দিকে (এবং পরেও) 'জনস্বাস্থ্য'-বিষয়ক সমস্ত ভাবনাচিন্তাই উৎপন্ন হচ্ছে সেনাবাহিনীর সমস্যাকে কেন্দ্র করে। কোম্পানির সৈন্যদের যুদ্ধপ্রস্তুতি ও ক্ষমতার একটি প্রধান অন্তরায় ছিল সংক্রামক ব্যাধি বা মহামারি। বিশেষত যে সেনাবাহিনীকে ভারতের নানা অঞ্চলে ঝটিকার মতো ঘুরে বেড়াতে হবে, তার পক্ষে সৈন্যদের অসুস্থতা ছিল এক মারাত্মক প্রতিবন্ধক। ১৮১৭ খ্রিস্টাব্দে বুন্দেলখণ্ডে পিন্ডারি ও মারাঠা শক্তির বিরুদ্ধে জমায়েত করা সৈন্যরা অনেকেই কলেরার কবলে পতিত হন। এক সপ্তাহে ৭৬৪ জন সৈন্যের পর্যন্ত মৃত্যু হয়েছে। সমসাময়িক রিপোর্টে বলা হয়: 'প্রতিদিন শ'য়ে শ'য়ে (অসুস্থ) সৈন্য ভূপতিত হচ্ছিল ও মৃত ও মুমূর্ষু মানুষে রাস্তা ঢেকে যাচ্ছিল'। কলেরার

আক্রমণ এ-যাত্রা চলে ১৮২১ সাল পর্যন্ত।[৫] একটি হিসেবে দেখতে পাচ্ছি ১৮১৭ থেকে ১৮৫৭ পর্যন্ত কোম্পানির অধীনে যত ইউরোপীয় সৈন্য ও অফিসার ছিলেন, তাঁদের মৃত্যুর মাত্র ছয় শতাংশের কারণ ছিল সরাসরি যুদ্ধকার্য। বাকিদের গ্রাস করে নানাবিধ অসুখ: জ্বর (ম্যালেরিয়া-জাতীয়) রক্ত-আমাশা, উদরাময়, যকৃতের অসুখ ও কলেরা। এর মধ্যে কলেরার প্রকোপ ছিল ভয়ানক।[৬]

সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রের কাছে সমস্যাটি নগণ্য ছিল না। সিপাহি বিদ্রোহের পর ভারতে শ্বেতাঙ্গ সৈন্যের সংখ্যা প্রভূতভাবে বৃদ্ধি পায়। ১৮৬৪ সালে ব্রিটিশ ভারতের সৈন্যবাহিনীর মোট ২২৭,০০৫ জনের মধ্যে ব্রিটিশ অফিসার ও সৈন্যের সংখ্যা গিয়ে দাঁড়ায় ৮২,১৫৬। অসুস্থতা ও মৃত্যুর দরুণ যে পরিমাণ সৈন্য ও অফিসার অসমর্থ বা বাতিল হয়ে যেতেন, তাদের বদলি সরবরাহ করতে গেলে প্রতি বৎসর দশ হাজার করে নতুন লোক আমদানি করতে হত।[৭] কোম্পানির রাজনীতিতে সেনাবাহিনীর স্বাস্থ্যের প্রশ্নটি একটি খুবই গুরুত্ব প্রশ্ন ছিল।

ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রের জনস্বাস্থ্যনীতির সূত্রপাত এই ইতিহাসে। সংক্রামক ব্যাধির উৎস অস্বাস্থ্যকর অভ্যাস ও অভ্যাস-সৃষ্ট পরিবেশে, এমন একটা মতবাদ উনিশ শতকের প্রথমার্ধে ইংল্যান্ডের শহরগুলিতে জন্ম নিচ্ছিল। শিল্পবিপ্লবের সঙ্গে সঙ্গে গড়ে ওঠা শ্রমিক বসতিগুলোই অস্বাস্থ্য, অসুস্থতা ও এমন কি 'অমানবিকতা'রও ডিপো—এই ধারণা এঙ্গেলসের অল্প-বয়সের রচনা *ইংলন্ডে শ্রমিকশ্রেণীর অবস্থা* (১৮৪৪) ও আরও অনেক সমসাময়িক পুস্তিকা ও সরকারি রিপোর্টে পাওয়া যাবে। এর ফলে ভারতের যেসব জায়গায় জনসমাগম হত তাকে খুব ভয় পেতেন ব্রিটিশ সরকার। বাজার, গঞ্জ, মেলা, তীর্থক্ষেত্র—তাদের চোখে এই সব জায়গাগুলোই ছিল রোগ ছড়ানোর কেন্দ্র। ডেভিড আর্নল্ড দেখিয়েছেন কেমন করে হরিদ্বারের কুম্ভমেলা, এলাহাবাদের প্রয়াগের মেলা, পুরীর জগন্নাথধাম, মহারাষ্ট্রের নাসিক ও পান্ধারপুরের তীর্থস্থান, অন্ধ্রের তিরুপতি, তামিলদেশে কাঞ্চিপুরম—এই সমস্ত ক্ষেত্রে নজর পড়ে রোগভয়ে ভীত বিদেশি সরকারের।[৮] ১৮৬১ সালে কনস্ট্যানটিনোপলে অনুষ্ঠিত 'স্বাস্থ্যকর পরিবেশ' বিষয়ক প্রথম আন্তর্জাতিক সম্মিলনে আলোচনায় একটি প্রধান বিষয় ছিল 'ভারত'। ভারতে তীর্থযাত্রীদের ভিড় ও দলবেঁধে ভ্রমণ করার রীতি এখানে বর্ণনা করা হয় 'কলেরা সংক্রমণের সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী কারণ' হিসেবে।[৯] এই মনোভাব থেকে ব্রিটিশ সরকার মেলা-পরিচালনার বিশাল আয়োজন গড়ে তোলেন। পুলিশ, ডাক্তার, ওষুধ, পানীয় জল, মলমূত্রত্যাগের ব্যবস্থা, বাঁশের বেড়া ইত্যাদি দিয়ে 'ভিড়'কে কীভাবে সুশৃঙ্খল ও সংযত করা যাবে, এ বিষয়ে অনেক ভাবনাচিন্তা খরচ করেন সরকার। হাতের কাছে বইটি নেই, তাই নাম উল্লেখ করতে পারছি না এক্ষুণি, কিন্তু বিশ শতকের গোড়ায় পুলিশ-প্রকাশিত মেলা ম্যানেজমেন্টের ম্যানুয়াল দেখেছি। যাতে বিভিন্ন সাবধানবাণী ছাড়াও জনপ্রতি কতখানি বাঁশ, দড়ি, জল, পায়খানা, ডাক্তার ও পুলিশ প্রয়োজন, তার একটা বাঁধা হিসেব দেওয়া ছিল।[১০]

কোম্পানির প্রথম দায়িত্বই ছিল ভারতবর্ষে চাকুরিরত ইংরেজ অফিসার ও সৈন্যদের এখানকার 'দূষিত' আবহাওয়া ও জায়গা থেকে যথাসম্ভব বাঁচিয়ে রাখা।

ইংরেজ-অধ্যুষিত অঞ্চলগুলি খোলামেলা হবে, অফিসারদের বাংলো হবে আলোবাতাস ভরা সুবিশাল কাঠামো, শ্বেতাঙ্গ-পাড়ার সড়ক, নালা ইত্যাদির স্বাস্থ্যকরতার প্রতি রাখা হবে কড়া নজর। ১৮৬৪ সালে মিলিটারি ক্যান্টনমেন্টস্ অ্যাক্ট রচিত হল এই উদ্দেশ্যে। ১৯০৯ সালে ক্যান্টনমেন্টস্ ম্যানুয়াল-এ লেখা হল: 'এ কথা আমাদের সর্বদা স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে...ক্যান্টনমেন্টগুলোর মুখ্য উদ্দেশ্য ব্রিটিশ সৈন্যের স্বাস্থ্যরক্ষা...। অন্য সবকিছুরই স্থান তার নীচে'।[১১] এই নীতি অনুসারে জন্ম হল ভারতের নানান শহরে ক্যান্টনমেন্ট, সিভিল লাইন, হিল স্টেশন ইত্যাদি। সাম্রাজ্যবাদী জনস্বাস্থ্যের মূল কথাই ছিল জাতিবৈষম্যকে বাঁচিয়ে রাখা।[১২]

এর 'কারণ' ছিল বিবিধ। একটি নিশ্চয়ই খরচা-সম্পর্কিত। ভারতীয় রীতিনীতিতে হস্তক্ষেপের ভয়ও ছিল। তা ছাড়া ছিল এই বদ্ধমূল বিশ্বাস যে, ব্রিটিশজীবন ভারতীয় সাধারণ মানুষের জীবনের চাইতে মূল্যবান। এই বিশ্বাস ব্রিটিশের ভারতে অনুসৃত 'জনস্বাস্থ্য' নীতিকে শহরমুখীও করে তোলে। এমনকী বিশ শতকেও গ্রামাঞ্চলে ম্যালেরিয়া-বিষয়ক যে অনীহা ছিল, তা সম্প্রতি গবেষণা করে দেখিয়েছেন তামিলনাড়ুর ঐতিহাসিক ডি. আর. মুরলীধরণ।[১৩]

মোট কথা, ঔপনিবেশিক সরকার আধুনিক রাষ্ট্রের একটি শর্তপালনে অক্ষম ছিল। সব শরীরই এক, সকলে ব্যক্তিগতভাবে 'স্বাস্থ্যকর' ব্যবস্থা নিলে তবেই 'জনস্বাস্থ্য'র বিকাশ হবে, সকল গৃহেরই পরিমার্জনা প্রয়োজন—ব্যক্তিগত শরীর-গৃহ-জনস্বাস্থ্য এই তিনের সমীকরণের যে-নীতির বিকাশ আমরা ইংল্যান্ডে দেখতে পাই, তা ব্রিটিশ সরকার ভারতবর্ষে পুরোদস্তুর পালন করেনি। এককভাবে ভারতীয় শরীরগুলো দুর্বল হোক, অল্পায়ু হোক, তাতে ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রের বা পুঁজির কিছু এসে যেত না তেমন। এমন কী শিল্পায়নও এমনও ধরনের হয়েছিল যে শ্রমিক-শরীরের ব্যক্তিগত পুষ্টির প্রতি নজর দেবার বিশেষ প্রয়োজন বোধ হত না। বাংলা পাটশিল্পের আলোচনায় আমি অন্যত্র দেখাবার প্রয়াস পেয়েছি যে 'সংক্রামক ব্যাধি' নিয়ন্ত্রণই ছিল চটকলগুলোর স্বাস্থ্যনীতির মূল উদ্দেশ্য।[১৪] ভয়ের কারণ ছিল ভারতীয় শরীরের একত্রীকরণ। তার সংস্পর্শ বাঁচিয়ে চললেই ব্রিটিশ বা ইউরোপীয় শরীর 'নীরোগ' থাকবে—এই নীতির ব্যতিক্রম কিন্তু সময় সময় বড় শহরগুলোতে করতেই হত। যদিচ শ্বেতাঙ্গপাড়া ও নেটিবপাড়া আলাদা করা ছিল, সংক্রামক ব্যাধি এলে তা কেবল গরিব, শ্রমজীবী মানুষের বস্তিতেই আটকে থাকবে এমন তো কোনও কথা ছিল না। ১৮৯৮ সালে বোম্বাই নগরীতে সরকারের প্লেগ-দমননীতির বিরুদ্ধে যেসব দাঙ্গা হয়, তার ইতিহাসে কিন্তু ব্রিটিশ সরকারের দোমনা ভাবটিই বেরিয়ে আসে। এক দিকে তখন শহরের শ্রমিক-অঞ্চলে রাষ্ট্রের জোরাল অনুপ্রবেশ ছাড়া উপায় নেই। 'ভারতীয়' শরীরকে চিকিৎসাধীন না করতে পারলে 'ইউরোপীয়' জীবনের আশঙ্কা বাড়বে। অন্যদিকে ঔপনিবেশিক সরকারের ভয় 'ধর্ম' নিয়ে টানাটানি করতে গিয়ে যদি আবার ১৮৫৭ ফিরে আসে!

জাতীয়তাবাদী নেতৃত্ব সরকারি সমালোচনা করেছিলেন—সে প্রসঙ্গে আমরা পরে ফিরে আসব। কিন্তু একটা জিনিস পরিষ্কার: 'জনস্বাস্থ্য' বা 'পরিবেশ'-এর প্রশ্নে সাম্রাজ্যবাদীর রাষ্ট্রের নীতি ছিল 'মিনিমালিস্ট', রাষ্ট্রশক্তির নিজস্ব বাঁচার প্রয়োজনে

ন্যূনতম যা করার ছিল তা-ই তাঁরা করতেন। ভারতের আধুনিক রাষ্ট্রের জন্মলগ্নের এটাই ইতিহাস। এই ইতিহাসে যদি স্বাস্থ্য ও শাসনের প্রশ্ন দুটিকে পরস্পর সম্পৃক্ত অবস্থায় দেখি, তাকে আকস্মিক বা সন্নিপাতিক বলে ধরে নেবার কোনও কারণ নেই। ইতিহাসের পাঠকমাত্রেই জানেন যে অনেক সম্পর্কই তার জন্মলগ্নের ইতিহাসে উলঙ্গভাবে ধরা পড়ে, কালক্রমে অভ্যাসের আস্তরণ পড়ে মূলসূত্রটিই অনেক সময় লোকচক্ষুর আড়ালে চলে যায়। মিশেল ফুকোর কথাই ভাবুন। বর্তমান সমাজে ক্ষমতার বন্টন ও ব্যবহার বিশ্লেষণ করতে গিয়ে তাঁকে রচনা করতে হয় কয়েদখানা, পাগলাগারদ বা চিকিৎসাগারের 'জন্ম'বৃত্তান্ত। সেই রকম ভারতের স্বাধীন রাষ্ট্র ও ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রের অনেক ফারাক থাকলেও, আমাদের দেশে আধুনিক রাষ্ট্রের গোড়াপত্তন ঔপনিবেশিক সময়ে, তাই বর্তমান শাসনব্যবস্থার অনেক অনুচ্চারিত সত্য তার জন্মের ইতিহাসে—অর্থাৎ ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রের ইতিহাসে—অনেক নির্লজ্জভাবে প্রকাশিত।

রাষ্ট্র, সমাজ, মহামারি ও জনমানস

অসুস্থতা, ব্যাধি, সংক্রামকব্যাধি—এরা মনুষ্য-সভ্যতার চিরন্তন সঙ্গী। সব সমাজেই এরা আছে, সব সমাজকেই এদের নিয়ে ভাবতে হয়, কিন্তু সব সমাজে বা ইতিহাসে ভাবনার 'ক্যাটিগরি' এক নয়। আমাদের গত দুশো বছরের ইতিহাসে দেখছি রাষ্ট্র ও রাষ্ট্রের কর্ণধারেরা যেভাবে ভেবেছেন, সাধারণ মানুষ সেভাবে সবসময় ভাবেননি। প্রাক-ব্রিটিশ যুগে হাকিম-বৈদ্যদের দর্শনও ছিল অন্যরকম। রাষ্ট্রের ভাবনা ও আমাদের সমাজের অন্তর্গত ভাবনায় বিরোধ ছিল, সে-বিরোধ স্থানে স্থানে খোলাখুলি সংঘর্ষের রূপ নিয়েছে। এর সবচেয়ে নাটকীয় নিদর্শন ১৮৯৭-৯৮-তে বোম্বাই শহরে সরকারি প্লেগ-নীতির বিরুদ্ধে সাধারণ মানুষের বিক্ষোভ, যা নিয়ে ভাল গবেষণা করেছেন ডেভিড আর্নল্ড ও ইয়েন ক্যাটান্যাক।[১৫]

বোম্বাই নগরে প্লেগ-জনিত প্রথম মৃত্যুর খবর আসে ১৮৯৬ সালের আগস্ট মাসে। সে-বছর অক্টোবর মাস থেকে সরকার ব্যাপক ও জোরদার ব্যবস্থা নেন প্লেগ প্রতিরোধের জন্য। আইনগতভাবে ব্যবস্থা নেওয়া হয়— প্রয়োজন হলে জোর খাটিয়ে প্লেগ রোগীদের হাসপাতালে ভর্তি করার, মেলা তীর্থযাত্রা (বিশেষত হজ-যাত্রা) বন্ধ করার, রেলযাত্রীদের স্বাস্থ্য পরীক্ষার, এমনকী প্লেগ-সন্দেহে মানুষকে আলাদা করে পরীক্ষা করার। সরকারি নীতির বিরুদ্ধে গণবিক্ষোভ জমতে থাকে ও প্রকাশ পায়। ১৮৯৬-র ২০ অক্টোবর প্রায় এক হাজার মিলশ্রমিক আক্রমণ করেন বম্বের আর্থার রোড হাসপাতাল। গুজব রটেছিল যে, এক মহিলাকে জোর করে ওখানে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল চিকিৎসার জন্য। ৯ মার্চ ১৮৯৮ একটি বারো বছরের বালিকাকে হাসপাতালে ভর্তি করার সরকারি চেষ্টাকে শহরের জোলা-সম্প্রদায়ভুক্ত তাঁতিরা একজোট হয়ে ব্যর্থ করে দেন। প্লেগ-কানুনবিরোধী আন্দোলন চলে উত্তর ভারতের বিভিন্ন স্থানে, কলকাতায়ও তার প্রভাব পড়ে। এই বিক্ষোভের কারণেই পুণার প্লেগ-কমিশনার ডব্লিউ. সি. র‍্যান্ড খুন হন ১৮৯৭ সালের জুন মাসে।[১৬]

বসন্ত, কলেরা বা ম্যালেরিয়া নিয়ে এমন সাংঘাতিক সরকার-বিরোধী বিক্ষোভের

নজির নেই। কিন্তু প্লেগসহ অন্যান্য মহামারি বা মড়ক, দুর্ভিক্ষ ইত্যাদি নিয়ে ঐতিহাসিক ও সমাজতত্ত্ববিদরা যে আলোচনা ও তথ্যসংযোজন করেছেন, তার ভিত্তিতে একটি সাধারণ সূত্রের নির্দেশ করা যায়—তা হল রাষ্ট্র বনাম সমাজ বা গোষ্ঠীর সংঘর্ষের কথা। এই সংঘর্ষের ব্যাপ্তি আমাদের গণ-ইতিহাসের নানা স্তরে। মহামারির ইতিহাস ঘাঁটলে একথাই মনে হয় যে 'সমাজ'-এর চোখে রাষ্ট্র অনেক সময়ই একটি বাইরের অনুপ্রবেশকারী শক্তি। তাই জনমানসের মহামারি-চিন্তায় একটি রাজনীতিক বিষয় থাকে যার প্রকাশ অনায়াসেই রাষ্ট্রবিরোধিতা হতে পারে। দ্বিতীয়ত দেখা যায় মহামারিকে ঘিরে 'সমাজ'-এর আত্মসংবদ্ধ হবার প্রয়াস। দুটি বিষয় নীচে একটু বিশদ আলোচনা করছি।

মহামারি ও রাজনীতিক চেতনা

সাম্প্রতিক ইতিহাস-আলোচনার ক্ষেত্রে পাঠক লক্ষ করে থাকবেন যে, একটি বক্তব্য বহুবারই উত্থাপিত হয়েছে। তা হল এই যে, নিম্নবর্গের ও সাধারণভাবে প্রাক-ব্রিটিশ রাজনীতিক চেতনায় মহামারি, মড়ক বা প্রাকৃতিক দুর্যোগের একটি বিশেষ স্থান আছে; আমাদের জনসংস্কৃতিতে মহামারি, মড়ক, বন্যা, খরা, ভূমিকম্প ইত্যাদি অনেক সময়েই রাজধর্মের ব্যত্যয় সূচিত করে। পশ্চিমবঙ্গে শীতলা পুজা নিয়ে তাঁর রচনায় র‍্যালফ নিকোলসও এই সূত্রটির নির্দেশ দিয়েছেন। কৌটিল্যের *অর্থশাস্ত্রে* পাঁচটি দৈব-দুর্বিপাকের কথা বলা আছে, যা রাজা ও রাজ্যের বিনাশকারী: অগ্নিকাণ্ড, বন্যা, ব্যাধি, দুর্ভিক্ষ ও মড়ক। নিকোলাসের মতে এটি কাকতালীয় কোনও ঘটনা নয় যে, বাংলার অষ্টাদশ শতকের মারাঠা আক্রমণ ও অরাজকতার মুখেই ছড়িয়ে পড়ে শীতলার পালাগান:

> অষ্টাদশ শতকের মাঝামাঝি শীতলা বিষয়ক রচনার প্রচার দেখে মনে হয়...বসন্ত রোগের অভিজ্ঞতা যেন একটি নতুন তাৎপর্য গ্রহণ করেছিল তখন। এই পালাগানের জনপ্রিয়তা ও মুঘল সাম্রাজ্যের অভ্যন্তরীণ গোলমাল সমসাময়িক ঘটনা। তাছাড়া যে অঞ্চলে এগুলোর উদ্ভব হয় সেই অঞ্চলগুলিই মারাঠা আক্রমণের শিকার হয়েছিল।[১৭]

'রাজত্ব' আর 'ধর্ম'—এই দুটি ধারণা একসূত্রে গাঁথা।[১৮] তাই দৈবদুর্বিপাক নীতির স্খলন, অধর্মের সূচনা ও (ধর্ম) রাজত্বের বিনাশের ইঙ্গিত দেয়। এই ভাবনার আনুষঙ্গিকভাবে উনিশ শতকে মহামারি উপলক্ষে জনমানসে যা প্রতিফলিত হয়েছে তাকে ব্রিটিশ শাসনের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ সমালোচনাই বলা চলে। আর্নল্ড ক্যাটান্যাক-প্রমুখেরা এর অজস্র উদাহরণ দিয়েছেন। বুন্দেলখণ্ডে হেস্টিংসের সেনাবাহিনী যখন কলেরা-আক্রান্ত হয়, তখন তার ভিন্নরকম অর্থ করেছিলেন সাধারণ মানুষ। স্থানীয় রাজা হর্দুলকোনের স্মৃতিতে পবিত্র কোনও স্থানে শ্বেতাঙ্গ সৈনিকেরা জনৈক ব্রাহ্মণের নিষেধাজ্ঞা অবজ্ঞা করে গোমাংস খেয়েছিল—এই অধর্মাচরণেরই ফল কলেরা।[১৯] আর রাজা, যাঁর ধর্মকে পালন করার কথা, অধার্মিকতাকে প্রশ্রয় দিলে বা নিজে অধার্মিক হলে তাঁর পতনও অনিবার্য হয় জনমানসের কল্পনায়।

এ কথা অনেক ঐতিহাসিকই লক্ষ করেছেন যে, জাতীয়তাবাদী কৃষক বা গণ আন্দোলনের উত্তাল মুহূর্তগুলোতে অনেক সময়ই এই গুজব স্বতঃস্ফূর্তভাবে রটেছে যে, ইংরেজ শাসন শেষ প্রায়। তার নিজের অধর্ম-ই তাকে ভেতর থেকে জীর্ণ করে ফেলেছে, পচা-গলা সরকার শীঘ্রই ধরাশায়ী হবে।

এটা লক্ষণীয় যে, প্লেগ-বিরোধী জনবিক্ষোভ ও দাঙ্গার সময় ঠিক এই ধরনেরই গুজব ছড়িয়েছিল। কলকাতায় মুসলমানদের মধ্যে বলা হয়েছিল, ইংরেজের দিন শেষ, তুর্কী সুলতান সৈন্য পাঠাচ্ছেন কলকাতায় ইংরেজদের সঙ্গে লড়াই করতে। হজ-যাত্রা বন্ধ করে দেওয়ার প্রতিক্রিয়া বর্ণনা করে একজন সাংবাদিক লিখেছে যে, শহরে সাধারণ মুসলমানের বিশ্বাস, এই সব হজ-বিরোধী নিয়মাবলীব জন্য 'প্লেগ' একটা অজুহাতমাত্র। আসলে সরকার চান না যে, মুসলমানেরা মক্কায় যান, কারণ ব্রিটিশের ভয় যে মক্কাগামী মুসলমানেরা ফিরে আসবেন সুলতানের সৈন্যবাহিনী সমেত, আর তাহলেই তো ব্রিটিশ-রাজের খেল খতম![১০]

গুজরাটের খেড়া পরগনার চাকালাসি গ্রামে ১৮৯৮ সনে দাঙ্গা হয় এই গুজবের ভিত্তিতে যে, 'মহীনদীর দক্ষিণে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের পতন হয়েছে...আর প্লেগসংক্রান্ত সতর্কতা ও বিচ্ছিন্নতা-নীতির উদ্দেশ্য একটিই—যাতে এই খবরটি নদীর উত্তরে না পৌঁছয়।'[১১] উত্তর-ভারতে রটনা হয়েছিল ইংরেজ ইচ্ছে করেই মারাত্মক ব্যাধি এনেছেন দেশে, যাতে রুশরা ভারত আক্রমণ না করেন।[১২] কলকাতায় রটেছিল যে হিমালয়বাসী এক সাধুর উপদেশে ও ইংরেজ রক্ষার্থে সরকার স্থির করেছেন যে মা-কালীর কাছে দুলক্ষ প্রাণ বলিদান করা হবে। তাই ওষুধ, টিকা আমদানি করে নরমেধযজ্ঞ![১৩]

ইংরেজ-বিরোধিতা ও সরকার বা রাষ্ট্র-বিরোধিতা মিলেমিশে আছে এই মনোভাবে। সরকার প্রজাবিরোধী, তাই খাবারে, কুয়োর জলে, রুটিতে, হাসপাতালের ওষুধে বিষ মেশানো হচ্ছে—এই রকম প্রচুর রটনার খবর দিয়েছেন ক্যাটান্যাক ও আর্নল্ড। মারকুটে সরকার সম্বন্ধে এ-ও রটেছিল মোরাদাবাদ, কানপুর, গুজারাটের অংশে, যে হাসপাতালে রোগীদের শরীর থেকে তেল নিষ্কাশন করে মলম তৈরি হচ্ছে ও সেই মলম পাঠানো হচ্ছে দক্ষিণ আফ্রিকায় বুয়র যুদ্ধে রত শ্বেতাঙ্গ সৈনিকদের কাছে। হ্যাফ্‌কিন-প্রবর্তিত টিকা বিষয়ে পঞ্জাবে বলা হয় তার সূচের সাইজ লম্বায় এক গজ, শরীরে ফোটালেই হয় মৃত্যু নয় বন্ধ্যাত্ব, ডেপুটি কমিশনার সাহেব এতেই মারা গেছেন (আধঘণ্টা অসহ্য যন্ত্রণাভোগের পর), ইত্যাদি।[১৪] বসন্ত-টিকার প্রসঙ্গেও আর্নল্ড দেখিয়েছেন যে, অনুরূপ রটনা হয়েছিল—টিকার উদ্দেশ্য জাত-ভাঙানো, ধর্মনাশ করা, নতুন করে বসানো বা জোর করে কুলি হিসেবে ধরে নিয়ে যাওয়া ইত্যাদি।[১৫]

রাষ্ট্রের জুলুম—এই গুজবগুলির একটি অন্যতম বিষয়। তার সঙ্গে যোগ হয়েছে অধার্মিক ইংরেজের অনাচারের কথা। রাষ্ট্রক্ষমতার বাইরে কীভাবে মানুষ বুঝতেন আধি-ব্যাধির অভিজ্ঞতাকে? ঔপনিবেশিক ও আধুনিক রাষ্ট্র সংক্রামক-ব্যাধির যে মানে করতেন, তার বাইরে নিম্নবর্গের জীবনে কী 'মানে' হত দুর্দৈবের?

দুর্দৈব ও সমাজ

শীতলাপুজোর ব্যাখ্যায় একটি অনুধাবন-যোগ্য কথা বলেছেন নিকোলাস— 'ক্যালামিটি' থেকে 'কমিউনিটি'। 'কমিউনিটি'র বাংলা যদি 'গোষ্ঠী' বা 'সমাজ' করি (অর্থাৎ 'সমাজ' কথাটির যে-অর্থে আমরা বাংলায় 'সমাজচ্যুত' কথাটা ব্যবহার করি), তাহলে বলা যায় শীতলাপুজোয়, ওলাবিবির বা ওলাইচণ্ডীর উপাখ্যানে বা দক্ষিণাংশে মারিআম্মার কাহিনীতে এমন একটি মানসিকতার সাক্ষাৎ পাচ্ছি, যা কোনও দুর্দৈবকে সমস্ত সমাজের সমস্যা বলে গণ্য করে। ফলে এইসব দেবীদের পুজো-আর্চায় এমন সব পদ্ধতি ও আচার অন্তর্ভুক্ত হত যা সামাজিক বন্ধনেরই পরিচয় দেয়, ও যা পালন করতে গিয়ে একটি গোষ্ঠী তার অন্তর্নিহিত যূথবদ্ধ চরিত্রই আবার নতুন করে অনুভব করত, একেই নিকোলাস বলেছেন 'দুর্দৈবকে সমাজে পরিণত করা'। অসুখ কারুর একার নয়, কারণ ব্যক্তির তার শরীরের ওপর ব্যক্তিগত মালিকানাস্বত্ব নেই, আমার শরীরের বসন্তগুটিকায় লেখা আছে আমার সমাজ বা গোষ্ঠীর ভবিষ্যৎ, সেই অর্থে ব্যক্তির শরীরও সামাজিক বা গোষ্ঠীগত—এই রকম একটা মনোভাব।

উদাহরণ অজস্র। বোম্বাই-এর প্লেগের সময় আবির্ভাব হয়েছিল এক প্লেগমাতার। তার নাম ছিল 'বোম্বাই কি মায়ান' ও তাঁর পুজো হত শীতলা মন্দিরে।[২২] পঞ্জাবের গ্রামে প্লেগের প্রতিক্রিয়ার বিষয়ে একটি সরকারি রিপোর্ট উদ্ধৃত করেছেন ক্যাটান্যাক, তার অংশবিশেষ তুলে দিচ্ছি:

> যখনই প্লেগের আশংকা করা হয়, তখনই ধার্মিক অনুষ্ঠানের আয়োজন শুরু হয়। একজন গ্রন্থীকে নিয়োজিত করা হয়...গ্রন্থ-পড়ার জন্য; 'হওয়ন'-এর ব্যবস্থা করা হয় উন্মুক্তভাবে। গ্রামের মসজিদে সাধারণভাবে প্রার্থনা করা হয়; কঠোর পরিশ্রমে খোঁড়া হয় পুষ্করিণী; দরিদ্র-ভোজনের আয়োজন করা হয়; নিম্নস্তরের দেবতা-দানোরাও বাদ যান না; ফকিরদের ডেকে ভূরি-ভোজন করানো হয় তাদের কেরামতির আশায়; আর গোটা গ্রামের চারপাশে বেড়া পড়ে, তার ওপরে খোদাই করা থাকে দানোদের মুণ্ডু, গ্রামের অতিপ্রাকৃত পাহারাদার হিসেবে।[২৩]

হেনরি হোয়াইটহেড-রচিত দক্ষিণ ভারতের গ্রামীণ দেবদেবী বিষয়ক যে বইটি আছে, তাতেও মড়ক-মহামারির মোকাবিলায় এই গ্রামীণ সমাজ বা গোষ্ঠী-ভাবনার প্রকাশ খুবই চোখে পড়ে। তামিল দেশের বসন্ত রোগের দেবী মারিআম্মার (বা দক্ষিণ আরকটের ক্ষেত্রে কান্নিআম্মার) পুজোয় এর প্রমাণ আছে। ত্রিচির কলেরা-দেবীর পূজায় গ্রামের সমস্ত পরিবার অংশগ্রহণ করেন ও পূজার পর পূজার উপকরণাদি একটি ঘটে ভরে গ্রামের সীমান্তে রেখে দিয়ে মনে করা হয় রোগ এখন গ্রামের বাইরে চালা হল।[২৪] এইভাবে নানাগ্রামে ঘুরতে ঘুরতে দেবীর প্রকোপ দূরে সরে যায়। তেলেগুদেশে মাসুলিপটমের নিকটবর্তী গুটিভডা গ্রামেও হোয়াইটহেড সাহেব অনুরূপ গ্রামীণ আচারের বর্ণনা দিয়েছেন। কর্ণাটকের বেল্লারি পরগনায় কলেরা প্রাদুর্ভাবে যে পূজা ও অন্যান্য আচারের বর্ণনা পাই, তাতেও গ্রামীণ সমাজের 'গোষ্ঠী'গত মনোভাব ও গ্রামভেদের ছবিই পাওয়া যায়।[২৫] সম্প্রতি ডেভিড হার্ডিম্যানের গ্রন্থে গুজরাট ও

মহারাষ্ট্রে কোঙ্কনস্থ অঞ্চলে ১৯২০-২১ সালে বসন্ত রোগের আবির্ভাব ও সেই প্রসঙ্গে বসন্তদেবী 'বায়া' মাতা-পূজার বর্ণনা আছে। তাতেও রোগ চালাবার কথা পাই গ্রামের সীমান্ত ধরে ধরে।[১০]

বলাবাহুল্য, এই যে 'গোষ্ঠী' বা 'সমাজ' যার পুনর্জন্ম হয় দুর্দৈবের মুখোমুখি, তার ভৌগোলিক প্রসার অনেক সময়ই খুব বিস্তৃত নয়। প্রায়শঃই দেখা যাচ্ছে একটি গ্রামের সীমা দ্বারাই এই 'সামাজিকতা' সীমিত। অতি সাম্প্রতিককালে এর সাক্ষ্য পাই নিকোলাসের গবেষণায়। ১৯৮১ সালে প্রকাশিত প্রবন্ধে তিনি লিখেছেন:

> সমুদ্র উপকূলবর্তী দক্ষিণ পশ্চিমবঙ্গে আজ শীতলাই সর্বাধিক প্রচলিত গ্রামদেবতা। প্রায়শই মনসার পাশে তাঁকে পাওয়া যায়, কিন্তু যেখানে দুজনকেই একসাথে পেয়েছি, সেখানে আমার অভিজ্ঞতায়—শীতলারই প্রাধান্য।...শীতলা পূজার বিভিন্ন পদ্ধতিতে এই ধারণাটি পরিষ্কারভাবে ব্যক্ত হয় যে কোনও একটি বিশেষ গ্রামই তাঁর পূজার ফলাফলের অধিকারী। এটা কখনও দেখানো হয় পূজারীদের একটি মিছিল নিয়ে সারা গ্রামটিকে প্রদক্ষিণ করে, বা গ্রামের সীমান্তপথ ধরে নিয়ে নিশানা পুঁতে পুঁতে, অথবা পুজোর শুরুতেই অন্যে কোনও পদ্ধতি দ্বারা গ্রামটিকে [প্রতীকীভাবে] ঘিরে ফেলে।...পূর্ব মেদিনীপুরে কোনও বিশেষ গ্রামের শীতলাকে সাধারণত 'অমুক গ্রামের মা' বলেই অভিহিত করা হয়। 'শীতলা' নামটি চালু হয় পুজোর সময়টুকুতেই।[১১]

এই গোষ্ঠীগত মনোভাবের কথা বলা মানে এই নয় যে গ্রামের দলাদলি ও অন্যান্য কলহ-দ্বন্দ্বের কথা ভুলে যাওয়া। বসন্ত-মহামারি বা শীতলাপূজা উপলক্ষে কীভাবে 'সমাজ' তার সামাজিকতা পুনরানুভব করে তারও সুন্দর বর্ণনা ও বিশ্লেষণ করছেন নিকোলস। শীতলাপূজায় শীতলার পালা অভিনয় হয়, তার খরচা দেন গ্রামেব সমস্ত পরিবার। অন্তত গ্রামের মানুষদের ধারণা এই চাঁদা দেবার সদিচ্ছা বা অনিচ্ছার সঙ্গে গ্রামের জাগতিক ও নৈতিক সুখস্বাচ্ছন্দ্যেব একটি নিগূঢ় সম্পর্ক আছে। দলাদলি ও নানা দৈনন্দিন কোন্দলবিধ্বস্ত এই গ্রামীণ সমাজে নৈতিক সমৃদ্ধির অর্থ দলাদলিমুক্ত মনোভাব, যা প্রাত্যহিকে অবশ্যই অনুপস্থিত। নিকোলাস লিখেছেন:

> মা যেমন তার বিবাদরত সন্তানদের [সময়ে সময়ে] একত্র করে মনে করিয়ে দেন যে তারা সকলেই সমানভাবে তাঁর দেহের অংশ, তেমনই যেন শীতলা মাতা বৎসরে একবার শান্তভাবে কিন্তু দৃঢ় হস্তে গাঁয়ে তাঁর ছেলেদের এক জায়গায় এনে, তাদের সাহায্য করেন [দলীয়] রাজনীতি ও স্বার্থানুসন্ধানের কথা—অল্প সময়ের জন্য হলেও—ভুলে থাকতে।[১২]

এই মানসিকতায় শরীরকে যে-দৃষ্টিতে দেখা হচ্ছে, তা বুর্জোয়া-চিন্তায় শরীর ভাবনা থেকে খুবই আলাদা। এখানে শরীরের তাৎপর্য সামাজিক বা গোষ্ঠীগত। কল্পনায় এই শরীরকে আমরা 'সামাজিক শরীর' নাম দিতে পারি। বলা যেতে পারে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী চিন্তায় শরীরের অবস্থান এর বিপরীত মেরুতে। সপ্তদশ শতকের বুর্জোয়া চিন্তাধারায়,

যাকে সি. বি. ম্যাকফারসন 'পসেসিভ ইন্ডিভিজুয়ালিস্‌ম্' বলেছেন, তাতে শরীরকে ভাবা হচ্ছে ব্যক্তিগত মালিকানাস্বত্বের তত্ত্বকে আশ্রয় করে। 'নিজের শরীরে নিজের অধিকার' এই চিন্তা বুর্জোয়া 'স্বাধীনতা'র ও ব্যক্তিগতস্বাতন্ত্র্যবাদের একটি প্রধান ও প্রাথমিক শর্ত।[৫৩] আজ যখন পাশ্চাত্যের নারীবাদী আন্দোলন *ওম্যান্‌স বডি: অ্যান ওনার্স ম্যানুয়াল* গোছের বই দেখি তখন বোঝা যায় এই চিন্তার প্রভাব কত গভীর ও সুদূরপ্রসারিত।

'বসন্ত', 'কলেরা', 'প্লেগ' ইত্যাদি মহামারির যে অভিজ্ঞতা হয়, 'সামাজিক শরীরে' তাকে কেবল 'অসুখ' বলে বর্ণনা করলে এই অভিজ্ঞতার সামাজিক, নৈতিক, রাজনৈতিক ও ধার্মিক দিকগুলোকে অবহেলা করা হয়। এই 'শরীর'-এর লক্ষণ ও ব্যঞ্জনাশক্তিতে যে-ভাষার প্রকাশ, তা জটিল ও বিচিত্র। সমাজ নিজেকে 'সমাজ' হিসেবে প্রত্যক্ষ করে এই দুর্দৈবের মাধ্যমে, তা তো আগেই বলেছি। পরন্তু দেখা যায় 'অসুখের' দেবদেবীবিষয়ক উপাখ্যানগুলির ও পূজা-পদ্ধতিরও অঞ্চলভেদে প্রভেদ হয়, তা-ও এই অভিজ্ঞতার বৈচিত্র্যের প্রতি ইঙ্গিত করে।[৫৪] সম্প্রতি এক গবেষক মাদ্রাজে গবেষণা করে দেখিয়েছেন যে, মানুষের অভিজ্ঞতায় 'মারিআম্মা' অর্থ কেবল অসুস্থতা নয়। এর সঙ্গে জড়িয়ে আছে শ্রেণীর, জাতের ও পরিবারের অভিজ্ঞতা।[৫৫] শীতলার উপ্যাখ্যানও কেবল 'অসুখে'র কথা নয়। এতে আছে ধর্মের কথা, রাজত্বের কথা, এমনকী নারীর সতীত্বের কথা:

স্বামী আত্মা স্বামী প্রাণ স্বামী ত জীবন।
স্বামী বিনে স্ত্রীলোকের বিফল জীবন ॥[৫৬]

তাছাড়া এই পালাগানে শীতলা কেবল বসন্তের দেবীই নন, অন্য সমস্ত রোগও তাঁর বশানুগ, আর শীতলার প্রকোপের সঙ্গে জড়িত হয়ে আছে বিরাট রাজার ধার্মিকতার কাহিনী।[৫৭]

এ কথাও মনে রাখা প্রয়োজন যে, এই সমস্ত পুজো পালাগান ইত্যাদির মধ্যে সবসময়ই রয়েছে একটা অভিনয়কার্য। মানুষের ওলাবিবি, শীতলাদেবী বা 'বায়া' দেবী সাজার খবর আর্নল্ড ও হার্ডিম্যান দুজনেই দিয়েছেন।[৫৮] এতে প্রাক-আধুনিক মানসিকতার একটি প্রায় সার্বজনীন চরিত্র প্রকাশ পায়। এই মানসিকতায় ঐহিক ও পারত্রিক জগত মিলেমিশে যায়, একই গল্পের মধ্যে ঢুকে পড়েন মর্ত্যবাসী মানুষ ও অমর্ত্যবাসী সব চরিত্র, তাই গল্পে মানুষের ভূমিকায় আসেন দেবতা, আর কখনও পৃথিবীর মানুষ অভিনয় করে দেবচরিত্রে। এখানে 'অভিনয়' কথাটিও আসলে ঠিক নয়, কারণ 'অভিনয়' ও 'অভিনেতার'র মধ্যে তফাৎ থাকে না এই অভিজ্ঞতায়। অন্য এক সময়ের গণ্ডিতে, অপার্থিব এক জগতে অংশ নেন দর্শক, শ্রোতা, পাঠক, অভিনেতা সকলেই।[৫৯]

শরীর চেতনা ও মানসিকতার সংঘাত

শরীরের এই যে 'সামাজিক' অবস্থান তাকে পরিবর্তন না করে ধনতান্ত্রিক শিল্পায়ন দুষ্কর। 'সামাজিক' শরীর সম্পূর্ণ অবলুপ্ত না হোক তাকে হার মানতে হবে অন্য এক শরীর-চেতনার কাছে—যেখানে শরীরের সঙ্গে শরীরের মালিকের সম্পর্ক ব্যক্তিগত, যেখানে সংক্রামক ব্যাধি কোনও সামাজিক, রাজনীতিক বা ধার্মিক সংকেত বয়ে আনে

না, 'কলেরা' 'বসন্ত'র অর্থ যেখানে হ্রস্ব হয়ে এসেছে 'জীবাণু'তে, স্বাস্থ্যের প্রশ্নে যেখানে কোনও রাষ্ট্র-বিরোধিতার বীজ নেই। তখনই সম্পূর্ণ হবে শিল্পায়নের স্বার্থে শ্রমজীবী মানুষের সববরাহের আয়োজন, আর উৎপাদন-ক্ষমতা তো খানিক পরিমাণে 'সুস্বাস্থ্য'-র ওপর নির্ভরশীল। এমনিভাবেই একদিন তৈরি হবে সুদূর গ্রামাঞ্চলে ও হাসপাতাল-গণস্বাস্থ্যকেন্দ্র-পরিকল্পনা কেন্দ্রের শাসনব্যবস্থা।

প্রশ্নটা মানসিকতা বা দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তনের, এবং এটা কেবল পিটিয়ে হয় না। উনিশ শতকের ইংল্যান্ডে শ্রমিকশ্রেণীকে উদ্দেশ্য ও উপলক্ষ্য করে যে 'স্বাস্থ্যকর পরিবেশ' আন্দোলন গড়ে উঠেছিল তাতে রাষ্ট্র ও এলিটশ্রেণী পরস্পরকে মদত যুগিয়েছিল।[৮১] এদের যৌথ প্রচেষ্টায় গড়ে উঠেছিল এইরকম একটি ধারণা যে ব্যক্তিগত পরিচ্ছন্নতা, পরিচ্ছন্ন গৃহ ও স্বাস্থ্যকর পরিবেশ---এই তিনটি গুণনীয়কের সমন্বয়ে গড়ে ওঠে জনস্বাস্থ্য। উনিশ শতকের শেষে এই ধারণার কতটা প্রসার ঘটেছিল তার প্রমাণ পাওয়া যাবে সাধারণ একটি সাক্ষ্যে---একটি সাবানের বিজ্ঞাপনে। ১৮৯১ সালের *দি গ্রাফিক* পত্রিকায় বেরিয়েছিল এই বিজ্ঞাপন।[৮২]

> PUBLIC HEALTH!
> THE SANITARY WASHING OF LINEN
> Dirt Harbours Germs of Disease
> ...
> HUDSON'S
> EXTRACT OF SOAP
> Dirt cannot exist where Hudson's soap is used
> ...
> Home, Sweet Home! The Sweetest, Healthiest
> Homes are those where Hudson's Extract of SOAP
> is in Daily Use.

পাঠক অনায়াসেই লক্ষ করে থাকবেন, কীভাবে 'গৃহ', 'স্বাস্থ্য' ও 'জনস্বাস্থ্যে'র ধারণা---যার গোড়ায় রয়েছে জীবাণু তত্ত্ব---মিলেমিশে আছে একটি সাধারণ, নিত্যব্যবহার্য বস্তুর বর্ণনায় ও বিজ্ঞাপনে।

এই মনোভাব ভারতের মাটিতে প্রোথিত করার মতো ক্ষমতা বা ইচ্ছে কোনওটাই ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রের ছিল না। একদিকে তার ছিল ভারতীয় শরীরবিষয়ে ছুতমার্গ (যার আলোচনা আগেই করেছি)। অন্যদিকে বিদ্রোহের ভয় ভারতীয় অনেক প্রথাকে 'কুসংস্কার' বলে চিহ্নিত করলেও, তাতে হস্তক্ষেপ নিতান্ত প্রয়োজন না হলে করতে চাইতেন না সরকার। প্লেগ-বিষয়ে প্রথমদিকে কড়াকড়ি চললেও, পরে অনেক নরম নীতি নেওয়া হয়েছিল দাঙ্গা এড়াবার জন্য। এর অনেক আগে ১৮৭০-এর দশকে প্রকাশিত *টিকাদারদের প্রতি উপদেশ*-এ দেখছি সরকারের সাবধানী ভাব। ওই পুস্তিকার

'ব্যক্তিদিগের প্রতি ব্যবহার'-বিষয়ক পরিচ্ছেদে বলা হচ্ছে টিকাদারেরা যেন অত্যাচার না করেন বা অপ্রিয় কথা না বলেন, অন্যথায় 'পর বৎসর সেই স্থানে টিকা দেওয়া কষ্টকর হইবে'। আরও বলা হচ্ছে:

> জ্বর, উদরাময়, কাশী, কি হাম যাহার ইংরাজী টিকার সহিত কোন সম্বন্ধ নাই এরূপ প্রকার পীড়া উপস্থিত হইলে ইংরাজী টিকা দেওয়া প্রযুক্ত উহার উপপত্তি হয়ে নাই এই বিষয়টি ব্যক্তিগণকে বুঝাইয়া দিতে বিশেষ কষ্ট স্বীকার করিবে।[৪২]

আমরা আগেই দেখেছি—স্বাস্থ্যশিক্ষা বিষয়েও বস্তুত বিশেষ নজর দেননি ইংরেজ সরকার। গা বাঁচিয়ে চলাই ছিল তার নীতি। বলা যেতে পারে, সামাজিক যে বন্ধনের সঙ্গে আশ্লিষ্ট ছিল মড়ক-মহামারির ধারণা ও অভিজ্ঞতা, সেই বন্ধনগুলিকে প্রচণ্ড আঘাত করার মতো ক্ষমতা ছিল না ওই সরকারের। সাম্রাজ্যবাদের তা প্রয়োজনও ছিল না। 'আধুনিকতা'র প্রয়োজনীয় সব আয়োজন 'আমাদের' মনের মতো করে করেননি, এ তো জাতীয়তাবাদের পুরনো অভিযোগ।

বরঞ্চ জাতীয়তাবাদী নেতৃত্বের ও মধ্যবিত্তশ্রেণীরই আকাঙ্ক্ষা ছিল যে দেশে 'আধুনিক' ও 'স্বাস্থ্যসম্মত' বিধিব্যবস্থা নেওয়া হোক ও সাধারণ মানুষের 'কুসংস্কার' দূর করার জন্য স্বাস্থ্য ও চিকিৎসাবিষয়ক শিক্ষার ব্যাপক প্রচার হোক।[৪৩] প্লেগের সময় তিলকের *মারাঠা* পত্রিকায় বলা হয়েছিল যে শিক্ষিত ভারতীয়ের কর্তব্যই হল গরিব মানুষের 'ভুল' ধারণা ও 'কুসংস্কার' দূর করতে চেষ্টা করা। *মারাঠা* আরও বলেছিল:

> এটা সত্যি যে জনসাধারণ প্লেগকে দৈবপ্রেরিত মনে করেন ও আধুনিক স্বাস্থ্যবিজ্ঞানের উপায়গুলির কার্যকারিতা সম্বন্ধে তাঁদের খুব একটা বিশ্বাস নেই। কিন্তু জনগণ মূর্খ বলেই এটা ধরে নেওয়া উচিত হবে না যে শীর্ষস্থানীয় ও বিশেষত শিক্ষিত শ্রেণীর মানুষেরা আধুনিক স্বাস্থ্যসম্মত পদ্ধতিগুলোর গুরুত্ব বোঝেন না।[৪৪]

আধুনিক স্বাস্থ্যবিজ্ঞানের ও চিকিৎসাবিদ্যার প্রচার চাইলেও, তিলকের চিন্তায় দ্বিধা ছিল। আর্নল্ড লিখেছেন তিলকের 'হিন্দু জাতীয়তাবাদ' তাঁকে আয়ুর্বেদের পুনর্জাগরণের প্রতিও আকৃষ্ট করত ও *মারাঠা*-র পাতায় তিনি পাশ্চাত্য-চিকিৎসা-বিদ্যা ও আয়ুর্বেদের চিন্তাধারা দুটির একটি 'সুচিন্তিত সংমিশ্রণ'কেই কাম্য বলে প্রচার করতেন।[৪৫]

এখানে কথাটা বলে নেওয়া প্রয়োজন। পাশ্চাত্য তথা আধুনিক চিকিৎসাশাস্ত্রে যে বিমূর্ত ব্যক্তিশরীরের ভাবনা আছে তা যতদূর জানি আয়ুর্বেদে নেই। *চরক-সংহিতা*-য় ব্যক্তিবিশেষের শরীর তার জাত-কুলসাপেক্ষ। তাছাড়া মানুষের সমস্ত কার্যাবলীর গোড়ায় জীবনের একটি ছক ধরে নেওয়া হয়। সেই ছকের উৎস তিন প্রকার আকাঙ্ক্ষায়: (১) জীবনধারণের আকাঙ্ক্ষা, (২) অর্থ ও কামের আকাঙ্ক্ষা ও (৩) মোক্ষের আকাঙ্ক্ষা।[৪৬] এখানে ব্রাহ্মণ্য সভ্যতার পুরুষার্থের কথা স্পষ্টতই মনে পড়বে। অর্থাৎ শরীর-চিন্তাকে ধরে আছে একটি সামাজিক, নৈতিক ও ধার্মিক ভাবনা। গীতায় 'শরীর' বিষয়ে যা কথা পাওয়া যায়, তাতে তো দেখা যায় 'আহার'ও একটি নীতির তত্ত্বে ধরা আছে—শ্রীকৃষ্ণ বলছেন ত্রিগুণভেদে আহার্য্যদ্রব্যের প্রকারভেদের কথা—সাত্ত্বিক,

রাজসিক ও তামসিক আহার।'[৪৭] এই সব কথাগুলোই সরাসরি সমাজের নীচের তলার মানুষের চেতনায় এসেছে এমন দাবি করি না। কিন্তু আমাদের ইতিহাসে যে মার্গসংস্কৃতি ও জনসংস্কৃতির বহু আদানপ্রদান ঘটেছে, এ নিয়ে হয়তো তর্ক হবে না।

জাতীয়তাবাদী মধ্যবিত্তশ্রেণী ও তাদের নেতৃত্ব এই ধরনের ধার্মিক-সামাজিক-নৈতিক শরীর-দর্শনের সঙ্গে আধুনিক চিকিৎসা-শাস্ত্রের যে শরীর তার একটা 'সমন্বয়' ঘটাতে চেয়েছিলেন। এটা আমাদের জাতীয়তাবাদী চিন্তার স্ববিরোধী চরিত্রের একটি লক্ষণ (এমন আরও অনেক লক্ষণ আছে)। ইংরেজ যতদিন সরকারি প্রভুর জায়গায় ছিল, ততদিন এই স্ববিরোধ ছিল অবশ্যম্ভাবী। একদিকে যেমন ইংরেজ-আনীত 'আধুনিকতা', 'দেশীয় উন্নতি', 'প্রগতি' প্রভৃতির প্রতি আকৃষ্ট হতেন শিক্ষিতশ্রেণীর মানুষেরা, তেমনি অন্যদিকে ভয় ছিল যে এই সকল আইডিয়ার বল্গাহীন চর্চায় 'ভারতীয়ত্ব'ই না লোপ পায়। আসলে ইংরেজ আমলে জাতীয়তাবাদী চিন্তায় 'ভারতীয়ত্ব'ই ছিল আত্মসম্মানের জায়গা। আমরা পাশ্চাত্যভাবের 'হনুকরণ' (রাজশেখর বসুর ভাষায়) করি না। ভারতীয়ত্ব বজায় রেখে এক ধরনের 'স্বীকরণ' করি—জাতীয়তাবাদী মনোভাবের এইটেই ছিল ভঙ্গি। অথচ কোনটা 'হনুকরণ' আর কোনটা 'স্বীকরণ' এর তো কোনও সর্ববাদিসম্মত সংজ্ঞা ছিল না—হওয়া সম্ভবও ছিল না—ফলে তর্ক হত বিস্তর। উত্তর যাই হোক, 'ভারতীয়ত্ব'-বিষয়ক প্রশ্নটা তোলাই ছিল জাতীয়তাবাদী মানসিকতার লক্ষণ।

উনিশ শতকে 'স্বাস্থ্য', 'পরিচ্ছন্ন পরিবেশ' বা 'চিকিৎসা'-বিষয়ে বাংলাভাষায় প্রকাশিত যে-সব পুস্তক-পুস্তিকা দেখেছি, তাতেও জাতীয়বাদের শরীর-ভাবনায় স্ববিরোধী চরিত্র স্পষ্ট। এক দিকে পাশ্চাত্য চিকিৎসাবিদ্যার 'স্যানিটেশন' আন্দোলনের প্রভাবে নানাবিধ মত প্রকাশ পাচ্ছিল, যেমন:

> 'শরীরকে সম্পূর্ণরূপে রোগশূন্য করার নাম স্বাস্থ্য।'[৪৮]

বা:

> 'বাটী পরিষ্কার রাখার ভার গৃহস্থের উপর নির্ভর করে, এবং দেশ পরিষ্কারের ভার মিউনিসিপ্যালিটির উপর নির্ভর করে। যখন উভয়ে নিয়মিত যত্ন ও ব্যয় স্বীকার করিয়া নিজ নিজ সীমা পরিচ্ছন্ন রাখিতে পারে, তখন সে-দেশে অপরিচ্ছন্নতাহেতু অনেক রোগও উপস্থিত হইতে পারে না।'[৪৯]

এই মনোভাবে 'অসুখ' 'স্বাস্থ্য' ইত্যাদি বিষয়ে প্রথাগত চিন্তা 'কুসংস্কার' হিসেবে প্রতিভাত হত। যেমন একটি পুস্তিকায় বলা হচ্ছে, যাঁরা মনে করেন

> পুরাতন জ্বর, প্লীহা, পাত অর্থাৎ যকৃত, এ সমুদায়ের প্রাদুর্ভাব এক্ষণে যেরূপ দৃষ্ট হয়, পূর্বে সেইরূপ হইত না...কুইনাইনই এই সকল আপদের মূল,' তাঁরা 'অশিক্ষিত কুসংস্কারাবিষ্ট ব্যক্তি।'[৫০]

অথবা অন্য একটি পুস্তিকায় বলা হল:

> কতক লোকে মনে করে অদৃষ্ট দোষে, বা দৈববশত পীড়া হইয়া থাকে, কাজেই নিরুপায়।...অদৃষ্ট বা দৈব টৈব কিছু নাই। যখন পীড়া হইবে তখন জানিবে যে কোনো কারণবশত হইয়াছে।"[৫১]

এই সমস্ত রচনায়—যৌক্তিকভাবেই—অনেক দেশাচারের সমালোচনা করা হত। সবটাই 'জাতীয় উন্নতি'র কথা চিন্তা করে, সন্দেহ নেই। অথচ 'ইংরাজ জাতির অনুকরণ' অতিমাত্রিক না হয়, এ-ও ছিল এক দুশ্চিন্তা। ফলত অনেক রচনাতেই চেষ্টা চলেছে পাশ্চাত্যের চিকিৎসাশাস্ত্রের সঙ্গে আয়ুর্বেদ মেলানোর।[৫২]

তবে জাতীয়তাবাদী চিন্তায় ইংরেজ-বিরোধিতার যে-দিক সেটা—স্বাস্থ্যের ও শরীরের প্রশ্নে—স্বভাবতই অনেক বেশি প্রকট হত যাঁদের আমাদের দেশের 'ট্র্যাডিশনাল ইন্টেলিজেন্টসিয়া' বলা যায় সেই হাকিম-বৈদ্য-জ্যোতিষীদের রচনায়।[৫৩] এঁদের রচনায়ই বারবার ঘুরে ঘুরে এসেছে 'দেশ কালে'র কথা, ইংরেজের অনুকরণশীলতার বিপদের কথা।[৫৪] উনিশ শতকের জাতির ভগ্নস্বাস্থ্যের কারণ অনুসন্ধান করতে গিয়ে এঁরাই পাশ্চাত্য-শিক্ষার বিরোধিতা করেছেন, যে-শিক্ষার 'দেশীয় আহার-বিহারের বিরুদ্ধে অনেক কথা উপদিষ্ট হইয়া থাকে।' স্বাস্থ্যভঙ্গের বিচারে বলা হয়েছে 'দেশীয় ভাব, দেশীয় রুচি, দেশীয় প্রকৃতি, দেশীয় আহার, দেশীয় বিহার হারাইয়াছি', এমনকী ইংরেজ সভ্যতার জীবাণুনাশক যে 'সাবান' তার ব্যবহারের সম্বন্ধেও সাবধান করে বলা হয়েছে, যে 'দেশের অর্থ ভিন্ন দেশে দিতেছি' ও 'সাবান তত পবিত্র পদার্থ নহে'।[৫৫]

প্লেগ-মহামারির যে-ব্যাখ্যা দিয়েছিলেন এক বাঙালি জ্যোতিষী, তাতেও ধর্মচেতনা ও ইংরেজ-বিরোধিতা প্রবল। 'ভারতবর্ষে মহামারী বা প্লেগ আসিবার কারণ' সভ্যতা তথা আধুনিক সভ্যতার প্রভাব; বোম্বাই, করাচিতে এর আধিক্য, কারণ 'সমুদ্র উপকূলে বৈদেশিক সংমিশ্রণাধিক্যদোষ বর্তমান'।[৫৬] 'প্লেগের টীকা সঙ্গত কিনা' এই আলোচনায় সরকারের সমালোচনা করে বলা হয়েছে:

> টীকা হইলেও যখন সংক্রামক ব্যাধির সংক্রামতা নিবারণ সম্বন্ধে সন্দেহ আছে, বিষ প্রবেশ করাইয়াও যখন সময়, ঋতু, কাল, স্থান ও আত্মদোষহেতু বিষের স্রোত রোধ করা যায় না, তখন টীকা দিয়া নির্দোষ দেহে দোষ সংক্রামণ করা কোন প্রকারেই যুক্তিসঙ্গত হইতে পারে না।...তোমার প্লেগ, কলেরা প্রভৃতি সংক্রামক ব্যাধির নিশ্চয়াত্মক ঔষধী এ পর্যন্ত ঠিক হইল না, অগ্রেই তুমি তাহার বীজ লইয়া মানবশরীরে বপন করিতে অগ্রসর হইয়াছ![৫৭]

এই বিশ্লেষণে মহামারি ভারতবর্ষের ধার্মিক, সামাজিক ও নৈতিক অধঃপতনের লক্ষণমাত্র, আর এর মূলে বিদেশি শাসনব্যবস্থা:

> ভারতবর্ষ এখন আর সেই পূর্বতন ঋষি নির্বাচিত ভারতবর্ষ নাই, ভারতবর্ষ এখন পাপ ও ক্লেদকণায় পরিপূর্ণ হইয়াছে।...বৈদেশিক সংমিশ্রণ দোষ, বেজাতীয় আচার

নিয়মানুষ্ঠান, ব্যবহার পরিচ্ছেদের স্বতন্ত্রতা, আহারবিহারাদির অনুচিত ও অস্বাভাবিক সংঘটন, রাজপূজা ও দেশসেবার অভাব, স্বদেশানুকূল আচারনীতির ব্যাঘাত, সভ্যতার অতিচার, সভ্য ভব্যের স্বেচ্ছাচার, দরিদ্রতার প্রাণশোষক আতঙ্ক, আইনকানুনের খর প্রস্রবণের প্রখরভাব, জল বায়ু ও দেশ কাল পাত্রানুকূল ঔষধী ভাষা ও ক্রিয়াকলাপের পরিত্যাজ্যতা, বৈদেশিক লবণ ও চিনির অতি প্রচলন, সাত্বিক নিরামিষাশী ফলমূলাহারী মনুষ্যের স্বল্পতা, গো-খাদক ও অপশুরভক্ষকজীবীর প্রাধান্য, বৈদেশিক অপ বা ভিন্নযোনিসংসর্গজনিত বর্ণসঙ্করাধিক্য, ভূগর্ভজাত বিষ-তৈল ((কেরোসিন), বিষ-কাষ্ঠ (পাথুরিয়া কয়লা) ইত্যাদির অতি প্রচলন; এই সমস্ত বিষম...ক্রিয়া বা বস্তু হইতে ভারতবর্ষের মূল ধ্বংসপ্রায় হইয়াছে। এক্ষণে ভারতবাসী নামে জীবিত মাত্র, বংশে গৌরব মাত্র, স্থানে স্থিতিমাত্র, অস্থিকঙ্কালসদৃশ দণ্ডায়মান রহিয়াছে। কার্যে আর সে পুণ্যভূমি ভারতবর্ষ নাই—তাই শোক, দুঃখ, অসহনীয় মর্ম্মবেদনা, মহামারী, প্লেগ বা ভূকম্পজনিত অকালমৃত্যুর আধিক্য, ভয় বিভীষিকায় চতুঃদিক আচ্ছন্ন, ভীষণ দুর্ভিক্ষ রাক্ষস তাড়নায় অন্নাভাবে জীর্ণ...।"[১]

এই 'পাঠটির জাতীয়তাবাদ অনস্বীকার্য, যদিও এতে ব্যক্ত মনোভাব বহুলাংশে 'আধুনিকতা'র পরিপন্থী। বরং জনসংস্কৃতির আলোচনায় আমরা সংক্রামক ব্যাধি সম্বন্ধে ধারণার নিদর্শন পেয়েছিলাম, এই মনোভাব তার কাছাকাছি (যদিও নিম্নবর্গের কল্পনায় বিমূর্ত 'ভারত' চেতনার এত স্পষ্ট অভিব্যক্তি না থাকাই স্বাভাবিক)।

এই সমস্ত সাক্ষ্য-প্রমাণ ও পূর্বের আলোচনার ভিত্তিতে আমার বক্তব্য একটাই। ঔপনিবেশিক ভারতে যে 'সামাজিক শরীর' রাষ্ট্র এবং জাতীয়তাবাদী নেতৃত্বের দ্বারা 'কুসংস্কারপ্রসূত' বলে চিহ্নিত হচ্ছিল, তার বিরুদ্ধে লড়াই করার ও তার পরিবর্তে বুর্জোয়া শরীরবোধকে সম্পূর্ণ প্রতিষ্ঠিত করার সুযোগ ঔপনিবেশিক ভারতে ছিল না। প্রথমত 'সামাজিক' জীবনে রাষ্ট্রের অনুপ্রবেশ-নীতি ছিল মিনিমালিস্ট—পরার্থে নয়, ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রের নিজস্ব স্বার্থচেতনাই ছিল এর সঙ্গে জড়িত।

অপরপক্ষে জাতীয়তাবাদী চিন্তায় ছিল স্ববিবোধ। 'আধুনিকতা'র লাগামহীন সাধনাকে মনে হত 'ইংরেজিয়ানা'র নামান্তর। ইংরেজ শাসনের অপমান যতদিন ছিল, 'ইংরেজিয়ানা' ছিল আত্ম-অবমাননার সামিল। সব কিছুতে একটা 'ভারতীয়' ভাব বজায় রাখতে পারলে তবেই আত্মসম্মান বাঁচত। 'পশ্চিমের আমরা অন্ধ অনুকরণ করি না'—এই কথাটা সোচ্চারে ঘোষণা করতে হত নিজেদের কাছে। 'ভারতীয়ত্ব' খোঁজার পথ কিন্তু হাজির করত এক ধরনের 'হিন্দুত্বের' দরবারে। ফলে মনের একটা দিক যাকে 'কুসংস্কার' বলে খারিজ করেছে, মনের আরেক দিকের প্রয়োজন ছিল তাকেই সাজিয়ে গুছিয়ে, কিছু সংস্কার করে 'আধুনিকতা'র কাছে গ্রহণযোগ্য করে তোলার। আর এ-কথাও মনে রাখা দরকার যে, ইংরেজ-বিরোধী মনোভাবের জন্মের উর্বরক্ষেত্র ছিল তথাকথিত পিছিয়ে পড়া, রক্ষণশীল মতাদর্শগুলোই। এক অর্থে জাতীয়তাবাদী চিন্তাও এই সব জীবনদর্শনের কাছে গভীরভাবে ঋণী।

ফলকথা, 'আধুনিকতা', 'প্রগতি', 'উন্নতি'র (অর্থাৎ, বর্তমানে যা ভারতবর্ষে ধনতান্ত্রিক

বিকাশের রূপ নিয়েছে) সর্বাঙ্গীণ প্রয়াসের মানসিক ও সামাজিক ক্ষেত্র তৈরি হবার একটি পূর্বশর্ত ছিল। তা হল এলিটের পক্ষে ইংরেজের হাত থেকে রাষ্ট্রযন্ত্রটিকে ছিনিয়ে নেওয়া। একবার ইংরেজ সরাসরি প্রভুত্ব থেকে হটে গেলে তো আর 'ইংরেজিয়ানা'য় কোনও অপমান নেই—কারণ ওটা আর তখন 'নকল-নবিশী' নয়, ওটা বিশুদ্ধ 'প্রগতি'। 'ভারতীয়ত্বের' প্রশ্নটি তাই আর স্বাধীন ভারতবর্ষের শাসকশ্রেণীর কাছে অত জরুরি নয়। তাছাড়াও ধনতান্ত্রিক বিকাশে ও সেই সূত্রে 'আধুনিকতা'র শর্তপালনে এই রাষ্ট্রের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। 'উন্নতি'র জন্য প্রয়োজন যে জনসংখ্যার ম্যানেজমেন্ট, তা-ও তো রাষ্ট্রেরই দায়িত্ব। তাই 'স্বাস্থ্য', 'শরীর' ইত্যাদি প্রশ্নে স্বাধীন রাষ্ট্র আর ঔপনিবেশিক সরকারের মতো মিনিমালিস্ট নীতি চলে না। আজ সুদূর গ্রামাঞ্চলেও স্বাস্থ্য-কেন্দ্র, পরিবার পরিকল্পনা-কেন্দ্র, স্বাস্থ্যকর্মীদের দৌলতে কৃষকের চেতনায় আধুনিক শারীরবিদ্যা পৌঁছে দেওয়ার জন্য রাষ্ট্রীয় কার্যক্রম নেওয়া হয়েছে। এই শরীরভাবনাকে ছড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে।

অর্থাৎ 'সামাজিক' শরীরকে বদলে বুর্জোয়া 'শরীর' করার যে ঐতিহাসিক যজ্ঞ, আধুনিক রাষ্ট্রই তার প্রধান হোতা ও 'আধুনিকতা'র মতাশ্রয়ী শিক্ষিত মানুষেরা তার পুরোহিতশ্রেণী। এর মানে এই নয় যে, 'সমাজ'-এর যূথবদ্ধতার মতাদর্শ সম্পূর্ণ হটে যাবে। রাষ্ট্রের ক্ষমতা এবং 'ফর্ম'-এর সঙ্গে নানান ঐতিহাসিক সমঝোতায় আসবে সে। এ-প্রসঙ্গের বিশদ আলোচনার অবকাশ বর্তমান প্রবন্ধে নেই। তবে আধুনিক রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য পরিষ্কার—'সমাজ'কে পোষ মানানো, এবং 'শরীর'-এর প্রশ্নটিকে 'সামাজিক' রাজনীতি বা রাষ্ট্রবিরোধী চিন্তার বাইরে নিয়ে আসা। এ-লড়াই এখনও চলছে। অবশ্য তৃতীয় দুনিয়ায় রাষ্ট্রের নানান গাঁটছড়া বাঁধা থাকে সামন্তশক্তির সঙ্গে, যা স্বভাবতই তার 'আধুনিকীকরণে'র ক্ষমতাকে অনেকটা দুর্বল করে দেয়। আমাদের পরিবার পরিকল্পনা প্রোগ্রামের ব্যর্থতার দিকগুলিতে 'শরীর' নিয়ে এই লড়াইতে রাষ্ট্রের বহুলাংশিক পরাজয়ের ইতিহাস লেখা আছে।

উপসংহার

'সমাজ' বস্তুটিকে কোনও রোমান্টিক দৃষ্টিতে উপস্থাপিত করা এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নয়। 'সমাজ'-এরও নিপীড়ন ক্ষমতা আছে, যদিও তার পদ্ধতি রাষ্ট্রের নিপীড়নপদ্ধতি থেকে আলাদা। স্মর্তব্য এ-ও যে, এই 'সামাজিক' শরীরকে একভাবে ব্যবহার করেই সামন্ততান্ত্রিক শাসন গড়ে উঠেছে। 'সামাজিক শরীর'-এর যাঁরা তাত্ত্বিক সেই পুরোহিত-জ্যোতিষী-কবিরাজ শ্রেণীও সামন্তপ্রভুদের পৃষ্ঠপোষকতায় লালিত। তাছাড়া মানুষের সভ্যতায় বিজ্ঞানের ও বৈজ্ঞানিক মনের দানও অনস্বীকার্য। আজ নিশ্চয়ই ঘড়ির কাঁটা পিছিয়ে কেউ বসন্ত-কলেরা-প্লেগ-ম্যালেরিয়ার মহামারিতে বেঘোরে মারা পড়তে চাইবেন না। সেটা কাম্যও নয়। তাই 'সমাজ'কে পুজো করা আমার উদ্দেশ্য নয়।

আমার উদ্দেশ্য 'স্বাস্থ্য' ও 'শরীর'-এর প্রশ্নকে ঘিরে আধুনিক রাষ্ট্র কীভাবে ও কী কারণে তার ক্ষমতার বিস্তার ও ব্যবহার করে, কী ধরনের বিরোধী-শক্তির মোকাবিলা তাকে করতে হয়—তা আলোচনা ও বোঝার চেষ্টা করা। বিজ্ঞানের শক্তি অস্বীকার করা

আমার উদ্দেশ্য না হলেও, বিজ্ঞানকে চিরদিন রাষ্ট্রিক এবং/অথবা ধনতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার বাহন হয়ে থাকতেই হবে, ইতিহাসের এমন কোনও অমোঘ নিয়ম আছে বলে আমার বিশ্বাস নেই। তা ছাড়া রাষ্ট্র ও ধনতন্ত্রের কবল থেকে বিজ্ঞানকে উদ্ধার না করতে পারলে প্রযুক্তির চেহারাটাও বদলাবে না।

রাষ্ট্রের ভিত্তি---লেনিন যেমন বলেছিলেন—সংগঠিত হিংসায়। হিংসার মাধ্যমেই তার জন্ম। নিজেকে বৈধ প্রমাণ করতে তার কতগুলো 'কল্যাণকর' মতাদর্শের সাহায্য নিতে হয়। আবার এগুলোই তার হাতে অস্ত্রবিশেষ। অথচ গান্ধীবাদী ভাবেই ভাবুন বা মার্কসবাদী ভাবেই ভাবুন, শেষ বিচারে মানুষের মুক্তি রাষ্ট্রের অবলুপ্তিতে ও ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণে, তাই রাষ্ট্রের ক্ষমতার চরিত্র বোঝা দরকার। এবং তেমনি বোঝা প্রয়োজন ইতিহাসে রাষ্ট্র-বিরোধিতার সূত্রগুলো কোথায়, কারণ একদিন আবার মানুষের মুক্তির কাহিনীর সূত্রপাত সেই সব জায়গা থেকে করতে হবে।

সব শেষে, একটা ইতিহাস লেখার দৃষ্টিভঙ্গির কথা এসে যায়। ১৮৯৭ সালে বোম্বাই-এর সাধারণ খেটে-খাওয়া মানুষ সরকারের প্লেগ-নীতির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছিলেন। তার ইতিহাস আজ কেন লিখব? নিছক নিম্নবর্গের বিরোধিতার ইতিহাস লিখতে চাই বলে? সেটা তো পপিউলিজম। মানুষ হাজারো বাধার মধ্যেও তার সংগ্রামী সত্তাকে জিইয়ে রাখে, এই কথাটার পুনঃপ্রচার করতে চাই বলে? সেটা তো হিউম্যানিজম। এর বাইরেও তো একটি ইতিহাস আছে, সেটা শরীর, রাষ্ট্র, ও 'সমাজ'-এর সংঘর্ষের ইতিহাস। আধুনিক ভারতের ইতিহাসে এই প্রশ্নটিকে নিয়ে আরও একটু ভাবনাচিন্তা করাই এই আলোচনার মুখ্য উদ্দেশ্য।

টীকা

১ Michael Worboys, 'The Emergence of Tropical Medicine a Study in the Establishment of a Scientific Speciality' in Gerard Lemaine *et al*, eds , *Perspectives on the Emergence of Scientific Disciplines* (The Hague, 1976), pp 79-80

২ Radhika Ramasubban *Public Health and Medical Research in India: Their Origins under the Impact of British Colonial Policy* (Stockholm, 1982), p 11

৩ Worboys, 'Tropical Medicine', p 79.

৪ ঐ, পৃ. ৮৫।

৫ David Arnold, 'Cholera and Colonialism in British India', *Past and Present*, No 113, Nov, 1896, p 127

৬ Ramasubban, *Public Health*, pp 13, 20

৭ ঐ, পৃ. ১২-১৩।

৮ Arnold, 'Cholera' p 139

৯ Ramasubban, *Public Health*, p 19

১০ বিষয়টি গবেষণাসাপেক্ষ, ও এ পর্যন্ত কোনও কাজ বিশেষ চোখে পড়েনি। এই প্রসঙ্গে আর একটি প্রশ্নও মনে আসে: 'ভিড়' সামলানোর অনেক 'টেকনিক' আজ রাজনীতিক গণসভা থেকে পাড়ার পুজো প্যান্ডাল সর্বত্রই ব্যবহৃত হয়; এই ট্রাডিশনের শুরু কি ঔপনিবেশিক রাষ্ট্র-কর্তৃক মেলা-সামলানোর চেষ্টায়? আমরা কি দৈনন্দিনে রাষ্ট্রেরই কতগুলো নিয়ম প্রতিফলিত করি?

১১ Ramasubban, *Public Health*, pp. 15-16.

১২ দ্রষ্টব্য—David Arnold, 'Smallpox and Colonial Medicine in Nineteenth-Century India প্রবন্ধটি Arnold ed *Imperial Medicine and Indigenous Societies* (Manchester 1988) গ্রন্থে প্রকাশিত হয়েছে।

১৩ V R. Muraleedharan, 'Some Observations on the Colonial Government's Response to Changing Medical Views The Case of Malaria in the Madras Presidency during the Early 1900s' (Paper presented at a conference on Science under the Raj India and Imperial Expectations 1800-1947 organized by the National Institute of Science, Technology and Development Studies at Delhi 9-10 May 1988

১৪ Dipesh Chakrabarty *Rethinking Working Class History: Bengal 1890 1940* (Princeton 1986) তৃতীয় পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।

১৫ David Arnold, 'Touching the Body Perspectives on the Indian Plague, 1896-1900' in Ranajit Guha ed *Subaltern Studies*, V, (Delhi 1987) pp 55-90, I.J Catanach 'Plague and the Indian Village, 1896-1914' in Peter Robb ed . *Rural India: Land Power and Society under British Rule* (Delhi, 1986) pp 216-43

১৬ দ্রষ্টব্য Arnold, "Touching the Body '

১৭ Ralph W Nicholas, 'The Goddess Sitala and Epidemic Smallpox in Bengal', *Journal of Asian Studies*, Vol XLI, No 1, Nov, 1981, p. 34

১৮ প্রসঙ্গত দ্রষ্টব্য—গৌতম ভদ্র, 'একটি আনুগত্যের দলিল: "কাস্তনামা বা রাজধর্ম্ম" ', *অনুষ্টুপ*, শারদীয় সংখ্যা, ১৯৮৭, পৃ ২০৫-৩১১।

১৯ Arnold, 'Cholera', p 128

২০ *Amrita Bazar Patrika*, 2 July 1897

২১ Arnold, 'Touching the Body', p 73

২২ ঐ।

২৩ ঐ।

২৪ Arnold, 'Touching the Body', pp. 71-3: Catanach, 'Plague', pp 224-5 দ্রষ্টব্য।

২৫ Arnold, 'Smallpox', p 22.

২৬ Catanach, 'Plague', p. 229

২৭ ঐ, পৃ. ২২৮।

২৮ Henry Whitehead, *The Village Gods of South India* (Calcutta, 1921), pp 32 38-9

২৯ ঐ, পৃ. ৫৫-৬১, ৭২-৭৪।

৩০ David Hardiman, The Coming of the Devi Adivasi Assertion in Western India (Delhi, 1987), pp 22, 25-6, Arnold, 'Cholera,' p 133, Catanach 'Plague', p. 229-ও অন্যান্য দ্রষ্টব্য।

৩১ Nicholas, 'The Goddess Sitala', p. 37.

৩২ ঐ, পৃ. ৩৯।

৩৩ C B Macpherson, *The Political Theory of Possessive Individualism: Hobbes to Locke* (Oxford, 1985), pp 137-42

৩৪ Whitehead, *Village Gods*, p. 115

৩৫ Margaret Trawick Egnor, "The Changed Mother or what the Smallpox Goddess did when there was more small pox' *Contributions to Asian Studies*, vol. 18, 1984, pp 24-45

৩৬ দ্বিজ নিত্যানন্দ-প্রণীত *গীতছন্দে শীতলার জাগরণ পালা* (কলকাতা, ১৮৭৯), পৃ ৫৪।

৩৭ ঐ, পৃ ৫-৮, ১৪-১৫ দ্রষ্টব্য।

৩৮ Arnold, 'Cholera', p 131; Hardiman, *Devi*, p. 25.

৩৯ মেদিনীপুরের ১৯৭৮ সালের বন্যার অভিজ্ঞতার পরিপ্রেক্ষিতে এই বিষয়ে সুন্দর আলোচনা করেছেন অদিতিনাথ সরকার, The Scroll of the Flood -নামক একটি এ যাবৎ অপ্রকাশিত প্রবন্ধে।

৪০ এ বিষয়ে সম্প্রতি মনোগ্রাহী আলোচনা করেছেন Peter Stallybrass ও Allon White তাঁদের বই *The Politics and Poetics of Transgression* (London, 1986) 'The City the Sewer, the Gaze and the Contaminating Touch' শীর্ষক পরিচ্ছেদটিতে।

৪১ ঐ, পৃ. ১২৭।

৪২ গোপালচন্দ্র মজুমদার-সঙ্কলিত ও অনুবাদিত, *ইংরাজি টীকাদারগণের প্রতি উপদেশ* (কলকাতা, ১৮৭২), পৃ. ৭ ৮। পুস্তিকাটির গোড়ায় গোপালবাবু নিজের পরিচয় দিয়েছেন 'ইংরাজি টিকার সুপারিনটেন্ডেন্ট সাহেবের আফিসের প্রধান কর্মচারী' বলে।

৪৩ এ বিষয়ে আর্নল্ড ('Touching the Body', p 85-97) ও সুমিত সরকার মন্তব্য করেছেন যে, চিকিৎসা বিষয়ে গান্ধীর চিন্তা আমাদের জাতীয়তাবাদী চিন্তার একটি ব্যতিক্রম। প্রণিধানযোগ্য কথা।

৪৪ দ্রষ্টব্য - - Arnold 'Touching the Body', pp 85-6

৪৫ ঐ।

৪৬ ভারতীয় চিকিৎসাশাস্ত্র নিয়ে লেখাজোখা প্রচুর। আমি উপকৃত হয়েছি শ্রীমতী অনুরাধা খান্নার সঙ্গে আলোচনায় ও এঁর দুটি অপ্রকাশিত প্রবন্ধ পড়ে—'Health and Disease An Interpretation from Ancient Indian Medicine' ও 'Theoretical Foundations of Ancient Indian Medicine (with special reference to *Charaka Samhita*)'। প্রবন্ধ দুটি পড়তে ও ব্যবহার করতে দেবার জন্য আমি শ্রীমতী খান্নার কাছে কৃতজ্ঞ।

৪৭ জগদীশচন্দ্র ঘোষ সম্পা: *শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা* (কলকাতা, ১৯৬৬), সপ্তদশ অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

৪৮ অমৃতলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, *স্বাস্থ্যবিধান* (হুগলী, ১৮৮৮) পৃ ১।

৪৯ ঐ, পৃ ২৫।

৫০ জদুনাথ মুখোপাধ্যায়, *বিষমজ্বরে কুইনাইন প্রযোগ-প্রণালী* (কলকাতা, ১৮৭৩), পৃ. ১-২।

৫১ *আমার আশ্চর্য বাসগৃহ* (কলকাতা, ১৯০২)। শারীরবিদ্যাবিষয়ক এই বইটি ক্রিশ্চিয়ান লিটারারি সোসাইটি-কর্তৃক প্রকাশিত হয়েছিল।

৫২ কৌতূহলী পাঠক উদাহরণ হিসেবে দেখতে পারেন রাধানাথ বসাক রচিত *শরীরতত্ত্বসার* (কলকাতা ১৮৬৪) ও রাধিকাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়ের *স্বাস্থ্য-রক্ষা* (কলকাতা, ১৮৭০) বই দুটি। তবে এমন বই আরও আছে।

৫৩ অনেকে এদের ইংরেজ-বিরোধিতার মধ্যে শ্রেণীস্বার্থের গন্ধ পান। কথাটা এক অর্থে ঠিক, এবং বলাই বাহুল্য যে 'আধুনিকতা' তথা 'প্রগতি'র প্রকোপের সামনে এঁরা ছিলেন একটি বিপন্ন শ্রেণী। কিন্তু এঁদের স্বার্থের আলোচনা বর্তমান ক্ষেত্রে প্রাসঙ্গিক নয়। তাছাড়া, মুঘল সম্রাটের প্রতি আনুগত্যের ভিত্তিতে সিপাহিদের যে ইংরেজ বিরোধিতা, তা যদি আমাদের জাতীয়তাবাদী ঐতিহ্যের অংশ হয়, তাহলে হাকিম-বৈদ্যদের তথাকথিত 'রক্ষণশীল' কিন্তু 'পশ্চিম বিরোধী' মনোভাবই বা আমাদের জাতীয়তাবাদী চিন্তার অংশ হবে না কেন?

৫৪ পাঠক দেখতে পারেন, গৌরীনাথ সেন কবিরঞ্জন রচিত *শারীরিক স্বাস্থ্যবিধান* (কলকাতা, ১৮৬৩) পুস্তিকাটি।

৫৫ গিরীশচন্দ্র সেন কবিরত্ন, *স্বাস্থ্য সহায়* (কলকাতা, ১৯০৩), পৃ ৫, ৬, দ্রষ্টব্য।

৫৬ তারিণীপ্রসাদ জ্যোতিষী, *প্লেগ-সংহিতা বা আর্য-স্বাস্থ্যবিধান* (কলকাতা, [১৮৯৯?]), পৃ ৪২।

৫৭ ঐ, পৃ. ৪৭-৯।

৫৮ ঐ, পৃ. ৪০।

হিংসা, দেশান্তর ও ব্যক্তিগত কণ্ঠস্বর

বীণা দাস

১৯৪৭-এর দেশভাগ ও সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার পর যাঁরা দেশান্তরী হতে বাধ্য হয়েছিলেন, সেই সব মহিলাদের ব্যক্তিগত কিছু কাহিনী আলোচনা করব এই প্রবন্ধে। কাহিনীগুলো আমি সংগ্রহ করেছি পঞ্চাশটি শহরবাসী পঞ্জাবি পরিবারের কাছ থেকে। পরিবারগুলি একে অন্যের সঙ্গে আত্মীয়তাসূত্রে যুক্ত।

এইরকম একজন মহিলার গল্প শুনুন। গল্পটি আমি আমার আলোচনার কেন্দ্রে রাখতে চাইছি। এর সঙ্গে অন্য কাহিনীগুলোর তুলনা পরে করব। মহিলার নাম ধরা যাক মনজিত। দেশভাগের সময় এঁর বয়স ছিল তেরো। লাহোর থেকে পালাবার পথে এর বাবা আর মা সাম্প্রদায়িক আক্রমণে মারা যান। গ্রামের মুসলমানেরা মনজিত আর তার দাদাকে বাঁচিয়ে স্বেচ্ছাসেবকদের হাতে তুলে দেয়। পরে তারা অমৃতসরে এসে পৌঁছয়। এদের এক মামা লুধিয়ানার সরকারি হাসপাতালে ডাক্তার ছিলেন। তিনি এদের আশ্রয় দেন।

মনজিতের জীবনকাহিনীর এই তথ্যগুলি আমি তাঁর কাছ থেকেই জানতে পারি। তাঁকে একদিন বলেছিলাম, 'দেশভাগের সময় আপনার অভিজ্ঞতার কথা শুনতে চাই।' মনজিত রাজি হয়ে যান। কিন্তু বলেন, 'আমার বাড়িতে নয়। আপনার বাড়িতে যাব একদিন।' যেদিন এলেন. লক্ষ করলাম মনজিতের পোশাক, চলাফেরা, কথাবার্তায় একটা সূক্ষ্ম পরিবর্তন ঘটে গেছে। যেন কোনও অনুষ্ঠানে এসেছেন, এমনি গল্প করতে আসেননি। বসেই একটা কাগজ বের করলেন, তাতে পঞ্জাবিতে লেখা। কাগজটা আমায় দেখিয়ে বললেন, 'ভাবলাম আমার অভিজ্ঞতাগুলো লিখেই নিয়ে আসি।' তারপর আমার সামনে বসে মনজিত নিম্নলিখিত কাহিনীটি পড়ে শোনালেন।

প্রথম স্মৃতিচারণ

আমবা যখন লাহোর ছাড়তে বাধ্য হই তখন আমার বয়স তেরো। শহরে যে দাঙ্গা হচ্ছে, তা আমরা জানতাম। কিন্তু দাঙ্গা আগেও হয়েছে। মাঝে মাঝে হয়, তারপর সব আবার স্বাভাবিক হয়ে যায়। দাঙ্গার জন্য, কেউ কখনও দেশ ছেড়ে চলে যায়নি। কিন্তু ক্রমে দেখলাম, অবস্থা দুর্বিষহ হয়ে উঠল। রোজ সকালে দেখতাম শহরে আগুন জ্বলছে। রাস্তা দিয়ে রক্তের স্রোত বইছে, এদিক-ওদিক সাদা কফন। সকলেই চলে যেতে শুরু করল। আমরাও ভাবলাম, একা-একা পড়ে থাকা সম্ভব নয়। বিশ্বাসই

হচ্ছিল না যে হিন্দু-মুসলমান যারা শতাব্দীর পর শতাব্দী একসঙ্গে বাস করেছে, তারা আর একত্রে থাকতে পারবে না। কয়েকজন প্রতিবেশীর সঙ্গে আমরাও ট্রাকে উঠলাম। মোটা টাকার বিনিময়ে ড্রাইভার কথা দিল অমৃতসর পর্যন্ত পৌঁছে দেবে। পথে ট্রাকটি আক্রান্ত হল। আমার আর কিছু মনে নেই। শেষ পর্যন্ত অমৃতসর পৌঁছলাম, এটুকুই শুধু মনে আছে। সম্প্রতি শিখ তীর্থযাত্রীদের একটি দলের সঙ্গে আমি লাহোর গিয়েছিলাম। গভীর দুঃখের সঙ্গে জানাচ্ছি, ওখানে হিন্দু মন্দির আর শিখ গুরদুয়ারার অবস্থা সঙ্গিন। গুরদুয়ারার উন্নতির জন্য ভারত সরকারের কিছু করা উচিত।

এই কাহিনী এবং কাহিনীকারের কণ্ঠস্বর সম্বন্ধে প্রথমেই লক্ষ করার বিষয়, এর আনুষ্ঠানিক প্রথাগত ঢঙ। নিজের অভিজ্ঞতার গল্প বলতে গিয়ে মনজিত হঠাৎ এই আনুষ্ঠানিক কথনের পেছনে লুকোতে চাইলেন কেন?

আমরা জানি, এই ধরনের কাহিনীতে স্থানকে কিভাবে ভাগ করা হচ্ছে, সেটা খুব তাৎপর্যপূর্ণ। নানাভাবে স্থান ভাগ করা যায়। একটা হল ভেতর আর বাইরের মধ্যে ভাগ। এই ভিতর ভাগ আর বাহির ভাগের মধ্যে আবার নানা মাত্রা সংযোজন করা যায়, তার প্রত্যেকটির এক-এক রকমের তাৎপর্য। গোটা কাহিনীটি আবার হয় ভেতরের দিকে নয় বাইরের দিকে নির্দিষ্ট থাকে—এটা নির্ভর করে কাহিনীকারের অবস্থানের ওপর। আমরা আরও জানি, অভিবাসীদের ক্ষেত্রে ভেতর আর বাইরের সম্পর্ক খুব জটিল হয়ে যায়। বাস্তবে যা অনেক দূরে, মনের দিক দিয়ে সেই জায়গাটাই হয়তো অত্যন্ত কাছের। আবার দেশান্তরী মানুষ বাস্তবে যে নতুন জগতে অবস্থিত, সেই জায়গাটাই হয়তো তার মনে হয় ভয়ানক দূরের। দেশান্তরের কারণ যেখানে হিংসা আর সংঘাত, ভেতর আর বাইরের জগতের সীমানাগুলো যেখানে জোর করে টানা হয়েছে, সেখানে যে ভিতর-বাহিরের সম্পর্ক আরও অনেক বেশি জটিল হয়ে যাবে, তাতে আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই। মনজিতের কাহিনী থেকে এটাই দেখাতে চাই।

গল্প বলতে গিয়ে মনজিত যে নিতান্তই আনুষ্ঠানিক একটা ঢঙ বেছে নিলেন, আমার ধারণা এইভাবে তিনি আমায় বোঝাতে চাইছিলেন যে, স্মৃতি অত্যন্ত বিপজ্জনক। নৃতত্ত্ববিদ হিসেবে আমি যখন মনজিতকে বলি, 'আপনার অভিজ্ঞতার কথা মনে করে বলুন', তাঁর মনের ওপর এর ফলে যে প্রতিক্রিয়া হতে পারে তার জন্য তো আর আমি কোনও দায়িত্ব নিচ্ছিলাম না। এতে যে বিপদ আছে, সেটাই মনজিত আমায় মনে করিয়ে দিলেন। সেজেগুজে এলেন, হাতে লিখিত বক্তব্য, সেটা বক্তৃতা দেওয়ার ঢঙে পড়ে গেলেন। এতে করে তাঁর নিজের বক্তব্যের সঙ্গেই একটা দূরত্ব স্থাপন করে রাখলেন মনজিত। বোঝা গেল, এই প্রাথমিক বক্তব্যটা একবার বলা হয়ে গেলে তারপর অন্য কথায় যাওয়া যাবে।

সুতরাং রাজনৈতিক সংঘাত আর দেশান্তরের ফলে যে স্থানটি বাস্তবে দূরের, মনের দিক দিয়ে তা কাছের হলেও সেটা বর্ণনা করার সময় মনজিত নিজেকে তার থেকে দূরে সরিয়ে রাখতে চাইছিলেন। দেশভাগের ঘটনা নিয়ে যে কথাসাহিত্য, সেখানেও দেখেছি

যে গল্পের লেখক একটা নৈর্ব্যক্তিক ভাষ্যকারের ভূমিকা নিয়ে ঘটনার বর্ণনা দিচ্ছেন। এ-সব গল্পের ক্রিয়ার কাল সব সময় অতীতে, ঘটনার স্থান নৈর্ব্যক্তিক, যেমন হাসপাতাল কিংবা হোটেল। একমাত্র নৈর্ব্যক্তিক ভাষ্যকারই যেন এ-সব ঘটনার যথাযথ বর্ণনা দিতে পারে। একান্ত নিজস্ব অভিজ্ঞতার কথা বলতে গিয়ে মনজিতও দেখলাম একই ভঙ্গি অবলম্বন করলেন।

একটা কথা অবশ্য বলা দরকার। যে স্থানটি এক সময় মনজিতের নিজের দেশ ছিল, এখন বিদেশ হয়ে গেছে, তার ওপরেও কিন্তু তিনি একটা দাবি জানিয়ে রাখতে চাইছিলেন। তাই বললেন, গুরদুয়ারাগুলোর সংরক্ষণের জন্য ভারত সরকারের কিছু করা উচিত। অন্য অনেক জায়গায় দেখা গেছে, অভিবাসীরা তাদের ফেলে-আসা জগতের মূল্যবোধ দিয়েই নতুন পরিবেশকে অর্থবহ করে তুলতে চায়। মনজিতের কাহিনীতে এর আরও দৃষ্টান্ত পরে দেখব। এখানে শুধু লক্ষ করা দরকার যে, পুরনো জগৎটা থেকে চিরতরে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়া সত্ত্বেও তার ওপর একটা দাবি কিন্তু থেকেই যাচ্ছে, যে দাবি পূরণ করার প্রায় কোনওই সম্ভাবনা নেই।

দ্বিতীয় স্মৃতিচারণ

মনজিত আরও একবার আমায় তাঁর অভিজ্ঞতার গল্প বলেন। এবার নিজের উদ্যোগেই। প্রথম সাক্ষাৎকারের প্রায় এক মাস পর আমি ওঁদের পাড়ায় গিয়েছিলাম। খবর পেয়ে মনজিত এসে আমায় বললেন:

> কাল রাতে একটা বিশ্রী স্বপ্ন দেখেছি। দেখলাম আমি লাহোরে ফিরে গেছি। চারদিকে আগুনের গন্ধ। আমি ছুটে ছাদে চলে গেলাম আগুন আর ধোঁয়া দেখব বলে। লাহোরে থাকতে আমি ওইরকম ছাদে গিয়ে আগুন দেখতাম।

আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'স্বপ্নের মধ্যে আপনি সব চেয়ে বেশি ভয় পেলেন কিসে?' তিনি বললেন, ওই সময় লাহোরে ওঁর দাদা রোজ রাজনৈতিক কর্মীদের সঙ্গে বেরিয়ে যেতেন। একদিন সকালে বেরোবার সময় মনজিতের হাতে একটা ছোট্ট পুরিয়া ধরিয়ে দিয়ে বললেন, 'সঙ্গে রাখ। গুণ্ডারা এলে সঙ্গে সঙ্গে খেয়ে ফেলবি। খবরদার, ওদের হাতে পড়িস না।' মনজিত পাশের বাড়ির এক বান্ধবীকে কথাটা বলেছিলেন। 'আমাদের সাহস ছিল না দাদাকে জিজ্ঞেস করি পুরিয়াতে কি আছে। আমরা দুজনেই শালোয়ারের দড়ির সঙ্গে পুরিয়াটা বেঁধে রাখতাম। আসলে জানতাম, ওটা নিশ্চয়ই বিষ। দরকার হলে সাহস করে খেতে পারব কিনা, তাই নিয়ে আমাদের আতঙ্কের সীমা ছিল না।' আমি জিজ্ঞেস করলাম, ওঁর দাদা কোথায় যেত সেটা তিনি জানতেন কি না। মনজিত বললেন, 'নিশ্চয় অন্যাদের মতো লুঠপাট করতেই যেত। যখন ফিরে আসত, দেখতাম চোখে কেমন একটা অদ্ভুত দৃষ্টি।' এর বেশি আর কিছু জানতে পারলাম না।

স্বপ্ন দেখে ভয় পেয়ে মনজিত যা বললেন তার একটা অংশ হল দূর থেকে জ্বলার দৃশ্য দেখা, অন্যটা হল ঘরের ভেতরকার আতঙ্ক। দাদা ঘরে থেকে বোনকে রক্ষা করার দায়িত্ব নেয়নি। বাইরে গিয়ে লুঠ করা, আগুন দেওয়া, ধর্ষণ করা, এটাই তার কাছে

অনেক বেশি পুরুষোচিত মনে হয়েছিল। দাদা যে ঠিক কি করত, আমরা জানি না। মনজিতের কথা থেকে এটুকুই স্পষ্ট যে পুরুষসমাজের অংশ হয়ে সে ওইসব কাজে অন্তত উপস্থিত থাকত। বোনের হাতে বিষের পুরিয়া ধরিয়ে দিয়ে পাড়ার ছেলেরা জানিয়ে দিল, তাদের বোনেরা যেন শত্রুর হাতে গিয়ে না পড়ে। আপাতদৃষ্টিতে মনজিতের আতঙ্কের কারণ তার নিজের মনোবল নিয়ে একটা সন্দেহ—সে যদি এই মারাত্মক দায়িত্বটা পালন করতে না পারে? একটু গভীরে দেখলে, আমার ধারণা, আতঙ্কের সূত্রটা যে অন্য জায়গায় নিহিত রয়েছে, সেটা বোঝা যাবে। এই প্রথম বোধ হয় মনজিত বুঝতে পারল যে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র একটা মান-ইজ্জতের লড়াইয়ে তার শরীরটা শুধুমাত্র একটি চিহ্ন হয়ে গেছে। তাই তার শরীর নিয়ে দুপক্ষেরই এত মাথাব্যথা।'

একটা অন্য কাহিনী বিচার করলে মনজিতের ভয়টা হয়তো আর একটু ভাল করে বোঝা যাবে। মনজিত নিজেই আমায় বললেন অমৃতসরের এক লব্ধপ্রতিষ্ঠ মুসলিম পরিবারের কথা। তারা পাকিস্তানে যেতে পারেনি, কারণ বৃদ্ধ পিতা তখন অত্যন্ত অসুস্থ এবং তাঁর দুই মেয়ে বাবাকে এই অবস্থায় ফেলে রেখে যেতে রাজি হয়নি। মেয়েরা পর্দানশিন, তাই বাইরের সঙ্গে যা যোগাযোগ সবই হত তাদের ছোট ভাই-এর মাধ্যমে। একদিন বাবার অবস্থা খুব খারাপ হওয়ায় ভাই গেল ডাক্তার ডাকতে। ঠিক সেই সময় এক বিরাট জনতা তাদের বাড়ি ঘেরাও করল। ছেলেটিকে নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করা হল। মৃতপ্রায় বাবা আর দুই দিদি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখল ছেলেটিকে তলোয়ার দিয়ে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে মারা হচ্ছে। বাবা এ-দৃশ্য সহ্য করতে পারলেন না, ওই অবস্থাতেই মারা গেলেন।

গল্পের এখানেই শেষ নয়। সেই দাঙ্গাকারী জনতার সামনে এবার দুই বোনকে হাজির করা হল মুজরা নাচার জন্য। 'মুসলমানেরা পরে বলে বেড়ায় যে মেয়ে দুটো তাদের জামার ভেতর ছুরি লুকিয়ে রেখেছিল। নাচতে নাচতে তারা দাঙ্গাবাজদের নেতাকে ছুরি মেরে হত্যা করে। তার পর নিজেরা আত্মহত্যা করে।' এইটুকু বলে মনজিত নিজে থেকেই যোগ করলেন, 'এটা অবশ্য একেবারেই বানানো গল্প হতে পারে। অধিকাংশ লোকই বিশ্বাস করে যে মুজরা নাচের পর মেয়ে দুটো অনেক পুরস্কার পায়। তার পর যারা ওদের ভাইকে মেরেছিল, তাদেরই রক্ষিতা হয়ে যায় ওরা।'

আমার সন্দেহ, এই গল্পটার মধ্যে লৌকিক ধারার অনেক উপাদানই মিশে গেছে। এর সত্যাসত্য বাস্তব ঘটনার মধ্যে খুঁজে পাওয়া যাবে না, কারণ এর অর্থ বহুলাংশেই মনস্তাত্ত্বিক। সত্যটা লুকিয়ে আছে নারীত্বের সেই সংকটময় অবস্থায় যেখানে দুটিই মাত্র বিকল্প—হয় কোনওমতে প্রাণরক্ষা করে বেঁচে থাকা, না-হয় পুরুষ-সমাজের নির্ধারিত মান-ইজ্জতের নিয়ম মেনে নিয়ে মৃত্যু বরণ করা। মনজিতের নিজের অভিজ্ঞতার কাহিনী বা অন্যের মুখে শোনা এই গল্প, দুই-এর মধ্যেই এটা লক্ষ করা যাবে। দুটো গল্পেই দেখছি ভেতর আর বাইরের সীমানা ভয়ানকভাবে লঙ্ঘিত হচ্ছে, ভদ্র পর্দানশিন মহিলা রূপান্তরিত হয়ে যাচ্ছে মুজরাওয়ালিতে, নারীর শরীর নিয়ে বিবদমান পুরুষদের মধ্যে ঘটছে সংঘাত। দেশান্তরী মহিলাদের ফেলে-আসা সত্য লুকিয়ে আছে এইসব ঘটনার মধ্যে। এবার দেখা যাক পুরনো জগতের এই স্মৃতি অভিবাসীদের নতুন পরিবেশে কেমনভাবে বদলে যায়।

নীরবতা

আগে বলেছি, মনজিতকে উদ্ধার করে ভারতে নিয়ে আসে স্বেচ্ছাসেবকেরা। পরে মনজিত আর তার দাদা মামার বাড়িতে এসে থাকে। মামা তাঁর দায়িত্ব সম্বন্ধে সচেতন ছিলেন। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব তিনি মনজিতের বিয়ের চেষ্টা করতে লাগলেন। এক দূর সম্পর্কের আত্মীয়ের সঙ্গে মনজিতের বিয়ে হয়। কুলমর্যাদায় শ্বশুরবাড়ি কিছুটা খাটো ছিল। বিয়েতেও বিশেষ ঘটা হয়নি। ব্যাখ্যা করতে গিয়ে মনজিত বললেন, এটাই স্বাভাবিক। দেশভাগের ওইসব সাংঘাতিক ঘটনায় মেয়ের কুমারীত্ব নষ্ট হয়নি, তা নিয়ে কেউই নিঃসন্দেহ হতে পারত না। তাই নিচু ঘরে বিয়ে দেওয়া ছাড়া উপায় ছিল না।

> আমার খুড়তুতো বোনকে মুসলমানেরা ধরে নিয়ে যায়। শুনেছি সে মুসলমান হয়ে গেছে। ভালই করেছে। এখানে এলে কেউ কি বিশ্বাস করত যে তার কুমারীত্ব নষ্ট হয়নি।

খুড়তুতো বোনের গল্পটা হয়তো অজুহাত। আসলে মনজিত বোধ হয় নিজের কথাই বলতে চাইছিলেন। আমায় অনেকবার বলেছেন, নতুন জায়গায় এলে অনেক ব্যাপারে নীরব থাকাটাই শ্রেয়। 'ভাল বিয়ে হলে মেয়েদের খুব সতর্ক থাকতে হয়। অসাবধানী কথায় সবকিছু ওলটপালট হয়ে যেতে পারে।' জগৎকে এই দুভাগে ভাগ করা—এক যেখানে কথা বলা যায়, আর-এক যেখানে কথা বলা নিষেধ—এটা শুধু মনজিতের ব্যক্তিগত ব্যাপার নয়। সাধারণভাবেই হিন্দু পরিবারে মেয়েরা বহু কথা লুকিয়ে রাখতে শেখে। বাপের বাড়িতে যে কথা প্রাণ খুলে বলা যায়, শ্বশুরবাড়িতে এসে তা খুব সাবধানে লুকিয়ে রাখতে হয়, এ প্রায় প্রত্যেক মহিলারই জীবনের অভিজ্ঞতা। মনজিতের বেলায় কিন্তু এই চিরাচরিত প্রথার কিছুটা ব্যতিক্রম ঘটেছে। কৈশোরের অভিজ্ঞতাকে নীরবতার আড়ালে ঢেকে রেখে, কার্যত সেটাকে যেন ভুলে যাওয়ার সুযোগ দিয়ে সমাজ তাঁকে আর পাঁচজন মহিলার মতোই জীবনযাপন করার রাস্তা খুলে দিয়েছিল। মনোবিজ্ঞানে যেমন বলে যে ভয়াবহ কোনও অভিজ্ঞতা ভাষায় বর্ণনা করতে পারলে ভয়টি কাটিয়ে ওঠা যায়, এক্ষেত্রে তা হয়নি। মনজিতের স্বামী অবশ্য মাঝে মাঝে মদ খেয়ে এসে তাঁকে বেশ্যা ইত্যাদি বলে গাল দিত। মনজিত নিজেই সে-কথা আমায় বলেছিলেন। কিন্তু মত্ত অবস্থায় এরকম উদ্ভট অপবাদ তো অনেকেই দেয়। মনজিতের আশপাশের মহিলারা এ-সব অপবাদে কান দিত না। ফলে যতই বিচ্ছিন্ন, যতই বিষময় হোক-না কেন, এক ধরনের সহনীয় জীবনযাত্রা সম্ভব হয়ে উঠেছিল তাঁর পক্ষে। যে-সময়কার ঘটনা মনজিত মনে আনতে চাইতেন না, জোর করে তা নিয়ে কথা বলাতে গেলে তাঁর স্বামী, মামা, দাদা, প্রত্যেকেই বাধ্য হত একে অপরকে দোষী করতে। মান-ইজ্জতের ভয়ানক লড়াই বেধে যেত আবার। সন্তর্পণে তাই প্রত্যেকেই যেন একমত হয়ে গিয়েছিল, এ-নিয়ে আর বেশি ঘাঁটানোর দরকার নেই। মনজিতের জীবনের এই ঘটনা যে সবার ক্ষেত্রেই ঘটত তা নয়। অন্য মহিলাদের কথা জানি যাঁরা ধর্ষিতা হয়েছেন এই সন্দেহে আত্মীয়দের কাছ থেকে চরম দুর্ব্যবহার পেয়েছেন।

রূপান্তর

যে সব মহিলাদের সঙ্গে দেখা করেছি, তাঁদের বেশির ভাগই নিজেদের অভিজ্ঞতা নিয়ে কথা বলতে চাননি। দেশভাগের ঘটনা নিয়ে একেবারেই কোনও কথা বের করা যায়নি, এমন নয়। তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সেটা নিরপেক্ষ দর্শকের জবানিতে। অনেক সময় সংঘাতের কোনও বিশেষ মুহূর্তের খুব খুঁটিনাটি বর্ণনা পাওয়া গেছে। যেমন:

'দুপাট্টাটা টেনে নেওয়ার সময়টুকুও পাইনি। যেমন ছিলাম সেভাবেই পালাতে হল।'
'রুটিটা সবে তাওয়ায় চাপিয়েছি এমন সময় গোলমালের আওয়াজ পেলাম। পালালাম। রুটিটা উনুনের ওপরেই পড়ে রইল।'
'খালি পায়েই দৌড়লাম।'
'বাচ্চাকে দুধ খাওয়াচ্ছিলাম। জামার বোতামগুলো লাগাবার পর্যন্ত সময় পেলাম না।'

এই যে পরিচিত দৈনন্দিন জীবনের ধারাবাহিকতা হঠাৎ বিপর্যস্ত হয়ে যাওয়া, এটাও মহিলাদের কথনভঙ্গির একটা বৈশিষ্ট্য। মেয়েদের গল্পে মৃত্যুর বর্ণনাও সাধারণত এইভাবেই উপস্থাপিত হয়। কোনও নিকট আত্মীয়ের মারা যাওয়ার কথা বলতে গেলে মেয়েরা প্রায়শই এরকম ছোটখাটো ঘটনার বর্ণনা দিয়ে তাঁদের শোক বোঝাতে চায়। যেখানে আগের পরিচিত জগৎটাই ভেঙে চুরমার হয়ে গেছে, তার সবচেয়ে ভয়াবহ ঘটনাগুলো নতুন পরিস্থিতিতে আর মনে আনা সমীচীন নয়, সেখানে একমাত্র মৃত্যুর উপমার আড়ালেই সেই ঘটনার স্মৃতিচারণ সম্ভব হয়ে উঠেছে।

দ্বিতীয় লক্ষণীয় বিষয়: দেশভাগের পর পুরনো আর নতুন জগতের সীমানা যে চিরস্থায়ী, এই সত্য আবিষ্কারের বিস্ময়। মহিলাদের কথায় তাদের সে-সময়কার মনোভাবটা বারে বারে বেরিয়ে আসে। তাঁরা ধরে নিয়েছিলেন, পলায়নটা সাময়িক, একটা আকস্মিক বিপদ থেকে রক্ষা পাওয়ার উপায়মাত্র। মহামারি, যুদ্ধবিগ্রহ, দুর্ভিক্ষ—এসব সময় বাঁচার জন্য সাময়িকভাবে পালাতে হয়, এ তো সবাই জানে। বিপদ কেটে গেলে আবার লোকে ঘরে ফিরে যায়। 'হিন্দুরা কতরকম রাজত্বে বাস করেছে। আমরা তো আর ক্ষমতা চাইনি। ব্রিটিশদের সঙ্গে যেমন মানিয়ে চলেছি সেরকম মুসলমানদের সঙ্গেও মানিয়ে চলতাম। যারা রাজত্ব করবে তারা আমাদের ঘরবাড়ি থেকে উচ্ছেদ করতে চাইবে কেন?' রাষ্ট্রের যে নির্দিষ্ট এবং চিরস্থায়ী সীমানা থাকে, বহু মহিলাই এই প্রথম এটা শিখলেন। ব্রিটিশ আমলেও ব্রিটিশশাসিত অঞ্চল আর দেশীয় রাজ্যগুলির মধ্যে যাতায়াতের বাধা ছিল না। 'কাপুরথালায় বা পাটিয়ালার লোকেদের সঙ্গে লাহোর বা অমৃতসরের লোকেদের স্বচ্ছন্দে বিয়ে-থা হত।' এঁদের মনে রাষ্ট্রের সীমানা ছিল সহজভেদ্য, সামাজিক সম্পর্ক অনায়াসেই রাজনৈতিক সীমারেখা অতিক্রম করে ছড়িয়ে পড়তে পারত। বিপদে পড়লে সীমানা পেরিয়ে ওপারে যেতে হবে, বিপদ কাটলে আবার এপারে ফিরে আসব, এটাই ছিল প্রত্যাশিত। নতুন দুই সার্বভৌম রাষ্ট্রের সীমানা যে একেবারেই দুর্ভেদ্য, একবার পার হলে আর ফিরে আসার কোনও উপায় নেই, এই নির্মম সত্যটি হৃদয়ঙ্গম করার প্রস্তুতি এঁদের অভিজ্ঞতায় ছিল না।

শরীরের ভাষা

উর্দু লেখক সাদাত হাসান মান্টো-র 'ফুন্দানে' নামে একটি গল্প আছে। তাতে মেয়েদের দুটো করে শরীর—একটা জন্মগত স্বাভাবিক শরীর, অন্যটা যাতে হিংসার ফল লালিত হয়। 'মেয়েরা স্বামীর দোষ নিজেদের শরীরের মধ্যে লুকিয়ে রাখে' – পুরুষের অত্যাচার সম্বন্ধে যে নীরবতা, মেয়েরা এভাবেই তার ব্যাখ্যা দেয়। দেশভাগকে কেন্দ্র করে মেয়েদের ওপর যে আক্রমণ, তা শুধু শত্রু পক্ষের পুরুষদের দিক থেকেই আসেনি। তার চেয়েও মর্মান্তিক তাদের আত্মীয় পুরুষদের প্রতারণা। এই প্রতারণার কথা তারা মুখে বলে না, এ-কথা আগেই বলেছি। কিন্তু মুখের ভাষা নীরব থাকলেও শরীর তার নিজের ভাষায় এই যন্ত্রণা প্রকাশ করে ফেলে।

একজন মহিলা যেমন দাবি করলেন যে পালাবার সময় তাঁর শরীরে এমন একটা আঘাত লাগে যেটা কখনোই আর সারেনি। এমনিতে নিজের অভিজ্ঞতা নিয়ে তিনি আমায় প্রায় কিছুই বলতে চাইলেন না, কিন্তু এই আঘাতের কথাটা খুব বিস্তারিতভাবে বললেন। একের পর এক বৈদ্য আর ডাক্তার দেখিয়েছিলেন তিনি। কেউই কিছু করতে পারেনি। মাঝে মাঝে ব্যাথাটা থাকত না, অন্য সময় অসহ্য ব্যথা হত। তাঁর পুত্রবধূরা অবশ্য এই আঘাতের ব্যাপারটা মোটেই বিশ্বাস করতেন না, বলতেন ওটা তাঁর ছেলেদের তাঁবে রাখার কৌশল। আমার কিন্তু মনে হয়েছিল যে, এই আঘাতের গল্পটা আসলে গভীর কোনও যন্ত্রণার প্রকাশ, যা খোলাখুলি বলা যায় না। তাই শরীরের ভাষায় বলতে হয়।

কান্তার গল্পটা আরও নাটকীয়। কান্তা একজন প্রৌঢ়া। মাঝে মাঝেই তাঁর ফিট্ হত। হঠাৎ শরীরটা শক্ত হয়ে আসত আর তিনি মূর্চ্ছা যেতেন। তাঁর স্বামীর একটু মাথার দোষ ছিল। লাহোরের যৌথ পরিবারে থাকার সময় তাতে খুব একটা অসুবিধা হয়নি। স্বামীরা তিন ভাই। তাদের স্ত্রী-সন্তান, তার ওপর শ্বশুর-শাশুড়ি, সব মিলিয়ে কান্তার শ্বশুরবাড়ির অবস্থা বেশ সচ্ছলই ছিল। দেশভাগের দাঙ্গায় এক ভাই মারা যান। বাকিরা অমৃতসরে পালিয়ে আসতে সক্ষম হয়। কিন্তু আর্থিক অবস্থা হয়ে পড়ে সঙ্গিন। মানসিক রোগগ্রস্ত স্বামীকে নিয়ে কান্তা চলে আসতে বাধ্য হলেন দিল্লির এক বস্তিতে। এক দোকানদারের জন্য সেলাইয়ের কাজ করে কান্তার সংসার চলত। স্বামী জি. পি. ও.-র সিঁড়িতে বসে অন্যের চিঠিপত্র লিখে দিয়ে দিনে পাঁচ-দশ টাকা রোজগার করতেন। আত্মীয়েরাও মাঝে-মধ্যে অল্পস্বল্প সাহায্য করত। কারও মৃত্যু ঘটলেই কিন্তু কান্তার ফিটের অসুখ দেখা দিত। শুধু আত্মীয়স্বজন বা বন্ধু-বান্ধবদের মৃত্যুতেই নয়, পাড়ার যে-কেউ মারা গেলেই দেখা যেত, কান্তা উদ্‌ভ্রান্তের মতো কাঁদতে কাঁদতে রাস্তায় বেরিয়ে পড়েছেন। তার পরেই ফিট্। পাড়া-পড়শির মৃত্যুতে মেয়েদের সমবেত বিলাপ অবশ্য সম্পূর্ণ প্রথাগত। তাই সেদিক দিয়ে দেখলে কান্তার আচরণ এমন কিছু অদ্ভুত নয়। কিন্তু অন্য মহিলারা কান্তার এই কান্নাকাটির ব্যাপারটাকে বাড়াবাড়ি বলেই মনে করতেন। বলতেন, নিজে এত কষ্ট পেয়েছে বলেই সে ওরকম করে।

কান্তার কাহিনীর আঁরও একটা দিক আছে। দেশান্তরের অভিজ্ঞতার ভয়াবহতা বোধ হয় সব চেয়ে বেশি আঘাত করে তাদেরই, পরিবারের ভেতর যাদের নিরাপত্তা কিছুটা

কম। এর ফলে সাধারণভাবেই পুরুষদের তুলনায় মেয়েদের ওপর এইসব ঘটনার প্রতিক্রিয়া ভিন্ন। কান্তার ক্ষেত্রে তার ওপর আরও জটিলতা এসে জড়ো হয়েছে। নতুন পরিবেশের সঙ্গে বোঝাপড়া করার দায়িত্ব প্রায় সম্পূর্ণই এসে পড়েছিল তাঁর একার ঘাড়ে। অসুস্থতার জন্য কান্তার স্বামীর যৌথ পরিবারের মধ্যে কোনও ক্ষমতা ছিল না। ঠিক সেই রকম, বাপের বা শ্বশুরবাড়ির ওপর নির্ভরশীল অল্পবয়সী বিধবা মেয়েদের ক্ষেত্রেও এই একই জটিলতা দেখা যায়। এই রকম এক বিধবার গল্প দিয়ে এই লেখাটা শেষ করব।

বিপন্নতা

ধরা যাক এঁর নাম আশা। আমার সঙ্গে যখন দেখা হয় তখন আশার বয়স পঞ্চান্ন। ১৯৪১ সালে আশার যখন কুড়ি বছর বয়স, তখন স্বামী টাইফয়েডে মারা যান। যৌথ পরিবারে ভাইদের মধ্যে স্বামীই ছিলেন সব চেয়ে ছোট। মা মারা যাওয়ার পর দাদারাই তাঁকে মানুষ করেন, ফলে দাদাদের সঙ্গে স্বামীর সম্পর্ক খুব ঘনিষ্ঠ ছিল। স্বামী মারা যাওয়ার পর আশা শ্বশুরবাড়িতেই থেকে যান। ভাশুর-জায়েরা তাঁকে সাহায্য করতে কার্পণ্য করেননি। আশার ছেলেপুলে ছিল না। ছোট ননদ তাঁর নিজের ছেলেকে আশাকে দিয়ে দেন পোষ্য হিসেবে। ছেলে অবশ্য তার নিজের মায়ের কাছেই থেকে যায়। সকলেই ধরে নেয়, বড় হলে এই ছেলেই আশার ভরণপোষণের দায়িত্ব নেবে। এরকম ব্যবস্থা যৌথ পরিবারে প্রায়ই ঘটত।

এইভাবে দেশভাগ হওয়া পর্যন্ত আশা শ্বশুরবাড়িতেই বাস করছিলেন। বাপের বাড়ি ছিল জলন্ধরে। এপারে চলে আসার পর সেখানেই আশ্রয় নিতে পারতেন আশা। বিশেষ করে যখন শ্বশুরবাড়ির লোকেরা একেবারে নিঃস্ব অবস্থায় লাহোর ছেড়ে চলে আসতে বাধ্য হয়। আশা তাঁর 'পালিত' পুত্রের সঙ্গে কিছুদিন বাপের বাড়িতেই রইলেন। কিন্তু পারিবারিক জটিলতা ক্রমে অসহনীয় হয়ে উঠল। যে-কোনও ঝামেলাতেই দোষ এসে পড়ত আশার ওপর। এমনকি শ্বশুরবাড়ির লোকেরা তাঁকে তাঁর স্বামীর মৃত্যুর জন্যও দায়ী করতে লাগল। 'ওঁরা বলত, আমি যথেষ্ট সুন্দর নই বলে নাকি আমার স্বামীর বেঁচে থাকার ইচ্ছেটাই চলে গিয়েছিল। সে খুব সুপুরুষ ছিল, আর আমি একেবারেই সাদামাটা। কথাটা শুনতে আমার এত খারাপ লাগত যে মাঝেমাঝে ভাবতাম আত্মহত্যা করব।'

চার বছর ধরে আশা একবার বাপের বাড়ি, একবার ননদের বাড়ি, এইভাবে চালাতে লাগলেন।

> সবখানেই আমি সংসারের কাজে সাহায্য করার চেষ্টা করতাম। সকাল থেকে রাত পর্যন্ত কাজকর্মে লেগে থাকতাম। বাচ্চাগুলোকে আমি খুব ভালবাসতাম, তাই কোনও কষ্ট হত না। কিন্তু সকলেই আমায় ঠেস দিয়ে কথা বলত। ব্যাপারটা একেবারে অসহ্য হয়ে উঠল যখন বড় নন্দাই আমার দিকে নজর দিতে শুরু করলেন। (বড় ননদ দাঙ্গায় মারা গিয়েছিলেন।) একদিকে মৃত স্বামীর প্রতি বিশ্বস্ত থাকতে চাইতাম। বড় ননদকেও খুব ভালবাসতাম। কিন্তু নতুন একটা সম্পর্ক হতে পারে,

এটাও আমাকে আকৃষ্ট করত। কি করা উচিত, বুঝতে পারতাম না। আমাকে নিয়েই যেন সকলের টানাটানি। নন্দাই কখনো বিয়ের কথা বলেননি। এতদিন এক বাড়িতে আছি, সে ভয়ানক লজ্জার ব্যাপার হত। আমার স্বামীর এক বন্ধু থাকতেন পুনায়। শেষ পর্যন্ত তাঁকেই চিঠি লিখলাম। তিনি আমায় পুনায় এসে কিছুদিন থাকতে বললেন। পুনায় যাওয়ার পর তিনি আমায় খুব বোঝালেন। বললেন, 'গোটা জীবনটাই পড়ে রয়েছে তোমার সামনে। এভাবে সব সময় অপমানিত হয়ে থাকবে কেন? আবার বিয়ে করো।' পুনার এক ভদ্রলোক ওঁর বন্ধু ছিলেন। ধনী লোক। ওঁর স্ত্রী তাঁকে ছেড়ে চলে গিয়েছিলেন। তাঁর সঙ্গে আমার বিয়ের সম্বন্ধ হল। বাপের বাড়ি আর শ্বশুরবাড়িতে লিখলাম বিয়ের কথা। তুমুল গোলমাল বেঁধে গেল। ওঁরা বললেন, আর আমার মুখদর্শন করবেন না। আমি গোটা পরিবারের ইজ্জত ধুলোয় মিশিয়ে দিয়েছি। ঠিকই বলেছিলেন ওঁরা। কলঙ্ক তো বটেই। ওঁরা আমায় কত ভালবাসতেন। তারপর ওঁদেরই যখন বিপদ এল, তখন আমি পালিয়ে গিয়ে ওঁদের বংশে কালি দিলাম। সমাজে আর ওঁরা মুখ দেখাতে পারবেন না। কিন্তু আমিই বা কি করব বলুন? আমার কোনও উপায় ছিল না।

তীব্র সংকটের মধ্যে পড়লেন আশা, বিয়ে করার চার বছরের মধ্যে তাঁর দুটি সন্তান হল। কিন্তু পুরনো শ্বশুরবাড়ির সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করতে পারলেন না। এদিকে নতুন স্বামীরও তাঁর প্রাক্তন স্ত্রী-র সঙ্গে সম্পর্ক বজায় রইল। আগের স্ত্রী মাঝে মাঝেই চলে আসতেন। বোঝাতে চাইতেন যে সম্পত্তির ওপর তাঁর ছেলেমেয়ের দাবি অটুট রয়েছে। একটি ছেলে এ-বাড়িতে এসেই থাকতে শুরু করল। আশার সঙ্গে একাধিক সাক্ষাৎকারের পর আমার মনে হয়েছিল আশা নিজেও নিজেকে খানিকটা তাঁর স্বামীর রক্ষিতা হিসেবেই ভাবতেন, স্ত্রী হিসেবে নয়। আগের পক্ষের স্ত্রী যখন আসতেন, তখন তাঁর কেমন লাগত জিজ্ঞেস করাতে আশা একটু আশ্চর্য হয়েই আমায় বললেন, 'কেন? ওর তো আসার অধিকারই ছিল।'

ব্রাহ্মণ্যধর্মে বৈবাহিক সম্পর্কের যে গভীর ধর্মীয় ভিত্তি আছে, এটা হয়তো তারই প্রতিফলন। কিন্তু যেটা লক্ষণীয়, সেটা হল প্রাক্তন স্বামীর পরিবারের সঙ্গে আশার সম্পর্ক। পুনর্বার বিবাহের পর আশা খুব সহজেই আগের সম্পর্কগুলো মুছে ফেলতে পারতেন। তা না করে সম্পর্ক বজায় রাখার জন্য প্রাণপাত চেষ্টা চালিয়ে গেলেন তিনি। দ্বিতীয়বার বিয়ে করার পরেও ছোট ননদের সঙ্গে তাঁর চিঠির আদানপ্রদান ছিল। যে নন্দাই একসময় তাঁকে নানারকম প্রস্তাব দিতেন, তিনি অবশ্য আশার চরিত্র সম্বন্ধে সব চেয়ে বেশি কুৎসা রটিয়েছিলেন। কিন্তু ছোট ননদ একটা মিটমাট করার চেষ্টা করে যেতে লাগলেন। অবশেষে আট বছর পর ছোট ননদ একদিন পুনায় আশার কাছে এলেন।

আগের পক্ষের শ্বশুরবাড়ির সঙ্গে সম্পর্ক টিঁকিয়ে রাখার এত কি প্রয়োজন ছিল? আশার বক্তব্য, তাঁর ছোট ননদের প্রতি ভালবাসার জন্যই তিনি এত সচেষ্ট ছিলেন যাতে একটা কোনও সম্পর্ক বজায় থাকে।

'আমার যখন বিয়ে হয়, এই ননদটি তখন খুব ছোট। সে সবসময় আমার সঙ্গেই

> থাকত। নানারকম খেলা তৈরি করেছিল আমার সঙ্গে। আমরা একজন আর একজনের দুপাট্টা পরতাম। এক থালায় খেতাম। সে এক গ্রাস আমার মুখে পুরে দিত, আমি এক গ্রাস ওর মুখে দিতাম। অন্যেরা আমাদের দেখে হাসত। খুব মজা হত।...আমার স্বামীর সঙ্গে তো খুব একটা বেশি দিন থাকতে পারিনি। ফুল ফুটতে না ফুটতেই যেন ডাল থেকে পেড়ে নিল কে। আমার শখ-আহ্লাদ ছিল অনেক। অন্য সময়, অন্য অবস্থায় সে সব মিটত নিশ্চয়ই। কিন্তু এটা নিশ্চিত জানতাম, ওই বাড়ির সঙ্গে সম্পর্কটা আমায় রাখতেই হবে।'

দ্বিতীয় বিয়ের তাৎপর্যটা তাহলে কি? আপাতদৃষ্টিতে সে বিয়েটা তো সুখের। সুন্দর দুটি মেয়ে হয়েছে আশার। তাদের নিয়েই থাকেন সবসময়।

> হ্যাঁ, খুব সুখে আছি। এরকম স্বামী পাওয়া আমার সৌভাগ্য। উনি আমায় কোনও কষ্ট দেননি। আমিও যথাসাধ্য ওঁর যত্ন করি। কিন্তু দ্বিতীয় বিয়েটা তো করতে হল এই পোড়া শরীরটার জন্য। তার তাড়নাগুলো তো আমি সামলাতে পারি না। শুধু আমার নিজের তাড়নাই নয়, পুরুষেরা যখন আমার দিকে তাকাত, আমার তো তখন কিছু করার থাকত না। ওরা তো আমায় দেখত না, আমার এই শরীরটাকে দেখত। নন্দাই যদি আমার দিকে নজর না দিতেন, আমি হয়তো শুদ্ধ হয়েই থাকতে পারতাম, বিধবার যেমন থাকা উচিত। কিন্তু ওই ঘটনার পর আমার ননদের সামনে আর দাঁড়াতাম কি করে? পরলোকে স্বামীর সামনেই বা দাঁড়াতাম কি করে? এখনকার স্বামীর সঙ্গে তো সাময়িক বোঝাপড়া। সমুদ্রে ঝড় উঠলে দু-টুকরো কাঠে যেমন হঠাৎ ঠোকাঠুকি লেগে যায় আর পরক্ষণেই আলাদা আলাদা ভেসে চলে যায়, সেই রকম। ওনার সঙ্গে সব দেওয়ানেওয়া এ-জন্মেই চুকিয়ে ফেলতে হবে। তা হলে আর আমার কোনও দুঃখ থাকবে না। ওনার তো আর একজন স্ত্রী আছে। ঈশ্বরের চোখে সেই ওঁর পাশে থাকবে। আমি তো পাপী।

মনে হতে পারে তাঁর মৃত স্বামীর প্রতি আশার একটা গভীর টান আছে। কথা বলতে গিয়ে কিন্তু দেখেছি, স্বামীর চরিত্রটা তাঁর কাছে খুবই ধোঁয়াটে। একবার যেমন বললেন, স্বামীর সঙ্গে ওঁর কয়েকটা পুরনো ফটোগ্রাফ আছে। 'সেগুলো দেখলে মনে হয় অচেনা দুটো লোক।' ওঁর কথাবার্তায় ননদেরাই অনেক বেশি জীবন্ত চরিত্র হিসেবে উপস্থিত হত। বিশেষ করে ছোট ননদ যে পরিবারের আপত্তি সত্ত্বেও শেষ পর্যন্ত একটা সম্পর্ক টিঁকিয়ে রাখতে সক্ষম হয়েছিল। মনজিতের ক্ষেত্রে যেমন দাদা, ঠিক তেমনি আশার ক্ষেত্রে তাঁর নন্দাই—যাকে রক্ষক হিসেবে ভেবেছিলেন, তার দিক থেকেই যখন আক্রমণটা এল, আশার পরিচিত জগৎটা খানখান হয়ে গেল। বর্তমানের সঙ্গে অতীতের সম্পর্কটা জোড়া লাগল শেষ পর্যন্ত অন্য মেয়েদের সাহায্যে। আশা কিন্তু মেয়েদের এই স্বতন্ত্র সামাজিকতার শক্তি সম্বন্ধে সচেতন ভাবে কিছু বলতে পারেননি। প্রচলিত স্ত্রী-পুরুষ সম্পর্কের মধ্যে দিয়েই তাঁর জীবনকাহিনী বোঝাবার চেষ্টা করেছেন।

অনুবাদ: পার্থ চট্টোপাধ্যায়

কথকতার নানা কথা

গৌতম ভদ্র

১ কথকের জন্ম: পাঠ থেকে 'কথা'

বাংলাদেশে উনিশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে কথকদের বোলবোলা ছিল বলেই মনে হয়। *সুরধুনী* কাব্যে গঙ্গা-প্রবাহের যাত্রাপথের সঙ্গে সঙ্গে দীনবন্ধু মিত্র বিখ্যাত জায়গা ও তাদের খ্যাতির কারণ বলছেন। তাঁর মতে, বাঁশবেড়িয়া (বংশবাটি) বা ভাটপাড়ার খ্যাতির পিছনে আছেন শ্রীধর কথক বা রামধন 'কথকরতন'।[১] অপরপক্ষে তর্কযুদ্ধে অবতীর্ণ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর প্রতিপক্ষদের জব্দ করতে কৃষ্ণহরি শিরোমণি নামে কথক চূড়ামণি সম্পর্কে চালু লোকগল্পকে মোক্ষম অস্ত্র হিসাবে ব্যবহার করেছিলেন।[২] গৌড়দেশ-খ্যাত কথকদের জন্ম ও কৃতি এই সময়কালে আবদ্ধ।

'বাগ্‌জীবন' বা কথোপজীবীরা মানুষজনকে আনন্দ দিয়ে দুই পয়সা কামাই করে এবং সেইজন্য কর দিতে তারা বাধ্য, কৌটিল্য সেইদিকে সজাগ দৃষ্টি কতকাল আগেই রেখেছিলেন।[৩] তবে উনিশ শতকে প্রচলিত দেশজ রীতিতে পুথি তৈরি করে পৌরাণিক আখ্যান বলার চল অষ্টাদশ শতকের আগে চালু ছিল বলে মনে হয় না।[৪] উনিশ শতকের প্রারম্ভে ওয়ার্ড সাহেবের বর্ণনায় স্পষ্ট যে, সকালে মূল গ্রন্থ পাঠ বা পারায়ণ হত। বিকেলে সাধারণের জন্য বাংলায় মূল গ্রন্থের অনুবাদ ও ব্যাখা করতেন যাঁরা 'কথক' বলা হত তাঁদেরই।[৫] সংস্কৃত ও বাংলা, দুই ভাষার দুই গোত্রের পড়ুয়া: পাঠক ও কথক। ঊনবিংশ শতকের গোড়াতে জয়নারায়ণ ঘোষাল তাঁর 'করুণা নিধান বিলাসে' (১৮১১) পাঁচালি, রামায়ণ, তরজা ইত্যাদি অবসর বিনোদনের নানা অনুষ্ঠানের তালিকাতেও কথকতাকে স্থান দিয়েছিলেন।[৬]

লোকগ্রাহ্য জনশ্রুতি অনুসারে প্রতিযোগিতার চাপে ভাগবত চিত্তাকর্ষক করতে বাঁকুড়ার সোনামুখীর গদাধর শিরোমণি বঙ্গদেশে কথকতার ঢঙ চালু করেন। অন্ততপক্ষে বাংলা সাহিত্যের আদি ইতিহাসের চটি বইগুলিতে এই কথা বার বার লেখা হয়েছে।

> বৈকালে শিরোমণি মহাশয় বেদীতে বসিয়া ভাগবতের কোন কোন স্থান ব্যাখ্যা করিতেন। তিনি উত্তম ব্যাখ্যাতা ছিলেন। অন্যান্য স্থানে তাঁহার ব্যাখ্যা শুনিতে বিস্তর লোক উপস্থিত হইত। কিন্তু ঐ স্থানে অধিক শ্রোতা আসিতেচে না দেখিয়া শিরোমণি মহাশয় তাঁহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। শুনিলেন, নিকটে একস্থানে রামায়ণ গান হইতেছে। শিরোমণি মহাশয় বলিলেন 'আচ্ছা, সকলকে বলিবে কল্য হইতে আমার

> নিকট ভাগবত গান শুনিতে পাইবে'। তিনি যেমন সুপণ্ডিত তেমনি গায়ক ও কবি ছিলেন। রাত্রিতে পরদিনের ব্যাখ্যেয় অংশকে তাঁহার স্বকপোল উদ্ভাবিত কথকতার রীতিতে পরিণত করিয়া রাখিলেন। পরদিন বৈকালে নতুনরীতির কথকতা আরম্ভ করিলেন; চারিদিক হইতে লোক ভাঙ্গিয়া পড়িল। তাঁহার স্বরসংযোগ, বাক্যবিন্যাস, ব্যাখ্যা ও সঙ্গীত পদাবলী শুনিয়া লোকে বিস্মিত ও মোহিত হইল। এইরূপে শিরোমণি মহাশয় প্রতিদিন ধ্রুবচরিত্র, প্রহ্লাদচরিত্র, দক্ষযজ্ঞ, বামনভিক্ষা প্রভৃতি শ্রীমদ্ভাগবতের অংশ সকল ব্যাখ্যা করিতে লাগিলেন। ইহাই কথকতার প্রথম সৃষ্টি।

প্রচলিত এই কাহিনীর সত্য-মিথ্যা নিরূপণ করা শক্ত। কিন্তু গ্রন্থ পাঠের ব্যাখ্যাংশ গীত ও গল্প সংযোগে পুনর্কথনই যে কথকতা এই ধারণা স্পষ্ট। গ্রন্থের পাঠ এই প্রক্রিয়ায় রূপান্তরিত হচ্ছে। ওয়ার্ডের সাক্ষ্যও অনুরূপ ধারণাকে সমর্থন করে। পরে দেখব পুথির প্রকরণ বিচারও একই ধরনের সিদ্ধান্তের অনুযায়ী। নির্দিষ্ট স্থান ও পাত্র নিয়ে অবশ্য বিতর্কের সুযোগ থেকে যাবে। স্থানমাহাত্ম্যের ক্ষেত্রে স্মর্তব্য যে পশ্চিমবঙ্গে আজও পেশাদার কথকদের অন্যতম প্রবীণের বাসস্থান হল বাঁকুড়ার সোনামুখি।

উনিশ শতকের প্রথমার্ধের নামকরা কথক শ্রীধর ও রামধন শিরোমণি। তাঁদের জীবনীর তথ্য বিচার করলে কথক তৈরি হবার একটা ছক পাওয়া যায়। জীবনীগুলি মৃত্যুর পর লিখিত, পারিবারিক আত্মীয়দের কাছ থেকে সরেজমিন তদন্তে সংগৃহীত। ব্যক্তি বিশেষে তথ্যের হেরফের হতে পারে কিন্তু উনিশ শতকের আদর্শ কথক চরিত্র গড়ে তোলার ক্ষেত্রে সংগৃহীত সাক্ষ্যগুলির ঐতিহাসিক তাৎপর্য অনস্বীকার্য।

১২২৩ সনে বাঁশবেড়িয়াতে এক পণ্ডিত বংশে শ্রীধরের জন্ম। বংশে কথকতা বা ভাগবত পাঠের ধারা ছিল। পিতা রতনকৃষ্ণ শিরোমণি সংস্কৃত চর্চা করতেন। তবে পিতামহ লালচাঁদ শিরোমণি ছিলেন কথক। ছেলেবেলা থেকে শ্রীধর ভাগবত পাঠে দীক্ষা পেয়েছিলেন হুগলির মালিপাড়া গ্রামের রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশের কাছে। শ্রীধরের ভ্রাতুষ্পুত্র অতুলচরণ ভট্টাচার্যও কথকতাকে পেশা হিসাবে নিয়েছিলেন। অতএব পরম্পরা ছিল, বংশের আবহাওয়ায় শ্রীধর শিক্ষিত হয়েছিলেন। কিন্তু এই পাঠের ঘরানায় শ্রীধর পাঁচালি গানে মেতে উঠলেন। ঘরানার প্রতিভূ জ্যেষ্ঠতাত জীবনকৃষ্ণ শিরোমণি আদৌ তা পছন্দ করলেন না। বিবাদ দেখা দিল। বহরমপুরে শ্রীধর ব্যবসায়ে দু-পয়সা উপার্জনের চেষ্টা করলেন। সেইখানেই তিনি কথক কালীচরণ ভট্টাচার্যের কাছে তালিম নিলেন। তালিম প্রধানত অভিনয়ের, মুখভঙ্গিমার। জীবনীকারের ভাষায়:

> কথকতা নাট্য ভাবরসাদির অভিব্যক্তি। কোন অবস্থায় মানুষের কিভাব হইয়া থাকে, কথকতার অঙ্গভঙ্গে বা বাক্যরঙ্গে তাহা বিকশিত করিতে হয়। কথকতা শিক্ষার কালে শ্রীধর কখনো কোন বালকের ও তখনকার সেভাব তুলিয়া লইতেন। আবার কখন বা বৃদ্ধের দন্তহীন মুখের কথার ভাব গ্রহণের জন্য কোন বৃদ্ধের সঙ্গে কথা কহিয়া, নির্নিমেষে তাঁহার রসনার গতিপ্রকৃতি পুঙ্খানুপুঙ্খ পর্যালোচনা করিতেন। সর্ববিধি

ভাবাভিব্যক্তির বিকাশ সাধনায় তাহার এমনই সাধনা ছিল। তাই তিনি আদর্শ কথক হইয়াছিলেন।[৮]

বর্ণনায় পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে, শ্রীধর কথকতার রীতিতে ভাবাভিনয় যোগ করেন, সুরতালে গীত বসান। পাঠ্য কাহিনীর চরিত্রানুযায়ী অভিব্যক্তি ফুটিয়ে তোলায় তিনি দক্ষ ছিলেন। নানা বিষয়ে গান লিখেছিলেন। দারুণ জনপ্রিয় হয়েছিল তাঁর গান, নানা লোকের নামে গানগুলো চলে আসে। কথকতার জন্য বিশেষভাবে পদাবলীও লেখেন। আদর্শ কথক গান গাইবেন ও অভিব্যক্তি অনুযায়ী করবেন, তা প্রত্যাশিত। পাঠ থেকে উনিশ শতকীয় কথকতার রূপান্তরের দুটি সূত্র এইভাবে পরিস্ফুট হল।

শ্রীশচন্দ্র বিদ্যারত্নের পিতা রামধনের জীবনী প্রসঙ্গে আমরা আর একটু বেশি খবর পাই। উনিশ শতকের প্রথমার্ধে তাঁর জন্ম, চব্বিশ পরগণার বারাসত মহকুমায় অবস্থিত খাঁটুরার লব্ধপ্রতিষ্ঠ বড় বাড়িতে রামপ্রাণ বিদ্যাবাচস্পতির তৃতীয় পুত্র রামধন তর্কবাগীশ। রামচন্দ্র ন্যায়বাচস্পতির টোলে কৃতী ছাত্র ছিলেন রামধন। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাদের আয়ুর্বেদ শাস্ত্রে বেশ পসার হয়েছিল অথচ রামধনের অবস্থা অনুরূপ ছিল না। শিক্ষক রামরুদ্রের পরামর্শে সুকণ্ঠী ও পণ্ডিত রামধন কথকতাকে পেশা হিসাবে বেছে নেন, কারণ 'ইহাতে বিলক্ষণ দুই পয়সা উপার্জনের সম্ভাবনা আছে।' পণ্ডিতবংশে তিনিই প্রথম কথক কারণ জ্যেষ্ঠ রামরতন সুকণ্ঠী ও বাগ্মী হওয়া সত্ত্বেও কথকতাকে পেশা হিসাবে গ্রহণ করেননি।

কথকতার রীতিতে রামধনও পরিবর্তনের কথা ভেবেছিলেন। ১৮ বছর বয়স থেকে পেশায় নামবার কথা তাঁর মাথায় ঢুকেছিল। কিন্তু প্রতিযোগিতা জোরদার, কৃষ্ণহরি ও গদাধরের রীতিকে টেক্কা দিতে হবে, শুধু মিষ্টি গলার জোরে পার পাওয়া যাবে না। প্রথমে তিনি ভাগবতীয় পণ্ডিতের কাছে পুরাণাদি পাঠ করে ভাগবতের গল্পকে নিজে সাজান এবং নিজস্ব বর্ণনা বা সাট বা চুর্ণী তৈরি করেন। কথকতার রীতিতে আখ্যানের টানে অনুপ্রাসবহুল বর্ণনার টুকরো টুকরো ছক জুড়ে দিলেন।

এরপরে তিনি সঙ্গীতে পারদর্শী চাকদ্বীপের (চাকদহ) নিকটবর্তী নারায়ণপুর গ্রামের পতিত ব্রাহ্মণ ভ্রাতৃদ্বয় রাম-শ্যামের সঙ্গে পরামর্শ করেন ও তাঁদের মতামত চান এবং তাঁরা 'রামধনের স্বরচিত ভাগবত ও চূর্ণিকা শুনিয়া মোহিত হইল'।

তাঁদের উপদেশ মতো রামধন কথকতার রীতিতে দ্বিতীয় অভিযোজন করলেন। শিমুলিয়ার কাঁসারিপাড়ার রাধানাথ দত্তের আনুকূল্যে একজন হিন্দুস্তানি গায়কের কাছে দুই বৎসর সঙ্গীত শিক্ষা করেন ও রাগ-রাগিনীসহ কথকতার আখ্যানে 'মহাজনী পদাবলী' যুক্ত করেন। এটা রামধনের 'প্রণালী' যাকে উনিশ শতকের মধ্যবর্তী সময়ে 'অদ্ভুত সৃষ্টি' বলা হয়েছিল। মনে হয় যে ভাগবত থেকে কথকতার জন্য নির্দিষ্ট আখ্যান বাছা ও লেখা এবং সেই কাহিনীর মাঝে মাঝে পরিস্থিতি অনুযায়ী নির্দিষ্ট গানের বিন্যাসের রীতি রামধনের হাতে পূর্ণ পরিণতি লাভ করেছিল। রামধনের কথকতার এই ধারা তাঁদের পরিবারের কেউ কেউ অনুসরণ করেছিলেন। লোকশ্রুতি অনুসারে কথকতায় উমাকান্তের সহজাত ক্ষমতা ছিল। কিন্তু মাত্র ৩৫ বৎসর বয়সে তাঁর মৃত্যু হয়। ভ্রাতুষ্পুত্র ধরণীধর শিরোমণি (১৮১৩-১৮৭৫) কথকতা করতেন। ধরণীধরের পসারের

সীমা ছিল না, লক্ষাধিক টাকা আয় করেছিলেন, বর্ধমান রাজসভার কথক ছিলেন তিনি। আবার বঙ্কিমচন্দ্রের বাবা যাদব চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের বাড়িতেও তিনি ডাক পেতেন। ধরণীধরের গলা সুরেলা ও পাঠে দক্ষতা ছিল অসাধারণ কিন্তু 'বিদ্যাসাধ্য' সেরকম ছিল না, নিষ্ঠাও পিতৃব্যতুল্য নয়। নতুনত্বের জন্য রামধনের পদাবলী বা সাট নানা লোকে ব্যবহার করত। কিন্তু ধরণীধরের রচনায় সেইরকম কোনও অভিনবত্ব ছিল না। চরিত্রদোষও নাকি ছিল। কিন্তু কথকতার অতুলনীয় গলাতেই তিনি আসর মাত করতেন। হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর স্মৃতিতে সেই ছবি ধরা পড়েছে।

> ধরণী কথক মহাশয় খুব ভালো কথা কহিতেন তাঁহার সুমিষ্ট অথচ গম্ভীর উচ্চ স্বরে প্রথম হইতেই আসর গম গম করিত। কিন্তু তিনি যখন হাঁ করিয়া গালের কাছে হাত আনিয়া ধরিতেন, তখন সমস্ত লোক মুগ্ধ হইয়া যাইত। আমরা তখন গানের কি বুঝি? কিন্তু এখনো সে সুর কানে লাগিয়ে আছে।[১০]

চূর্ণী বা সাট তৈরি, গান রচনায় দক্ষতা ইত্যাদি নানা প্রকরণে রামধনী রীতি ও শৈলী গড়ে ওঠে।

ধরণীধর শিষ্য-প্রশিষ্য সৃষ্টি করেন। ঝোঁক ভাগবতী কাহিনীতে। অপরপক্ষে রাঢ় অঞ্চলে গদাধরী রীতি চালু ছিল। জোর দেওয়া হয়েছিল রামায়ণী কথকতায়। অন্যান্য অঞ্চলেও কথকতার নিজস্ব রীতি গড়ে উঠেছিল। যেমন কথকতার শিক্ষকরূপে উদ্ধব চূড়ামণির নামডাক ছিল। হাওড়ার বাগনান বা হুগলির ধনিয়াখালিতে তাঁর জন্ম হয়। হাটখোলার ভৈরবচন্দ্র বিদ্যালঙ্কারের টোলে তিনি পড়েন এবং পণ্ডিত রঘুনাথ শিরোমণির কাছে পাঠের শিক্ষা নেন। চন্দননগরে রঘুনাথ শিরোমণির টোল ছিল। প্রথম জীবনে রঘুনাথ গুপ্তিয়াতে ও বরানগরে ব্যাকরণ পড়াতেন। পরে গোন্দলপাড়া নিবাসী গোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের মাতার আগ্রহে চন্দননগরে বাস করতে শুরু করেন। দক্ষিণেশ্বরে তাঁর কথকতার আসর বসত। উদ্ধব চূড়ামণি তাঁর শ্রেষ্ঠ ছাত্র। এই উদ্ধব ঠাকুরেরই ছাত্র মহানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়। ১৩২০ সালে উদ্ধবের মৃত্যু হয়। রঘুনাথ শিরোমণির পুত্র রামনাথ চট্টোপাধ্যায়ও যশস্বী কথক ছিলেন। ১৩৩১ সালে তিনি জীবিত, চন্দননগরে বাস করেছেন এবং হুগলির অগ্রগণ্য কথক। সঙ্গে সঙ্গে টপ্পা গেয়েও তিনি আসর জমাতেন।[১১]

পূর্ববঙ্গের কথকদের মধ্যে কৃষ্ণকান্ত পাঠকের বেশ নামডাক ছিল। ১২২৮ বঙ্গাব্দে ফরিদপুর জেলার কাসাভোগে তাঁর জন্ম ও ১২৯৮ বঙ্গাব্দে মৃত্যু হয়। ৭০ বৎসর বয়স পর্যন্ত তিনি গান তৈরি করেছিলেন ও দাপটে গান গাইতেন। ঢাকা জেলার বিক্রমপুর ফুরশাইল বা ফুল্লশালী গ্রামের কালাচাঁদ বিদ্যালঙ্কারের খ্যাতি ছিল অভিনব আখ্যান ও শ্লোক ব্যাখ্যায়। ভাগবতের কাহিনীর তাক লাগানো ব্যাখ্যা করতেন তিনি। অঞ্চলে 'কিশোরী ভজন' সম্প্রদায়ও তিনি প্রতিষ্ঠা করেন, ভক্তরা তাঁর নিজস্ব পাঠ ও ব্যাখ্যাকে মান্য করত। উনিশ শতকে কথক হিসাবে ধর্মসম্প্রদায় তৈরি করার কৃতিত্ব তাঁর।[১২]

কথকদের রাজত্বে পুরুষদেরই আধিপত্য ছিল। দ্বারকানাথের আমলে ঠাকুরবাড়িতে নিয়মিত এক জন বৈষ্ণব ঠাকুরানি আসতেন। এ প্রসঙ্গে স্বর্ণকুমারী দেবীর সাক্ষ্য:

> সংস্কৃত বিদ্যায় ইহার যথেষ্ট ব্যুৎপত্তি ছিল অতএব বাঙ্গালা ভাল জানিতেন ইহা বলা বাহুল্য। উপরন্তু ইহার চমৎকার বর্ণনাশক্তি ছিল, কথকতা-ক্ষমতায় ইনি সকলকে মোহিত করিতেন। যাঁহাদের বিদ্যালাভের ইচ্ছা নাও বা থাকিত, তাঁহারও বৈষ্ণবী ঠাকুরাণীর দেবদেবী বর্ণনা, প্রভাত বর্ণনা, শুনিতে কুতূহলী হইয়া পাঠগৃহে সমাগত হইতেন।[১৩]

বৈষ্ণবী ঠাকুরানি অন্তঃপুরে বৈঠকী কথকতা করতেন। বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী ও বিপিন পালের লেখা থেকে জানা যায় যে বৃন্দাবনে একজন বাঙালি মহিলা আসরে ভাগবত পাঠ করতেন। তাঁর ব্যাখ্যা ও পাঠ শুনতে জনসমাগমও হত। বিংশ শতকের গোড়ায় হাওড়ার আমতা অঞ্চলের রামচন্দ্রপুর গ্রামে কলকাতা থেকে একজন পেশাদার গায়িকা এসে কয়েকদিন ধরে ভাগবত পাঠ করেছিলেন।[১৪] কিন্তু পুরুষ কথকদের নাম জানলেও মহিলা কথক ও পাঠকদের নাম ধাম কোনও কিছুই জানা যায় না। সভায় পেশাদার মহিলা কথক হিসাবে এই শতকে চন্দননগরের ক্ষান্তিলতা দেবীই বোধ হয় প্রথম। পরে কোন্নগরের বাসন্তী দেবী, কৃষ্ণা বকসী প্রমুখ বিদূষী মহিলারা আসরে পাঠ ও কথকতা করে সুনাম অর্জন করেছেন। কথকতায় পরিবার ও পরম্পরার কথা ঘুরে ফিরে আসছে। দেখা যায় যে কথকতার রবরবার যুগে কথকতার শিক্ষক হিসাবে কয়েকজন নাম করেছেন। অধিকাংশই ব্রাহ্মণ, পরন্তু কথকতা বৈষ্ণবদের একচেটিয়া। শাক্ত সাধনার ধারায় পেশাদার কথক হিসাবে কাউকে দেখা যাচ্ছে না।[১৫] ডাকসাইটে কথকদের সবাই পণ্ডিত, সংস্কৃতে কিছু না কিছু অধিকার সকলেরই আছে। তবে সংখ্যায় অল্প হলেও কিন্তু অন্য ধরনের কিছু কথকেরও উল্লেখ পাওয়া যায়। অষ্টাদশ শতকে মেদিনীপুরের হরিহরপুর গ্রামে ভরদ্বাজ গোত্রের দে বংশীয় কায়স্থ ছিলেন দুঃখী শ্যামদাস। সংস্কৃত জানতেন না। ভাগবতের পাঠ শুনে নিজেই পাঠ ও গাইবার উদ্দেশ্যে *গোবিন্দ মঙ্গল* কাব্য লেখেন এবং সেই গ্রন্থটি তার পরিবারে পূজিত হয়। পাঠক ও গায়ক হিসাবে তাঁরা গুরুবংশ, অধিকারী পদে সম্বোধিত। শিষ্যরা প্রায়শই নিম্নবর্ণের। গ্রামে গ্রামে ঘুরে গ্রন্থ পাঠ করা শ্যামদাসের (আমৃত্যু ১৭৮৩) জীবিকা ছিল; গেয় গ্রন্থে আখ্যান তাঁরই সৃষ্টি।[১৬]

আধুনিককালে শান্তিনিকেতনের ভুবনডাঙা নিবাসী অবনী অধিকারী অনুরূপ আরেকটি চরিত্র। জাতে শূদ্র, আদি নিবাস বীরভূমের থানা মেজিয়া, গ্রাম রাইডিহি। পূর্বপুরুষ রামদুর্লভ অধিকারী ও মাঘা রাম অধিকারী রামায়ণ গান গাইতেন, নিজেদের দল ছিল। তিনি নিজে পড়েছেন অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত। পরে গানের দলে পাচকের কাজ করেন, সঙ্গে সঙ্গে বাজনা বাজাতে শিখলেন। দাদা কানাই অধিকারী প্রধান গুরু, তাঁর কাছ থেকে পালা তৈরি করার কায়দা অবনী আয়ত্ত করেন।[১৭] শ্যামদাস ভাগবতী গাইতেন। অবনী গান রামায়ণী।

কিন্তু শ্যামদাস বা অবনীর পরম্পরাতেও পরিবারগত শিক্ষানবিশির চিহ্ন আছে। অবশ্য একক প্রচেষ্টাতে কথক হয়ে ওঠার নিদর্শন পাওয়া যায়। শিবপুরের লব্ধপ্রতিষ্ঠ মুন্সেফ বসন্তকুমার পাল-এর বিশেষ পরিচিত ছিলেন রানাঘাটের মাঝের গ্রামের বাসিন্দা উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য। গলা খুব ভাল, গান গাইতেন। হাইকোর্টের অবসরপ্রাপ্ত জজ

রমেশবাবু [সেনের?] আনুকূল্যে তার ভাই পাখোয়াজবাদক কেশববাবুর কাছে সংগীতে কিছুটা শিক্ষা নেন। পরে কথকতা করাটাই পেশা হিসাবে বেছে নেন। রমেশবাবুর সুপারিশে প্রেসিডেন্সি কলেজের নীলমণি পণ্ডিতের কাছে কিছুটা সংস্কৃতও শেখেন। ভাল কথক হবার অন্যতম প্রাকশর্ত ভাল সংস্কৃত জানা। ১৮৯৫ সন নাগাদ ঢাকায় তিনি বসন্তবাবুর পরিবারে আশ্রয় নেন এবং নতুন পেশায় হাতে-কলমে নেমে পড়েন। ঢাকার উকিল ঈশ্বরচন্দ্র ঘোষ দুর্ঘটনায় বিপর্যস্ত, তাঁদের বাড়িতেই আসর বসানোর বন্দোবস্ত হল। বসন্তবাবুর তত্ত্বাবধানে ও উৎসাহে উপেন্দ্রনাথ কথক হিসাবে জীবন শুরু করলেন।[১৮]

> সংস্কৃতে খুব বড় পণ্ডিত না হোলেও গলাটি ছিল অতি মধুর, তাই যত সময়োচিত গান বেশী হয়, তার জন্যে আমি তাঁকে অনুরোধ করি, কারণ তাহাতেই লোক বেশী আকৃষ্ট হবে।
>
> আমি তখন বেকার বসে থাকি—সমস্ত দুপুরবেলা কথক মহাশয়ের রিহারসেল দেওয়া—কথকতার মহলা শুনতাম, আর যেখানে পরিবর্তন করলে ভাল মনে লাগত তা তাঁকে বলে দিতাম। সন্ধ্যা থেকে আরম্ভ হয়ে ৩/৪ ঘণ্টা পাঠ হতো সহরের গণ্যমান প্রায় সকলেই আসতেন, স্বামীজীও এসে বসতেন। চির প্রথামত দুই চারটি সংস্কৃত পদাবলী না গাইলে নয়, প্রচুর বাংলা গান, অমনকি আধুনিক গানও সময়মত লাগিয়ে দিতেন তাতে সকলের আরো মনোরঞ্জন করতেন। এক মাস সেখানে কথকতা হয়েছিল সকলেই বেশ খুশি হয়েছিলেন ব্রাহ্মণের প্রাপ্তিও আশাতীত হয়।

উপেনী কথকতা স্পষ্টতই পরম্পরা বহির্ভূত, রামধনী বা গদাধরের রীতির সঙ্গে বড় একটা মিল নেই। কিন্তু জমাটি গানের জোরে তাঁর বেশ পসার হয়েছিল। বর্ধমান রাজবাড়িতেও 'বাঁধা বেদি' পেয়েছিলেন। ১৯১৪ সালে অসুখে তাঁর কণ্ঠস্বর নষ্ট হয়, কথকতার পেশাও তিনি আর করতে পারেন না। উনিশ শতকের শেষে উপেনী কথকতার ঢঙ ঐতিহ্যানুসারী রীতি তরলীকরণের নিদর্শন। এই রীতির বিরুদ্ধে এই সময় প্রতিক্রিয়া দেখা যায়।[১৯] কথকতা ও পাঠের ধারায় তৃতীয় প্রতিসরণ আসে। যদি গদাধর প্রথম এবং রামধন ও শ্রীধর দ্বিতীয় প্রতিসরণের জনক হন, তবে তৃতীয় রীতির উদ্ভাবক হলেন প্রভুপাদ অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী (১৮৬৬-১৯৪৪) ও তাঁর শিষ্য-প্রশিষ্যরা। প্রথমত, উনিশ শতকের শেষভাগ থেকে গৌড়ীয় বৈষ্ণব সমাজে একটি সংগঠিত আন্দোলন শুরু হয়। নিখুঁত সম্পাদনাসহ বৈষ্ণব গ্রন্থ মুদ্রণ, বিধিবদ্ধ নিময় প্রবর্তন ইত্যাদি পরিকল্পনার মাধ্যমে প্রভুপাদ অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী নানা স্থানে 'হরিসভা' প্রতিষ্ঠিত করতে লাগলেন ও শ্রীপাটগুলোকে পুনরুজ্জীবিত করতে যত্নবান হলেন। ভাগবত পাঠ ও কাহিনী বর্ণনা, বৈষ্ণব মহোৎসবের আয়োজন করা ইত্যাদি হরিসভাগুলির নিত্যকর্ম ছিল।

গ্রন্থাগার স্থাপন করাও শুরু হল। অন্যত্র নানা বৈষ্ণব 'উপসম্প্রদায়ের' উপর আক্রমণ চলল, গৌড়ীয় বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের মতানুগ 'নিষ্কলুষ' 'শাস্ত্রসম্মত' ব্যাখ্যার জন্য গোস্বামীরা একজোট হলেন, হাত মেলালেন বিমানবিহারী মজুমদারের মতো সুপণ্ডিত।[২০] এই প্রেক্ষাপটে গৌড়ীয় সম্মিলনীর (১৪ বৈশাখ, ১৩৩৮ সন) উদ্যোগে প্রচলিত কথকতা ও

পাঠ-রীতিকে সংশোধিত করার কথাও ভাবা হয়। দীনেশচন্দ্র সেনের সহযোগিতায় প্রভুপাদ অতুলকৃষ্ণ কীর্তন ও কথকতাকে বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠক্রমের অন্তর্গতও করতে চেয়েছিলেন; পরীক্ষা নেবার ও ডিগ্রি দেবার কথা ভেবেছিলেন।[১১]

দ্বিতীয়ত, এই আন্দোলনে পাশ্চাত্য শিক্ষিত পণ্ডিতরা অংশ নিলেন। টোলে পড়া সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতদের জায়গায় এলেন বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষিত, অধ্যাপনা পেশায় নিযুক্ত ব্যক্তিরা। ঢাকার প্রভুপাদ প্রাণকিশোর গোস্বামী (১৮৯৯-১৯৮০) এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ। পূর্ব বাংলার মফস্বলে বৈষ্ণবধর্ম প্রচারের মাধ্যম হিসাবে পাঠ ও কথকতাকে তিনি ব্যবহার করেন। কৃতী ছাত্র অধ্যাপকরূপে তখন ননী ঠাকুরের নামডাক ছিল।[১২] পাশ্চাত্য প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষায় শিক্ষিত কথক ও পাঠকদের ধারা বৈষ্ণব সম্মিলনী আন্দোলনের সময় থেকে শুরু হয়। আধুনিককালে অধ্যাপিকা বাসন্তী চৌধুরী এই রীতির পদাঙ্কানুসারী।

প্রভুপাদ অতুলকৃষ্ণ গোস্বামীর জন্ম নিত্যানন্দ বংশে। পাঠ ও কথকতার আবহাওয়ায় তিনি মানুষ হয়েছেন। পিতা মহেন্দ্রনাথ গোস্বামী স্বয়ং যশস্বী পাঠক ছিলেন। চাকরি ছেড়ে পাঠকতা তাঁর পেশা হয়। কাঁসারিপাড়ার তারকনাথ প্রামানিকের বাড়িতে কথকতা, পাঠ, কীর্তন লেগেই থাকত এবং সেই বাড়িতে অতুলকৃষ্ণের নিত্য যাতায়াত ছিল। কিন্তু নীলকান্ত গোস্বামীর ব্যাখ্যাই তাঁকে অভিভূত করত। ঘটনাচক্রে পাটনার বাঁকিপুরে মথুরবর্মনের বাড়িতে তাঁকে একটি অনুষ্ঠানে ব্যাসাসনে বসতে হয় ও স্মৃতির উপরে নির্ভর করে 'ধর্ম্মঃ প্রোজ্ঝিত' (ভাগবত, ১ম স্কন্ধ, ১ম অধ্যায়) শ্লোকের ব্যাখ্যা নীলকান্ত গোস্বামীর অনুসরণে প্রদান করেন। 'পুঁজির ভিতর একটি মাত্র শ্লোক।' তবুও সেই দিনের প্রশংসা ও বাহবা যুবক অতুলকৃষ্ণকে পাঠক হিসাবে আবির্ভূত হতে প্রণোদিত করে। ডাকও আসতে লাগল, কারণ 'গোঁসাইয়ের ছেলে, ভাগবত জানে না, এ কখন হতে পারে!' নানা অন্য খেয়ালে অতুলকৃষ্ণ ছেলেবেলায় মত্ত ছিলেন। গুরু বংশের এই দায়িত্বে তাঁর, সেই অর্থে, শিক্ষা ছিল না, জানতেন মাত্র একটি শ্লোকই। তাই দিয়ে কতদিন চালানো যায়! কিন্তু অবস্থা বেগতিক। এ প্রসঙ্গে অতুলকৃষ্ণের নিজের জবানি শোনা যাক:

> মনসাতলাগলির ৮ নং দর্প নারায়ণ ঠাকুরের ষ্ট্রীট। গয়া প্রসাদ মল্লিক বাবার শিষ্য। তাঁহার স্ত্রীর ইচ্ছা হইল—নিয়মসেবার সময় একটু করিয়া ভাগবত শুনেন। আমাকে অনুরোধ করায় রাজি হইলাম। দশম স্কন্ধ পাঠ আরম্ভ হইল। পাঠের শেষে তাঁহারা একটু ব্যাখ্যা শুনিবার আবদার করিলেন। তাহাও পূর্ণ করিতে হইল। সারাদিন হাড়ভাঙা পরিশ্রম করিয়া ব্যাখ্যার উপকরণ সংগ্রহ করিতে লাগিলাম। রাত্রে নীলকান্ত গোস্বামী মহাশয়ের ব্যাখ্যা এখানে ওখানে শুনিয়া বেড়াইতে ও বেদান্ত আলোচনা করিতে লাগিলাম। আমার ব্যাখ্যা সকলের পছন্দসই হইতে লাগিল। কিছু টাকাও পাইতে লাগিলাম। উৎসাহ খুব বাড়িয়া যাইতে লাগিল। এইরূপে আমি ক্রমশ এক জন ব্যাখ্যাতা হইয়া পড়িলাম।[১৩]

ছেলেবেলায় বখাটে ছেলে অতুলকৃষ্ণ ধীরে ধীরে বংশগত পেশায় ফিরে এলেন।

ভূদেব কবিরত্নের অনুরোধে ও যোগেন্দ্রনাথ কবিরাজ প্রমুখ পণ্ডিতদের উপস্থিতিতে ১৩০১ সনে অতুলকৃষ্ণ রামকানাই অধিকারীর ঠাকুরবাড়িতে হরিসভার সাংবাৎসরিক উৎসবে 'যমলার্জুন ভঞ্জন' ব্যাখ্যা করলেন, শিষ্যবাড়ির আঙিনা ছাড়িয়ে এতদিনে সভাসমিতিতে অতুলকৃষ্ণ তাঁর স্বীকৃতি পেলেন, নিজস্ব রীতিও উদ্ভব করলেন। প্রচলিত পাঠ ও কথকতার রীতি থেকে তা ভিন্ন। হরিসভা আন্দোলন গড়ে ওঠার সময় ঢাকা জেলার বুধনী গ্রামের প্রাণগোপাল গোস্বামী তাঁর সহযোগী হন। অতুলকৃষ্ণের তালিমে সতেজ কণ্ঠের অধিকারী প্রাণগোপাল হরিসভাব আসরে পাঠের এই রীতিকে প্রতিষ্ঠিত করায় সচেষ্ট হলেন। প্রাণকিশোর প্রাচীনের সঙ্গে নতুন ও প্রচলিত রীতির সুন্দর তুলনা টেনে লিখেছেন:

> সেই প্রাচীন কথকরা দিনের পর দিন ভাগবতীয় প্রসঙ্গ লইয়া কথকতা করিতেন। এই কথকতার রীতি ব্যাখ্যা-রীতি হইতে সম্পূর্ণ পৃথক ধরনের। কথকেরা গান গাহিতেন, অঙ্গভঙ্গি করিতেন, *অযথা* প্রায়শঃ রসিকতার অবতারণা করিতেন, পুরাণকথা অবলম্বন করিয়া *বিচিত্র উপন্যাস সৃষ্টি করিতেন*, শুধু তাহাই নয় এক পুরাণের কথায় বহু পুরাণের কথা ও দৃষ্টান্ত উপস্থাপিত করিয়া কখনও বা ভাষার ছটায় কখনও বা গুরু গৌরবকণ্ঠের গাম্ভীর্যে পুরাণ কথাকে একটি অভিনয়ের পর্যায়ে নিয়া ফেলিতেন। *গীতিনাট্যের মত এই কথকতা* আগাগোড়া *ধারাবাহিক সঙ্গীতের মতই মনে হইত*। কথকগণের কথকতায় নানা রাগ-রাগিনীর আলাপ হইত—কখনও কখনও বা প্রাণগলানো কীর্তন আবার কখনও বা হাসির ফোয়ারা ছুটিত শ্রোতৃবৃন্দের মহলে। প্রাণগোপাল প্রভু পাঠ আরম্ভ করিলেন *পূর্বাচার্যগণের* ব্যাখ্যা টীকার মাধুর্য পরিবেশন রীতিকে অবলম্বন করিয়া। শ্রীরূপসনাতন শ্রীজীব ভাগবতের ব্যাখ্যায় যে সিদ্ধান্ত সম্পুটিত করিয়াছেন, শ্রীপাদ বিশ্বনাথ যে রসবিন্যাস পরিপাটী দেখাইয়াছেন, সেই সকল বিষয় হইল প্রাণগোপালের পাঠের মূল উপাদান। এই অভিনব রীতি প্রদর্শনে শ্রোতাদের চমক লাগিল, ভাবুকের ভাব উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল, ভক্তের প্রাণ গলিয়া গেল আর সর্বসাধারণের মনে ভাগবতের মহিমা প্রসারলাভ করিল দ্রুতগতিতে।[২৪]

প্রাণকিশোরও এই রীতিভুক্ত। কথকতার আদর্শ সম্পর্কে তাঁর নিজস্ব বক্তব্য:

> যে যত আবোলতাবোল বলতে পারবে সেই-ই তত ভালো কথক হে।...এখন ছাপা বই থেকে কিছু টুকে নিলে আর নিজের মনোমত কতগুলো গান ছড়া, রচনায় একটু রঙ্গরস জমাতে পারলেই হল। কাজেই গান আর গল্পই হয় কথকতার প্রধানতম অঙ্গ। যথার্থ শাস্ত্র তাৎপর্য, সে পড়ে থাকে অনেকটা পশ্চাতে। যারা নিছক শাস্ত্র কথা নিয়ে এ বাজারে নামবে তাদের জমায়েত ঘটাতে একটু বেগ পেতেই হবে।[২৫]

আসলে অতুলকৃষ্ণ, প্রাণগোপাল ও প্রাণকিশোর ফিরতে চেয়েছিলেন তত্ত্বসমালোচনায়। কথকতার দুটি মেরু আছে, শ্রোতাদের চিত্ত বিনোদন এবং ভাব ও তত্ত্বের ব্যাখ্যা। লোক মনোরঞ্জনের জন্য কথার সুকুমার বিন্যাস কথকরা করতেন। কিন্তু উনিশ শতকের প্রান্তে সংস্কারবাদী ভাগবতী পণ্ডিতদের মনে হল যে এই বিন্যাসে তত্ত্ব

হারিয়ে যাচ্ছে। কথকতাটা তো কাব্য নয়; তার উদ্দেশ্য ধর্মপ্রচার, শুকদেব পরীক্ষিৎকে যেভাবে পরকালের পথ চিনিয়েছিলেন। তাঁরা গদ্য বিন্যাসকে মেনে নিলেন, টীকা অনুমোদিত পাঠে নিজেদের বিন্যাস আনলেন। সংস্কৃত ভাষাকে পরিহার করে টুকরো টুকরো ছোট বাক্যে কথা সাজালেন। কিন্তু উদ্দেশ্য কথকতার বিন্যাসকে তত্ত্ব আলোচনার কাঠামোয় আনা। উদাহরণ দেওয়া হল কোনও গভীর তত্ত্বের অনুষঙ্গে, গল্পও বলা হল সেই প্রসঙ্গে। গল্পের অনুষঙ্গে তত্ত্ব এল না। প্রাণকিশোর ঘরোয়া ধরনের সংলাপে তত্ত্ব ব্যাখ্যা করার রীতি নিলেন, জীবের ব্রহ্মসাযুজ্য দেখাতে গিয়ে বললেন:

'তেল সলতে যতক্ষণ আছে, প্রদীপও জ্বলিতেছে। কামকামনা আছে। জীব একযোনি হতে অন্য যোনিতে চলিতেছে। তেল সলতে গেল, প্রদীপ নির্বাপিত।'[২৬]

পাঠের এই রীতি বরানগরের পাঠবাড়ির কেদারনাথ রায় কাব্যপুরাণ-ব্যাকরণতীর্থও নিয়েছিলেন। তাঁর ভাষণ বিন্যাস চিরাচরিত আখ্যান অনুযায়ী নয়, বরং তত্ত্ব অনুযায়ী, সমস্যা অনুযায়ী। যেমন—গুরুতত্ত্ব, জীবস্বরূপ ইত্যাদি। সমস্যা তোলা হয়েছে, ভাগবতে ভক্ত চরিতের প্রবেশ কেন? উত্তর দিতে লৌকিক উদাহরণ টানা হল:

> চিকিৎসক যখন রোগী দেখেন, তখন রোগ সম্পূর্ণ না হলে শক্ত জিনিশ খেতে দেন না। তরল জিনিশ খাইয়ে রাখেন, ক্ষুধা বাড়লে ধীরে ধীরে শক্ত জিনিশ খেতে দেন। শিশু ভুমিষ্ঠ হলেই তার অন্নপ্রাশন হয় না। ছ মাস দুধ খাইয়ে অন্ন হজমের পাকস্থলী তৈরী করা হয়। তারপর অন্নভক্ষণ। তেমনি করেই শুকদেব পরীক্ষিতের কৃষ্ণতৃষ্ণা জাগাবার জন্য ভক্তচরিত বলেছেন।[২৭]

এই পাঠেও বক্তার নিজস্ব বিন্যাস আছে, ক্রম তিনিও অনুসরণ করেছেন। কিন্তু স্বর গীতি বা নাটিকার প্রবন্ধে গ্রন্থনা নেই, বরং তত্ত্ব প্রচারের বন্ধনে আবদ্ধ।

আসলে পাঠক ও কথকের মধ্যে, তত্ত্ব বিন্যাস ও গল্পের দাবির মধ্যে টানাটানি, কামড়াকামড়ি আছে। রামধনের জীবনের দুটি প্রচলিত কাহিনীতে এই টানাপোড়েন সুস্পষ্ট। পাঠক বা পণ্ডিতরা যে জনপ্রিয় কথকদের সবসময় খুব পাত্তা দিতেন, তা নয়। প্রচলিত লোক কাহিনী অনুসারে রামধনের জীবনে এই রকম অভিজ্ঞতা বার বার হয়েছে। উনিশ শতকের ধনিয়াখালি ছিল পাঠক ও কথকদের বড় আড্ডা। এক সভায় এক দিন রামধন বেদিতে বসে ভাগবত ব্যাখ্যা করার ইচ্ছা প্রকাশ করলে 'পাঠক মহাশয় প্রত্যাখ্যান করিয়া বলিলেন যে কথকতা করাই কথকের কর্তব্য; কথক কর্তৃক ভাগবত ব্যাখ্যা করিবার প্রয়োজন নাই'। সে দিনের শাস্ত্র আলোচনায় পরাস্ত রামধন কাশীতে বেদ ও বেদান্ত অধ্যয়ন করে তাঁর জ্ঞানের খামতি পূর্ণ করেন। আবার আর একবার রামধনের কথকতা শুনে ভট্টপল্লীবাসী পণ্ডিতগণ 'রামধন লেখাপড়ায় জল দিয়াছেন বলিয়া ব্যঙ্গ করেন।' প্রত্যুত্তরে রামধন সংস্কৃতে আলোচনা শুরু করেন। পুরুষরা তুষ্ট হলেও মেয়েরা এক বর্ণ কিছু বুঝল না। 'তখন রামধন পুনরায় সাধুভাষায় কথা কহিয়া ভট্টপল্লীবাসিনী বামাগণকে পরিতৃপ্ত করিয়া স্বকীয় বাসভবনে প্রত্যাগত হইলেন।'[২৮]

কথকতা আখ্যানমূলক। কথাকাহিনী ও সঙ্গীতে বিধৃত পাঠে এই সব থাকতে পারে কিন্তু তা বিধিমার্গে আবদ্ধ, তত্ত্ব আলোচনা ও সমস্যা নিরসন পাঠকের উদ্দেশ্য। পাঠ

একটি ওজনে বাঁধা, সেখানে হালকা হবার জো নেই। কথকতা এবং পাঠে নিজস্ব বিন্যাস বিংশ শতকে সবাই করেন কিন্তু স্বর ও কাঠামোতে থেকে যায় বেশ কিছু ফারাক। প্রকরণ বিচারের সময় এই শাস্ত্রে আবার ফিরে আসব।

২ কথকতার পেশা: পোষ্টা ও প্রণামী

কীর্তন বা রামায়ণী গানের দল থাকে, কথক বা পাঠক একাই অনুষ্ঠান জমান। কিন্তু দুটোই পেশা, দুটোর জন্য প্রতিযোগিতা আছে, দুটোর পোষ্টা দরকার। সমাজের অবয়বে রদবদলের সঙ্গে সঙ্গে পোষ্টাও বদলে যায়। জমিদার পরিবাররা কথকদের অন্যতম পৃষ্ঠপোষক ছিল। কিছু কিছু জমিদারিরবাড়ির বাঁধা কথক ও পাঠক থাকত। বিক্রমপুরের তেলিরবাগের ভূঁইঞারা যখন বসতি স্থাপন করেছিলেন তখন 'বৃত্তি' বা চাকরান জমি দিয়ে গ্রামে লোক বসিয়েছিলেন—যেমন, নাপিত, ধোপা, ভূঁইমালি ইত্যাদি। এদের সঙ্গে নিয়ে আসা হয়েছিল সংস্কৃতজ্ঞ গোলকচন্দ্র চক্রবর্তীকে। বাবুদের বাড়িতে কথকতা ও পাঠ করা তাঁর কাজ। গ্রামে তাঁর ভিটাকে সবাই পাঠবাড়ি বলত। রামকৃষ্ণ পরমহংসের কাছে বরানগর থেকে আসতেন যুবক নারায়ণদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, কথকতা ছিল তাঁর পেশা। সেই সূত্রে বেলঘরিয়ার জয়নারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁকে দেবোত্তর জমি দেন এবং বরানগরের কুঠিঘাটে তাঁর বসতবাটি সেই ভূখণ্ডের উপরে আজও আছে।[২৯] হুগলির রাধানগরের জমিদার *তীর্থভ্রমণ* প্রণেতা যদুনাথ সর্বাধিকারীর প্রত্যেকদিন সান্ধ্য আসরে নিয়মিত হাজিরা দিতেন গ্রামের পাঠক ও কথক গোপাল চূড়ামণি। প্রত্যেকদিন অনেক রাত্রি পর্যন্ত ভাগবতের পাঠ হত। কিন্তু কার্তিক মাসে বিশেষ উৎসব উপলক্ষে গোঁসাই মালপাড়া গ্রাম থেকে একজন গোস্বামী আসতেন। ঠাকুর দালানে সমস্ত কার্তিক মাস ধরে সকালে ভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা এবং অপরাহ্নে কথকতা হত। জমিদার বাড়িতে এই সময় পাঠ করার জন্য তাঁর আসর বাঁধা থাকত।[৩০] কথা ব্যবসায়ী হিসাবে ঢাকা জেলার সাভার নিবাসী ভারতচন্দ্র রায় ত্রিপুরার রাজসভায় নিয়োজিত ছিলেন। তার মাসিক বেতন ছিল ৬০্। তবে দীনেশচন্দ্র সেনের বর্ণনা থেকে মনে হয় যে ভারতচন্দ্র ঠিক কথক নয়, গল্প বলিয়ে ছিলেন।[৩১] লক্ষ করার বিষয়, ছেলের গানের খ্যাতির খবর শোভাবাজারের রাজবাড়িতে অনুষ্ঠিত এক কথকতার আসরে নিধুবাবুর মা শুনেছিলেন।[৩২] নানা উপলক্ষে এই রকম আসর বসত। শ্রাদ্ধ ইত্যাদি দশকর্মাদিও উপলক্ষ হতে পারত, তীর্থভ্রমণ সমাপ্তি শেষেও গিন্নিমা আসর বসাতে পারতেন। আবার ব্রত উদযাপন সংকল্পে ও পারিবারিক বিপর্যয়ে মনে শান্তি পাবার জন্য কথকদের ডাকা হত। কথকরা আসতেন। দোল, রাস ইত্যাদি বাৎসরিক উৎসবেও কথকদের ডাক পড়ত। তবে পুরাণ পাঠ ও কথকতার নাকি উৎকৃষ্ট সময় ছিল অন্তর্জলি যাত্রা। মৃত্যুর প্রাকমুহূর্তে শুকদেব পরীক্ষিৎকে ভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা করে শুনিয়েছিলেন। তাই কৃষ্ণমোহন শিরোমণি বা কৃষ্ণহরি কথক গঙ্গাতটে ওইরকম কথকতার আসরে দানগ্রহণ পর্যন্ত করতেন না।[৩৩]

সময়মাফিক আসর নানা রকম হতে পারত: বৈঠকী আসর, একদিনের কথা বা মাসাধিক পাঠ। আয়োজন বা দক্ষিণাও সেই অনুযায়ী হত। কথকদের অবশ্য আসর

পাবার জন্য চুক্তি করতে হত, চুক্তির খেলাপ হলে আসর হাত ছাড়া হবার সম্ভাবনা ছিল। তাই 'দেহকৃৎ ঠাকুরকে' (পিতাকে) বীরভূমের সেবক ঈশ্বরচন্দ্র দেবশর্মা লিখছেন—

> সাঁখপুর হইতে মনুয্য আসিতেছে ৪ রোজ জৈষ্ঠ না জয়া হইলে জবাব হইবে দ্বিতীয় কথক আসিবে অতএব ৩ রোজ জৈষ্ঠ সাঁখপুরে মোকাম জাইতে হইবেক জানিবেন...পুনুছ নিবেদন কুনুক মোতে ওজর না হয় তাহা করিবেন সে স্থানেতে দিন দুয় কথা কহিয়ে আসিবেন য়ধিক কি লিখিব। [৫৪]

জমিদার ছাড়াও গ্রামে উঠতি সম্পন্ন গৃহস্থরা কথকদের বেশ বড় পৃষ্ঠপোষক ছিল। উনিশ শতকে নানা জাতি সমাজে মর্যাদা লাভে সচেষ্ট হয়েছিল। উন্নতিকামী 'নবশাখ' গোষ্ঠীরা বৈষ্ণব ধর্ম গ্রহণ করেছিল। নানা উপলক্ষে তাঁরা কথকতার আসর বসাতেন। এই পরিস্থিতিতে রামধন তর্কবাগীশ কথকতার পেশায় ঢুকে পড়ার সুযোগ পান। খাঁটুরার সিদ্ধিরাম রক্ষিত জাতে তাম্বুলি, দালালির কাজে বেশ কিছু উপার্জন করেন। পাঁচ টাকা বায়না নিয়েও শেষপর্যন্ত গদাধর শিরোমণি তাঁর বাড়িতে কথকতা করতে অস্বীকার করেন। শেষ মুহূর্তে কৃষ্ণহরিকে ধরে আনা হয়, রামধনকে কথকতার ধারক হিসাবে নিযুক্ত করা হয়।[৫৫] তারাশঙ্করের লাভপুর গ্রামে ব্যবসায়ীরা কথকতার আসর দিতেন।[৫৬] কানুঠাকুরের বংশধর নদীয়ার ভাজনঘাটের কৃষ্ণকমল গোস্বামীর প্রধান পৃষ্ঠপোষক তো ছিলেন সুবর্ণ বণিক সম্প্রদায়। ঢাকা নিবাসী মদনমোহন পোদ্দার সাহাদের নেতা, তিনি ঢাকাতে কৃষ্ণকমলের থাকার প্রথম বন্দোবস্ত করেন। সুবর্ণ বণিকদের আনুকূল্যে তিনি 'পৌরাণিক বৃত্তি' অবলম্বন করে জীবিকা নির্বাহ করেন। এই ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের যোগাযোগ সূত্রে কলকাতাতেও তাঁর ডাক আসে, ঢাকা নিবাসী ব্যবসায়ীগণের যত্নে তিনি বড় বাজারে কথকতা করেন। আবার সেই আসরে উপস্থিতির সূত্রে টালিগঞ্জে রামদিয়াবাসী কুণ্ডুদের আড়তবাটিতে তিনি পাঠের আমন্ত্রণ পান। এক আসর থেকে অন্য আসরে যাবার যোগাযোগ হয়। সেখান থেকে খিদিরপুর নিবাসী কায়স্থ নীলরতন সরকারের ভবনে এক সপ্তাহ ধরে তাঁর পাঠ ও কথকতা চলে।[৫৭] ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের নিজস্ব যোগাযোগ, আসরে উপস্থিত ভক্ত শ্রোতাদের আগ্রহ এবং নিজ বাড়িতে কথকতার আয়োজন করবার ইচ্ছা, এইগুলি ছিল কথকদের পসার বৃদ্ধি হবার সূত্র। ক্ষান্তিলতা দেবীও এইভাবে আসরে মুগ্ধ শ্রোতাদের কাছ থেকে নিত্যনতুন জায়গায় বলতে যাবার আমন্ত্রণ পেতেন। একটা আসরে ভাল পাঠ করা হয়ে ওঠে অন্য আসরে বসবার অন্যতম শর্ত।

পরবর্তীকালে বারোয়ারি পূজা অনুষ্ঠানে কথকদের ডাক পড়ত। প্রথম মহাযুদ্ধের পরে হাওড়ার ব্যাঁটরার কদমতলার বারোয়ারি দুর্গাপুজোর সময় কথকতা হত। বারোয়ারি থেকে কথককে প্রত্যেকদিন পারিশ্রমিক দেওয়া হত।[৫৮] একবার মহানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়ও গ্রামের বারোয়ারিতলায় 'তরণীসেন বধ' কথকতা করেছিলেন।[৫৯] উনিশ শতকের শেষে ও বিংশ শতকের গোড়ায় স্থাপিত হরিসভাগুলিতে কথকরা প্রায়ই অনুষ্ঠানের আমন্ত্রণ পেতেন। ১৯২৮ সালে বেহালা হরিভক্তি প্রদায়িনী সভার ৭৬তম

সাংবাৎসরিক উৎসব দুর্গাচরণ সাংখ্যতীর্থ, প্রমথনাথ তর্কভূষণ প্রমুখ পণ্ডিতদের গুরুগম্ভীর বক্তৃতার শেষে কথকতার অনুষ্ঠান রাখা হয়েছিল। তখন, 'শেষে আড়িয়াদহ নিবাসী প্রসিদ্ধ কথক শ্রীযুক্ত নেপালচন্দ্র ভাগবত রত্ন মহাশয় উঠিয়া সরস বাগবিন্যাসে সমাগত জনগণের চিত্ত বিনোদন করেন।' নানা কথক এই সব হরিসভায় আসতেন। খিদিরপুরের ক্ষীরোদচন্দ্র মুখোপাধ্যায় বা কথক গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য কোনও কোনও বৎসরে নিযুক্ত হতেন। আবার কোনও বছর উল্লেখ পাওয়া যায় যে বিশ্বেশ্বর শাস্ত্রী মহাশয় শাস্ত্র ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে দুই মাস কথকতা করেছিলেন। ১৯৬১ সালেও আমরা খবর পাই যে 'চুঁচড়ো নিবাসী সীতা রাম ভাগবতাচার্য আষাঢ় ও শ্রাবণ প্রায় দুই মাস কাল ভাগবতীয় উপাখ্যানগুলি কথকতার মাধ্যমে অতি সুন্দরভাবে সভায় পরিবেশন করিয়াছেন।' হরিসভায় এই সব আসরের পৃষ্ঠপোষক হিসাবে যাঁদের নাম পাচ্ছি তাঁরা সবাই উঠতি গোষ্ঠী, 'আঢ্য, সাহা, কুণ্ডু, নস্কর, শীল, দাশ, কর্ম্মকার' ইত্যাদি। এক বার নীলমণি মান্না কথকতার আসরের জন্য বিশেষ দান হিসাবে পাঁচ টাকা দিয়েছেন।[৪০]

জমিদার বা উঠতি ব্যবসায়ীদের টাকার জোর আছে, সমাজে প্রতিষ্ঠা পাবার ইচ্ছা আছে, তাঁরা শহরে ও গ্রামে কথকতার আসর বসাবেন, কীর্তন গানের বন্দোবস্ত করবেন, যাত্রার দল খুলবেন, এই সব তথ্যে আশ্চর্য হবার কিছু নেই। কিন্তু কথকতা শোনা ও শোনানো পুণ্য লাভের পথ, শুধু শুনতেও ভাল লাগে। কথকতার বোলবোলাওয়ের সময় গ্রামের সাধারণ গৃহস্থ বাড়িরাও এই শিল্পের গুণগ্রাহী ছিল। এই সব আসরের পৃষ্ঠপোষকতা করতে বাড়ির মেয়েরা বেশি করে এগিয়ে আসতেন। প্রসঙ্গক্রমে বীরভূমের হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় স্মৃতি-নির্ভর রচনায় লিখেছেন,

> বেশী দিনের কথা নয়, পঞ্চাশবৎসর পূর্বেও দেখিয়াছি—কথক গ্রামে আসিয়াছেন, কিন্তু একবৎসর পূর্বে গ্রাম হইতে বাহির হইতে পারেন নাই। দক্ষিণা ছিল দিন দুইটি টাকা মাত্র। কখনো একাকী আসিতেন, কখনো সঙ্গে একজন মাত্র সেবক থাকিত। সঙ্গতিপন্ন গৃহস্থ যাহারা তাঁহারাই পাঁচ দিন দশ দিন পনের দিন পর্যন্ত কথক ঠাকুরকে সযত্নে গৃহে রাখিতেন। ব্রাহ্মণেতর জাতি হইলে কোন ব্রাহ্মণবাড়িতে তাঁহার আহার ও বাসের ব্যবস্থা হইত। কখনো বা নিজেদের চণ্ডীমণ্ডপে বা বৈঠকখানায় স্থান দিয়া আহারের ব্যবস্থা করিতেন ব্রাহ্মণগৃহে। *অতিদুঃখিনী শূদ্র বিধবা অন্ততঃ একটা দিনও কথকতা দিতেন।* সন্ধ্যায় গ্রামের কোন দেবস্থানে অথবা গ্রাম্য প্রধানের কিম্বা কোন ভক্তিমান গৃহস্থের চণ্ডীমণ্ডপে কি বিষ্ণুমন্দিরে কথকতা করিতেন।[৪১] (নজরটান আমার)

সময়কালে গ্রামে কথকতার পৃষ্ঠপোষকতার ব্যাপ্তি উদ্ধৃতাংশের ছত্রে ছত্রে ধরা পড়ে। সে রকম কিছু না জুটলে কলকাতা শহরে কথকরা নিজেরাই বসে যেতেন এবং শ্রোতা সমাগমও হত। কথকতার রসজ্ঞ যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি তাঁর একটি অভিজ্ঞতা এইভাবে লিখেছেন,

সাত আট বছর পূর্বে একবার কলিকাতায় কয়েকমাস ছিলাম, বৈকালে গোলদীঘিতে

> বেড়াতে যেতাম। দেখতাম দীঘির দক্ষিণ পাড়ের মণ্ডপে একটি লোক কি বলত, বিশ পঁচিশজন একমনে শুনত। কথক কৃষ্ণবর্ণ, কিঞ্চিৎ স্থূলকায়, চল্লিশ পঁয়াল্লিশ বৎসর বয়স। গা খোলা, উড়ানী কখনও কোলে, কখনও ভূমিতে পড়ত। দক্ষিণবাহু কখনও প্রসারিত, কখনও বক্ষলগ্ন; স্বর কখনও উদাত্ত কখনও অনুদাত্ত হ'ত। লোকটির দেবদত্ত শক্তি ছিল, নইলে এতগুলি লোক প্রত্যহ শুনতে আসত না।[৪২]

বিংশ শতকে যানবাহনের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে কথকের চাহিদা অঞ্চলে আবদ্ধ নেই। আসরের ডাক দূর-দূরান্ত থেকে আসে। প্রয়াত ফেলারাম বন্দ্যোপাধায় 'বাংলা বিহার উড়িষ্যা, অধুনা বাংলাদেশ, আসাম, উত্তরপ্রদেশ' প্রভৃতি এলাকায় রামায়ণী কথকতা করেছেন। অধুনা তাঁর পুত্র দ্বিজরাজ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভৌগোলিক পরিক্রমা একই ধরনের। গত জুন মাসে, (১৯৯৩) এক মাস ধরে উড়িষ্যার ময়ূরভঞ্জের রাজালোকায় শ্রীশচন্দ্র দাসের বাড়িতে দ্বিজবাবু কথকতা করেছেন; সভায় মাইক ছিল, আসরে সহস্রাধিক লোক হত। বাসন্তী দেবী বিদেশেও পাঠ করেন। প্রবাসী বাঙালিরা সাধারণত আসর বসায়। আবার ১৯৯৩ সালের জানুয়ারি মাসে নিউ-আলিপুরের এন-ব্লক-এ রঙিন পোস্টার দেখা যায়। লন্ডননিবাসী বিশ্ববিখ্যাত 'যুবমানস প্রবক্তা' শ্রীকিরীট ভাই কলকাতায় 'সঙ্গীতময় ভাগবত প্রবচনের' অনুষ্ঠান করবেন। প্রচার মাধ্যম ও সময়ের সঙ্গে সবাইকে মানিয়ে নিতে হয়।

১৮৩৪ সালে কার্তিক মাসে বীরভূমে কথকতায় আয় কীরকম হত? বীরভূমে প্রাপ্ত একটি জমাখরচের হিসাবে দেখা যাচ্ছে যে কথকের আয় নিজস্ব এক টাকা এক আনা।[৪৩] উনিশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে পাদ্রি রেভারেন্ড জেমস লং কথকদের স্মৃতিশক্তি ও বলার ক্ষমতায় মুগ্ধ হয়েছিলেন।[৪৪] সেই প্রসঙ্গে জানিয়েছিলেন যে দক্ষ কথকদের কয়েকজন মাসে ৫০০্ আয় করতেন। কোনও কোনও ঋতুতে কেউ কেউ ২০০০ টাকা পর্যন্ত উপার্জন করেছেন। এঁদের মধ্যে দু-একজন কোনও বাড়ির বাঁধা কথক হয়ে থাকতেন। ঘরে জনা পঞ্চাশেক মহিলাকে দৈনিক দুঘণ্টা কথা শোনাবার জন্য কলকাতার এক জন ধনী লোক কথক নিযুক্ত করেছিলেন। কথকতার জনপ্রিয়তা এই সময় তুঙ্গে উঠেছিল। বিংশ শতকের গোড়ায় বাঁকুড়ায় যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধির মা গ্রামে নারায়ণী কথকতার আসর দিয়েছিলেন। তিন ক্রোশ দূর থেকে কথক ঠাকুর শিষ্য নিয়ে এসেছিলেন; ওই অঞ্চলের নামকরা কথক। এক মাস পাঠ চলেছিল, ৩০০্ দক্ষিণা নিয়েছিলেন।[৪৫] ১৩১১-১২ সনে ১৩ ফাল্গুন থেকে বৈশাখ পর্যন্ত কবিরাজপুরে পার্বতীচরণ রায়ের স্ত্রী বগলাসুন্দরী দেবী মহাভারত পাঠ ও কথকতার আসর বসান। পাঠক ছিলেন হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ ও কথক ছিলেন তাঁর কাকা জানকী নাথ শিরোমণি। পাঠ ও কথকতা বাবদ তাঁদের প্রাপ্তি হরিদাসবাবুর হিসাবের খাতা থেকে উদ্ধৃত করা যাক।[৪৬]

পূর্ব সনের ১৭ ফাল্গুন	৫্
৭ চৈত্র	২০্
মোট	২৫্

১১ বৈশাখ লক্ষ্মী বাটি আসিবার কালে তাহার মাং	২৫৲
২ জৈষ্ঠ খুড়া বাটি আসিবার কালে তাহার মাং	২৲
৫ জৈষ্ঠ্য মহাভারতের দক্ষিণাদি	১১০৲
সোনা একভরি সাড়ে ছয় আনা (মুং অং)	৩৪৷৷০
শাল এক জোড়া (মুং অং)	২০৲
গরদ এক থান ঐ	৪৲
চেলির জোড়া ১টা, ,,	৪৲
চেলির সাড়ি ১ খানা ,,	৩৲
কাঁসার বাটি ৭টা (মুং অং)	৩৷৷০
পিতলের ঘটি ৩টা ,,	১৷৷০
কাঁসার থাল ১ খানা ,,	২৷৷০
সূতার কাপড় মোট ,,	২৫৲
সংসারে পিতৃঠাকুরের নিকট দত্ত মোট—	২৫০৲

মাং = মারফত, বাং = বাবদ, মুং অং = মূল অনুমান

আসলে আয় দুই রকমের। কথকতা বা গানের জন্য যজমানের কাছে বরাদ্দ দক্ষিণা ও আসরে পাওয়া প্রণামী। রামায়ণী গান দলবদ্ধ; রামায়ণী কথকতা একক কিন্তু দক্ষিণাদির বন্দোবস্ত একই রকম ছিল। কলকাতার পুরনো এক বাসিন্দা লিখছেন, 'তখন [উনিশ শতকের শেষপাদে] মধ্যবিত্ত গৃহস্থ বা গরীবগুরবো যাদের বাড়িতে একটু উঠান আছে তাঁরাই বাড়ীতে রামায়ণ গান দিতেন।' এর জন্য বন্দোবস্তের নাম ছিল 'মালা নাবানী', অবস্থা বিশেষে তা হতে পারত 'পাঁচ টাকা থেকে পনের টাকা পর্যন্ত।'

> মালা নাবানী ব্যাপারটা হ'ল, কথক ঠাকুর জামাকাপড় ছেড়ে গলায় পৈতে বার করে বেগুনী রংয়ের বেনারসী জোড়, গলায় চাদর, খালি গায়ে বসলেন, যিনি গান দিয়েছেন তিনি এসে কথক ঠাকুরের গলায় এক ছড়া গোড়ে মালা পরিয়ে দিলেন। গান শেষ হলে তার গলা থেকে মালা ছড়াটা খুলে নিয়ে চুক্তি মোতাবেক টাকা দিয়ে দেবেন। কথক ঠাকুর তখন হাতের চামরটা কর্তার মাথায় বার তিনেক ছুঁইয়ে আশীর্বাদ করলেন। শ্রোতারা গান শুনে যে প্যালা কথক ঠাকুরের থালায় দিয়েছেন, সেটা তাঁর উপরি প্রাপ্য। যদি কেউ সিদে দিয়ে থাকেন সেটাও ধর্তব্যের মধ্যে নয়।

এই প্যালা দেওয়া আসরের অপরিহার্য অঙ্গ। প্যালা না দিলে, না নিলে কোনও কথকতার আসর সিদ্ধ হয় না।

অনুপম ভঙ্গিতে বনেদী বাসিন্দাটি লিখেছেন,

> বাড়ীর বিধবা ঠাকুমা বা জ্যাঠাইমারা একখানি চাদর জড়িয়ে দুই একটি নাতি নাতনীর হাত ধরে কথা শুনতে যেতেন। সঙ্গে দুটো এক আনি বা দোয়ানী নিতেন বা দুচারটে পয়সা আঁচলের খুঁটে বেঁধে নিতেন, প্যালা দিতে হবে। 'রামায়ণ গান শুনে মুল্য না দিলে কানে কালা হয়ে যাবে। তিনকাল গিয়ে এককাল ঠেকেছে প্যালা না দিয়ে গান

> শুনে এসে কানে কালা হয়ে নরকে যাবে নাকি?' ছোট উঠান, তার উপর সতরঞ্চি পাতা, ফরসা চাদর দিয়ে মোড়া, শ্রোতারা সব অধিকাংশ ঠাকুমা ও জ্যাঠাইমার দল। গুটি গুটি এসে কথক ঠাকুরের জায়গাটা ফাঁক রেখে, গোল হয়ে বসে গেল।[৪৭]

প্যালা আদায় করার কায়দাও কথকদের জানতে হত। মেহেরপুরের কথক ঠাকুর কালীনাথ ভট্টাচার্য এই কাজে বেশ পোক্ত ছিলেন। যেমন,

> এক কথকতা উপলক্ষে মধ্যে মধ্যে তাঁহার উপরি প্রাপ্তিও মন্দ হত না। সন্ধ্যার পর কথা শেষ হইলে কোনওদিন চিকের অন্তরালস্থিত পুরমহিলাগণকে লক্ষ্য করিয়া বলিতেন, 'মা সকল, কাল রামের বিবাহ, বিবাহে 'নকতা' দিতে হয়,—তা যেন মনে থাকে।' কোন দিন বলিতেন, 'কাল লক্ষ্মণভোজন, সিধা আনিতে ভুলিও না।'—কেহ নূতন কাপড় দিত, কেহ কাঠের বারকোশ পূর্ণ করিয়া সিধা দিত, কেহ নূতন কাঁসার ডিসে নানা মিষ্টান্ন দিত; এতদ্ভিন্ন ডাব, পেঁপে, তরমুজ, সুপক্ক কলা, এবং নানাবিধ তরকারিও তাঁহাকে উপহার দেওয়া হইত।[৪৮]

প্রণামী ও সিধার মাধ্যমে কথকের নানা প্রাপ্তিযোগ হত। আসর জমাতে পারলে লোক আসবে, আয়ত্ত হবে। আসরে প্রাপ্তির আকাঙ্ক্ষা ধরা পড়ে এক কথকের নিজের জবানিতে,

> ...গিন্নীমার একটু আগেই বাড়ী ফিরে যেতে হচ্ছে। তিনিই সবার আগে দাঁড়ালেন সিধের ডালাটি দুহাতে করে। তার ডালার ভেতর চাল ডাল তেল নূন মশল্লা গব্যঘৃত তৈল আলু কুমড়ো সবই আছে। সঙ্গে একখানা ছোট গীতা, একটি পৈতে আর একটি ক্ষুদ্র চামরও রয়েছে দেখা গেল।
> ...কাপড় একখানা, তার সঙ্গে রূপোর টাকা, একটি তামার পয়সা আর একটি সোনার তুলসীপাতা কাগজে মোড়া, এগুলিও ঠাকুরের হাতে দিলেন নন্দর মা। ঠাকুর এগুলি নিজের পাশেই আসনের উপর রেখে দিলেন। বামনভিক্ষার কথা তো পড়ে রইল সেদিনের মত ঐ পর্যন্ত। নন্দী গিন্নীর পর মেয়েমহলে ক্রমশই চঞ্চলতা ঘনিয়ে উঠলো। এক এক মায়েরা সব ডালা থালা চুপরি রেকাব করে সিঁধে নিয়ে এগুতে শুরু করলেন, আর তখন কথকতা চলে? ডাব আর নারিকেল স্তূপীকৃত হতে লাগলো ঐ তুলসী মঞ্চের একপাশে।[৪৯]

সফল কথকের স্বপ্ন এটা। বাস্তবে কাপড় বা সিধে পাওয়া যায় কিন্তু অনেকদিন ধরে কথকতা চললে প্যালার পরিমাণ ৫ পয়সা বা ১০ পয়সা। চালতাবাগানের আসরে দ্বিজবাবুর থালায় ওইভাবেই পাড়ার জ্যাঠাইমা বা মাসিমারা তাঁদের সাধ্যমতো প্যালা দেন। দ্বিজবাবুর হাতে চামর থাকে, তাই বুলিয়ে তিনি তাঁদের আশীর্বাদ করেন, সেটা রীতি। আসরে বাসন্তীদেবীকে যিনি যাই দেন, বাসন্তীদেবী হাসিমুখে তাই নেন। শ্রোতারা ভক্ত, দান তাঁদের শিরোধার্য। সেই দানকে ফিরিয়ে দেওয়া অসম্মানের কাজ, ধর্মবিগর্হিত। এই শোভনতা কথকদের আচরণে প্রত্যাশিত।

জনপ্রিয়তার পট পরিবর্তন: একটি বিতর্ক

উনিশ শতকের শেষভাগ থেকে কথকতার জনপ্রিয়তায় ভাটা দেখা দিচ্ছে। সঞ্জীবচন্দ্র, বঙ্কিমচন্দ্র প্রমুখদের চোখে সেটা ভাল করে ধরা পড়েছে। বিংশ শতকের তৃতীয় দশকে দীনেশচন্দ্র সেন 'কথকতাকে' বাংলা 'লুপ্ত সম্পদ' বলছেন। অধুনা কথকতার ক্ষীণ ধারা দেখা যায়। সোনামুখীর কথক রাজকৃষ্ণ গঙ্গোপাধ্যায় নিজেদের প্রজন্মকে এই পেশার শেষ প্রতিনিধি বলে মনে করেন। দ্বিজবাবুর বংশেও আগামী প্রজন্মে এই পেশা কেউ অবলম্বন করবে না। রাজকৃষ্ণবাবুদের বংশের সবাই কথক; প্রয়াত হেরম্বনাথ গঙ্গোপাধ্যায় ও ফকিরনাথ গঙ্গোপাধ্যায় এই পেশায় নিয়োজিত ছিলেন। তাঁর জ্ঞাতি ভ্রাতা বিশ্বনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ও কথকতা করেন। রাজকৃষ্ণবাবুর বাঁধা আসর আছে, শান্তিনিকেতনেও গৃহস্থবাড়িতে তাঁর আসর বসে। কিন্তু উপার্জন কমেছে। আগে যেখানে জমাটি সময়ে আয় হত আট হাজার, এখন সেখানে আয় দুই হাজারের বেশি হয় না। রাজকৃষ্ণবাবুর কথায় এক বংশানুক্রমিক পেশাদার শিল্পীর আক্ষেপ স্পষ্ট।[৩০]

এই জনপ্রিয়তার হ্রাসবৃদ্ধি প্রসঙ্গে আমেরিকার গবেষকদের কিছু বক্তব্য আছে। মিলটন সিঙ্গারের নির্দেশে ডামলে মহারাষ্ট্রে কতকগুলি হরিকথা পাঠের আসর সমীক্ষা করেছিলেন, কথকদের ও শ্রোতাদের জাতপাত-এর একটা হিসাব তাঁর রচনায় পাওয়া যায়। সাম্প্রতিককালের একটি সুলিখিত প্রবন্ধে ফিলিপ লুটগেনডর্ফ বারাণসী শহরে রামচরিতমানসের পাঠের জনপ্রিয়তাকে ব্যাখ্যা করেছেন উচ্চবর্গের পৃষ্ঠপোষকতার সূত্রে; তাঁর লেখায় পাঠের রীতিবদলও বিশ্লেষণ করা হয়েছে পোষ্টাদের রদবদলের কার্যকারণ সম্পর্কে। এই প্রসঙ্গেই কথকদের চাহিদা ও আয়ের তেজি বা মন্দাভাব আলোচিত হয়েছে। সমাজ 'সংস্কৃতায়নের' নির্দেশক হল রামায়ণ পাঠের জনগ্রাহ্যতা।[৩১]

কথকতা প্রসঙ্গে আমেরিকার পণ্ডিতদের বক্তব্যের সঙ্গে বৈমত্য আছে। সমাজে কিছু লোক সব সময় ওঠে, কিছু লোক সবসময় পড়ে। প্রকৃতপক্ষে, ওঠা-পড়া, পোষ্টাদের খাই, উচ্চবর্ণের সংস্কৃতির অনুবৃত্তি, কোনওটাই নির্দিষ্ট শিল্পের প্রতি সামাজিক আনুকূল্য বা উদাসীনতার 'করণ' হতে পারে না। শিল্পের নিজস্ব ভূমিকা আছে, শ্রোতাদের রুচি ও রসবোধ আছে।

সংস্কৃতায়ন ও পোষ্টাদের সামাজিক বিবর্তনের ছকের বিচারে শিল্পরীতির নিজস্ব সামাজিক ভূমিকা এবং শ্রোতাদের রুচি ও রসবোধের পরিবর্তনের সমস্যা একদম আমল পায় না। গোষ্ঠীর ওঠানামার সমান্তরাল প্রতিফলন বলে বিবেচিত হয় কথকদের পেশার জোয়ার-ভাটা।

উনিশ শতকের প্রাসঙ্গিক সাক্ষ্যগুলি খুঁটিয়ে পড়লে আপত্তির সারবত্তা বোঝা যাবে। লুটগেনডর্ফের গবেষণার অন্যতম প্রতিপাদ্য বিষয় হল—হিন্দি ছাপাখানার আগমন রামায়ণ পাঠের জনপ্রিয়তা বাড়িয়েছে। ছাপাখানা আসার ফলে সুলভ মূল্যে রামায়ণ কাশীর মধ্যবিত্তের হাতে এল, বাড়িতে বাড়িতে রামায়ণ পাঠের দৈনিক আসর বসতে শুরু হল, 'রামায়ণীজী'দের শিক্ষা আরও সহজসাধ্য হল।[৩২] পাঠের জনপ্রিয়তার পেছনে সুলভে বই পাবার চাইতেও বড় প্রশ্ন হল, বারাণসী শহরের মধ্যবিত্তদের পাঠের রুচি, বিষয়ের প্রতি আকর্ষণ। বাজারে চাহিদা আছে বলে সস্তায় বই ছাপা হচ্ছে, উলটোভাবে

শুরু নয়। অনুরূপ অবস্থায় বটতলার ছাপাখানাও সুলভ মূল্যে রামায়ণ ছাপিয়েছিল, হাজারো অন্যরকম ধর্মগ্রন্থও ছাপানো হয়েছিল। আজও সেই ধারা অব্যাহত আছে। কিন্তু তারও মধ্যে পাঠের রুচিতে বদল দেখা দিল, বাঙালি পাঠক বদলাতে শুরু করল। তাতে ছাপাখানার ভূমিকাও বদলে গেল। দীনেন্দ্রকুমারের প্রাসঙ্গিক মন্তব্য শোনা যাক।

> আমাদের পল্লী হতে কথকতা উঠিয়াই গিয়াছে। সে কালে যাহারা কথকতা দ্বারা সংসার প্রতিপালন করিতেন, একালে তাহাদের বংশধররা অন্য বৃত্তি অবলম্বন করিয়াছেন। গার্ল স্কুলের কল্যাণে একালের মেয়েরা লেখাপড়া শিখিয়া *সেকেলে রামায়ণ, মহাভারত* আর স্পর্শ করেন না; এখন তাহারা সাহিত্যে আর্ট ও মনস্তত্ত্বের বিশ্লেষণসূচক, নব্য ঔপন্যাসিকগণের প্রণীত কামায়ণ পাঠে তৃপ্তিলাভ করিতেছেন, রামায়ণে *আর মন ওঠে না।*[৫৩] (নজরটান আমার)

নবীনচন্দ্র সেন নিজে পাঠে সুনিপুণ ছিলেন। পাঠ উঠে যাওয়ার গাওনা গাইতে গিয়েও তিনিও হুবহু এক কথা বলেছেন।

> ...দেখিলাম আমার বাল্যকালে যাহারা পাঠক ছিল, তাহাদের মধ্যে এখন ২/৪ জন যাহারা জীবিত আছে, তাহারাই এখনকার খ্যাতনামা পাঠক। তাহাদের উত্তরাধিকারী আর কেহ গ্রামে জন্মে নাই। কারণ জিজ্ঞাসা করিলে শুনিলাম—দেশে পুঁথি কে শুনে যে পাঠ করিতে কেহ শিক্ষা করিবে। কোন বাড়ীর স্ত্রীলোকেরা আর এ পুঁথি শুনে না। বুঝিলাম স্ত্রীশিক্ষায় দেশ যথার্থই টলায়মান। এ সকল পুঁথির স্থান উপন্যাস গ্রহণ করিয়াছে।[৫৪]

'নবেল পড়া মেয়েদের' উপর দীনেন্দ্রকুমার ও নবীন সেনদের জাতক্রোধ কতটা উনিশ শতকের পুরুষতন্ত্রের স্বভাবজ ফল, সেই প্রসঙ্গ বর্তমানে আলোচ্য নয়। প্রাসঙ্গিক শুধু এই ইঙ্গিত যে কথকতার প্রধান শ্রোতা মেয়েরা, কিন্তু তাঁদের রুচিতে বদল হয়েছে; তাঁরা নিজেরা পড়তে সক্ষম হয়েছেন ও বাদ-বিচার করছেন, রসবোধ অন্যদিকে মোড় নিয়েছে, সাহিত্য বদলে গেছে, উপন্যাস পাঠ জনপ্রিয় হচ্ছে। পৃষ্ঠপোষকতার পরিবর্তনের পেছনে সামাজিক গোষ্ঠীর ওঠা নামার চাইতে অনেক বেশি সক্রিয় রসের আস্বাদের রূপান্তর, উপন্যাস নামে নতুন শিল্পের প্রতি ক্রমবর্ধমান আগ্রহ।

অন্যদিকে ঊনবিংশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে কথকদের সামাজিক ভূমিকা প্রসঙ্গে প্রত্যাশায় খামতি ঘটেছিল, আচার-অনুষ্ঠানের মূল্যায়নেও প্রশ্ন উঠেছিল। কথকতা ও পুরাণপাঠ ধর্ম-সাধনার সঙ্গে যুক্ত, পাঠে পুণ্য হয়, শুনলে পাপ কেটে যায়, এই জাতীয় বিশ্বাসে তার আবেদনের একটি দিক জড়িত আছে। কথক ঠাকুর বিশেষ গুণ বিশিষ্ট হবেন, এই ধারণা প্রত্যাশিত। রামগতি ন্যায়রত্ন কথকদের প্রতি গৃহস্থের বিরক্তির কথা উল্লেখ করেছেন।

> সম্প্রতি কিছু নিরক্ষর বা স্বল্পাক্ষর লোক এ ব্যবসায় অবলম্বন করিয়াছেন, এবং তাহাদের অনেকের পানাসক্তি, বিশেষতঃ পরদারানুরক্তি দর্শনে ঐ শ্রেণীর উপরেই

লোকের অভক্তি জন্মিয়া গিয়াছে। এখন আর কোন ভদ্রলোক নিজ বাটীর মধ্যে কথা দিতে পার্যমানে সম্মত হন না।'' (নজরটান আমার)

শ্রীহট্টে পুরাণপাঠ প্রচলিত ছিল, পুরোহিতরাও যেমন তেমন করে পাঠ সেরে দুপয়সা আয় করতেন। কিন্তু এই রীতি যে আচার সর্বস্বতায় পরিণত হচ্ছে, শিল্প কুশলতা যে হারিয়ে গেছে, সেই বিষয়েও গৃহস্থরা সজাগ হচ্ছিল। বিপিনচন্দ্র পাল লিখেছেন,

> আমার মনে পড়ে দু' একবার আমার জেঠতুত ভাই, ইনি বাবার মুহুরী ছিলেন এবং বাবার সংসারের কাজকর্মের তত্ত্বাবধান করিতেন—বাঙলা নজির খড়োয়া দিয়া মুড়িয়া পুরাণ বলিয়া এই পাঠের সময় রাখিতেন। কখনও কখনও আমাদের পরিবারে হয় নাই কিন্তু অন্যত্র এমনও শুনা গিয়াছে—দুষ্ট বালকেরা ছেঁড়া চটি এইরূপে মুড়িয়া পুরাণের আসনে স্থাপন করিত। লোকেদের ধর্মবিশ্বাস কতটা যে নষ্ট হইয়া গিয়াছিল, এই সকল ঘটনা ও কাহিনীতে তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়।[৫৫]

ময়মনসিংহে পুরাণ পাঠের দুরবস্থা, পাঠক ও কথকদের নিরক্ষরতা ইত্যাদি অভিজ্ঞতার কথা কৃষ্ণকুমার মিত্রও লিপিবদ্ধ করেছেন।[৫৬] বিপিন পাল বা কৃষ্ণকুমার মিত্রের লেখায় ব্রাহ্ময়ানির ছোঁয়াচ থাকা অস্বাভাবিক নয়। কিন্তু রামগতি নিশ্চয় ব্যতিক্রম। পূর্বের কথকরা সবাই দক্ষ বা নিষ্কলুষ ছিলেন, এমন মনে করারও কারণ নেই। কিন্তু কথকরা আর আগের মতো নেই, পুরাণ পাঠের মাহাত্ম্য কমে যাচ্ছে, ভদ্র গৃহস্থের মনে এই ধারণার জন্ম, তজ্জনিত অশ্রদ্ধা ও তাচ্ছিল্যের ভাব, পেশাকে আঘাত হানার পক্ষে যথেষ্ট। মনে রাখা দরকার যে জমাটি দীর্ঘস্থায়ী আসর বসাবার উদ্যোগ জমিদার বা উঠতি ব্যবসায়ীরা নিত। কিন্তু আসরে গৃহস্থবাড়ির মেয়েদের, সাধারণ শ্রোতাদের উৎসাহ ও অংশগ্রহণের কথা সাক্ষ্যে বার বার বলা হয়েছে। সাধ্যমতো প্যালা তারাই দিত, তাদের আগ্রহও কম ছিল না। তাই 'গেরস্তদের' ও বাড়ির মেয়েদের মনোভাবের পরিবর্তন এই ক্ষেত্রে গুরুত্বপুর্ণ। আবার অশ্রদ্ধা বা তাচ্ছিল্য যে সবসময় সার্বিক ধর্মবিশ্বাসে শিথিলতার পরিচায়ক, তা না হতে পারে। বরং ঠিক এই সময়ে 'নব্য হিন্দু' পুনরুত্থানবাদীরা যেভাবে ধর্মকে বিন্যস্ত করতে লাগলেন, তার সঙ্গে পুরাতনী কথকতার রূপ ও ব্যাখ্যা হয়তো তাল রাখতে পারল না।

অন্যদিকে যাত্রা ইত্যাদির উদ্ভব হচ্ছে, বাংলা রঙ্গমঞ্চেও পৌরাণিক পালা জাঁকিয়ে বসেছে, বিনোদনের ক্ষেত্রে কথকতার নানা প্রতিযোগী বেড়েই চলেছে।

বাংলার সামাজিক ইতিহাসে রুচির ও অনুভূতির পট পরিবর্তন নিয়ে লেখা সবে শুরু হয়েছে। পোষ্টা-র সামাজিক অবস্থান বা তার পণ্য ক্রয়ের ক্ষমতা বা বাজারি চাহিদা, শিল্পের পৃষ্ঠপোষকতাকে নির্ধারণ করার একমাত্র শর্ত হতে পারে না। নানা স্তরে সহৃদয়ের মনের রূপান্তর, রসের আস্বাদে রদবদল, নন্দন বোধে পরিবর্তনও সমভাবে বিবেচ্য। বর্তমান পর্যায়ে কোনগুলি 'কারণ', কোনটাই বা 'ব্যাপারবৎ কারণ' বা 'করণ' তা ঠিক করা মুশকিল। এই ক্ষেত্রে আপাতত জয়ন্ত ভট্টের অনুগামী হয়ে বলা যেতে পারে যে সামগ্রীর 'করণত্বই' প্রাসঙ্গিক। কোনও কারণই এককভাবে কার্যের 'করণ' নয়।

যেহেতু সামগ্রী (কারণকূট বা নিখিল কারণের সমষ্টি) থাকলে কার্য অবশ্য উৎপন্ন হয়, সেটাই অসাধারণ কারণ বা 'করণ'। ইতিহাসবিচারে জয়ন্ত ভট্টের ধারণা অনেক এঁড়ে তর্কের অবসান ঘটাতে পারে।

৩ কথকতার কৃৎকৌশল: আসর বিন্যাস

পদ্মপুরাণের পাতালখণ্ডের একটা পুরো অধ্যায় জুড়ে আছে পাঠের আসর কীরকম হবে তার বিবরণ। উনিশ শতকে ওয়ার্ডের বিবরণীতেও আসর সাজানোর কথা প্রাধান্য পেয়েছে। আসর জমাটি না হলে কথকতা মার খাবে। উনবিংশ শতকের সাতের কোঠায় একটি গ্রামের কথকতার আসরের বর্ণনা এইরকম:

> একবার চাটুয্যে গিন্নী তীর্থ পর্যটন করিয়া আসিয়া বাড়ীতে তিনমাস 'কথা' দিয়াছিলেন; এই উপলক্ষ্যে তাঁহাদের বাড়ীর বাহিরের আঙ্গিনায় বাঁশের 'চ্যাটাই'-এর আচ্ছাদন দ্বারা একটি প্রকাণ্ড মণ্ডপ নির্মিত হইয়াছিল। তাঁহার নীচে দক্ষিণপ্রান্তে কথক ঠাকুরের উপবেশনের জন্য একখানি কাঠের তক্তপোষ সংস্থাপিত ছিল। সেই আসনে 'উত্তরমুখো' হইয়া বসিয়া কথক ঠাকুর কথকতা করিতেন, তাঁহার দক্ষিণ পার্শ্বে অনুচ্চ টুলে শালগ্রামশিলা সংস্থাপিত হইতেন। কথক ঠাকুরের সম্মুখে মৃত্তিকার উপর প্রসারিত সতরঞ্চিতে বসিয়া শ্রোতারা কথা শুনিতেন। আঙ্গিনায় উত্তর সীমায় একখানা খড়ো ঘর ছিল, তাহার সম্মুখে চিক টাঙ্গাইয়া পল্লী রমণীগণ সেই চিকের অন্তরালে বসিতেন। অপরাহ্নে চারিটার সময় কথারম্ভের সংবাদ প্রচারের জন্য চাটুয্যে বাড়ীতে কাঁসরঘণ্টা বাজিয়া উঠিত। আমরা ছেলের দল সেই শব্দ শুনিয়া কথা শুনিতে ছুটিতাম। বিলম্ব হইলে স্থানাভাব হইতে পারে ভাবিয়া আমরা সর্বাগ্রে সেখানে উপস্থিত হইয়া 'ফরাস' অধিকার করিতাম। গ্রামস্থ অধিকাংশ লোক পাঁচটা বাজিবার পূর্বেই সেখানে উপস্থিত হইতেন। নিম্নশ্রেণীর লোকেরা মাটীতে বসিয়া নিস্পন্দভাবে কথা শুনিত।"[৫৮]

চাঁদোয়া ব্যাসাসন, বেদি, শালগ্রাম শিলা—ইত্যাদি সব আসরেই সাধারণ অঙ্গ ছিল। কথকের আসন উঁচু হবে, তা পবিত্র, এই কথা পদ্মপুরাণে বলা আছে। কথকী পরিভাষায় 'ব্যাসাসন' আজও চালু শব্দ। আসনকে কথক প্রণাম করে বসেন কারণ আসন তাঁর পূজার সামগ্রী। বিক্রমাদিত্যের সিংহাসনের উপর গড়ে ওঠা ঢিবিতে বসে যেমন রাখাল বালক সেরা বিচারকে রূপান্তরিত হয়, ওই আসনের প্রসাদে কথক ঠাকুর হয়ে ওঠেন পরম্পরাগত ব্যাস। তাই ক্ষমতা থাকলে ব্যাসাসন তৈরিও করা হত তরিবৎ করে। এক কথকের জবানিতে এই তরিবতের কথা শোনা যাক:

> চাঁদোয়ার তলায় তক্তপোষের উপর গালিচা, গালিচাখানা কাশ্মীরী কিন্তু শতবর্ষেরও অধিক তার বয়স। স্থানে স্থানে একটু ছিন্ন হয়েছে। গেলবারে কুম্ভমেলায় গিয়েছিলেন বড় বউমা। তিনি কথক ঠাকুরের বসবার জন্য আগ্রা থেকে সুন্দর ঝালর দেওয়া একখানা রেশমের আসন এনেছেন। সেই আসনখানা গালিচার উপর দেওয়া আছে।

পাশেই একটা তাকিয়া। তুলো দেখা যায় [।] নতুন ওয়াড় দেওয়া হয়েছে।’’[৫৯]

কথকতা সাধনার অঙ্গ, ঠাকুরের কাজ। চালতাবাগানে রাধারানি বিগ্রহের কথা মনে রেখে দ্বিজরাজবাবু মাসাধিককাল কথকতা করেন। মেহের-হরের কথকঠাকুর কালীনাথ ভট্টাচার্য বা প্রবাদপ্রতিম ধরণীধরের মজলিশে শালগ্রাম শিলার সামনে বসতেন কথক। আর আসর বিন্যাসেও থাকবন্দি সমাজের রূপ থাকত, ব্রাহ্মণ ও শূদ্রদের বসার আসন আলাদাই হত। নৈহাটির কাঁঠালপাড়ায় বঙ্কিমচন্দ্রের বাড়িতে কিশোর হরপ্রসাদের অভিজ্ঞতা দীনেন্দ্রকুমারের মতোই:

রায় বাহাদুরের বাহিরবাড়ির পাঁচ ফুকরে দালানের সামনে যে উঠান আছে, সেই উঠানে কথা হইত। কথকের জন্য যেমন সবজায়গায় ইটের বেদি হয়, এ বাড়িতে তাহা হয় নাই। একখানা বড় চৌকি ও একখানা বড় তাকিয়া বেদির কাজ করিত। ঐ বেদির উপর একখানি ভালো গালিচা পাতা থাকিত। সামনে একটি বড় টিপায়ের উপর একখানি পিতলের সিংহাসনে শালগ্রাম থাকিতেন, তিনি কথার প্রধান শ্রোতা। উঠানময় গালিচা ও শতরঞ্চ পাতা থাকিত; ব্রাহ্মণেরা গালিচায় বসিতেন, শূদ্রেরা শতরঞ্চে বসিত।[৬০]

গ্রামের আসর, সাধ্য কি যে ক্ষমতাবিন্যাসের থাককে অগ্রাহ্য করে? এইরকম আসরের মধ্যমণি হলেন কথক ঠাকুর। দীনেন্দ্রকুমারের বর্ণনায়,

কথক ঠাকুরের ললাট চন্দনচর্চিত, নাসিকায় দীর্ঘ তিলক, শিখার গ্রন্থিতে একটি ফুল। দেহ রেশমী নামাবলী দ্বারা আচ্ছাদিত, কণ্ঠে পুষ্পমাল্য। তিনি তুলটের কাগজে লিখিত ও পাতলা কাষ্ঠের আবরণাবৃত প্রায় এক হাত দীর্ঘ পুথিখানি সম্মুখে খুলিয়া রাখিয়া মধ্যে মধ্যে এক একটি শ্লোক দেখিয়া লইতেন, এবং তাহা আবৃত্তি করিয়া ব্যাখ্যা করিতেন; কখন গান করিতেন, ব্যাখ্যা উপলক্ষে নানা গল্প বলিতেন; কখনও হাসাইতেন, কখনো কাঁদাইতেন। কথা কহিতে কহিতে শ্রান্তিবোধ হইলে ট্যাঁক হইতে নস্যপূর্ণ শামুক বাহির করিয়া দুই এক টিপ নস্য লইতেন, এবং সম্মুখস্থিত তো-করা গামছাখানি দ্বারা নাকমুখ মুছিয়া পুনর্ব্বার সঙ্গীতের সুরে কথা আরম্ভ করিতেন।[৬১]

আসর বসতে পারত নানা উপলক্ষে। উৎসবে তো বসতই। আবার তীর্থ পর্যটন সমাধা করে, ছেলের অন্নপ্রাশন, বা শোক দুঃখ উপশমের উদ্দেশ্যে কিছু দক্ষ কথক চাই, আর মুমুক্ষু পাঠক চাই। আদর্শ পাঠক শুকদেব আর শ্রেষ্ঠ শ্রোতা পরীক্ষিৎ।[৬২] আসর জমাতে গেলে কিছু তৈরি শ্রোতাও চাই। দুঁদে কথক তাই লেখেন,

...এর মধ্যেই দেখুলম, কোনো ভক্তের চক্ষে জল গড়াবার উপক্রম হয়েছে। এদের বড় তাড়াতাড়ি ভাব হয়ে যায়। এসব লোক কথক ঠাকুরের খুব প্রিয়। তিনি গুটিকয়েক এরকম ভক্ত খুব কাছে নিয়ে বসেন।

তিনি বলেন, এরাই তাঁর যথার্থ সমজদার শ্রোতা। এদের মুখ না দেখে তিনি কথাই

বলতে পারেন না।[৬৩]

কিন্তু আসর যতই সাজানো হোক না কেন, শ্রোতারা যতই উন্মুখ থাকুক না কেন, শেষপর্যন্ত জমানোর দায়িত্ব গিয়ে পড়ে কথকের উপরই। একদিন ঠাকুরবাড়িতে জসীমউদ্দীন এই কথা মর্মে মর্মে বুঝেছিলেন। 'গল্পের আসরের উপলক্ষ করিয়া হলটিকে একটু সাজান হইয়াছে। কথক ঠাকুরের মত সুন্দর একটি আসনও রচিত হইয়াছে আমার জন্য।'

সেইদিন আসরে রবীন্দ্রনাথ ছাড়া হাজির ছিলেন সবাই। অবনীন্দ্রনাথ, গগনেন্দ্রনাথ, দীনেন্দ্রনাথ, রথীন্দ্রনাথ, এবং ঠাকুরবাড়ির সুসজ্জিতা বধূরা। আর গ্রামদেশের জসীমউদ্দীন এই রকম আসরে যেন 'বলির পাঁঠা'।

গল্প বলিতে বলিতে গল্পের খেই হারাইয়া ফেলি। পরের কথা আগে বলিয়া আবার সেই ছাড়িয়া-আসা কথার অবতারণা করি। দশ পনের মিনিট বাদে দিনুবাবু উঠিয়া গেলেন। সামনের শাড়িতে ঝকমকিতে দোলা দিয়া কৌতুকমতীরা একে অপরের কানে কানে কথা বলিতে লাগিলেন। কেউ কেউ উঠিয়া গেলেন।[৬৪]

গ্রামের কবি জসীমউদ্দীনের বলার ধরন ঠাকুরবাড়ির শহুরে মনের হৃদয়-সংবাদী হয়নি। আসর জমল না, যদিও বহিরঙ্গে ত্রুটি ছিল না। আবার এই আসরই মহিম কথক বা ক্ষেত্র কথকের কথায় কীভাবে জমে উঠত তার স্বীকৃতি আছে অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের স্মৃতিচারণায়।

এ যে মহিম কথকের পুঁথি, একটি একটি পাতা পড়ে যেতেন কথক ঠাকুর আর একটি একটি ছবি যেন চোখের সামনে ভেসে উঠত। লাল বনাত একখানা গায়ে দিয়ে বসতেন পুঁথি হাতে, হাতে রূপোর আংটি, হাত নেড়ে নেড়ে কথকতা করতেন। রূপোর আংটির ঝকঝকানি আজও দেখতে পাই।...
ক্ষেত্রনাথ কথকের বলার ধরন চমৎকার, গলাটাও ছিল সুমিষ্ট। দক্ষিণের বারান্দার গায়ে নাচঘরটা তখন অস্তমিতমহিমা গন্ধর্বনগরের মধ্যে ম্লান শোভা ধারণ করেছে। তারই মধ্যে ক্ষেত্রনাথ কথক মায়ের মনের অবস্থানুযায়ী এক একটি কথা ভাগবত থেকে বলে চলেছেন, এইভাবে গেল প্রায় একবছর।[৬৫]

গল্প ফাঁদার মুনশিয়ানা

চাঁইবুড়োর সাতরাজার ধন যে একমানিক, সেটা যে পুথি এই কথা সবাই জানে, পুষ্পিকাতেও বার বার তাই লেখা আছে। তাই নানা ঝামেলা, নানা নিষেধ। যেমন,

পুস্তক পড়িতে দিবে সুবুদ্ধির ঠাই।
সবাগুনা গ্রন্থ জেন গোবরায় নাই।

মাতুলমহাশয়ের বাহির বাটির মণ্ডপে বসিয়া পুথির অনুলিপি করা হয়েছে, 'ঘাড়ের মধ্যে সাল হইয়া বড় বেতা পাইয়া এহি পুস্তক সমাপ্ত করিলাম—এহি পুস্তক আর কেহর

এলাকা নহি,' ১২৪০ (১৮৩৩) সনে শ্রীকৃষ্ণকান্ত এই কথা লিখেছেন। তাই আর এক জনের ভাষায়, 'দুঃখেন লিখিতং গ্রন্থং পুত্রবৎ পরিপালয়েৎ।' তাই এরকম কোনও পুথি অপহরণ করার পাপ প্রসঙ্গে অভিশাপ স্পষ্ট: 'এ পুস্তক জে চুরি করে সে শাশুড়ির শৃঙ্গার করে' বা 'শাশুড়্যা হইবেক'। কিন্তু পুথি তো লেখা হয় পাঠের জন্য। ১১৮০ (১৭৭৩) সনে জগন্নাথ ঘোষ গদাপর্ব লিখতে গিয়ে বলছেন, 'শ্রবণ কারণ ইহা লিখিলাম সব।' 'সঙ্কর ঘোষ' তাঁকে দিয়ে প্রতিলিপি করাচ্ছেন: 'জত্ন কড়ি লেখাইলে কড়ি করে ব্যয় ॥' ১২৩০ সনে *শ্রীমদ্ভাগবত* (১৮২৩) 'মহাপৌরাণ'-এর পঞ্চম স্কন্ধের প্রতিলিপি করতে গিয়ে রামপ্রসাদ দাস বোস বলেন, 'কিন্তু এক নিবেদন। বক্তা ঠাকুর মহাশয়দিগকে আমার শতং কোট নমস্কার। আমার দোশাদোশ ক্ষমা করিবা।'[৬৬]

পুথি লেখাতে পুণ্যও আছে, অর্থ প্রাপ্তিও আছে। লিপিকররা জানে পুথিতে 'দোশাদোশ আছে', 'বক্তা মহাশয়েরান' 'তাহাকে সুদ্ধ করিবেন।' লেখা শুদ্ধ হবে পাঠে, পাঠ প্রধান, লেখা পড়া নয়, পড়ালেখা। তাই সুবুদ্ধিই পড়তে পারবেন, অন্যরা পড়তে গেলে হয়ে যাবেন গোবর-গণেশ। আগে জানতে হবে কী লেখা আছে, হৃদয়ে ভক্তি থাকতে হবে, তবে তো পড়া-লেখা হবে। শুদ্ধ মনে পাঠ করতে হয়। তাই একসময়ে পুথিকে পুজো না করে কথকতার আরম্ভ বা শেষ অকল্পনীয় ছিল। এ হেন কথকতা করার অধিকারের একটা সূত্র পরম্পরা, পেশার ধারাবাহিকতা, এক কথক ঠাকুরের চেখে পুথির মাহাত্ম্য ধরা পড়েছে এইভাবে,

> দেখলুম কথক ঠাকুর নবীন হলেও তাঁর পুঁথিখানা নতুন নয়। অনেক দিনের হাতে লেখা পুঁথি...ভাগবতের সবখানি এই পুঁথির মধ্যে ললিতাক্ষরে লেখা আছে। ধারে ধারে তিনপুরুষের হাতের লেখার নিদর্শন, ক্ষুদ্র টিপ্পনী। কোথাও শ্লোকের একপাদ, কোথাও পূর্ণশ্লোক আর কোথাও কোনো দৃষ্টান্তের সংকেত। যারা এই পুঁথি নিয়ে কথকতা করেছেন, তাদের রুচি ও শিক্ষা অনুসারে নানা শাস্ত্রের প্রমাণ পাশে পাশে সংগৃহীত।
>
> গুরুদেব বলেছেন, পুরাণ যেমন ষট সংবাদ না হলে রুচিজনক হয় না, তেমন পুঁথিও তিন পুরুষের না হলে শোধন হয় না। এ সব পুঁথিও তিন চার হাত বদল হয়ে অনেক তথ্য পূর্ণ হয়, আর লিপিকর প্রমাদও সংশোধিত হয়ে যায়।[৬৭]

পুথি কথকের নিজস্ব কিন্তু সেই পুথি ধারা-বহির্ভূত নয়, পরম্পরায় বিধৃত। পাঠে পুথির সার্থকতা, পুরুষানুক্রমে পাঠের মাধ্যমে পুথি পোক্ত হয়। অবিরত পাঠে পুথির গৌরব বৃদ্ধি পায়, পুথি শুদ্ধ হয়। সেই জন্যই আসরে পুথির স্বচ্ছন্দ লেনদেন আছে। পুথি বলাটাই তো কথকতার একরূপ। কথক কালীপ্রসাদ দেবশর্ম্মার চিঠির বয়ান হল, 'এখানে আমার পুথি আরম্ভ হইয়াছে, কিছুকাল বিলম্ব হইবেক।'[৬৮] আবার ১২৫৩ (১৮৪৬) সনের পৌষমাষে কথকতা করতে গিয়ে লক্ষ্মীনারায়ণ দেবশর্ম্মা ঠ্যাকায় পড়েছেন। শ্যামাচরণ ভট্টাচার্যকে অনুরোধ করে তিনি লিখেছেন, 'কীন্তু লঙ্কাকাণ্ড পুস্তক এখানে অর্পাপ্ত হইআছে য়তেব যুনিলাম জে আপকাদের গ্রামে এই পুস্তক আছে আপনি মম পিতি অনুগ্রহ পিকাস করিঞা ঐ পুস্তক এই লোক সমীভারে পাঠাইঞে দিব।'[৬৯]

যেহেতু পুথি পাঠ করা হয়, তার চাহিদা আছে, তাই সবসময় মালিকের কাছে পুথি ফেরত যোগ্য। তাড়া খেয়ে ১২১৫ (১৮০৮) সনে মাণিকচন্দ্র দেবশর্ম্মা 'যুদ্ধে মঞ্জরী ঠাকুর জীউ' স্থানে একরারনামা লিখতে বাধ্য হচ্ছেন। 'সন ১২০৫ পাচ সাল শ্রীযুত পিতা ঠাকুর আপনকার স্থানে হইতে শ্রীশ্রীভাগবৎ পুথী লইয়া আসীয়াছিলেন। সন ১২১৩ সালে সেহী পুথী নতুনবাজার মোকামে পাট করিয়া এখানে ছিল সে পুথী লইয়া সহরের সেবকবাটিতে রাখিয়াছি প্রকায করিয়া জাইবার কালে সহর হৈতে পুথী লইয়া আপনকার নিকট দিবো।'[১০]

পুথি না হলে পাঠ হবে না। পুথি পরম্পরাগত কিন্তু পুথির মালিক আছে, তার উপরে কোনও না কোনও স্বত্ব আছে। পরম্পরার কাঠামোতে পুথির চরিত্র নির্ধারিত হচ্ছে, অথচ বিন্যাসে থাকছে বিন্যাসকারের দক্ষতা, নিজস্বতা। পাঠ সামূহিক, পুথিও সামূহিক পাঠের জগতে প্রোথিত, তার সার্থকতা সেখানে। তাহলে কথকের নিজস্ব মুনশিয়ানা কোথায়, তার সরহদ্দই বা কত দূর সেটা বিচার্য হয়ে ওঠে।

যেভাবে পাঠকের রূপান্তর ব্যাখ্যাকার ও কথকের মধ্যে হয়েছে, ঠিক সেইভাবে কথকের পুথি রচনাও, মূল গ্রন্থের অনুসারে, একটি মাধ্যমিক স্তরের মধ্য দিয়ে দানা বেঁধেছে। এশিয়াটিক সোসাইটিতে রক্ষিত আলোচনা প্রসঙ্গে হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এই জাতীয় রচনার কথা উল্লেখ করছেন। রামায়ণ, মহাভারত বা ভাগবত আয়তনে বিশাল, নানা শ্লোকে ও জটিলতত্ত্বে পরিপূর্ণ। ফলে কোনটা রাখব আর কোনটা বাদ দেব, সেটা কথকরা ঠিক করতেন, মূল গ্রন্থ থেকে বেছে বেছে আখ্যান ও শ্লোক সাজিয়ে একটা নির্বাচিত সংকলন তৈরি করতেন। রমাপতি এইভাবে উত্তরাকাণ্ডের কথা সংগ্রহ করেছেন, কেশব পঞ্চানন ভট্টাচার্য এইভাবে ভাগবতের কথা চয়ন করেছেন, গালভরা নাম দিয়েছেন 'হরি-ভক্তি তরঙ্গিনী'। উনিশ শতকের গোড়ায় গণেশ বিদ্যাবিনোদ একই পদ্ধতিতে ৫৯০টি শ্লোকে রামায়ণের আদিকাণ্ডের কাহিনীর চুম্বক দিয়েছেন। এই সংগ্রহ গ্রন্থগুলি আখ্যানের মূল কাঠামো, কোন কোন বিষয় আলোচিত হবে তার নির্দেশ। এই কাঠামোর উপরে প্রলেপ দেওয়া হয়, তৈরি হয় কথা এবং আখ্যান। এই সংগ্রহগুলি লেখা হত সংস্কৃতে। মূল শ্লোক থাকত, সঙ্গে সঙ্গে সহজ সংস্কৃত গদ্যে গল্পসারও দেওয়া হত। সম্ভবত ওইগুলির উপর ভিত্তি করেই দিবাকালের পাঠকে প্রথমদিকের কথকরা সন্ধেবেলায় লোকের সামনে অনুবাদ করতেন; এই জাতীয় সংগ্রহ করার প্রথম উদ্দেশ্য হয়তো তাই ছিল।[১১] কথকের ভূমিকা প্রসারিত হবার সঙ্গে সঙ্গে এই সংগ্রহের কাঠামোও পরিবর্তিত হয়।

'আদিকাণ্ড' কথা পুথিতে নানা আখ্যানের চুম্বক দেওয়া আছে, 'কথকস্য কথা' যেমন গঙ্গাবতরণ, 'রামাদয়ো মিথিলায়াং চলিতাঃ।' আবার তারই সঙ্গে জুড়ে দেওয়া হচ্ছে জটায়ু-মারীচবধ অথবা 'জনস্থানে রমতা রামেন শূর্পনখা বিরূপিতা।' এমনভাবে বাক্যবিন্যাস করা হচ্ছে যাতে করে বাংলায় রূপান্তরিত করতে কোনও অসুবিধা না হয়, 'সরযূতীরে কোষলো নাম জনপদস্তু অযোধ্যানাম নগরী'। আখ্যানের কাঠামোর সূত্রটি সাজানো হয়ে রইল।[১২]

আবার এইরকম সহজ সংস্কৃতে আখ্যানভিত্তিক আরেকটি পুথির মাঝে জনকের

মুখে একটা সংস্কৃতগন্ধী -বাংলা শ্লোক জুড়ে দেওয়া হয়, বোধহয় শ্রোতাদের কাছে লাগসই শোনাতে পারে। যেমন,

'জনক উঃ জগদম্বার শ্লোক

নম অন্নদা অন্নপ্রদান করা।
ত্বয়ী দিনদয়াময়ী দুঃখহরা।
হে শুভঙ্করী সঙ্কট শান্তিকরা।
জগদম্বে জগন্মাতা যোগধরা ॥
হে কাশীশ্বরী শঙ্করি অন্নদাতা।
শমনস্য ভয়ে সদা রক্ষ মাতা ॥
ত্বয়ি শিব সনাতনী শক্তি প্রদা।
এ অশক্তজনে বরদে বরদা ॥
অতি অকৃতি দুর্ম্মতি দিন হীনে।
ওগো দিনময়ি কর ত্রাণ দিনে।'[৭৩]

আবার আরেকটি 'সংগ্রহের' পুথিতে 'দেশে দেশে কলত্রাণি'র মতো রামায়ণের বিখ্যাত শ্লোকগুলির মধ্যে হঠাৎ কুম্ভকর্ণের একটি সংলাপ বিচ্ছিন্ন পাতায় দেওয়া হল: 'কুম্ভ উঃ দিকপালান্ ভক্ষয়িষ্যামি ২ পাবকং। দেবান্ বিপ্রান্ বধিষ্যামি।...পাতয়িষ্যামি নক্ষত্রঞ্চ মহীতলে। শতক্রতুং বিজেষ্যামি পশ্যামি বরুণালয়ং। পবর্তন চূর্ন্তুয়িষ্যামি। দারয়িষ্যামি মেদিনীং। মহাদেবং বধিষ্যামি পশ্যাদা বিক্রমং মম।' বলাবাহুল্য, পাঠের মজলিশে সংস্কৃতে লেখা এই ধরনের সংলাপকে মুখে মুখে বাংলায় করে দেওয়া আদৌ দুঃসাধ্য নয়। এই বিশেষ সংগ্রহ পুথিটিতে স্থানে স্থানে বিচ্ছিন্ন পাতায় বাংলায় লেখা সাটও আছে, যেমন, 'অশ্বমেধ যজ্ঞাবসানে অযোধ্যা মণ্ডল মধ্যবর্তী সৌধ নিকর মণ্ডিত প্রাঙ্গণে বিবিধ ক্ষৌমরাদি [?] বসনোনির্মিতাসনোপরি নৃপ নৃপতিগণ স্ত্রিয়গণ দিব্যসিংহাসনোপবিষ্ট...গাওরে কি রামায়ণ গান শিখেছো।'[৭৪] সহজ সংস্কৃতে লেখা গদ্য সংলাপের পাশাপাশি বাংলা সাটও লেখা হচ্ছে, সংগ্রহের কাঠামোয় নানাভাবে যোজনা চলছে, যোজনা কাঠামোকে রূপান্তরিত করছে স্বতন্ত্র পুথিতে। এই রদবদলের প্রক্রিয়া ধরা পড়ে এক কথকের লেখায়:

> আমি মনে করেছিলুম, ভাগবতের মূল শ্লোক আর কোন প্রসিদ্ধ ব্যাখ্যা বোধহয় পুঁথিখানায় আছে। ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করে জানলুম, তা নয়। মাঝে মাঝে কোথাও ভাগবতের মূল শ্লোক আছে, আর প্রায়শঃ নানা শাস্ত্রের প্রমাণ, উপাখ্যান আর তার সঙ্গে দৃষ্টান্তগুলির উল্লেখ করা হয়েছে। দেখলুম, কয়েকখানা পাতায় সমাসবহুল সুদীর্ঘ বাক্যাবলীর সমষ্টি আছে। সেগুলি মূল পুঁথির অংশ নয়, কিন্তু খোলা পাতা হিসাবে ঐ সঙ্গেই আছে। ঠাকুর বলেন, ঐগুলি অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। এই পাতাগুলির

মধ্যে কোনটা বনের বর্ণনা, কোনটা পর্বতের বর্ণনা আর কোনটা রাজসভা বা নগরের বর্ণনা। এই বর্ণনাগুলো কথা জমানোর জন্য খুব প্রয়োগ হয়ে থাকে।[১১]

পুরাণকাব্য থেকে সংগ্রহ, আবার সংগ্রহ থেকে নানাভাবে প্রসারিত ও যোজিত হয়ে কথকের পুথি—এই স্তরে উপনীত হবার প্রক্রিয়ায় যোজনার কয়েকটি সাধারণ সূত্র ধরা যেতে পারে। প্রথমত, আখ্যান বিন্যাসে আমরা লোককথা ও পৌরাণিক কাহিনীর মিশ্রণ দেখি, দৃষ্টান্ত হিসাবে লোকগল্পকে বার বার হাজির করা হয়। এই কায়দাকে অগ্নিপুরাণের ভাষায় বলতে পারে 'কথান্তরম', এক কথার মধ্যে অন্য কথা ঢুকিয়ে দেওয়া যাতে করে মূল কাহিনীটা জোরদার হয়। দ্বৈপায়ন ব্যাস বনে যাচ্ছেন। মায়ের কান্না শুনে থেমে গেলেন। মাতৃভক্ত। তাই মাকে গল্প শোনালেন। বলা হল কিন্তু 'ইতিহাসং শৃণু'। ঠিক যেমন ঘটেছিল, ঠিক তাই। শুদ্ধমতি বামুন, তার বৃদ্ধা মা এবং হিংসুটে বউ। 'ইতিহাসং শৃণু'-র পরেই ভাষা বদলে গেলে, তার রওয়ানি হয়ে গেল অন্যরকম। মায়ের বিরুদ্ধে বৌ-এর হিংসা ও স্বামীকে উত্তেজিত করার নমুনা: 'ওর স্ত্রী বলে মলো আমি কেয় নই। বানে ভেসে এসেচি। শাশুড়ি বুড়ি ঘরের বালাই। থাকতে সুখ হবে না। দূর করে দেবো। তবে বাঁচবো।' আর রাত্রে স্বামীর পা টেপার সময়

> চকের জল শুদ্ধমতির পায়ে পড়লো। ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগলো। কেন? প্রিয়ে কাঁদ কেন। কি জন্যে স্ত্রী যদি কাঁদে পুরুষ টো ব্যস্ত হয়। কি চাই বল। আমি মলেই বাঁচি। আমার কপালে আর সুখ নাই। পাড়া প্রতিবেশিনীরে দুদে ভাত খায় একদিন দুগ্ধো অন্নে খেতে পেলাম না। আর শোনার কি রূপোর আঁচোড় গায়ে হলো না। বলে ডুকরে ডুকরে কাঁদচে। হাবি কাঁদিসনে, সব দেবো।

লোককথায় ঝগড়াটে বউ-এর রূপও এসেছে। স্বামী রোজগারে বেরুলে শাশুড়ির প্রতি স্ত্রীর মূর্তি,

> প্রাচীনা বলে ও বৌমা বড় ক্ষুধা পিপাসা দেয় না খাই। ও ঘরে' হতে বেরিয়ে ভিমরুলের চাকের মত মুক ফুলিয়ে বলে মাথা নেড়ে মরহ, আকন্দ ডাল [sic] মুড়ি দেরমোচো তোমার মরণ নাঞি মা ককুগুর' প্রেমাই পেয়েচো যম বা তোর পাঁজি পুতি ভুলে গেছে।

শাশুড়ি ডাইন, বনে ছেড়ে দেওয়া উচিত, তাই স্বামীকে বলা হয় ও তুক করা হয়,

> ওমা কি হবে? মরণ কেন হলো না। পাড়ায় কাকে খেয়ে এসেচেন। নজ্জায় মুক পাততে পারি না। আমার সোনার ঠাকরুণকে কে আড়ি করে চোষকা মন্ত্র দিয়ে গেছে হে।... তুমি বাঁচালে হয়। সাবধানে থেকো। ওয়ো হলে নাকি আপনারই ঘরেই আসে। আমাদের কপালে জা থাক তুমি বেঁচে থাকো। হাতের কগাচি থাক।...এই বলে সাঁড়ের গোবর কেঁচোর মাটি পিদ্দিমের শিশ। কপালে দিলে আর ফু ২ করে বুকে ফুৎকুড়ি

স্বামীকে ভজিয়ে বনে শাশুড়িকে পাঠাবার পরে বউয়ের আনন্দ আর ধরে না।

> দূর করেচি ঘরের আপদ। এখন একলা একেশ্বরি। সৃষ্টিধরী হয়ে বসেচি। খাবো দাবো নাচবো গাবো।...বার বার পথ দেকচে। স্বামি ফিরে এলে হয়। আর আহ্লাদে মাজখানটা ভেঙ্গে ২ ফেটে ২ পড়ছে।...জেন ফুটি ফটা কাঁকুড় ফাটা ফুটকড়াই আটখানা হয়ে দুটি বুড়ো আঙুলে বেড়িয়ে বেড়াচ্চে পৃথিবী সরা দেখচে।``

দ্বৈপায়নের জন্ম ও জীবনবৃত্তান্তের মধ্যে এই কাহিনী নিয়ে আসা হল মাতৃভক্তির মাহাত্ম্য প্রচার করতে; সত্যবতীর প্রতি ব্যাসদেবের চিরন্তন আনুগত্যকে প্রতিষ্ঠিত করা উদ্দেশ্য। কিন্তু গল্পের ভাষা ও বস্তুর অভিমুখে ভাগবতী আখ্যানের বিপরীত, লোকগল্পের মেজাজ ও ছক স্পষ্ট। তাই মার্গ ও লোকের মিশ্রণ দেশজ রীতির জন্ম দেয়, সেই রীতিতে কথকতা করা হয়। আধুনিককালে দ্বিজরাজবাবুও এই রীতির ব্যতিক্রম নন। রামের সভায় লবকুশ রামায়ণ গাইতে এসেছে। সকালে তারা অযোধ্যানগরী ঘুরে বেড়াচ্ছে। তখন ময়রার দোকান থেকে বিনা পয়সায় মিষ্টি খাওয়ার যে ফন্দি লবকুশ বার করেছিল, তা আমাদের ছেলেবেলার শোনা গল্প: 'বাবা, মাছি রসগোল্লা খাচ্ছে' বা 'পিঁপড়ে রসগোল্লা খাচ্ছে।' আসরে বাচ্চারা গল্পটা শুনে হেসে ফেলে, আমাদেরও ছেলেবেলার কথা মনে পড়ে যায়, কাহিনীতে মৌতাত ধরে যায়। কিন্তু যতই কথান্তর হোক না কেন, সুতো যতই ছাড়া হোক না কেন, গোটাবার কায়দা জানতে হবে, মূলে ফিরতেই হবে।

আখ্যানের মধ্যে চরিত্রায়নের জন্য ছোট ছোট 'চুটকির' মতো রচনা থেকে যায়। এইগুলিতে থাকে লৌকিকের স্পর্শ, কথকের উদ্ভাবনা। কয়েকটা নিদর্শন দেওয়া যেতে পারে। দেবকীর প্রথম সন্তানকে ভাগবতী কংস বধ করতে অনীহা প্রকাশ করে। পরে নারদের কাছে দৈবী চক্রান্তের কথা শুনে সব ক'টি সন্তানকেই হত্যা করল। কথক এই সূত্রকে নিজের মতো করে সাজিয়েছেন। কংসের কাছে বসুদেব প্রতিশ্রুত, তাই দেবকীর গর্ভের প্রথম সন্তানকে নিয়ে এসেছেন।

'কংস উঃ সদ্যজাত সন্তান, অচ্ছিন্ন নাড়ী। রুধিরাক্ত এ সন্তান লএে সভায় কেনো। তুমি কি খেপেচো নাকি।'

বসুদেব প্রতিশ্রুতির কথা মনে করিয়ে দিলেন। তখন,

> ওহে বসুদেব ও কথাটা আমার মনে নাই। মিথ্যাতে তোমার এতো ভয়। আমরাত প্রতিদিন কতো মিথ্যা বলে থাকি। ওহে বসুদেব তোমার বাড়িতে কি সত্যের গাচ আছে। তোমাকে আমার পণ্ডিৎ বলে জ্ঞান ছিলো। এখন জাল্লেম জে তোমার তুল্য মূর্খ আর জগতে নাই।...আকাশবাণি হয়েছিলো। দেবকীর অষ্টম গর্ভের পুত্র হতে আমার বিনাশ হবে। প্রথম জাতো শন্তান কি অপরাধ করে। তোমার হৃদীএে কি দয়া নাই। লএ জাও ২ গৃহে লএে যাও।

ভাগবতী কংস ও কথকতার কংসে প্রভেদ প্রচুর। কংসের মুখে এইরকম বিচারবোধ তাকে অনেক স্বাভাবিক করেছে, সত্য ও মিথ্যা দৈনন্দিনতার ছাপ লেগেছে। আবার

'টাইপ' চরিত্র হিসাবে নারদকে আনা হয়েছে, তার পরামর্শে কংস শিশুকে হত্যা করল। পরামর্শটাও একটি লৌকিক হিসাবের ধাঁধা। কথকতা পুথিতে বেশ বিস্তৃত করে লিখেছেন:

নারদ উ। বটে তুমি অষ্টম কারে বলো। কংস উ।। সপ্তমের পর জে তারে অষ্টম বল্লি। নারদ উ।। সপ্তমের পর তারে অষ্টম বলো। ভালো আট্টা মণি আনওয়েন করি দেখি। কংস মহারাজ তৎখনাৎ মণি আনওয়েন কল্লেন। নারদ উ।। এখানে রক্ষ্যা করে গণনা করো দেখি। কংস গণনা করতে লাগলো। একো দ্বি তৃ চত্তুঃ পঞ্চ শষ্ঠ সপ্তম অষ্টম, এইটি অষ্টম হলো। নারদ বলেন বটে ওইটা বাদিকে রেখে গণনা করো। কংস পুনরায় গণনা করে। পূর্ববৎ এক দ্বি ত্তৃ চত্তু পঞ্চ শষ্ঠ সপ্তম অষ্টম। আজ্ঞা হল সপ্তমটা অষ্টম হলো জে।...এইরূপ পণপুরাণ ন্যাত্রে দ্বারায় দেবর্শী নারদ শকলগুলোকে অষ্টম করে দেখালেন। পণপুরাণ ন্যায় কেমন। জেমন একগণ্ডা দুই গণ্ডা করে কুড়ি গণ্ডা করে এক পণ হলো। আবার সেই সকল একত্র করে পুনরায় গণনা কত্তে গেলে আবার এক গণ্ডাতে কুড়ি গণ্ডা হয় সেইরূপ সকলগুলি অষ্টম হলো।

শ্রোতার কৌতূহল উস্‌কে দিকে কথক নিজে লেখেন, 'বলো দেব ঋষি-নারদ কংসকে এমন উপদেশ কেন কর্লেন।' কারণ লোকবিশ্বাস ও দেবরোষ। 'মৃতবৎশা' স্ত্রী নাকি শীঘ্র গর্ভধারণ করে তাই ছটি সন্তান বিনাশ হলেই 'অবিলম্বে বৈকুণ্ঠনাথ হরি ভূতলে অবতীর্ণ হবে।।' আর 'কংস বালক বিনাশ করে প্রচুর পাপ সঞ্চার করুক। তাহলে শীঘ্রই জমালয়ে গমন করবে।'[৭৭] যুক্তির ফাঁক নেই। পরিকল্পনাটিও নারদের লোকগ্রাহ্য কুঁদুলে স্বভাবের সঙ্গে মিলে যায়, তাঁর পাতা ফাঁদে বোকা কংস পা দেয়, দৈবী জগতের চক্রান্ত রূপান্তরিত হয় লৌকিক জগতের প্যাঁচ-পয়জারে। আর সেই বুনটটি কথক নিজেই বানিয়ে তোলেন, পৌরাণিক আখ্যানের টানেতে লোক অভিজ্ঞতা সহজে খাপ খায়।

পৌরাণিক আখ্যানের ধারার মধ্যে এই রকম ছোট বুনটের কাজ, গায়কীর মতো কথকী 'গিটকিরি' প্যালায় গতি সৃষ্টি করে, বৈচিত্র্যও বাড়ায় দৈবী চরিত্রের মহিমায় মানবিক মাত্রা যোগ করে। এই বুনটের কাজগুলি ঘটনা ও ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়াভিত্তিক, মূল কাহিনীর ইতি-উতিতে আবদ্ধ। লঙ্কায় রাম সীতাকে অগ্নি-পরীক্ষার আদেশ দিয়েছেন। কথকের বর্ণনায় হনুমান সেই মুহূর্তে অকুস্থলে নেই, কুবেরের উদ্যান থেকে ফুল আনতে গেছে। ফিরে এসে সাজানো চিতা দেখে হনুমান চটে আগুন।

'এই কথা শ্রবণ করে হনুমানের ভাবোন্মাদ হল। আমার মা অশতি। অশতি বলে রাম তারে ত্যাগ করেছেন আজ দেখিবো রাম কেমন বির।'

পুথিতে হনুমান বলে 'রামং যমগৃহং নয়ামি।' শালগাছ তুলে রামকে আক্রমণ করেন, লক্ষ্মণের সঙ্গে লড়াইয়ের প্রবৃত্ত হন। অনুযোগ করেন,

'জদি মাকে প্রতিপালন কর্ত্তে পারবে না আমায় কেনো বল্লে না। আমি ভিক্ষা করে মাকে খায়াতেম।' রামের সব কৃতিত্ব হনুমান নাকচ করে এইভাবে।

'জদি বলো রাম হরধনু ভঙ্গ করেছেন। শে ধনু বহুকালের পুরাতন জির্ন্ন হয়েছিলো।'[৭৮]

হনুমানের এই মূর্তি প্রচলিত তুলসীদাসী, বাল্মীকি বা কৃত্তিবাসী রামায়ণে নেই, সূত্রাকারেও উল্লিখিত হয়নি। কিন্তু ভক্ত হনুমানের এই প্রতিক্রিয়া স্বাভাবিক লোকগ্রাহ্য, ওই রকম এক পরিস্থিতিতে রামের অপ্রত্যাশিত আচরণে যে নাটকীয়তার সম্ভাবনা ছিল কথক সেই সুযোগ ছেড়ে দেননি। ভক্ত হনুমানকে দিয়ে রামের আচরণের প্রতিবাদ কথক করিয়েছেন। ন্যায়পরায়ণ ও সীতাভক্ত বলে হনুমান লোকগ্রাহ্য চরিত্রে মিশেও গেছেন।

এই রকমই আর একটি টুকরো ঘটনার কথাও কথক উল্লেখ করেছেন, একটি ভাবকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য। স্বর্ণলঙ্কায় লক্ষ্মণ মোহগ্রস্ত, অযোধ্যায় ফিরতে ইচ্ছুক নন। তাই লঙ্কার বাইরে বেড়াতে গিয়ে দেখলেন যে মাথায় আগুনের পাত্র ও পায়ে লৌহবর্ম্ম পরে এক দল কৃষক চাষ করছে। মাংসাশী পাখি ও বিষধর সাপের উপদ্রবের জন্য তাদের ওই রকম বেশ। তখন,

> লক্ষ্মণ উ ॥ এইস্থানে জদি এতো ভয় এস্থান ত্যাগ করে অন্যত্র বাশ করো না। কৃশকেরা বলেন শে শত্য। কিন্তু জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী। এই নিমিত্ত আমরা এস্থান পরিত্যাগ করে অন্যত্র গমন করতে পারি না, লক্ষ্মণের মনে? আমারো জননী জন্মভূমি আছে।[৭৯]

এইভাবে নানা জায়গা থেকে শোনা, তুলনামূলকভাবে অপ্রচলিত সূত্র থেকে নেওয়া বা নিজেরই তৈরি করা গল্প কথার বুনটে ধরা থাকে, অভিযোজনের মধ্য দিয়ে কথকের বৈশিষ্ট্য বোঝা যায়। আখ্যানগুলোর মার্গীয় কাঠামো, এই রকম সংযোজন ও কথান্তরের ফলে লোকভাবনার নানা স্তরে প্রসারিত হয়। পরিবর্তিত হয়ে দেশজ রীতির অঙ্গ হয়ে ওঠে। হুতোমি ঠাট্টায়, কথকঠাকুর বস্তুত যা বলেন, 'সকলি কাশিরাম খুড়োর উচ্ছিষ্ট ও কোনটা বা স্বপাক'।

কথার অন্য লক্ষ্মণ বিচারে দণ্ডী নির্দেশ দিয়েছেন প্রাকৃতেও কথা গ্রাহ্য। ভারতের শ্রেষ্ঠ কথা সংগ্রহই তো লেখা হয়েছে, 'ভূতভাষায়'। যে কোনও কথকতার পুথিতে নানা ভাষার সমন্বয় চোখ এড়াবার নয়। এক দিকে সমাসবদ্ধ দীর্ঘ বাক্য, বর্ণনা, সাট অন্য দিকে যথাস্থানে সুযোগ মতো পরিস্থিতি বুঝে একেবারে লোকজ সংলাপ। একটা নজির দেওয়া যাক:

> ক্রমশ দেবকীর গর্ভ বর্দ্ধিত হতে লাগিল। একদা মথুরাবাশিনী স্ত্রি শকল কুম্ভকক্ষে যমুনার জল আনয়ন করিতে গমন করিতেছে পথিমধ্যে মনে ২ 'অ দিদি চল ন্না একবার দেখে যাই কারাগৃহে বসুদেব দেবকী কি কর্চে। অন্নি জাৎ লোকের ভাল্লয় হগ, আর মন্দই হগ. না দেখলে যাবেন না।' পথিমধ্যে কুম্ব রক্ষ্যা করে কারাগৃহদ্বারে গমন করে দ্বারের উভয় পার্শ্বে হস্তার্পণ করে দাড়িএে দেখেন দেবকীর বশুদেবের রূপেতে করে কারাগৃহ জেন আলোকিত হএেচে। দেখে বলেন মাগো বসুদেব রূপেতে জেনো ফেটে মরচে। মাগির কিরূপ হএেচে। মাগিদিগে চাও জায় না। মিনশে জেন রূপের কাঁদি হয়েচে। কোন স্ত্রি বলেন তা অমন হয়। জতো বেটা বেটি মরে বাপ মাএের রূপ হয়, গতর লাগে।[৮০]

বর্ণনা সাধুভাষায়, তৎসম শব্দযুক্ত সংলাপে শব্দ প্রয়োগের ধরন একদম অন্যরকম 'মাগি', 'গতর', 'রূপের কাঁদি' ইত্যাদি প্রাকৃত শব্দ প্রয়োগে বাছ-বিচার নেই। যা কথায় স্বাভাবিক, পুথিতে হুবহু তাই বসানো হয়েছে। এই স্বচ্ছন্দ 'গুরুচণ্ডালি' কথকতার ভাষার জোর: কেবল স্ত্রীদের সংলাপেই নয়, পরিস্থিতি বর্ণনাতেও এর লাগসই প্রয়োগ দেখা যায়। বৃন্দাবন থেকে মথুরায় কৃষ্ণকে আনার জন্য দূত চাই: দূত খোঁজার আয়োজনের বিবৃতি লক্ষণীয়:

> বৈষ্ণব না হলে বিশ্বাস করে আসবে না। একজনা বৈষ্ণব দেখ। এই সুনে মালা ছিঁড়ে তিলক পুছে সব পলায়ন। একজন দেখে বলেন ঐ বৈষ্ণব কিহে তুমি বৈষ্ণব নও। কোন পুরুষেই নই। অপ্রলাপ কথা জাকে জা নয় তাই বল। উহু মসয় পাওয়া যায় না। একজনা বলে অক্রুর মালা হাতে করে না। হাঁ হাঁ ডেকে আন। উনি শুনে বাড়ী গিয়ে লুক্কাইত। অক্রুরের স্ত্রী বলে বড় হাঁপিয়ে এলে জে। চুপ কর ২। তুমি হাতের কগাছি রাখবে না খুয়বে বলত। কংস দূত ধর্ত্তে আসছে। তুমি জেন প্রকাশ করো না। আ মলো পোড়া কপালের দশা। তেমন মেয়ে নই বলবার জন্য মর্চ্চি। এমন কালে কংস দূত আগমন কোথা গো অক্রুর বাড়িতে আছ।[৮১]

সংলাপ ও ভাষার বিন্যাসে নাটকীয়তা সৃষ্টি করা হল। মথুরায় ত্রাস ও শোরগোল, সেই মেজাজের সঙ্গে তাল রেখে ভাষা ও সংলাপ সাজানো হচ্ছে যাতে করে বলার সঙ্গে সঙ্গে ওই ভাব কথার বাঁধুনিতে ধরা পড়ে। বিবৃতির বয়ানটা প্রত্যক্ষ, পরোক্ষ নয়। 'যদুশ্রেষ্ঠ' কংস-পার্ষদ অক্রুর রূপান্তরিত হচ্ছেন ভক্ত কিন্তু ভীরু বৈষ্ণবে।

আবার আর্তির ও আসন্ন অপমানের ভয়ের মেজাজকে ধরা হয়েছে সরাসরি সংস্কৃত শ্লোক ও টেনে টেনে বাক্য রচনার মিশেলে। পাশাখেলায় পাণ্ডবরা পরাজিত হবার পর একটি পুথিতে দ্রৌপদীর অবস্থা ও মানসিকভাবের পরিচয় দেওয়া হয়েছে এইরকম ছত্রে:

> মহারাজ জন্মেজয় কি কর্বো। রাজসূয়াবভূমে জনেন মহাক্রতৌমন্ত্রপূতেন শিক্তাঃ। সা পাণ্ডবানাং পরিভূয়বীর্যবলাৎ প্রমৃষ্যাধৃতরাষ্ট্রিয়েন। উ।। মৃত্যু উপস্থিত বুঝি।। কি হলো রে।। বাড়িতে ডেকে এনে এই করলে। ধন নিলে।। এই অপমান।। গোবিন্দভিষিক্ত এ কেশ। কালশাপ দংশিলে সে বিষত্রাণ পাবি নে।[৮২]

কথকতায় ভাষা বদলের এই নজরকাড়া রীতি বঙ্কিমের সমজদারিতে ধরা পড়েছে। তাঁর মতে, কথকতায় নানা অঙ্গ, ব্যাখ্যা, বর্ণনা, পদাবলী ও গান। প্রথম অঙ্গে ভাষা সংস্কৃতানুসারী, জমাট ভাবকে শিথিল করে। পরিস্থিতি বর্ণনায় আবার ভাষা প্রয়োজন বোধে জমাটি, সংস্কৃত-অভিসারী। পদাবলীর উদ্দেশ্য ঝঙ্কার ও লালিত্য তৈরি করা; রসানুযায়ী গানের ভাষার রকমফের হয়। কিন্তু এই সবের মধ্যে কথকতার ভাষার নিজস্বতা দেখা যায় পরিস্থিতি বর্ণনায়, 'রসোদ্দীপন' যার লক্ষ্য। বঙ্কিমচন্দ্রের নিজস্ব কথায়:

> ইহার বাক্য (Sentence)-গুলি ক্ষুদ্রাবয়বের হয়, অনেক ক্রিয়াপদ অনুক্ত থাকে,

> অনেক ক্রিয়া বিশেষণও অনুক্ত থাকে, ক্ষুদ্র বাক্যের পর দীর্ঘচ্ছেদ থাকে, কখন কখন কোন বিশেষ কথায় শ্রোতার (বা পাঠকের) মনঃসংযোগ করার জন্য পুনরুক্তি থাকে, আর কথকদের স্থানে এই ভাষার সহায়কারী নানা ভঙ্গী থাকে। এই ভাষা হৃদয়চ্ছেদ করিয়া পাটে পাটে বসিতে থাকে।...ইহাতে ছোট ছোট জমাট বাক্যের গাঁথনি থাকে। জমাট পদগুলিকে পৃথক করিয়া লইলে সংস্কৃত পদ বলিয়া বোধ হইতে পারে, কিন্তু সমস্ত গাঁথনি ভাগবতের ন্যায় জটিল রীতি যুক্ত নয়।[৮৩]

কথকের মুনশিয়ানার আর একটি পরিচয় হল তত্ত্বকথা আলোচনা করা, নানাভাবে সামাজিক মূল্যবোধ ও আচারের সঙ্গে কাহিনীকে সংযুক্ত করা। সরাসরি কথক ব্যাখ্যার মাধ্যমে, প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে, এই জাতীয় ক্ষেত্র তৈরি করতে পারেন বা অনেকসময় চরিত্ররা সংলাপের মাধ্যমে নানা পরিস্থিতির উপর মন্তব্য করেন। যাকে চিরন্তন ও শাশ্বত বলে মনে করা হয়, তাকে দৈনন্দিনতার মধ্যে মেশাতে হবে, তা না হলে কথকতার সামাজিক গ্রাহ্যতা বিপন্ন হবে, যৌথের ধারণার সঙ্গে কথকতার বিযুক্তি ঘটবে।

শিবের বিবাহের পর শিব বাড়ি যান না, ঘর জামাই হয়ে থাকেন, মেনকার জ্বালার অন্ত নেই। কথক রামপদ ভট্টাচার্য নিজে একটি বাক্যে প্রেক্ষিত ঠিক করেন, পরে মেনকার উক্তি বসান:

> এখন শশুর বাড়িতে অধিককাল থাকলে সকলে বিরক্ত হয়। একদা মেনকা উ।। আমি একলা মেয়েমানুষ কদিক করবো। প্রত্যহ আর জামাই আদর কর্ত্তে পারি না। উমাও ঘরের একখানি কাজ করবে না। কেবল দুজনে খাবেন আর ঘরের ভিতর রাতদিন বসে থাকবেন, দেখে দেখে গা জ্বলে যাচ্ছে। জামাইটি মানুষ হয় না। কেবল ভাঙা ধুৎরা খাবে আর চিরকাল শশুরবাড়ি বসে থাকবে। এদের উপায় হবে কি।[৮৪]

'ইতিহাস শৃণু', এই বললেন একজন কথক। 'এখন শশুর বাড়িতে অধিককাল থাকলে সকলে বিরক্ত হয়', এই কথা লিখলেন আর একজন। অতীত ও বর্তমান দুটোই বলা যেতে পারে, পৌরাণিক সময়ের মধ্যে ঢুকে পড়ে। বর্তমানকে মাথায় রেখে মেনকা উচ্চারণ করেন লাখ কথার এক কথা 'এদের উপায় হবে কি?' উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে গ্রাম বাংলার বা মফস্বলী শ্রোতার কাছে প্রশ্নটা পরিচিত, তাৎক্ষণিক। পৌরাণিক আখ্যানের মধ্যে বাস্তব উঁকি মারে।

আবার কতকগুলি আখ্যানের ঝোঁক এইরকম, যে তত্ত্বকথা আনতে হয়, না হলে মূল্যবোধের সঙ্কট দেখা যাবে, পুরুষতান্ত্রিক সমাজে লালিত নৈতিকতা মার খাবে। 'রাসলীলা' কথকতার অতি জনপ্রিয় আখ্যান, বৈষ্ণবীয় তত্ত্বের কেন্দ্রবিন্দু অথচ লৌকিক ক্ষেত্রে তার তাৎপর্য 'উচ্ছৃঙ্খলতার' জন্ম দিতে পারে। নানাভাবে কথকতার পুথিতে এই সমস্যাকে মোকাবিলা করতে হয় কারণ শ্রোতাদের মধ্যে মেয়েদের সংখ্যা তো আর কম নয়। তাই পুথিতে সরাসরি সমস্যা উত্থাপন করতে হয়, পূর্বপক্ষ ও সিদ্ধান্ত পক্ষের ধাঁচে তাকে নিরসনও করতে হয়। উদাহরণ দেওয়া যাক।

এক উপপতি শেবা অতি ভয়াবহ কর্ম্ম। কোন গৃহস্থের গৃহে গমন করলে পর তাকে সমাদর করে না। নিকটে বশতে দেয় না। সকলের নিকট খাটো হয়ে থাকতে হয়। অধিক কি বাড়ির চাকর তাকে বলতে হয় চাকর বাবা ভাৎ খাও এসে। সে বলে জায় মা ঠাকরুণ তোমার স্বভাব ভালো নয় তোমার হাতের অন্ন ব্যঞ্জন ভোজনে ইচ্ছা হয় নাই। দেখোদেখি এমনি কর্ম্ম চাকরের নিকট খাটো হয়ে থাকতে হয়।[৮৫]

এইরকম সামাজিক অবস্থায় গোপীদের প্রেম কেন সমর্থনীয়? যুক্তি দেওয়া হচ্ছে :

এক জে অমৃত তারে বিশ জ্ঞানে পান কল্লেও অমর করে। এক অমৃতজ্ঞানে পান কল্লেও তাতেও অমর করে। অমৃতের কার্জ যে অমরত্ব প্রদানত্তাই করে থাকে। তেম্নি পরমাত্মা জে হরি তাকে গপি শকল উপপতি বুদ্ধিতেও চিন্তা করেও গুণময় দেহ ত্যাগ করে নিত্য দেহ পেয়ে কৃষ্ণ নিকটে সর্বাগ্রে গমন কল্লেন। ....জে কাম নরকপ্রদ সেই কাম জদি ঈশ্বরে অর্পণ করতে পারো তাহলে সে মুক্তি লাভ করে। জে জেভাবে চিন্তা করুগ। তা হল্লেও তো ঈশ্বর চিন্তা হয় ॥[৮৬]

কিন্তু কৃষ্ণের তরফে যুক্তি কী? সমস্যা প্রশ্নাকারে রাখা হল, পূর্বপক্ষ স্থাপিত হল।

পব স্ত্রি জে গোপীসকল তাহার সহিৎ রাশ ক্রিড়া কল্লেন। এতে ধর্ম্মের বিরুধ্বাচরণ হলো! জদি বলেন আপ্তকাম পুরুষের ইহা অধর্ম্ম নয়।... আমার এই জিজ্ঞাশ্যো। জদি জদুপতি শ্রীকৃষ্ণ আপ্তো কাম তবে কি অভিপ্রায়ে নিন্দিত ফর্ম্ম করলেন। এ বিষয়ে আমার সংশয় উপস্থিত হয়েছে।[৮৭]

সংশয় নিরসন করা হল, পূর্বপক্ষের আপত্তি খণ্ডন করা গেল।

ধর্ম্ম ব্যতিক্রমো দৃষ্ট।...জেমন শর্বভুক অগ্নি সকল ভোজন করেন বিষ্ঠাও ভোজন কর্চ্ছেন এবং গো-মহিশাদি ভোজন কর্চ্ছেন। তা বলে কি তিনি অপবিত্র হন। সেই অগ্নি আবার যজ্ঞিয় হবি ভোজন করে থাকেন।
...জদি বলেন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ আপ্তকাম হয়েও॥ তিনি এরূপ কার্জে কেনো প্রবিত্ত হয়েন ॥ এ বিষয়ে আপনি শ্রবণ করন। জদিও ভগবান আপ্তকাম তথাপি ভক্তজনের প্রতি অনুগ্রহ করার নিমিত্ত মনুষ্যদেহ আশ্রয় করে এইরূপ রাশক্রিড়া করেন।[৮৮]

আর শেষ কথা হল সব কাজ সবার সাজে না, ক্ষমতার তারতম্য আছে। দেবতা বলে কথা। ক্ষমতার ভাষাকে শেষপর্যন্ত রূপান্তরিত করা হয় যুক্তিতে,

...জেমন রুদ্র মহাদেব ব্যতিরেকে অন্য ব্যক্তি বিশ পান কল্লে তৎক্ষণাৎ মৃত্যু হয় তেমনি কোন মূঢ় ব্যক্তিরা জদি মনে করেন ॥ জে কৃষ্ণ রাসলীলা করেচেন এবং বস্ত্রহরণ করেচেন আমরা তাই করবো অই কথা মনে করে॥ জদি সেই কার্যে প্রবৃত্ত হয় তৎক্ষণাৎ তার মৃত্যু হবে।[৮৯]

যুক্তিগুলি আদৌ নতুন নয়। ভাগবতে রাসলীলা প্রসঙ্গে অনুরূপ কথা বলা হয়েছে। পরীক্ষিৎ প্রশ্ন করেছেন, শুকদেব বলেছেন; আত্মকামত্ব, অগ্নির সর্বভুকত্ব, রুদ্রের বিষপান ইত্যাদি অনুষঙ্গগুলি উল্লেখ ভাগবতসম্মত। কিন্তু ভাষার প্রয়োগে বলার ঝোঁকে তারতম্য ধরা পড়ে। শাপমন্যি নতুন করে পাঠক্রমে ঢোকানো হলো। ভৃত্যরা যে গিন্নির হাতে খেতে চায় না, ঠাকরুনকে অমর্যাদা করে, এটা সংযোজিত। থাকবন্দী সমাজে কর্ত্রীর মর্যাদা, অধিকারভেদ যে ভক্তির পরতে পরতে জড়িয়ে থাকে, ভাগবতী আখ্যানের এই সূত্রকে বিশেষভাবে নজরে আনাটা কথকের কাজ। তত্ত্বকথা পরিবেশনের ক্ষেত্রে ভাষ্যকার ও টীকাকারের সঙ্গে কথক মিশে যাচ্ছেন।

সমাজে পাতিব্রত্য এবং গোপীদের পরকীয়া প্রেম, এর মধ্যেকার দ্বন্দ্ব মেটাতে কথায় নানা যুক্তি আনতে হয়, উপমাকে, দৃষ্টান্তকে ব্যবহার করা হয় যুক্তি হিসাবে, শেষে শাপের ভয়ও দেখাতে হয়। কথক ধর্মবক্তাও বটে, তাকে পরম্পরাগতভাবে গল্পও বলতে হবে আবার লক্ষ্যও রাখতে হবে যে সামাজিক স্থিতি না ভেঙে যায়, তাহলে শ্রোতার সমাজই বদলে যাবে, আসরের উদ্দেশ্য মার খাবে।

সময় সময় কথান্তরে যাবার খাতিরেও প্রশ্নোত্তর রাখা হত, যাতে করে বলাটা বেখাপ্পা না হয়ে যায়। যেমন কালিয়দমন পালার একজায়গায়,

> রাজা উ॥ গুরো গা এ কেমন হলো। এই আপনি পূর্বে বললেন ফানী-এর বিশ তেজেতে জমুনার উভয় তীরে বৃক্ষলতা ঔষধি তৃণ পর্জন্ত জলিত হয়েছিলো। কিন্তু সে স্থানে কদম্ববৃক্ষ কিরূপে জীবিত ছিল। শুদেব উ॥ মহারাজ কি শ্রোতা॥ আপনি॥ আপনারে শ্রোতা পেএে আমি কৃতার্থ হলাম। মহারাজ শুন শুন। এই কদম্ববৃক্ষ কিরূপে জীবিত ছিল তাহার কারণ শুন..[১০]

এই কথার পরে অন্য কথা শুরু হয়, গরুড়ের অমৃত আহরণ ও কদম্ববৃক্ষে রেখে ক্লান্তি অপনোদন। প্রাসঙ্গিক ভাগবতী শ্লোকে কদম্ববৃক্ষের উল্লেখ আছে, একটানে গল্পের ফাঁকে ঘটনাটি একটি শ্লোকে বলা হয়েছে। প্রশ্নোত্তরের রীতি ভাগবতে আছে, প্রথাসিদ্ধ। কথক ঠাকুর সেই রীতি ব্যবহার করে কথান্তরে গেলেন। ভাগবতে অনুষঙ্গ একটি শ্লোকে সারা হত, কথকতায় সেটা এক পাতা জুড়ে চলল, বেতালা মনে হল না। প্রশ্নের উত্তর হিসাবে যে আখ্যানটা বলা হয়েছে।

সংস্কৃত রসশাস্ত্রের বিচারে 'কথা' ও 'আখ্যায়িকার' বহিরঙ্গ নিয়ে ভামহ ও দণ্ডির কুটকচালি তর্ককে অপ্রাসঙ্গিক করে তুলেছিলেন বাণভট্ট। একটি নিবন্ধে এই তর্কের বিবর্তন নিয়ে মনোজ্ঞ আলোচনা করেন সুশীলকুমার দে। শেষপর্যন্ত 'রসেই' কথার পরিণতি। আলোচনা থেকে 'কথার' দুইটি নান্দনিক সূত্র পরিষ্কার।[১১] মহাভাষ্যের টীকাকারেরা আলোচনায় বার বার 'গ্রন্থিক' শব্দটিকে কথকের প্রতিশব্দ হিসাবে ব্যবহার করেছেন, ধারণা গ্রন্থনের, কথনের।

বাঁধুনি ও 'গাঁথনি'টা জরুরি। শ্রোতাদের মজলিশে 'কথা'কে গেঁথে তোলা কথকের কাজ। সেইখানে কাহিনীর উৎসবিচার ততটা প্রাসঙ্গিক নয়। কথা জমাটি হচ্ছে কিনা, জমাটি কথা জমায়েতকে ধরে রাখতে পারছে কিনা, সেইটা বিচার্য। এই জমাট বাঁধার

গুণ আবার নির্ভর করছে কথকের বুদ্ধিতে বিষয় কীভাবে অধিগত হল, তার উপর। কথকী রীতি কেবল গ্রন্থগত নয়, স্বকীয় বুদ্ধিতেও বটে।[১১]

তাঁর বিচারে ভামহ জানিয়েছেন যে কথা হল পুরোটা রচা কিন্তু কথায় প্রবাহ থাকতে হবে।[১২] প্রবন্ধের 'ভাবিকা' গুণ থাকে, তার প্রসাদে অতীত ও ভবিষ্যৎ মানসচক্ষে প্রত্যক্ষ হয়। এই 'ভাবিকত্ব' বা ভাবিকা সিদ্ধ হবার অন্যতম শর্ত 'কথায়াঃ স্বভিনীততা', কথাপ্রবাহ। উর্দূতে 'স্বভিনীততার' সুন্দর প্রতিশব্দ হল 'রওয়ানি'। ' বাঁধুনি' ও 'রওয়ানি', এই দুটি গুণ যখন পরস্পরের প্রতি স্পর্ধা নিয়েও 'সাম্যে' অবস্থান করে তখন কথা হয়ে ওঠে শিল্প রসে ভরপুর। 'কথায়াং সরসং বস্তুং গদ্যৈরৈব বিনির্মিতম্।'[১৩]

ভামহী ধারণানুসারে সরসবস্তু গদ্যে লিখিত হলেও তাকে 'শ্রব্য' বা শ্রবণমনোহর হতে হবে। স্বর ও সুর সংযোগে শ্রবণীয় কথার চমৎকারিত্ব বা মনোহারিত্ব বৃদ্ধি পায়। এক্ষেত্রে সহযোগের, ঘটকালির চিন্তা কার্যকর। 'সহিতের' তত্ত্বে স্বর ও সুর সংযোগে শব্দ গ্রন্থনা ও তার পাঠ হয়ে ওঠে কথকতা।

স্বরের কথা, সুরের খেলা

মন্দিরের পুরোহিত ও টোলের অধ্যাপকের পদ নিয়ে দুই ব্রাহ্মণ যুবকের মধ্যে জবর প্রতিদ্বন্দ্বিতা। লাজুক অম্বরনাথ এবং চতুর ও বাকপটু আদ্যনাথ। এই লড়ায়ের ক্ষেত্র হল কথকতার আসর। জমিদার কন্যা বাণী সমজদার, ছেলেবেলা থেকে কথকতা শুনে তার কান তৈরি। স্নানযাত্রা থেকে ঝুলন পর্যন্ত মাসাবধিক কাল আসর বসে, গ্রামবাসীরাও শোনার অভিজ্ঞতায় কম যান না, তাঁদের গ্রামে ভাগবতী কথকতা প্রতি বৎসরে অনুষ্ঠিত হয়।

'মুখচোরা অম্বর', নিজের চিত্তরঞ্জনের জন্য 'শুধু নীরবেই পাঠকার্যে' অভ্যস্ত। ফলে কথকতার আসরে বসে তার করুণ অবস্থা হয়। পাঠকার্যে অনভ্যাসের দরুণ,

> সে ঘামিতে লাগিল। কথা বলিতে বলিতে মধ্যে মধ্যে সে থমকিয়া থামিয়া পড়ে, কণ্ঠ যেখানে তারায় তুল্লিতে হইবে, সেখানে উদারায় নামিয়া আসে, যেখানে হর্ষে উচ্ছ্বসিত হইয়া কহিতে হইবে, সেখানে কণ্ঠ বাধিয়া নবোঢ়া বধূর মত লজ্জায় অস্ফুটতর হইয়া আসিয়া হয়ত শেষে থামিয়ে যায়।.. শ্রোতার দল প্রসন্ন হয় না, বক্তা লজ্জায় মাটি হইয়া যাইতে চাহে।[১৪]

আদ্যনাথ দক্ষ কথক, তাঁর কথকতা স্বরক্ষেপণে সিদ্ধ। তাঁর কথকতা শুরু থেকেই জমে ওঠে।

> স্ফীতবক্ষে টগর ফুলের মালা পরিয়া কণ্ঠস্বর কখনো পঞ্চমে কখনো ভৈরবীতে কখনো বেহাগে কখনোও বা আবার ললিত রাগিণীতে উঠাইয়া নামাইয়া হাসাইয়া কাঁদাইয়া নদীতরঙ্গের মত অবলীলায় যে বাহিত করিয়া দিয়াছে, সে আদ্যনাথ।[১৫]

ভূদেবের পরিবারের মেয়ে লেখিকা অনুরূপা দেবী, কথকতা তাঁর পরিচিত শিল্প। তিনি জানেন যে কথকী দক্ষতার অন্যতম উৎস হল স্বরের কুশলী নিয়ন্ত্রণ।

ভরতমুনির নাট্যশাস্ত্রে 'কাকুস্বররঞ্জক' অধ্যায়ে স্বর প্রয়োগের রীতিনীতি নিয়ে আলোচনা আছে। ভাব সৃষ্টির সঙ্গে স্বর প্রয়োগের যোগ নিবিড়। ভাব অনুযায়ী, পরিস্থিতি অনুযায়ী, কণ্ঠস্বরের পরিবর্তন। কোথায় তা হবে মন্দ্র (কণ্ঠস্থ বিলম্বিত ধ্বনি), আবার কোথায় হবে দীপ্তা। প্রয়োক্তদের প্রতি অনুপুঙ্খ নির্দেশ আছে। 'ভাবেযেতেষু নিত্যং হি নানারসসমাশ্রয়াৎ।' কণ্ঠস্বরের ওঠানামার সম গুরুত্বপূর্ণ বিরাম। বিরামের প্রযত্ন আবশ্যক, বিরাম অর্থসূচক। বিরামই 'অর্থসমাপ্তি নিমিত্তং' এইকথা অভিনবগুপ্ত তাঁর টীকায় মনে করিয়ে দিয়েছেন।[৯৭] বিরামে গোলযোগ হলে অন্য অর্থ হবে।

নাট্যশাস্ত্র একটি সংগ্রহ গ্রন্থ। এর শিকড় নিহিত আছে ব্যবহারিক ও লৌকিক অভিজ্ঞতায়। টীকায় অভিনবগুপ্ত চেষ্টা করেছেন তাঁর নিজের দর্শন চাপাতে।[৯৮] লোকবৃত্তি বা লোকস্বভাবের অনুসরণে বিরামের জন্য কথকরা বলার ভঙ্গি চালু করেছিলেন, যে ভঙ্গির কথা নাট্যশাস্ত্রেও উল্লিখিত হয়েছে।[৯৯] এই ভঙ্গি প্রসঙ্গে তারাশঙ্করের সাক্ষ্য হল,

> নিশাপতি গম্ভীরভাবে বললে, দেবর্ষি নারদকে দেখে ব্যাস বললেন—অহো ভাগ্য! আসুন-আসুন-আসুন, দেবর্ষি সমস্কার।
> নিশাপতি তখন ভাগবত কথকতার এ ষ্টান্টটুকু আয়ত্ত করেছে। সেকালে ভাগবতের আসরে এইভাবে অনেকজন আগন্তুক কথকের সাদর সম্বর্ধনায় আপ্যায়িত হয়ে বিনয় প্রকাশ করে অপ্রস্তুত হতেন।[১০০]

স্বরক্ষেপণ ও স্বরভঙ্গি কথকরা অভ্যাস করতেন, আসরে সেইভাবে বলতেন। বিক্রমপুরের বাসাইলনিবাসী রাখালচন্দ্র গোস্বামী হলেন বংশগতগুরু, শিষ্যবাড়িতে তাঁকে পাঠ করতে হত, কথকতা করতে হত। গলার স্বরক্ষেপণে স্বাভাবিক নিপুণতা ছিল তাঁর বৈশিষ্ট্য। প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা থেকে একজন সাক্ষ্য দিয়েছেন যে ভাওয়ালে আসরে বসে বলার ঝোঁকে বলেছেন, 'তোমার বাড়ী কোথায়?' সামনে বসে থাকা শ্রোতা সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিয়েছে, 'হ্যাপার পরাণ গ্রাম।'[১০১]

এই কৃৎ-কৌশলকে মাথায় রেখে কথকরা পুথি লিখতেন। পুথির বিন্যাসে ও ভাষায় তার ছাপ আছে। পুথিসংলগ্ন হরিনাম মাহাত্ম্যের একটি চূর্ণীতি টানা বাক্য সমষ্টি লেখা আছে। অর্থ অনুযায়ী বিরামপূর্বক পড়া বিধেয়। যেমন,

> ভাইরে বেদেয় হরি রামায়ণেয় হরি আদ্যে হরি অন্তে হরি হরি চলো কোন ভয় নাঞি কোন শ্রম নাঞি কোন ক্লেশ নাই মুখে হরি বললেই হয় রে অনাআশে, পরমপদ পাবে রে। ভেবে দেখো দেখি ছিলেই বা কথা এলেই বা কথা সেখানে কি কথা বলে এলে বিষয় পেয়ে ভুলে গেলে কিছু মনে নেই ধনোপার্যেণ করো গৃহ ব্যাপার করো স্ত্রী পুত্রাদির লালনপালন করো তা যত বারণ করেন নাঞি তায় করো আর থেকে ২ মুখে একাকার হরি ২ বলে ডাক গো জন্ম সফল হবে কুল পবিত্র হবে।[১০২]

লেখায় কোনও যতিচিহ্ন নির্দেশ নেই। অথচ পড়লেই বোঝা যায় কোথায় থামতে হবে, কোথায় বা শুরু করতে হবে। এইবার কথোপকথনের একটা নমুনা পেশ করা

যেতে পারে।

> এখানে দ্রৌ পাকগৃহে দ্বারে অঞ্চল পেড়ে সয়ন। নিদ্রা। এই সময় দুঃস্বা ছুটে গিয়ে চরণে পড়েছে। চোকবুজে উ৷৷ কেয় ঠাকুর পো? কেন? একি। চক্ষে জল কেন। উ৷৷ আমাদের সর্বনাশ হয়েছে। এলোকেশে সোনার প্রতিমা আঃ এই দণ্ড খানিক নিদ্রা হয়েছে কেন ঞেদের সঙ্গে বিবাদ হয়েছে। না। তবে কি মুখ ম্লান কিছু খাও নাই।... দুঃস্বা চকে হাত দিয়ে রোদন। ঘরে থেকে সাধ করে বৌ এনেছিলাম। বৌরে বৌ। তাদের কেশ ধরে নিয়ে গেল। বৌরে বৌও ও। এনে দে তোর পায়ে পড়ি। বৌরে বৌ। উ ৷৷ ভয় নাই।[১০৩]

উপযুক্ত অনুচ্ছেদে দ্রৌপদী ও দুঃশাসনের মুখোচ্চারিত বাক্য এক স্বরে পড়লে চলবে না, তাল ও বিরামে পার্থক্য আছে, তাই দিয়ে পরিচিতি অনুযায়ী চারিত্রিক মেজাজ বোঝা যাবে। বাক্যবন্ধ ও যতির মধ্যে রীতিনির্দেশ স্পষ্ট। পাঠ্যস্বর অনুযায়ী শ্রোতাদের কাছে বিশেষ আবেদন বিজ্ঞাপিত হবে, এই কথা মনে রাখা আবশ্যক।

বাঙালি কথকদের পাঠরীতিতে একটি বিশেযত্ব নজর এড়াবার নয়। সংস্কৃতবহুল বাক্যাবলী বা 'সাট' বা 'চূর্ণীর' প্রয়োগ বাঙালি কথকতার রীতি ছিল। অনুপ্রাস ও সংস্কৃতবহুল শব্দ পাঠের ঝোঁকে ঝংকার তোলে, অর্থ ব্যতিরেকে শ্রোতাদের অভিভূত করে থাকে। এই কায়দায় কথকরা নিপুণ ছিলেন। রবীন্দ্রনাথের ভাষায়,

> আমাদের দেশের কথকরা এই তত্ত্বটি জানিতেন, সেইজন্য কথকতার মধ্যে এমন অনেক কান-ভরাট-করা সংস্কৃত শব্দ থাকে এবং তাহার মধ্যে এমন তত্ত্বকথাও অনেক নিবিষ্ট হয়, যাহা শ্রোতারা কখনই সুস্পষ্ট বোঝে না কিন্তু আভাসে পায়—এই আভাসে পাওয়ার মূল্য অল্প নহে।[১০৪]

সাটের সব শব্দের অর্থ বোধগম্য হয় না। সময় সময় অর্থও সামান্য, পুনরুক্তিতে ভরা। অথচ শব্দ ঝংকারে যে সৌন্দর্য আভাসে সৃষ্টি করে, তা শ্রবণ তৃপ্তিদায়ক। অর্থের বোধ সেক্ষেত্রে তত্টা প্রয়োজনীয় নয়, হয়তো রস উপভোগের বাধক। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ও যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধির বাল্য বয়সের অভিজ্ঞতাও রবীন্দ্রনাথের রসবিচারের অনুসারী। যোগেশচন্দ্রের জবানীতে,

> মনে পড়ে, নয় বৎসর বয়সে রামায়ণ নিয়ে কাড়াকাড়ি করেছি। বছর পাঁচ ছয় পরে রামায়ণ কথা প্রথম শুনি। সে কি আনন্দ! কথক ঠাকুরের বাক্যচ্ছটা বুঝতে পারতাম না, কিন্তু তা-তে কিছুই এসে যেত না, খেই হারাত না।[১০৫]

উনিশ শতকে 'কথকতার সুর' বেশ চালু শব্দ। স্বরের সঙ্গে আছে সুর, গান বাঁধার কাজ। কিছু পালা তো সুরে ছন্দে লেখা হত, তাদের শিল্পীরা হতেন গায়েন। কথকদের বানানো গান বেশিরভাগ সময়ে পৃথকভাবে লেখা হত, পুথিতেও আলাদা সংযোজিত হত। গান নানা সূত্র থেকে নেওয়া হত, টুকে রাখা হত, প্রয়োজনে কাজে লাগতে পারে।

কথক মহানন্দের হাতে লেখা গানের খাতা সবচেয়ে বড় প্রমাণ। শ্রীমদ্ভাগবতের পালায় লেখা থাকত হরি মাহাত্ম্য নিয়ে গান,

গৌড় শারং

> হরে হর মম ভব যাতনাং নাশায়াসু বসুদেব বিশয় বাশনাং। অহম্মদ মত্ত তব জ্ঞান বিহীনে দীন হীন রামধনে সদাবিশয় নিপুণে বিতর করুণাং। ১ ॥ আলিয়া ॥ ইহ মে ভবে রাঘবে কিন্তবে। অহমিহ সদামত্তো বিশয়াসবে। তব ভজন পূজন মনাদযত্য মম মনঃ ॥ মুহ্যতি সতত মহং মামতি রবে ॥ নিবাস সংসার বনে ছিদ্রবহুল ভবনে ॥ নিত্য ভয়ে কলিকাল চোর সম্ভাবে ॥ সদা মহা মোহনিশী তেন দীনোদ্ধব ত্রাসি রাম তব তব শুনৈশি পদপল্লবে ॥ ১ ॥

রামপদ ভট্টাচার্য গানটা লিখেছেন, ‘ রাম’ কথাটি ভণিতায় আছে।[১০৬] কিন্তু গানটা লেখা আছে আলাদাভাবে, পালার কোনও অনুচ্ছেদের সঙ্গে যুক্ত নয়। ভাগবতী পালা। ফলে চূর্ণীর মতো সময় বা জায়গা বুঝে গানটা গাওয়া যাবে, বেমানান হবে না।

আবার সময় সময় পালার সংলাপের মধ্যে গান রাখা হত।

> কোন গপি রাধিকারে বলছেন শখিরে আর কালার প্রেমে কাজ নাই। তখন রাধিকা শখিরে অমন কথা বলিশ নে। শখী ॥
> গান ॥ শে কালো সামান্য কালো নয়। বেদাগমে কয় ॥ মহাজোগী মহাকালো কালোভবে জোগী হয় ॥ কিবা দিবা রাত্রো কালো না ভাএে কালাকালো সর্বদা জে ভাবি। কালো নাহি তারো কালো ভয় ॥[১০৭]

দ্বিজরাজ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি কথকদের আসরে বসলে মনে হয় সে আখ্যানে গানের ভূমিকা সবসময় গল্পের অঙ্গ নয়, বরং অলঙ্কার। কাহিনী বলার ফাঁকে ফাঁকে বিরতির জন্য, গান দেওয়া হয়, বৈচিত্র্য আনা হয়, তা না হলে বিবৃতি একঘেয়ে লাগতে পারে। কথা থেকে গান, গান থেকে আবার কথায় যাওয়া যেতে পারে। হনুমান ভরদ্বাজের আশ্রমে যাচ্ছেন, যেতে তো সময় লাগবে, ওই সময়ে আকাশপথে বর্ণনা না দিয়ে, হনুমানের মুখে দ্বিজবাবু গান বসিয়ে দিলেন,

‘বিমল আনন্দে, সুললিত ছন্দে জগদানন্দে ডাকোনারে’ [১০৮]

আবার লঙ্কায় হনুমান বৃদ্ধবেশে শিবভক্ত রূপে প্রবেশ করবেন, তখন মুখে শিবস্তোত্র স্বাভাবিক, হনুমান শিবস্তোত্র আবৃত্তি করতে লাগলেন, দ্বিজবাবুও স্তোত্র সুরে গেয়ে উঠলেন,

‘শঙ্কর হর পরমেশ, পতিত পাবন দীনেশ।’[১০৯]

কিন্তু কোনও কোনও সময় গানের মাধ্যমে তত্ত্বকথাও বলা হয়। কাহিনীর অন্তর্নিহিত ভাব সুরেলা কথায় যত সহজে গ্রাহ্য হবে, আর অন্যরূপে হওয়া সম্ভব নয়। বাসন্তী দেবী এই রীতিতে সিদ্ধা, দ্বিজবাবুও প্রয়োজনে গানের এইরকম ব্যবহার করেন। হনুমান তাঁর বুক চিরে রাম-সীতার যুগল মূর্তি দেখাচ্ছেন, সেটা রূপক, তার তাৎপর্য গানে ব্যাখ্যা করা হল, ‘জয় মহাবীর জয় ॥’ কথকতায় গান এখানে যাত্রার প্রচলিত বিবেকের কণ্ঠে

সঙ্গীতের ভূমিকা পালন করেছে।[১১০]

গান সংগ্রহ করা রীতি, একজনের লেখা গান অন্যে গাইতে পারতেন। গানও নানারকম, রামপ্রসাদী, কীর্তন, বাউলাঙ্গ, রাগপ্রধান, স্তোত্র ইত্যাদি। সব সুরই যে সহজ সরল, এই কথা মনে করার কোনও সঙ্গত কারণ নেই। অধুনা নিব্রত ব্রহ্মচারী তাঁর ভাগবত পাঠে স্বচ্ছন্দে রজনীকান্তের গান সুযোগ মতো ব্যবহার করেন।[১১১] মহানন্দও গান প্রযোগে উদার মতাবলম্বী ছিলেন। দাশরথি রায়ের গান কথকরা গাইতেন কারণ ভাব ও সুরের ক্ষেত্রে তিনি অপ্রতিদ্বন্দ্বী, জনপ্রিয়ও বটে।[১১২] পুথিতে দেখা যায় যে গান যেন শুনতে শুনতে লেখা হচ্ছে, আঁকাবাঁকা লেখা, আবার অপর পৃষ্ঠায় একই গানের পরিষ্কার অনুলিপি করা হচ্ছে। এক পাতায় এক পিঠে চূর্ণীর কয়েকটা ছত্র, 'পরমধার্মিক দ্বের্দণ্ড প্রবল বল প্রতাপান্বিত, দুষ্টদমন শিষ্টপালন' ইত্যাদি বলে পরীক্ষিতের বর্ণনা, অপর পিঠে গানের কয়েকটা টুকরো ছত্র 'সোনার চাঁদ গোঁড়াচাঁদকে পাগল করিলে' ইত্যাদি।[১১৩] এইগুলি নানা জায়গা থেকে চলতি অবস্থায় নেওয়া হচ্ছে, এইটা স্পষ্ট। ষষ্ঠীর দিনে স্থানীয় কথক এসেছেন, তম্বুরা নিয়ে প্রচলিত আগমনী গীত গাইলেন। ফরমায়েশ মতো একটি নতুন গান গাইলেন, গানটি ওই আসরের এক ১৪/১৫ বৎসরের কিশোরের লেখা, কিশোরটির নাম বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।[১১৪]

গান যাই হোক না কেন, যেই শিক্ষক হোক না কেন, কথকতার আসরে গানের আবেদন সামগ্রিক। পাঠক্রমে স্বরগুলির একক প্রয়োগ বিবেচ্য। কিন্তু যখন সংগীতের মাধ্যমে রসসৃষ্টি হবে, তখন প্রযুক্ত স্বরগুলির সামগ্রিক আবেদনে ভাবটি ধরতে হবে। স্বরলিপি কাঠামো মাত্র। গায়কী, কণ্ঠ, পদ ও সুর মিলিয়ে ভাব রূপপরিগ্রহ করে, শ্রোতাকে মগ্ন করে। কথকের আসরে সংগীতের সামগ্রিকতা অনুভবের বিষয়, লেখা বা বলার মধ্যে সব ধরা যায় কিনা সন্দেহ। তবুও রসভুক্তির একটি পরিস্থিতির বর্ণনা দেওয়া যেতে পারে। অনুরূপা দেবীই আমাদের ভরসা।

> সেদিন কথা শেষে সঙ্গীত হইয়া সভা ভঙ্গ হইল। সেই তাল লয যুক্ত স্বর ও সঙ্গীতের উদ্দীপনা সঙ্গীত শেষ হইলেও বাণীকে অনেকক্ষণ অবধি মন্ত্রমুগ্ধ করিয়া রাখিল। ভ্রাতৃরূপে পরিকল্পিত শ্রীভগবানের উদ্দেশ্যে সদ্য-পুত্র-শোকাতুরা সুভদ্রার গীত, গীতটির মর্ম্ম এইরূপ...জান নাকি তোমার দেওয়া এ জীবন সকল আলোক যদি নিবিয়া যায় তথাপি তোমার আলো এ জীবন হইতে নিমেষের তরেও নিবিবে না। তুমিই আমার অভিমন্যু, তুমিই আমার অর্জুন, তুমিই আমার বাসুদেব, তুমিই আমার সব, আমার সবই তুমি প্রভু।...সঙ্গীতের শেষ কম্পন বৃহৎ খিলানের মধ্যে বিলীন হইয়া গেল। ইহার পরও কিছুক্ষণ কেহ বাক্যোচ্চারণ করিল না।...কথক থামিয়া গিয়াছে, সে (বাণী) এতক্ষণ কিছুই জানিতে পারে নাই। এতক্ষণ সে মন্ত্রমোহে আচ্ছন্নবৎ হইয়া সুভদ্রার কথাই ভাবিতেছিল।[১১৫]

কথকতায় তাৎক্ষণিকতা

উনিশ শতকের প্রথমদিকে রাইপুর থেকে নীলকণ্ঠ দেবশর্মা নানুরে জানাচ্ছেন:

> নিবেদনমিদং, শ্রীযুক্ত দাদামহাশয় ৮ রোজ এ বাটিতে পৌচিআছেন এবং ৯ রোজ পুরাণ আরদ্ধ বাবুদিগ্যের বাটিতে হইআছে জানিবেন লাভাদির কিছু হয় নাই কথকথা উত্তম হইতেছে সকলের মনহিৎ হইআছে আর উত্তর উত্তর ভাল হইতেছে...[১১৬]

'উত্তর উত্তর ভাল হইতেছে', আসর জমে উঠেছে, কথকের সঙ্গে শ্রোতার ঘটকালি হয়েছে, কথক তাদের মনোমত হয়েছে। পুথিতে গ্রন্থনা থাকে, কাহিনী গ্রন্থনে আবদ্ধ। অথচ অনুষ্ঠান রোজ হয়, পুথিকে ঘিরে থাকে শ্রোতা ও পাঠক। সব শ্রোতাও সমান নয়, আসরের আবহাওয়াও সব জায়গায় এক নয়। কথকতার ভাল বা মন্দে তারতম্য ঘটে, কথককে সতর্ক থাকতে হয়, চিঠির বয়ানে তা ধরা পড়ে। তাই বাঁধা পুথির তারতম্য ঘটবে; পুথি মূল খুঁটি। কিন্তু আসরে কথককে পুথির এদিকে-ওদিকে যেতে হয়, হুবহু পুথি ধরে চললে আর 'উত্তর উত্তর' ভাল হবার সম্ভাবনা কম। পুথি দেখতে হয়, ছুঁতে হয়, এবং তার পরে বলতে হয়। দীনেন্দ্রকুমারের বর্ণনায় ছবি স্পষ্ট,

> তিনি (কথক ঠাকুর) তুলটের কাগজে লিখিত ও পাতলা কাঠের আবরণাবৃত প্রায় একহাত দীর্ঘ পুথিখানি সম্মুখে খুলিয়া রাখিয়া মধ্যে মধ্যে এক একটি শ্লোক দেখিয়া লইতেন, এবং তাহা আবৃত্তি করিয়া তাহার ব্যাখ্যা করিতেন; কখন গান করিতেন, ব্যাখ্যা উপলক্ষে নানা গল্প বলিতেন; কখনও হাসাইতেন, কখনও কাঁদাইতেন।[১১৭]

পুথিতে শ্লোক দেখা ও শ্রোতাদের হাসানো-কাঁদানোর মধ্যে ফাঁক অনেক। কথক গান গাইছেন, ব্যাখ্যা করছেন, গল্প বলছেন সবই মুখে, সঙ্গে সঙ্গে চলছে। শ্লোকগুলি সব পুথিতে লেখা। শ্লোক বা মূল কাহিনী কথায় পল্লবিত হচ্ছে, গানে অলঙ্কৃত হচ্ছে, গল্পে বিস্তৃত হচ্ছে। ফলে অনুষ্ঠানের তাগিদে সফল কথকরা আসরে বসে শ্রোতার মনোভাব বুঝে গান তৈরি করেন, গল্পের রদবদল ঘটে, স্বরের পরিবর্তনে ভাবের আবেদনেও রকমফের হয়। আসরের এই তাৎক্ষণিকতা অনুযায়ী মুখে মুখে রদবদল ঘটানো তাঁর দেখা সেরা বাঙালি কথকদের গুণবিশেষ। এই কথা দীনেশচন্দ্র সেন স্পষ্ট বলে গেছেন।[১১৮]

কথকদের নিজস্ব অভিজ্ঞতায় এই রীতি স্বীকৃত। দ্বিজরাজ বাবু বলেন যে, 'আসরে আসার আগে ভাবলাম এক আর আসরে বসে এমন কথা বললাম যা ভেবে আসিনি। জানি না কি করে বললাম।'[১১৯] আর এক কথক ঠাকুর লিখেছেন,

> অনেকদিন ধরে একই ধরনের বাঁধা নিয়মের গানগুলো মাঝে মাঝে একটু অদলবদল করে ঠাকুর গান করেন। মাঝে মাঝে নতুন গানও তিনি তৈরী করে শুনিয়ে দেন। ঠাকুরের এখন এমন একটা শক্তি হয়েছে যে কথা বলতে বলতে সুর ধরলেন —আর সঙ্গে সঙ্গে পদযোজনা।...ঠাকুর কথা বলে গেলেই গান হয়ে যায়।[১২০]

আসরে বসে সৃষ্টি করা, রদবদল করা তো শ্রোতার রুচিনির্ভর, শ্রোতার প্রতিক্রিয়া

কথক ঠাকুরকে বক্তব্যের তারতম্য ঘটাতে প্রণোদিত করে। তাতে শ্রোতাদের রস আস্বাদনে খিচ লাগতে পারে, কারও কারও বিরূপ মন্তব্য আসতে পারে। কথক ঠাকুরের আত্মজৈবনিক রচনায় আসরে শ্রোতার প্রতিক্রিয়া ও কথকের বাচকতার মধ্যে টানাপোড়েন ধরা পড়ে,

> এই যে মুখুটিমশায় আসুন, আজকের কথকতা কেমন শুনলেন? দেখুন, সভায় আপনাদের মত জ্ঞানীগুণী লোক থাকলে কথার সুরই পালটে দিতে হয়। এই ধরুন ছন্দা, সে লেখাপড়া শিখেছে। একটা কথা বল্লে সে বোঝে। কাজেই ওদের মত শ্রোতা যদি কাছে বসে কেমন করে আর সাধারণ গল্প বলে কথা শেষ করি? অবশ্য তাতে করে সাধারণ শ্রোতার পক্ষে একটু কিরকম মনে হয়, হলোই বা তা বলে কি রোজই একসুরে গান আর গল্প করে যেতে হবে, তবে শাস্ত্র ব্যাখ্যার যেটুকু রহস্য সেটুকু আর কোথায় বলব? সাধুদের দল থেকে আজ আমায় একজন কে বলছিল—ঠাকুর কথাগুলি বড় শক্ত হয়ে যাচ্ছে। আজ যে একটাও গান হল না, কেবল কোথাকার কোন পণ্ডিত কি বলেছেন সে কথা, ওগুলি শুনে আমাদের কি হবে?
> ...ঠাকুরমহাশয়, সে কথা তো ঠিকই—মুখুটি মশায় বলল; তবে কিনা সাধারণ লোকে যাতে বেশ মেতে যায়, সেভাবেই আপনাকে কথা লাগাতে হবে।[১১১]

শ্রোতার শোনার ইচ্ছা, শ্রোতার প্রস্তুতি, কথকের বলার ইচ্ছা, কথকের নিজস্ব প্রস্তুতি—এর মধ্যে ব্যবধান আছে, বিরোধ আছে, আবার যোগও আছে। দুটি মিলেই তৈরি হয় আসরের তারতম্য, তা আবার ঠিক করে দেয় বলার তারকে।

আসর সমাজস্থিত, তার বাইরে নয়। ফলে পরিস্থিতি অনুযায়ী কথকের বাচকতা অতিরিক্ত মাত্রা পেতে পারে। প্রতিমা দেবী তাঁর স্মৃতিতে এর সাক্ষ্য ধরে রেখেছেন :

> স্বদেশী যুগের আরম্ভের সঙ্গে সঙ্গেই 'সখি কেবা শুনাইল শ্যাম নাম' আর মৃদঙ্গের বোল, শ্রোতাদের আবেগের ধ্বনি এ'ল নীরব হয়ে। ক্ষেত্রচূড়ামণি কথক তখনো কুরুক্ষেত্রের বর্ণনা ও গীতার ব্যাখ্যা করে শ্রোতাদের চিত্তকে রুদ্ররসে উত্তেজিত করে রেখেছিলেন। সেটা স্বদেশী আন্দোলনের যুগের সঙ্গে তখনো বেখাপ্পা হয়নি।[১১২]

বাইরের সামগ্রিক পরিস্থিতি বদলাচ্ছে, ক্ষেত্রচূড়ামণির কথকতা নতুন মাত্রা পাচ্ছে, গীতা বা কুরুক্ষেত্রের বর্ণনার রুদ্ররস তখন নতুন অর্থে মণ্ডিত হচ্ছে। স্থানীয় পরিস্থিতিতেও এইরকম প্রতিক্রিয়ার সম্ভাবনা স্বীকার করা যায়। আত্মজৈবনিক রচনাতে প্রাণকিশোর গোস্বামীর মতো 'পুরাণ-বক্তা' এইরকম অবস্থার বিবৃতি দিয়েছেন। 'বামন ভিক্ষা' পালায় কথক দানের প্রশংসা করছেন, বলছেন 'দানের মত আর কি আছে?' গ্রামের বাঁরুয্যে পরিবার, শীল পরিবার এদের দানের কথা বলা হল। দীঘি কাটানোর কাহিনী উল্লেখ করা হল। তাতে সভা থেকে রেগে সাধু সান্যাল উঠে গেলেন। কারণ,

> এই গ্রামের সকলেই জানে সাধু সান্নালের মত কৃপণ আর কেউ নেই। সেই সান্নালের সামনে অত দানের কথা, তাই ওই কথা তার ভালো লাগেনি। তিনি আরো

ভয় করছিলেন। এর পর কথক যদি সভার দিকে লক্ষ্য করে দানের কথা কিছু বলে ফেলেন তাতে বেশী করে লাগবে এই সন্ন্যালের।[১২৩]

এইরকম কোনও প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা কথক প্রাণকিশোরের ছিল কিনা বলা মুশকিল। কিন্তু কথক ও শ্রোতার ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া নিয়ে এতাবৎকাল বাংলা ভাষায় লেখা একমাত্র বইতে এই রকম পরিস্থিতিকে বাদ দেওয়া হয়নি, সেটা ভুললে চলবে না। সামাজিক মূল্যবোধেব উপর গল্পের টানে কথক মতামত প্রকাশ করেন, গল্প ও কাহিনীতে মন্তব্য জুড়ে দেন। আসরের শ্রোতারা সমাজস্থ, তাতে তাদের প্রতিক্রিয়া হতে পারে, বাচকতা অভীষ্ট অর্থে না পৌঁছোতেও পারে।

আসরে নানা লোকের কাছে কথকতার গল্প নানা অর্থ নিয়ে আসে, শ্রোতারাও তাদের মত করে কথকের বয়ানের মধ্যে নিজের মানে খুঁজে পায়। শ্রোতা এ কথকের যৌথ চেষ্টার মধ্যে কথকতার বয়ান গ্রাহ্য হতে পারে। যোজিতের সঙ্গে ব্যবধান অতিক্রম করাই তো যোজকের কাজ।

লেখা থেকে বলার প্রক্রিয়া, কথার ঝোঁকে বাক্য বদলে যাওয়া, শ্রোতার দাবিতে গল্প বানিয়ে তোলা, এইসব রওয়ানির মধ্যে পড়ে। কিন্তু কোথাও এইরকম হলে চলবে না যে মূল রস বদলে যাবে, রাম হবে কাপুরুষ ও রাবণ হবে পরম সুশীল, দেশরক্ষায় রত। তাহলে কথকতায় অনৌচিত্য দোষ ঘটবে, রসাভাব হবে। সীমা যেখানে টানা হয়, বাঁধুনি সেখানে রওয়ানির সঙ্গে মেলে। এই ক্ষেত্রেও লেখা ও বলার সাম্য দরকার, টানাপোড়েন সেই সাম্যকে জোরদার করার জন্য, ভেঙে দেবার জন্য নয়।

কথকতার শৈলীতে আধুনিকতা ও ধারাবাহিকতা

কথকতা সম্পর্কিত একটি মূল্যবান প্রবন্ধে হরিপদ চক্রবর্তী মহাশয় বেশ জোরের সঙ্গে বলেছেন যে কথকতা 'একটি অপরিবর্তিত শিল্পধারা।" যাত্রা, ঢপ গান বা পাঁচালিতে পরিবর্তনের তুলনায় প্রাচীন কথকতার সঙ্গে প্রচলিত আধুনিক কথকতার পার্থক্য খুব কম। কাঠামোর কোনওরকম তুলনামূলক আলোচনা তিনি করেননি। প্রবন্ধের উপসংহার তিনি মতামত জানিয়েছেন মাত্র।[১২৪]

হরিপদ চক্রবর্তীর মন্তব্য হয়তো তুলনামূলক বিচারে সঠিক। যাত্রা, পাঁচালির অনুষ্ঠান দলগত। অভিনয় ও মঞ্চেও নানা কৌশলের প্রয়োগ আজকে সিদ্ধ। ফলে পরিবর্তনের গতিও দ্রুত। পক্ষান্তরে কথকতার ব্যবহারিক শিল্প চাতুর্য কথকের উপর নির্ভরশীল। কণ্ঠস্বরের চড়াই-উতরাই দিয়ে এবং সংগীত ও শব্দযোজনা করে সব বোঝাতে হয়। কিন্তু কথকতাতেও বিবর্তনের ছাপ আছে। যতই ধীর গতিতে হোক, কথকতাও পরিবর্তন থেকে পুরোপুরি মুক্ত নয়। পরিবর্তনের উৎস দুটি। এক, শ্রোচার রুচি ও আধুনিক প্রচার-মাধ্যমের প্রভাব। দ্বিতীয়ত, শিল্পীর নিজস্ব বৈশিষ্ট্য।

নব্বইয়ের দশকে দেখছি যে দ্বিজবাবু, বাসন্তীদেবী অথবা অবনী অধিকারী হারমোনিয়ম ব্যবহার করেন। উনিশ শতকের কথকের আসরের নানা বিবৃতিতে স্বভাবত হারমোনিয়মের উল্লেখ নেই, কারণ তখনও সেটা চালু হয়নি। এটা অবশ্যই একটি

পরিবর্তন। মাইক্রোফোনও কথকরা ব্যবহার করেন।

যে সব আধুনিক কথকতার আসর শুনেছি বা তাদের পুথি দেখেছি, তাতে বলা যায় যে 'চূর্ণীর' প্রয়োগ আজকাল অনুপস্থিত। ওই জাতীয় বর্ণনা বা বিবৃতির সঙ্গে আধুনিক শ্রোতা আদৌ অভ্যস্ত নয়, তাদের কানই তৈরি হয়নি। কবে থেকে চূর্ণীর প্রয়োগ কমতে শুরু করল, বলা মুশকিল। কিন্তু কুমদবন্ধুর পুথিতে 'সাট' নেই। পঞ্চাশের দশকে ক্ষান্তিলতার খ্যাতি, ফলে তখন থেকে চূর্ণীর ব্যবহার কমে আসছে বলে অনুমিত হয়। হয়তো বাংলা ভাষা ও সংস্কৃত ভাষার সঙ্গে সাধারণের সামগ্রিক পরিচয় ও তার সঙ্গে সঙ্গে ভাষা প্রয়োগ প্রসঙ্গে রুচির বদল 'চূর্ণীকে' ধীরে ধীরে অপ্রয়োজনীয় করে তুলেছে।

প্রচার-মাধ্যমের চাপও এক-আধটু বদল আনে। দ্বিজবাবু যুগলমন্ত্রে দীক্ষিত, 'সীতার পাতাল প্রবেশ' পালা আসরে কোনওদিন করেননি। শুধু একবার বেতারে করেছিলেন। ধারক বা শ্রাবকও আজকাল দেখা যায় না। সবাই যে সব আসরে পুথি বা খাতা সামনে রেখে পড়েন, তাও নয়। সকলেরই একটি পাঠ লেখা আছে, তাতে সন্দেহ নেই, কিন্তু আসরে অনেকেই আজকাল স্মৃতি-নির্ভর। ধারাবাহিকতা থেকে যায় ভাব-বস্তুতে, রসবিন্যাসে। আধুনিক কথকদের রীতি লক্ষণীয়। দ্বিজবাবু প্রথাসিদ্ধ মঙ্গলাচরণ করেন। দ্বিজবাবুর মঙ্গলাচরণ এইরকম : সুরে পর পর পরিচিত সংস্কৃত শ্লোক আবৃত্তি; রামের বন্দনা স্তোত্র, বাল্মীকি বন্দনা, শিবস্তোত্র, ভগবতী স্তোত্র (সর্ব্ব-মঙ্গল মঙ্গল্যে শিবে সর্ব্বার্থ- সাধিকে ইত্যাদি), কৃষ্ণস্তোত্র (হে কৃষ্ণ করুণাসিন্ধু দীনবন্ধু জগৎপতে ইত্যাদি), মারুতি বন্দনা (নমামি অঞ্জনাসুতং বায়ুপুত্রং মহাবলং ইত্যাদি), ব্রহ্মা বন্দনা, পর পর বলা হচ্ছে। এঁদের কৃপায় মূক বাচাল হয়, পঙ্গু গিরি লঙ্ঘন করে। তারপরে বাংলা গান, 'রাম নাম বল, বল, এই নাম কর সার' (কীর্তনাঙ্গ সুর)। বাংলা গদ্যে তুলসীদাসী বচন আবৃত্তি, পরে বচনটির বিস্তৃত অনুবাদ : রামায়ণ পাঠ সর্বমঙ্গলকর ও পাপহর, বৈতরণী পারের তরণীস্বরূপ। কৈলাসে শিবের মুখে পার্বতী অপূর্ব রামকথা শ্রবণ করছেন, সেইটা যেন কৃপাপ্রাপ্ত দ্বিজবাবু বলছেন। গদ্যে আবেগ মিশিয়ে দ্বিজবাবু বলেন, রামকৃপাতেই তাঁর পাঠ করা সম্ভব হচ্ছে, 'যন্ত্র আমি, যন্ত্রী তুমি, রথ আমি, রথী তুমি, যেমন পরিচালনা করবে তেমনিই পরিচালিত হব, যেমন বাজাবে তেমনিই বাজবো।' আবার গান, 'আমার হৃদয়-মন্দির মাঝে এসো রাম ধনুধারী' ইত্যাদি। তার পরে আখ্যান শুরু।[১১৫]

পালার শেষও প্রথাগত। ' রাম বল মন' গানের কলি। তারপরে চিরপরিচিত,

যে গায়, যেবা গাওয়ায় যেবা করায় শ্রবণ,
অনায়াসে হয় তাদের পাপের বিমোচন।

চিরজীবী হনুমানকে সেইদিনের মতো বিদায় দেওয়া হয়, তিনি তো আসরে হাজির ছিলেন। ('নিজস্থানে গমন করুন পবন নন্দন।') কৃত্তিবাস পণ্ডিতের জন্ম শুভক্ষণ, তাঁকে প্রণাম জানানো কর্তব্য। এরপরে আগামী দিনের পালার বিষয় বলা হয়। সবার শেষে আসরে 'ভক্তজনের' সম্মিলিত কণ্ঠে ' রামধুন' দিয়ে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি করা হয়। 'ঈশ্বর আল্লা তেরে নাম' এই ছত্রটি গাওয়া হয় না।

একভাবে বিন্যস্ত মঙ্গলাচরণ ও সমাপ্তিকরণ-এর মাধ্যমে দ্বিজবাবু প্রত্যেকটি পালার 'ফ্রেমটি' বেঁধে দেন। এই সরহদ্দটি প্রথাগত। 'রামধুন' অবশ্য সংযোজিত, বাঙালি

কথকতায় এর প্রয়োগ ঊনবিংশ শতকে ছিল কিনা সন্দেহ। কিন্তু দ্বিজবাবুর উদ্দেশ্য স্পষ্ট। পালাটি রামময়, রাম-পরিকররা সবাই আছেন, আছেন ভক্ত কবিরা, আদি কবি বাল্মীকি, গোস্বামী তুলসীদাস ও পণ্ডিত কৃত্তিবাস। এঁদের বার বার দ্বিজবাবু ছুঁয়ে যান, 'সনাতন কাব্যবীজ'-এর আধার তো এই মহাকবিরা।

দ্বিজবাবুর কথকতা গল্পপ্রধান। আখ্যানটা বড় কথা, তত্ত্বকথা মাঝে মাঝে থাকে, গান ফাঁকে ফাঁকে আসে। কথা ভক্তিরসপ্রধান। রাক্ষস বা হনুমান চরিত্র দিয়ে প্রয়োজনমাফিক দ্বিজবাবু হাস্যরস আনেন। রামের সেতুবন্ধনে কাঠবেড়ালিকে হনুমানের তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করা ও তাই নিয়ে কাঠবেড়ালির অভিযোগ, দ্বিজবাবু গম্ভীর স্বরে বলেন ও আসরে বাচ্চারা হেসে উঠছে, এইটা আমার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা।[১২৬] দ্বিজবাবুর সূত্রও বিভিন্ন, তুলসীদাসী কৃত্তিবাসী থেকে যোগবাশিষ্ট রামায়ণ, রামরসায়ন ইত্যাদি। কিন্তু আখ্যানে লম্বা সংস্কৃত শ্লোক তিনি বলেন না, কথায় দীর্ঘ বাক্যও নেই। রামায়ণের মধ্যে প্রয়োজনে মহাভারতের গল্প এনেছেন, শবরীর উপাখ্যানে বিদুরের কৃষ্ণ সেবার কথা সাজিয়েছেন।[১২৭]

একটি দেশজ উপাখ্যানে কীভাবে অভিযোজন করা হয়েছে, দেখা যেতে পারে। তরণীসেন কৃত্তিবাসের নিজস্ব সৃষ্টি। রামের প্রশ্নের উত্তরে বিভীষণ ঠারে-ঠোরে তরণীর পরিচয় দিয়েছেন, 'প্রকারেতে দিলেন প্রকৃত পরিচয়।' এর পরে যুদ্ধ। কৃত্তিবাসের আখ্যানের মাঝে দ্বিজবাবু নিজের কথা জুড়লেন, 'এই হল ত্যাগ...ঘর-দোর নেই, বিয়ে থা হল না, সংসার ত্যাগ করে বেরিয়ে গেলাম, আর মহাপ্রভুর মত সংসারত্যাগ, বুদ্ধদেবের মত রাজ্যধন ঐশ্বর্যপূর্ণ সংসার ত্যাগ, এ দুটো সংসারত্যাগে পার্থক্য নেই? আজ একমুঠো অন্নের সংস্থান করতে পারলাম না, বহু চেষ্টা করলাম, ভাঁড়ে ভবানী, বললাম আজকে আমি আহারে সংযম করেছি আর চতুর্বিধায় [?] সামনে পড়ে আছে তবু আহারে সংযম করেছি, এ দুটোর পার্থক্য নেই?'[১২৮] দ্বিজবাবু তত্ত্বের প্রসঙ্গে বেশি বাক্য ব্যয় করেন না। কিন্তু গল্পের নাটকীয়তা ও নিগূঢ়ার্থ বাড়াবার জন্য কাহিনীতে মোচড় দেন, কৃত্তিবাসের রওয়ানির রদবদল করেন। বিভীষণের পরামর্শে রাম ব্রহ্মাস্ত্র প্রয়োগ করেন ও তরণী মারা যাবার পর বিভীষণ কাঁদেন, বলেন,

প্রভু করি নিবেদন।
মরিল তরণীসেন আমার নন্দন।

রাম সান্ত্বনা দিলেন। তখন বিভীষণ বলেন,

বিভীষণ বলে, প্রভু, নিবেদি চরণে।
পুত্রশোকে কান্দি হেন না ভাবিহ মনে ৷৷
ধন্য ধন্য পুণ্যবন্ত আমার সন্তান।
মরিয়া তোমার হস্তে পাইল নির্বাণ।
....
শত্রুভাব করি সবে পাইলা উদ্ধার!

শ্রীচরণ সেবা করি কি লাভ আমার॥
যদি পারিতাম দেহ করিতে পাতন।
বৈকুণ্ঠনগরে মম হইত গমন ॥[১৩৭]

পালায় দ্বিজবাবু বিভীষণের আক্ষেপকে অন্যভাবে রেখেছেন। পুত্রের মৃত্যুর পর সরাসরি বিভীষণ ধনুর্বান হস্তে রামকে আহ্বান করেছেন। 'তরণীর যুদ্ধ শেষ—এবার আমার পালা। তরণী বালক, সে যুদ্ধ শেখেনি. ধরো ধনুর্বাণ, যুদ্ধ করো মোর সনে,...না তুমি আমার মিতা নয়, তুমি আমার পুত্রহন্তা ॥' পালায় রাম বিভীষণকে প্রতিশ্রুতি দিলেন যে তরণীকে তিনি বাঁচিয়ে দেবেন। বিভীষণ তখন জানালেন যে. অন্তর্যামী হলেও রাম ভক্তহৃদয়ের মর্ম বুঝছেন না। রামের মিত্রতায় লাভ নেই, লাভ শত্রুতায় আছে. কারণ শত্রুতা করেই তো তরণী বৈকুণ্ঠে গেল। কৃত্তিবাসে বৈকুণ্ঠে না যাবার জন্য রাম বিভীষণকে সান্ত্বনা দেন এই বলে.

শ্রী রাম বলেন দুঃখ ত্যজ বিভীষণ ॥
যেই তুমি সেই আমি ইথে নাহি আন।
সাধুর জীবনমৃত্যু একই সমান ॥
যতদিন রবে তুমি অবনীভিতরে।
আমার সমান দয়া তোমার উপরে ॥

দ্বিজবাবুর পালায় রাম বিভীষণকে বলেন—'বৈকুণ্ঠ যে তোমার মধ্যে এসে গেছে। বিগত কুণ্ঠা যেখানে, সেখানেই তো বৈকুণ্ঠ।' তরণীসেনকেও ছাপিয়ে যান বিভীষণ। দ্বিজবাবুর তরণীসেন বধ পালা প্রকৃতপক্ষে বিভীষণের ভক্তির পরীক্ষার ইতিবৃত্ত। কৃত্তিবাসের মূল রসকে ব্যাহত না করে বিভীষণের ব্যবহারকে একটু বদলে দিয়ে দ্বিজবাবু গল্পে প্রতিসরণ আনলেন।

দ্বিজবাবুর পাঠভঙ্গির সঙ্গে বেতারে বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্রের মহাভারতের গল্প বলার ভঙ্গির মিল আছে। *প্রভাবের কথা বলছি না,* সাযুজ্যের কথা আনছি। দ্বিজবাবু গান করেন, বীরেন্দ্রকৃষ্ণ গল্পে আদৌ গান গাইতেন না কিন্তু উভয়ে ভাষাকে এক তারে বাঁধেন। শিষ্ট, সাধু অথচ সহজ ভাষা। চরিত্রানুযায়ী যে ভাষার রদবদল হত তা কিন্তু নয়। স্বরে অভিনয়াংশ কম, মেয়েদের সংলাপও এক স্বরে বলেন, কোনও 'মেয়েলি' ভাব আনেন না। দ্বিতীয়ত ঘটনানুযায়ী ছোট ছোট ভাগে আখ্যানকে বিভক্ত করে বলা হয়। নিজের মন্তব্য, প্রশ্ন বা গান (দ্বিজবাবুর ক্ষেত্র) এই ছোট ছোট ভাগগুলির সংযোজক। ফলে গল্পের রওয়ানি তৈরি হয়, পরের ঘটনাটি শোনার জন্য কৌতূহল উসকে দেওয়া হয়। বিভূতিবাবু কথকতার ও গল্প বলার এই শৈলীকে ধরতে পেরেছিলেন। বাবা হরিহরের পাঠ শোনে অপু,

> এদিকে আবার যখন সিন্ধু সৌবীরের রাজা রহুগন তাঁহার স্বরূপ না জানিয়া রাজর্ষি ভরতকে শিবিকাবাহক নিযুক্ত করেন—তখন হইতে কৌতূহলে ও উৎকণ্ঠায় তাহার (অপুর) বুক দুরু দুরু করে, মনে হয় এইবার একটা কিছু ঘটিবে, ঠিক ঘটিবে।[১৩৮]

ছোট ছোট ঘটনাগুলির নিজস্ব ভাব আছে। কোনওটা হাসির উদ্রেক করে, কোনওটা

বা দুঃখের। এই সব টুকরো টুকরো ভাব মিলে গোটা পালাটার মধ্যে যখন এক সামগ্রিক রস ফুটে ওঠে, তখনই কথকতা শিল্পোত্তীর্ণ হয়, গল্প বলাটা হয়ে ওঠে আর্ট।

অবনীবাবুর কথকতাটা প্রথানুগ তবু শৈলীতে দ্বিজবাবুর 'রামায়ণীর' সঙ্গে তাঁর পার্থক্য আছে। অবনীবাবুর পাঠ অনেকটা পাঁচালির ঢঙে, আখ্যানে গানের চাইতে পয়ারে লেখা পদ্যাংশ বেশি।[১৩২] অবনীবাবুর মূল উৎস জগৎরামী-রামপ্রসাদী রামায়ণ, অষ্টাদশ শতকে রাঢ় অঞ্চলের বিখ্যাত সাধকের লেখা। 'অদ্ভুত-অধ্যাত্ম মত, একত্র করিয়া যুত, রচনা বিবিধ রসধাম।'[১৩৩] মঙ্গলাচরণের বিন্যাস এক, খালি সংস্কৃত পদগুলির বেশিরভাগ বাংলা পয়ারে গীত। আখ্যান ছন্দে বিধৃত, সংলাপও প্রায়শ তাই। পালার আগে একটি দীর্ঘ বন্দনাগান আছে। তাতে পরিচিত সমস্ত মার্গীয় দেবতা আছেন, তদতিরিক্ত কেউ কেউ আছেন। দীর্ঘ বন্দনাগানের শেষ অংশ তুলছি,

> পিতামাতা চরণকমলে প্রণাম জানাই।
> পিতামাতার সম গুরুভাই এই জগতে আর কেহ নাই ॥
> আর শিক্ষাগুরু দীক্ষাগুরু বন্দিনু চরণ।
> এই আসরে আসুন শ্রীরাম লক্ষ্মণ ॥
> এই আসরে এসো মাগো বীণাবাদিনী।
> সঙ্গে করি লয়ে এসো ছয় রাগ আর ছত্রিশ রাগিণী ॥
> মাগো মা, তোমার কৃপাতে মাগো রামের গুণ গাই।
> তুমি মুখ ফিরালে বাক্য নাহি পাই ॥
>
> ... ...
>
> কলিযুগের দেবতা বন্দি দেবী বিষহরি।
> পদ্মফুলের উপর জন্ম হয় যার শিবের কুমারী ॥

কোনও পরিশীলিত আসরে, হরিসভায়, রাময়ণী বন্দনাগানে মনসার প্রবেশ অপ্রত্যাশিত। কিন্তু অবনী অধিকারীর বন্দনা দেখায় যে রামায়ণী পালাতে, বন্দনার বিন্যাসে আঞ্চলিক সংস্কৃতির নানা সূত্রে, সবকিছু ঢুকে পড়তে পারে। গ্রামে যাদের ক্ষমতা স্বীকৃত, লৌকিক আসরের বন্দনাগানে তাদের বাদ দেওয়া বিপদজনক।

ইন্দ্র ব্রাহ্মণ নন, তাই গৌতম মুনি তাঁকে সামগান শেখাননি। তখন ছদ্মবেশী ইন্দ্র অহল্যার কাছে সামগান শেখেন। অবনীবাবুর পালায় শৃঙ্গার বা জৈবিক আকর্ষণ গৌণ। অবনীবাবুর পালার বিন্যাসও একটু আলাদা। ছোট কথা, মূল সংলাপ গানে, আবার ছোট কথা, নমুনা দেওয়া যাক,

> এমন সময় দেবরাজ ইন্দ্র গৌতম মুনির বেশ ধারণ করিয়া অহল্যার কুটিরে এসে উপস্থিত হইল। আর এখানে,
>
> অহল্যা গৌতম জ্ঞানে তারে করে সম্ভাষণ।
> বলে, আজি কেন প্রাতঃকালে গৃহে আগমন ॥'
> দেবরাজ ইন্দ্র বলে
> 'ওগো তব রূপ হইল স্মরণ।'

তোমার গানের রূপ আমার মনে পড়ল।
তাই, 'কেমনে করি বল তপস্যা আচরণ॥'

আমি শুনেছিলাম ভগবান তিনি গানে বড় সন্তুষ্ট হন। ...অভিধানে পণ্ডিতগণ অর্থ করেছেন সামবেদ মানে হল গান, গানের সুরে ভগবানকে ডাকা, এর নাম সামবেদ। দেবী তুমি আমাকে একখানি গান শোনাও।

'একদিন এ কারণে দিলেন অহল্যাদেবী তারপরে গাহিলেন গান।
গানের সুর শিখন করি দেবরাজ ইন্দ্রপুরে যান ॥'

অবনীবাবুর কথকতায় পাঁচালি গানের প্রভাব আছে। গান গদ্য সংলাপের অনুসারী নয়। বরং গানের মধ্যে ঘটকালির কাজ গদ্য করেছে।

ক্ষান্তিলতা দেবীর কথা গদ্যে। তাঁর কথার চলন আখ্যায়িকার ঢঙে নয়। দ্বিজবাবুর কথকতায় গল্পের আধারে ব্যাখ্যা থাকে। কিন্তু তত্ত্ব ব্যাখ্যার প্রমাণ ও দৃষ্টান্ত হিসাবে ক্ষান্তিলতা দেবী গল্পের উপস্থাপনা করতেন বা কুমুদবন্ধু পালা লিখতেন। দুইজনের ভঙ্গি ও মেজাজে পার্থক্য এইখানে।

'কুন্তীস্তব' পালায় ক্ষান্তিলতা দেবীর সব গুণ, কুমুদবন্ধুর লেখার সব বৈশিষ্ট্য পাওয়া যায়। প্রসঙ্গ নির্দেশ, দীর্ঘ ব্যাখ্যা ও সংলাপ, শ্লোক ও নানা ভাষ্যের অংশ এবং নানা গান। পালার আরম্ভে তিনি বলেন যে কুন্তীদেবীর স্তবাবলীর মধ্য দিয়ে কুন্তীদেবীর বর প্রার্থন। প্রসঙ্গে 'ভগবান লীলাগুণ কথা' বিষয়ে *'কিছু আলোচনা'* করবেন। এই *'আলোচনাই'* হল তাঁর কথকতার বিন্যাস। অর্জুনের হাতে অশ্বত্থামার পরাজয় ও পরীক্ষিতের জীবনরক্ষা হল প্রেক্ষাপট। দ্বৈপায়ন হ্রদে দুর্যোধনের উরুভঙ্গ থেকে অশ্বত্থামার পাণ্ডব শিবিরে নিশি অভিযান ও পরাজয়, উত্তরার ভ্রূণরক্ষা ইত্যাদি একটানা গদ্যে বলা হয়েছে, প্রসঙ্গ নির্দেশ করা হয়েছে। যখন প্রভাতে কৃষ্ণ পাণ্ডব শিবির ত্যাগ করতে উদ্যত তখন তাঁর সঙ্গে কুন্তী কথোপকথনে লিপ্ত হলেন। বিবৃতিতে বোঝানো হয়েছে যে কেন কৃষ্ণ পাণ্ডববন্ধু, কেন কৃষ্ণ পরীক্ষিৎকে রক্ষা করলেন। কুন্তীর মুখে ধুয়ার মতো ফিরে এসেছে, কেবল একটি বিষয় : কৃষ্ণকে দেবার মতো পাণ্ডবদের দুইটি বস্তু আছে, 'ব্যথা মাখা অশ্রুজল' ও 'অবনত মস্তকে প্রণাম', এই দুইটিকে নানাভাবে নানাগানের সংযোগে ক্ষান্তিদেবী তাঁর কথায় ব্যাখ্যা করেছেন। ব্যাখ্যাতে প্রায়শই সংলাপ দীর্ঘ। কৃষ্ণের প্রতি সম্বোধনের উদাহরণ দেওয়া যাক. 'হে আমার করুণানিধান, হে আমার বিপদভঞ্জন, হে আমার দীন দয়াল, হে আমার পাণ্ডবসখা, হে আমার কাঙ্গালের ঠাকুর' ইত্যাদি।[১৫৫]

একই বিষয়ের নানা বিচার কথকতাকে ব্যাখ্যামূলক করে তোলে। গল্পের রওয়ানির চেয়ে ভাবের তাৎপর্য প্রতিষ্ঠা হয়ে ওঠে লক্ষ্য। ক্ষান্তিদেবীর কথকতার শৈলী তাই। একটি কেন্দ্রীয় ভাবকে নানা ভঙ্গিতে আলাপ করার মধ্যে নিহিত আছে তাঁর পাঠের আঙ্গিক। নানা টুকরো টুকরো ভাবকে নিয়ে অন্য এক সামগ্রিক ভাবের আবেদন ফোটানো তাঁর অভীষ্ট নয়।

বাসন্তীদেবীর বৈশিষ্ট্য মঙ্গলাচরণে।[১৫৬] তিনি এখানে নতুন ভঙ্গি উদ্ভাবন করেছেন। প্রথমে তিনি কোনও একটি দৈনন্দিন অভিজ্ঞতা থেকে পালা আরম্ভ করেন। মালদহের

এক সভায় গিয়ে আরম্ভ করেন যে তাঁর দামি জিনিস হারিয়েছে, চোরের নামও জানেন, কেউ খুঁজে দিতে পারবে কিনা। সভায় সাড়া পড়ে যায় তখন তিনি বলেন যে তাঁর হৃদয় হারিয়েছে, চোর শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং। আমার শোনা আসরে তিনি আরম্ভ করেন যে একজন পরিচিতের (রামবাবু) সঙ্গে তাঁর অনেকদিন দেখা সাক্ষাৎ হয়নি, কারণ তাঁর মেয়ের বিয়ে ছিল। সেই বিয়েতে অলঙ্কার দেওয়া হয়েছে, 'কৃষ্ণ নাম শ্রবণ কুণ্ডল', যাতে মেয়ে সবসময় কানে দিতে পারে। সেই বিয়ের অনুষঙ্গে বলেন যে শ্রোতারাও প্রত্যেকে কন্যাদায়গ্রস্ত, তাঁদের ঘরে দুইটি বয়স্থা কন্যা আছে। রতি ও মতি তাদের নাম, তাদেরও সুপাত্রস্থ করতে হবে। এইভাবে দৈনন্দিন অভিজ্ঞতাকে রূপক হিসাবে ব্যবহার করে তিনি পালার উপস্থাপনা করেন।

প্রণাম জানানো হয় গুরুকে, গ্রন্থকে, গ্রন্থ প্রতিপাদ্য শ্যামসুন্দর ও রাধারাণীকে, রচয়িতা ব্যাসদেবকে, বক্তা শুকদেব ও শ্রোতা পরীক্ষিৎকে। এবং অবশেষে অতীত ও বর্তমানের উপস্থিত ও অনুপস্থিত বৈষ্ণব ভক্ত শ্রোতাকে প্রণাম করে তিনি ভাগবতী কথা শুরু করেন। তাঁর এই রীতি প্রথানুগ।

বাসন্তীদেবীর কথকতাও ব্যাখ্যামূলক। গোবিন্দ অধিকারীর গান, মহাভারতের কাহিনী, লৌকিক দৃষ্টান্ত সবই আনা হয় তত্ত্ব প্রতিবেদনের উদ্দেশ্যে। বাসন্তীদেবীর পাঠে কিন্তু নাটকীয় সংলাপ কম। তার বর্ণনা গীতি-নাটিকার আকারে বিন্যস্ত নয়। বরং গীতি-কথিকার ঢঙে তিনি তাঁর বক্তব্য সাজান।

শৈলীতে আধুনিক কথকদের মধ্যে পারস্পরিক পার্থক্য থাকা স্বাভাবিক। ধরণীধর বা ক্ষেত্রমোহনের শৈলী কী ছিল, বলা যায় না। যাঁরা বর্তমানে কথকতা করছেন, তাঁরা কেউ উনিশ শতকের কথক পরম্পরার লোক নন। অতএব ধারাবাহিকতার কথা জোর দিয়ে বলা যায় না। বহিরঙ্গে পরিবর্তন এসেছে, কিন্তু কথকতা পৌরাণিক আখ্যানমূলক, তার মূল রস ভক্তি। এই অন্তরঙ্গে বোধ হয় পরিবর্তন আসেনি। কিন্তু শ্রোতা বদলেছে, ভাষায় রুচি একরকম নেই, দৈনন্দিন অভিজ্ঞতায় নানা পরিবর্তন এসেছে। অনুষঙ্গ বোঝাতে গিয়ে, 'ঘটকালি' করার সময়, গান, পালার সংলাপ ও বিন্যাস, উদাহরণ চয়ন যুগোপযোগী না হলে আসর জমানো অসম্ভব। আজকের কথকরা এই কথা জানেন।

৪ শ্রোতার জগৎ

সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের পিতৃকুলের আর্থিক অবস্থা যে রকমই হোক না কেন, মামার বাড়ি বেশ সচ্ছল ছিল। মাতামহ ছিলেন হাওড়ার শিবপুরের ছোটখাটো জমিদার, ইংরেজ সওদাগরের হউসে বড়বাবু। এমন অবস্থায় যা হয়। উনিশ শতকীয় যৌথ পরিবারে জুটে গিয়েছিল এক গরিব পোষ্য জ্ঞাতি। সুনীতিবাবুর মানিকাকা। এই অর্ধপোষ্য গরিব আত্মীয় সবার উপহাসের পাত্র। ফাই-ফরমায়েশ খাটা তাঁর অবশ্যকর্তব্য। যে কোনও বৃহৎ কাজ-কর্মে জুতো সেলাই থেকে চণ্ডীপাঠ করার দায় বর্তাত মানিকাকার উপরই। সাদামাটা গেঁয়ো মানুষ, বিদ্যার দৌড়ও সামান্য। দুপুর বেলা একপাল বাচ্চাকে তিনি তাঁর গাঁয়ের গল্প বলতেন। জমাটি নিমন্ত্রণ রক্ষার মজাদার কাহিনী আর মাঝে মাঝে যাত্রায় দেখা, 'কথকতায় শোনা পালা, অজামিলের কথা,

রুক্মাঙ্গদ রাজার একাদশী, ধ্রুবের তপস্যা' ইত্যাদি। সেই মুহূর্তে ভাইপো-ভাইঝি বা ভাগনে-ভাগনিদের কাছে মানিকাকাই কথক হতেন, 'এ সব গল্প বেশ শ্রুতিরোচক আর মনোমোহন করে শোনাতেন'। কথক ঠাকুরের দৌড় কেবল আসরে সীমাবদ্ধ থাকে না। মানিকাকার মতো মানুষের মাধ্যমে একনিষ্ঠ শিশু শ্রোতাদের জমাটি আসর বসে।

মানিকাকা কথকতার আসরে হাজিরা দিতেন। কারণ ভাল 'আক্ষেপের কথা' শোনা তাঁর বাই ছিল। 'চৌধুরি পাড়ায় কথকতার আসরে কথক ঠাকুর যখন কোন গম্ভীর বিষয় নিয়ে বাগাড়ম্বর করে বলে যেতেন, মানিকাকা নিবিষ্ট চিত্তে শুনতেন, আর অনেক সময়ে চোখ দিয়ে তাঁর ঝর ঝর করে জল পড়ত। তিনি তখন একাগ্র মনে, তাঁর বর্ণনা অনুসারে, দুটো "আক্ষেপের কথা" শুনছেন। তাঁর এই "আক্ষেপের কথা" শোনার আগ্রহ আমাদের কছে একটা রসিকতার বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছিল।'[১৬]

অবজ্ঞেয় মানিকাকা খুঁজে বেড়াতেন কোথায় 'আক্ষেপের কথা' শুনতে পাওয়া যাবে। বড়লোক আত্মীয়রা তাই নিয়ে ঠাট্টা করতেন। পরিবারের ক্ষমতা বিন্যাসের নিম্নতম বিন্দুতে অবস্থিত দুর্ভাগা বোকাসোকা মানিকাকা কিন্তু বার বার ওই রকম আসরে ছুটে যেতেন, এমনকি বাড়ির গুরুদেবকেও রেহাই দিতেন না। তাঁর কাছ থেকেও 'গোটাকতক "আক্ষেপের কথা"' শোনবার দাবি জানাতেন। ওই রকম আসরে তিনি তাঁর মনের আশ মেটাতে পারতেন, কাঁদতেন, তাঁর 'একাগ্রতা' তাঁর বিদ্রূপকারীদেরও চোখ এড়াত না।

বড়লোক আত্মীয়রা হাসতেই পারেন, কিন্তু ভট্টনায়ক, আনন্দবর্ধন, অভিনবগুপ্তদের কাছে এই জাতীয় অভিজ্ঞতার মূল্যের শেষ ছিল না। রস-সৃষ্টির আলোচনায় ভুক্তিবাদী, ধ্বনিবাদী বা রসধ্বনিবাদীরা সহৃদয়, সামাজিক বা রসজ্ঞকে আলোচনার কেন্দ্রে বসিয়েছেন। রসের প্রতীতি রসচর্বণ বা রস আস্বাদনে, সহৃদয় বা সামাজিক সেই রস আস্বাদনে সক্ষম। সহৃদয়ের রসচর্বণা ভিন্ন রসের অনুভব প্রকাশবেদ্য নয়। কাব্যরসের আধার কবিও নন, কাব্যও নয়, সহৃদয় পাঠকের মন। সঙ্গীত ও অভিনয় প্রসঙ্গেও একই কথা প্রযোজ্য।

জবরদস্ত কথক নন, অলোচনার আসরে রসবোধের বিষয়ী হিসাবে অভাজন মানিকাকাই জাঁকিয়ে বসবেন। কিন্তু কীভাবে? আমাদের কথকরা কি এতটা জানতেন? রসের ধারণা কি তাঁদের আয়ত্তে ছিল? বেশির ভাগ কথকই বৈষ্ণব। ভাগবতী কথকতার বহু পুথিতে শ্রীধর স্বামী ও বিশ্বনাথ কবিরাজের টীকার উল্লেখ পাওয়া যায়। বৈষ্ণব ধর্মতত্ত্ব রসতত্ত্বের নামান্তর, ভক্ত ও ভগবানের সম্পর্ককে নানা রসের মাধ্যমে বর্ণিত করা হয়েছে। সুতরাং কথক ঠাকুর রসতত্ত্বের ঐতিহ্য সম্পর্কে অনবহিত থাকতেন, একথা মনে করা সঙ্গত নয়। সরাসরি প্রমাণও আছে। কথকদের রচিত সংগ্রহ গ্রন্থে আখ্যানাংশ নির্বাচন ও ভাগ রস অনুযায়ী করা হত। যেমন :

> 'রামায়ণ কথা সংগ্রহঃ'তে আরম্ভেই বিন্যাস এরকম : 'নবরসঃ কিং। শৃঙ্গারোযথা সীতাহরণ শূর্পনখাঃ গমনাদিঃ ॥ ১ ॥ বীরো যথা রাবণ কুম্ভকর্ণবধাদয়ঃ ॥ ২ ॥ করুণো যথা রামস্য বনগমনাদিঃ ॥ ৩ ॥ অদ্ভুতো যথা সাগরবন্ধনাদিঃ ॥ ৪ ॥ হাস্যোযথা দশরথগৃহে রাম জন্ম ॥ ৫ ॥ ভয়ানকোযথা রাবণমারীচ সম্বাদঃ' ইত্যাদি ॥ [১৭]

আবার বর্ষীয়ান কথক কুমুদবন্ধু বলেন যে, 'কথকতা খুব শক্ত বাবা, কথায় নবরসের বিন্যাস করতে হবে তো।'[১৩৭]

সরাসরি ঐতিহাসিক প্রমাণসূত্র ছাড়াও বলা যেতে পারে যে কথকতা একটা বিশেষ রকমের পাঠ। এই পাঠের মাধ্যমে কীভাবে সহৃদয় বা সামাজিক ভরতের হরিণ শিশুর হারানোর বেদনায় আকুল হন, লঙ্কায় হনুমানের কীর্তিকলাপে হেসে খুন হন? ভরত বা হনুমান কেউ পরিচিত নন, তাঁদের অভিজ্ঞতার তিনি সরাসরি শরিকও নন। শ্রোতার নিজের বোধ স্বগত, ভরত বা হনুমানের ভাব পরগত। লৌকিক ভাবের পরিমিতত্ব ছাপিয়ে যাওয়া যায় কীভাবে, কীভাবে কথকের উচ্চারিত শব্দের জোরে, পাঠের ঝোঁকে অন্য বিষয় 'সহৃদয় হৃদয়-সংবাদী' হয়, বিষয়ের 'চমৎকৃতিতে' সামাজিক-এর 'তন্ময়ীভবনতা' দেখা যায়, অতি সাধারণ শব্দ রসধ্বনিতে রূপান্তরিত হয়? এই প্রশ্ন তাত্ত্বিক। নবম থেকে একাদশ শতকে, নানা প্রস্থানের নানা বিতর্কের মধ্য দিয়ে হারিয়ে যাওয়া পুস্তক *হৃদয় দর্পণে*-র লেখক ভট্টনায়ক অথবা 'ধ্বন্যালোকের' অজ্ঞাতনামা কারিকাকার, বৃত্তিকার আনন্দবর্ধন এবং লোচন, টীকাকার অভিনবগুপ্তরা সদলবলে এই প্রশ্নের মোকাবিলা করেছেন। এই প্রসঙ্গে কথকরা এই তত্ত্বের সব অনুপুঙ্খ সম্পর্কে পূর্ণ সচেতন ছিলেন কিনা, তা অবান্তর, রসসৃষ্টির ক্ষেত্রে শ্রোতার ভূমিকার সাধারণ বিচারেই রয়ে গেছে তত্ত্বের প্রাসঙ্গিকতা।

তাঁদের রচনানুসারে, শব্দের সংকেতিত করার ক্ষমতা মানা, বলা হয়েছে "ধ্বননং শব্দস্যৈব ব্যাপার ॥" 'শব্দজাঃ শব্দা' ধ্বনি বলে অভিহিত। কিন্তু শব্দের মধ্য দিয়ে অভিধা ও লক্ষণার বা তাৎপর্যের শক্তি ছাপিয়ে যে ব্যঞ্জনাজন্য বোধ বা ব্যঙ্গ অর্থ সৃষ্টি হয়, ধ্বনিবাদীদের কাছে সেটাই ধ্বনির বিশেষ পারিভাষিক অর্থ। শব্দের নিজস্ব শক্তিতে এই ব্যঞ্জনার ক্ষমতা নিহিত আছে, ব্যঞ্জনার স্বতন্ত্র বোধে রস জাগ্রত হবার সম্ভাবনা থাকে। 'শব্দনং শব্দঃ শব্দব্যাপারঃ, ন চাসাবভিধাদিরূপঃ, অপি ত্বাত্মভুতঃ, সোহপি ধ্বননং ধ্বনিঃ।' বক্তার উচ্চারিত শব্দ ব্যঞ্জনা নামক বিশিষ্ট শক্তির দ্বারা শ্রোতার বা সহৃদয় বা সামাজিকের মনে অভিজ্ঞতাজনিত বাসনাদি সংস্কারের উদ্রেক করে, বর্ণিত বিষয়ের সঙ্গে তন্ময়ীভবনতার প্রাপ্তিযোগ হয়।[১৩৮]

কিন্তু এই স্তরেই ভট্টনায়ক বা অভিনবগুপ্ত ব্যঞ্জনার দ্বারা রসসৃষ্টির দুইটি ধারণার নির্দেশ করেছেন। এই তন্ময়ীভবনতা বা চিত্তবৃত্তির সঙ্গে একাত্মতা অলৌকিক, এই অনুভবনের আস্বাদনের সঙ্গে লৌকিক সুখ-দুঃখবোধের অনুভবের পার্থক্য আছে। রসচর্বণা লৌকিক ভাবের পরিমিতত্বকে অতিক্রম করে, শব্দ ব্যঞ্জনার এতই ক্ষমতা। বাল্মীকির আদি শ্লোক নিয়ে আলোচনাকালে বলা হল যে 'ইহা লৌকিক শোক হইতে পৃথক (লৌকিকশোক ব্যতিরিক্তাং) এবং নিজের চিত্তবৃত্তির যে বিগলিত অবস্থায় ইহা আস্বাদিত হইতেছে, তাহাই ইহার একমাত্র সারবস্তু। পরিপূর্ণ কুম্ভ থেকে যেমন জল উছলাইয়া পড়ে (রসপরিপূর্ণকুম্ভোচ্চলন) তেমনই চিত্তবৃত্তির স্বাভাবিক নিঃষ্যন্দিতার জন্য বিলাপবাক্য ক্ষরিত হয়।"[১৩৯] রসের এই উচ্ছলন প্রবণতার জন্য শোক আর ক্রৌঞ্চের একান্ত শোক নয়, বাল্মীকির নিজস্ব দুঃখ নয়, শোক সহৃদয়ের চর্বণাযোগ্য। কিন্তু এই চর্বণা সম্ভব, লৌকিক অনুভবের পরহগত্ব বা আত্মগতত্ব অতিক্রম করা যায়, 'রসাদি

বিষয়ে ভাবকত্বের দ্বারা'। রস ভাবিত হলেই ভোগ (অনুভব) করা সম্ভব। ভট্টনায়কের মতে, 'রসের সম্পর্কে যাহা বিভাবাদির সাধারণত্ব সম্পাদন করে তাহাই ভাবকত্ব।' এই ভাবকত্বের ধারণাকে অভিনবগুপ্ত বাতিল করতে পারেননি। প্রচলিত পাঠ্যপুস্তক *সাহিত্য দর্পণে* বিশ্বনাথ কবিরাজ এই 'ভাবকত্বের' অপর পারিভাষিক নাম দিয়েছেন 'সাধারণীকৃতিঃ'। উচ্ছলন প্রবণতা ও রসধ্বনির মাধ্যমে রসের অনুভবকে আদর্শায়িত করা ও ব্যাপ্তি দেওয়া হয়। ফলে রস সামাজিক হৃদয়সংবেদ্য হতে পারে, বহুজনীন হতে পারে। রসবোধের আলোচনায় শব্দের ব্যঞ্জনার শক্তির মাধ্যমে লৌকিক সীমা, নিছক ব্যক্তি-অভিজ্ঞতার সীমাকে অতিক্রম করার বাসনা এই তত্ত্বে বার-বার স্বীকৃত হয়েছে।

কথক বাগাড়ম্বরের মাধ্যমে, শব্দ শক্তির মাহাত্ম্যের জন্য, ধ্বনি বা রস সৃষ্টি করেন। মানিকাকার আত্মগত শোকানুভবে হৃদয় সিক্ত ছিল, মানসপ্রক্রিয়ায় তিনি রসধ্বনিজাত বিষয়ে তন্ময়ত্ব পান, রসচর্বণা শুরু হয়। এই অনুভবন লৌকিক নয়, 'মানসপ্রক্রিয়া'; এই রস কাহিনী বা কথকে আবদ্ধ নেই, রস ব্যাপ্ত, 'সহৃদয় হৃদয়সংবেদ্য।' মানিকাকার মতো আসরে অনেকেই এর অংশগ্রাহী। আসর রসবোধের ক্ষেত্র হিসাবে রূপান্তরিত হয়েছে রামের অযোধ্যায়, কৃষ্ণের বৃন্দাবনে বা ভরতের তপোবনে।

কথকতার আসরে রসভোগের বা সীমা অতিক্রমের আরও নানারকম উদাহরণ হাজির করা যেতে পারে। গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সদ্য বিবাহিত বড় ছেলের অকালমৃত্যুতে সমস্ত পরিবার শোকে মুহ্যমান। মুশকিল আসানের পথ বাতলালেন দীনেশচন্দ্র সেন।[১৪২]

> আমি একদিন বলিলাম, 'আপনারা যদি সান্ত্বনা চান, তবে আমি একজন ভাল কথককে নিযুক্ত করতে পারি, তাহার কথায় আপনারা শান্তি পাইবেন।' সমুদ্রে পতিত ব্যক্তি যেরূপ তৃণটিকেও আশ্রয় করিতে হাত বাড়ায়, গগনবাবু এই প্রস্তাবটির সফলতা সম্বন্ধে আস্থাহীন হইয়াও ইহাতে রাজী হইলেন। বাড়ির মেয়েরা সাগ্রহে এই প্রস্তাবে সায় দিলেন।'

কোন পরিস্থিতিতে কথকদের ডাকা হয়, তার আভাস পাওয়া গেল। মেয়েরা এই বিষয়ে যথারীতি উৎসাহী, দীনেশবাবু তাও জানাতে ভোলেননি। কথক ক্ষেত্রনাথ চূড়ামণিকে দেখতে আদৌ নয়নাভিরাম নয়।

> কিন্তু কথা বলিবার ইহার আশ্চর্য শক্তি! প্রথম দিনই আসর জমিয়া গেল। গগনবাবুর বাড়িতে ছেলে বুড়া সকলেই মৌতাত ধরিলেন, সন্ধ্যায় বড় হল-ঘরটায় ক্ষেত্রচূড়ামণির কালোকণ্ঠে ঔজ্জ্বল্য প্রদান করিয়া ফুলের মালা দুলিতে থাকিত, এবং তিনি ধ্রুব, প্রহ্লাদ, জড়ভরত, দক্ষযজ্ঞ, রুক্মিনী হরণ, বকাসুর বধ প্রভৃতি কত পালা যে বলিয়া যাইতেন, তাহার অবধি ছিল না। তিনি কথায় কথায় ছবি আঁকিয়া যাইতেন; বর্ণনার ছটায় মেঘ, বৃষ্টি, বসন্ত সমীরণ এবং পদ্মবন যেন চোখের সম্মুখে উপস্থিত করিতেন, কখনও শ্রোতৃবর্গ অশ্রুসিক্ত হইয়াছে, কখনও হাসির স্রোতে ভাসিয়া গিয়াছে। এরূপ অপরূপ বক্তাকে পাইয়া ধর্মের কথায় পৌরাণিক প্রসঙ্গে মন হইতে শোক ধীরে ধীরে মুছিয়া যাইতে লাগিল।

> ... প্রায় একমাসের মধ্যে গগনবাবুর মন এরূপ লঘু হইয়া গেল যে যখন ক্ষেত্র কথক কথা বলিতেন, তখন গগনবাবু লুকাইয়া তাঁহার চেহারা ও ভঙ্গীগুলি আঁকিতেন।

ক্ষেত্রচূড়ামণির কথকতা হৃদয়সংবেদ্য হয়েছিল। বলার কারুকৃতিতে, পৌরাণিক গল্পের ব্যঞ্জনায় গগনবাবুর শোকসন্তপ্ত পরিবার সবাই রসের আস্বাদনে সমর্থ হয়েছিলেন, যাঁদের ব্যক্তিগত শোকভার 'লঘু' হয়ে গিয়েছিল এমন কী ক্ষেত্র কথক নিজে গগনবাবুর শিল্পের বিষয় হয়ে গেলেন। এই ক্ষেত্রে রসচর্বণার দ্বারা ব্যক্তি-শোকানুভবের সীমা অতিক্রম করা সম্ভব হয়েছিল। এই অতিক্রম্যতা কেবল গগন বাবুর মধ্যেই সীমিত ছিল না, তা জনগ্রাহ্য হয়েছিল, 'ছেলেবুড়া সকলের মৌতাত ধরেছিল।' ক্ষেত্র কথক বলেছেন আর রস আস্বাদনের ভাগীদার হয়েছেন বাড়ির আমজনতা।

এই আমজনতার সঙ্গে কথকের ঘটকালি কীরকম পরিস্থিতি তৈরি করতে পারে, তার ছবি অনুরূপা দেবীর লেখাতেও ধরা পড়ে। নায়িকা বাণী রসজ্ঞ, তার দৃষ্টিতে কথকের অনুষ্ঠান দেখানো হচ্ছে। শ্রোতার প্রতিক্রিয়া, কথকের নৈপুণ্য সব কিছু বর্ণনায় ধরা পড়েছে।

> ...সেদিন কথকতার বিষয় ছিল 'অভিমন্যুবধ'। ক্ষমতাশালী বক্তা...ভাষা প্রাণস্পর্শী, স্বর অনন্য-সাধারণ। বীর বালকের অতুল সাহস, অমিত পরাক্রম, শ্রোতৃদলকে উত্তেজিত করিয়া যেন রণক্ষেত্রে টানিতেছিল। তারপর সে কি উৎকণ্ঠা, কি বিপুল উদ্বেগ। শ্বাস বুঝি কণ্ঠের মধ্যে চাপিয়া আসে। সপ্তরথী আসিয়া একা অসহায় বালককে একসঙ্গে ঘিরিল। পিশাচ, পিশাচ! দন্তে দন্ত নিষ্পেষিত ও হস্ত দৃঢ় মুষ্টিবদ্ধ হইয়া গেল। প্রতিকার নাই! ইহার কি প্রতিকার নাই! ধিক! যদি না অন্যায়কারী শত্রুপক্ষকে দলিত করিয়া সপ্তরথীর লৌহ-নিগড়-মধ্য হইতে সোনার হরিণটিকে উদ্ধার করিয়া আনিতে পারা যায়, তবে শতধিক এই জীবন। কিন্তু হায়! কোন উপায় রইল না, অন্যায় সমরে ভারতের ভবিষ্যরবি অকালে অস্তমিত হইল। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ মাতুল, পিতা সব্যসাচী, পিতৃব্য মহাবল ভীম যাহার সহায়, সে আজ অসহায় অনাথভাবে সপ্তরথীর সপ্তশরে শোণিতরঞ্জিত বিক্ষতাঙ্গে বসুধা আলিঙ্গন করিল।..
>
> দর্শকগণ নীরবে অশ্রুমোচন করিতেছিল। কোন কোন পুত্রশোকাতুরা জননী হৃদয়ের আবেগ সংবরণ করিতে না পারিয়া ডুকরিয়া কাঁদিয়া উঠিতেছিলেন। বাণী নীরবে চক্ষু মুছিয়া কথকের মুখে চাহিল। সে মুখে কোন পরিবর্তন লক্ষ্য হইল না। চিত্রকরের তুলি যেমন চিত্রের ভাবপ্রদান করে, বর্ণ সমাবেশে ইন্দ্রালয় নন্দন কানন রচনা করে, নিজে সে ভাবসম্পদের ধারও ধারে না, যে এতগুলি লোকের বক্ষতলে শোকস্মৃতি জাগ্রত করিতেছিল, সে নিজে যেন তাহার মধ্যে ধরা ছোঁয়াও দেয় নাই।[১৪৩]

এই উদ্ধৃতিতে ফুটে উঠেছে বৈপরীত্য, পালার ধাপেধাপে, কী করে শ্রোতা তন্ময়তা পায় ও কীভাবে কথক নিরাসক্ত থাকে, ফলে কীভাবে আসর রসোত্তীর্ণ হয়।

উনিশ শতকের শেষের দিকে কথকতার বড় পৃষ্ঠপোষক ছিল কলকাতায় গড়ে ওঠা

হরিসভা। আসর বসত সেখানে। বেহালার প্রাচীন হরিভক্তি প্রদায়িনী সভার পুরাতন কার্যবিবরণীর পাতা থেকে টুকরো খবর তোলা যাক।[১৪৬]

> সভার উদযোগে বিগত মাঘমাস হইতে বৈশাখের শেষ পর্যন্ত শ্রীযুক্ত গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য কথক মহাশয় শ্রীমদ্ভাগবতীয় কথা কহিয়াছিলেন। ইহাতে প্রত্যহ শ্রোতৃসংখ্যায় সভাগৃহ পরিপূর্ণ হইত। দূরপল্লী হইতে অসংখ্য স্ত্রীলোক এই কথা শ্রবণ করিতে প্রত্যহ উপস্থিত হইতেন।

পরের বছরের প্রতিবেদনও একই রকম :

> গত মাঘ মাসের ও ফাল্গুনের কিয়দ্দিন পর্যন্ত খিদিরপুর নিবাসী শ্রীযুক্ত ক্ষীরোদচন্দ্র মুখোপাধ্যায় কথক মহাশয় মাসাধিককাল শ্রীমদ্ভাগবতীয় কথা কহিয়াছিলেন। ইহাতে প্রত্যহ শ্রোতৃসংখ্যায় সভাগৃহ পূর্ণ হইত। *বলা বাহুল্য শ্রোতৃগণের মধ্যে স্ত্রীলোকের সংখ্যাই অধিক হইত।*" (নজরটান আমার)

১৯৯২ সালে চালতাবাগান গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্মিলনীর আসরেও একই দৃশ্য দেখা যায়।[১৪৭] রাধারাণীর কাছে কথক দ্বিজরাজবাবুর মানসিক করা আছে। পৌষ বা মাঘ মাসে একমাস ধরে রামায়ণী কথকতা করেন তিনি।

শ্রোতাদের শতকরা ৯৫ ভাগ পাড়ার বৃদ্ধা বা বয়স্কা মহিলা, তিন-চার ভাগ বৃদ্ধ। তাঁরা নিয়মিত আসতেন, দু-চার পয়সা প্যালাও দিতেন। আসরে জোকার দেওয়া, কান্না, ভাবে অভিভূত হওয়া, সবই তাঁদের মধ্যে দেখা যেত। ষাট বছর আগেকার বেহালার হরিসভা বা এখনকার চালতাবাগানের হরিসভার আসরে শ্রোতার চরিত্রে বা পরিবেশে পার্থক্য খুব আছে বলে মনে হয় না।

আসরে বেমানান একমাত্র আমি। ফলে অনেকের প্রশ্নের জবাব দিতে হত, আলাপও জমে গিয়েছিল। বছরের পর বছর দ্বিজবাবুর কথকতা শুনছেন, শুনতে শুনতে গান মুখস্থ হয়ে গেছে, এমন একজন বললেন, 'নাতনি কোন স্কুলে পড়ে খোঁজ রাখি না। ওর পড়াও বুঝতে পারি না। রামকথা বুঝি, তাই আসি।' আর একজন আগে আসতে পারতেন না। সংসারে কাজ ছিল। এখন সবাই বড় হয়েছে, কাজ কম, ফাঁক পেলে চলে আসেন। এখনও কাজ থাকলে আটকে থাকতে হয়। তখন মন খারাপ করে। মন ভার হলে কথকতা শোনেন, মন হাল্কা হয়ে যায়।

আবার একজন বাল্যবিধবা। কষ্টেসৃষ্টে ছেলে মানুষ করেছেন, বিয়ে দিয়েছেন। তা অনেক হয়েছে। রান্নাঘরে আর ঢুকবেন না। শেষ কয়েকটা দিন, ধর্মকর্ম নিয়ে থাকবেন।

আবার কেউ বললেন যে, বাড়ির ছেলের কথা বলার সময় হয় না, সবাই সবসময় ব্যস্ত। এখানে আসেন। অনেক লোকের সঙ্গে কথাবার্তা হয়। সময় কাটে। আবার কথকতায় মনও শান্ত হয়, ভাল ভাল কথা শোনেন।

সবাই বৃদ্ধা, সবাই মহিলা, বৃহৎ পরিবারে সকলের দায়িত্ব ছিল। আজ সেই ভার নেই, নাতনি ও ছেলেদের সঙ্গে আড়ো-আড়ো ভাব, আগের বাঁধন শিথিল হয়েছে। সময়ও আসন্ন, শেষ পারাণির কড়ি চাই, জীবনের দায়বোধের কৈফিয়ৎ হয়তো দিতে হবে।

কথকতায় বর্ণিত মূল্যবোধের জগতে তার উত্তর পাওয়া যেতে পারে। আবার কথকতার রস আস্বাদন অনেকে মিলে করেন, আলাপ আলোচনায়, আদানপ্রদানে সেখানে সমাজ গড়ে ওঠে, এককত্ব কেটে যায়। রস আস্বাদনের প্রক্রিয়ায় যোগ দিতে এসে এখানে শ্রোতা হয়ে ওঠেন সামাজিক, সমূহে বা গোষ্ঠীতে তিনি স্থিত হন।

আবার কোনও না কোনওভাবে এঁরা নিজেদের বঞ্চিত ভাবেন। এঁদের এই বঞ্চনা রসের 'সাধারণীকৃতির' জন্য, শব্দের ব্যঞ্জনা শক্তির প্রভাবে, কোনওদিন মিলে যায় শবরীর সার্বিক দুঃখে, তার প্রাপ্ত সামাজিক তুচ্ছ-তাচ্ছিল্যে। আবার পরম ভক্তিতে শবরীর যখন চরম প্রাপ্তি হয়, এঁরা মাটিতে কেঁদে লুটিয়ে পড়েন, বার বার হরিধ্বনি করেন। দ্বিজরাজ বাবুর বলা আখ্যানের শবরী তখন আদর্শায়িত হয়ে সর্বজনগ্রাহ্য হয়েছে।

লক্ষণীয় যে ভট্টনায়ক বা অভিনবগুপ্তদের রচনায় সহৃদয় ও সামাজিক সমার্থক, একটির পরিবর্তে অপরটি ব্যবহৃত হয়। সহৃদয়-এর সঙ্গে সামাজিকের এই যোগ তাৎপর্যপূর্ণ, একজন জরন্মীমাংসক যোগী সহৃদয় হতে পারেন না, বাসনার সংস্কার তাঁর নেই, শৃঙ্গার রসের আস্বাদন তার পক্ষে কী করে সম্ভব? রসাস্বাদন অলৌকিক কিন্তু যে বাসনাখ্য সংস্কার চিত্তবৃত্তিতে বিভাবাদিরূপে থাকে, যা রসবোধে অভিব্যক্ত হয় তা সামাজিক অভিজ্ঞতাপ্রসূত। অভিজ্ঞতা একক নয়, তা সমাজস্থ। সহৃদয়কে বার বার 'সামাজিক' নামাখ্যায় ভূষিত করে। তার নিজস্ব অভিজ্ঞতাকে যেন বাস্তবের মধ্যে বেঁধে রেখে দেওয়া হয়।[১৪৬]

এই বাস্তবতা ক্ষমতা বিন্যাসের দ্বারা আবদ্ধ। মানিকাকা সামাজিক বা সহৃদয় কিন্তু বাস্তবে তিনি পরান্নভোজী, বড়লোক আত্মীয়ের গলগ্রহ। হরিভক্তি প্রদায়িনী সভা বা চালতাবাগানের হরিসভার অধিকাংশ শ্রোতাই পুরুষ শাসিত সমাজে মেয়ে; নানা দৈনন্দিন বঞ্চনার অবশ্যম্ভাবী শিকার। চালতাবাগানের বৃদ্ধারা আবার নানা অর্থে সংসারের প্রান্তবাসী। সম্পন্ন গগন ঠাকুররাও শোকে বিপর্যস্ত। নানাভাবে লৌকিক অভিজ্ঞতা এঁদের আহত করেছে, নানাভাবে এঁরা পর্যুদস্ত। নিষ্পেষণের, হতাশার তাড়নায় এরা কথক ঠাকুরের কাছে যায়, দাবি জানায়,

> আমরা চাই একটু প্রাণ জুড়ানো হরিকথা যাতে চোখে জল আসে, *প্রাণে ভরসা জাগে।* এইসব তত্ত্বকথায় যে শুধু প্রাণ শুকিয়ে যায়, কোন ভরসা পাই না। মনে হয় আমরা ভগবানের কাছ থেকে অনেক দূরে পড়ে আছি।[১৪৭] (নজরটান আমার)

রসের উচ্ছলন ক্ষমতা ও সাধারণীকৃতি এই লৌকিক ক্ষেত্রকে মানসক্রিয়ায় অতিক্রম করায়, শ্রোতারা রসভুক্তির মাধ্যমে একক বোধকে সাধারণ বোধে রূপান্তরিত করেন। সাধারণীকৃতির ধারণার মধ্যে আছে একদিকে আদর্শায়িত করার ঝোঁক অন্যদিকে আছে ব্যাপ্ত করার বৃত্তি। উচ্ছলনের মধ্য দিয়ে, ব্যাপ্ত হবার মধ্য দিয়ে সীমা অতিক্রম করা যায়। ক্ষমতা বিন্যাসের নানা সীমা একক শ্রোতাকে লোকজীবনে নানা নিষেধের মধ্যে আবদ্ধ করে, তার সত্ত্বা বা বোধকে খণ্ডিত করে। রসধ্বনির মাধ্যমে, শব্দশক্তির মাধ্যমে রাম বা শবরীর কাহিনীতে শ্রোতা একাত্ম হয়, লৌকিক বোধের উত্তরণে, অলৌকিক বোধের

জগতে তার সাযুজ্য ঘটে। অলৌকিক জগতে এই সাযুজ্যতার মাধ্যমে, আস্বাদনের মাধ্যমে, তার 'চিৎ সম্বিত' হয়। সাংখ্য মতাবলম্বী ভট্টনায়ক বর্ণিত সম্বিতের অর্থ 'চৈতন্য'। নিম্নকোটির প্রতিনিধি মানিকাকার চৈতন্য দৈনন্দিন জীবনে নিয়মিত খণ্ডিত হয়, ক্ষমতার চাপে তাঁকে অস্বীকার করা হয়, ঠাট্টা করা হয়। রসধ্বনির ভোগে সেই চৈতন্য ফিরে পাওয়া যায়, তা স্ফুটিত হয়। চৈতন্যের প্রাপ্তি, অভিব্যক্তি, রসভোগের সাধারণীকরণের মাধ্যমেই সম্ভব। সংসারের অন্য সব ক্ষেত্র মানিকাকার কাছে, বুড়িদের কাছে সংকুচিত, প্রবেশাধিকার সেখানে সীমিত, কিন্তু রসভোগের এই ক্ষেত্র খোলা রয়েছে। আসরে তারা স্বরাট, কারণ তারা সামাজিক, রসের অনুভব সেখানে 'সহৃদয় হৃদয় দর্পণমধ্যান্তে।' শব্দময় ধ্বনিময় কথকতার আসরে তাই দেখা যায় তাদের ভিড়।

আশির কোঠায় নৃতত্ত্ববিদ ভিক্টর টার্নারের 'সীমা অতিক্রমের' (Liminality) তত্ত্ব অনেক সমাজবিজ্ঞানীকে নাড়া দিয়েছিল। দৈনন্দিন ক্রিয়াকলাপের মধ্যে এমন আচার অনুষ্ঠান আসে, নানা শিল্পকর্মের মধ্য দিয়ে এমন ক্ষেত্র খুঁজে পাওয়া সম্ভব যেখানে গ্রাহ্য কাঠামো মুহূর্তের মধ্যে নাকচ হয়ে যায়, সমূহের অবস্থিতি বড় হয়ে ওঠে, মুক্তির অনন্ত সম্ভাবনা দেখা যায়। মুহূর্তগুলি হয়তো ক্ষণস্থায়ী কিন্তু সেইগুলির পুনরাবৃত্তি হয়, নানা আচারে, আন্দোলনে, উৎসবে, তীর্থযাত্রায় কাঠামো থেকে বাইরে যাবার পথ খুঁজে পাওয়া যায়, এমন কী কাঠামো নাকচ হতেও পারে। মানসিক ও ব্যবহারিক, উভয়ক্ষেত্রে, এই প্রক্রিয়া কার্যকর হয়।[১৪৮]

ভারতীয় রসতত্ত্বের ব্যাখ্যায় এই প্রক্রিয়ার অন্যতর মাত্রা দেখা যায়। রসের আলোচনায় আছে 'চমৎকারিত্ব', ও এই চমৎকারিত্ব নিহিত আছে বিস্তৃতির ধারণায়। ভরত নাট্যশাস্ত্রে স্পষ্ট বলা হচ্ছে,

যোহর্থো হৃদয় সংবাদী তস্য ভাবো রসোদ্ভবঃ।
শরীরং ব্যাপ্যতে তেন শুষ্কংকাষ্ঠমিবাগ্নিনা॥

আগেই দেখেছি, অভিনবগুপ্ত এই রসব্যাপ্তির তত্ত্বে কীভাবে সায় দিয়েছেন। বিশ্বনাথ কবিরাজ লিখেছেন, 'চমৎকারশ্চিত্তবিস্তাররূপো বিস্ময়াপর পর্যায়ঃ।' (চমৎকার শব্দের অপর নাম হচ্ছে চিত্ত বিস্তাররূপ বিস্ময়)।[১৪৯]

রসপ্রস্থানের ব্যতিক্রমী চরিত্র কুন্তকও রসের এই সামান্য গুণকে স্বীকার করেছেন। তাঁর ভাষায় 'চমৎকারো বিতন্যতে, চমৎকৃতির্বিস্তার্যতে।' ফলে মুহূর্তে মুহূর্তে রসাস্বাদন হয়, সেই আস্বাদন ক্ষণকালের নয়।[১৫০] কবি-হৃদয় থেকে রস ক্ষরিত হয়, উচ্ছলিত হয়। আবার রসাস্বাদনে সহৃদয় চিত্তের বিস্তার হয়। এই তত্ত্বে কাঠামোর মধ্যে থেকেও মানসক্রিয়ায় কাঠামোকে অতিক্রম করার কথা থাকে; সামাজিক সংস্কারে আবদ্ধ হয়ে। লৌকিকভাবে তটস্থ থেকেও রসাস্বাদনে অলৌকিকভাবে রূপান্তরিত হওয়া যায়। ভ্যান গেনেপ বা টার্নার বার বার কাঠামোর বাইরে যাওয়ার ক্ষেত্রে নানা পর্ব বা ভাগের কথা বলেছেন, সীমা অতিক্রমের মুহূর্তগুলিকে সেই পর্বান্তরের মধ্যে প্রোথিত করার চেষ্টা করেছেন।

রসানুভূতির ভারতীয় ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে এইরকম পর্বভাগের বা মুহূর্তের অনুসন্ধানের প্রয়োজন উপলব্ধ হয় না। রসব্যাপ্তির বা উচ্ছলনের মধ্যে সহৃদয় ডুবে যান, চমৎকৃত

হন, তটস্থের সীমা অতিক্রান্ত হয়, মুহূর্ত ও ক্ষণকে আলাদা করে চেনার সুযোগ থাকে না, কাঠামোর বাইরে তার বিরোধী রূপ দাঁড়িয়ে থাকে না, কাঠামোর মধ্যে হাজির ও গায়েব অনুযোগী-প্রতিযোগী রূপে আবদ্ধ, একটার সঙ্গে অন্যটা সমবায় সম্বন্ধে থাকে, মুহূর্তের মধ্য দিয়ে সংযোগ বিচ্ছিন্ন করা যায় না। সহৃদয়ের রসাস্বাদনের সামগ্রিকতার রূপ তাই এই তত্ত্বে ধরা পড়ে।

৫ কথকতার সামাজিকতা : লোকশিক্ষার চরিত্র বিচার

বঙ্কিমচন্দ্র বা সঞ্জীবচন্দ্র, দীনেশচন্দ্র সেন বা হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, সবাই ঐতিহ্যানুসারী সমাজে কথকদের শ্রেষ্ঠ লোকশিক্ষক বলেছেন। কথকের সম্বল কথা। মজলিশে সেই কথার মাধ্যমে শ্রোতারা নানা নীতি উপাখ্যান শুনতেন, আখ্যানের বয়ানে, গানের কথার পরতে পরতে থাকত জীবনচর্চার নানা মূল্যবোধের ইঙ্গিত, কী করলে ভাল হয়, কী করলেই বা মন্দ হয়, এইসবের নির্দেশ। এই ভালমন্দ ত্রিকালব্যাপ্ত। কথকের বয়ানে ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্তমান সমভাবে বিরাজ করে। অথচ শ্রোতারা তো সাম্প্রতিক। দৈনন্দিন অভিজ্ঞতা ও জীবনচর্চার মধ্যেই তাদের নীতিবোধ স্থিত। তাই ঘটকালি করার সময় কথকও দৈনন্দিনকে ভুলতে পারেন না, পৌরাণিক চরিত্রে বাস্তবের মিশেল দিতে হয়; কথা যত 'অসম্ভব' হোক না কেন, তাকে 'সহজের' সমে, সমাজের পথে, ফিরতে হবে। বার-বার শ্রোতারা কাল্পনিক আখ্যানে খুঁজে বের করেন নিত্য প্রাসঙ্গিকতা, প্রাত্যহিক জগতের তুলনায় বা প্রতিতুলনায় পৌরাণিক চরিত্রগুলো ফিরে আসে, ঢুকে পড়ে প্রবাদ ও প্রবচনে, ধারণা হয়ে ওঠে লোকগ্রাহ্য, 'বিদুরের খুদ' বা 'রাবণের চিতা', 'কংস মামা' বা 'দৈত্যকুলে প্রহ্লাদ'; পৌরাণিক কথা জন্ম দেয় ধারণার, ধারণা রূপ পায় লৌকিক ছড়ায়, সামাজিক মন্তব্যে,

ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ গেল, শল্য হল রথী,
চন্দ্র সূর্য অস্ত গেল জোনাকি ধরে বাতি।

উনিশ শতকের দ্বিতীয় পাদে, লোকবৃত্তের বাইরে দাঁড়িয়ে, ইংরেজের পিঠ চাপড়ানোর কাঙাল, ইংরেজি নবীশ, 'নদের ফটিক চাঁদ'দের বিরুদ্ধে বঙ্কিম প্রায়ই গালমন্দ করতেন। সমাজে 'শিক্ষিত' ও 'রামাদের' মধ্যকার দূরত্ব ক্রমশ যোজন-প্রমাণ হচ্ছে। বঙ্কিম চিন্তিত। এই ব্যবধান কমাবার জন্য যে 'সুশিক্ষিতের' উদ্যোগ কাম্য। লোকশিক্ষার প্রকল্পে তাঁর অগাধ আস্থা। স্বভাবত তাঁর আলোচনার অনুষঙ্গে হাজির হন আশৈশব পরিচিত কথক ঠাকুর,

> গ্রামে গ্রামে, নগরে নগরে, বেদী পিঁড়ির উপর বসিয়া, ছেঁড়া তুলট, *না দেখিবার মানসে সম্মুখে পাতিয়া*, সুগন্ধ মল্লিকামালা শিরোপরে বেষ্টিত করিয়া নাদুস্‌নুদুস্ কালো কথক সীতার সতীত্ব, অর্জ্জুনের বীরধর্ম্ম, লক্ষ্মণের সত্যব্রত, ভীষ্মের ইন্দ্রিয়জয়, রাক্ষসীর প্রেমপ্রবাহ, দধীচির আত্মসমর্পণবিষয়ক সুসংস্কৃতের সদ্ব্যাখ্যা সুকণ্ঠে সদলঙ্কার সংযুক্ত করিয়া আপামর সাধারণ সমক্ষে বিবৃত করিতেন। যে লাঙ্গল চষে, যে তূলা পেঁজে, যে কাটনা কাটে, যে ভাত পায় না পায়—সেও শিখিত *যে ধর্ম্ম*

> *নিত্য,* যে ধর্ম্ম দৈব, যে আত্মান্বেষণ অশ্রদ্ধেয়, যে পরের জন্য জীবন, যে ঈশ্বর আছেন, যে বিশ্ব সৃজন করিতেছেন, বিশ্ব পালন করিতেছেন, বিশ্ব ধ্বংস করিতেছেন, *যে পাপ পুণ্য আছে, পাপের দণ্ড, পুণ্যের পুরস্কার আছে,* যে জন্ম আপনার জন্য নহে, পরের জন্য, যে অহিংসা পরমধর্ম্ম, যে লোকহিত পরম কার্য—সে শিক্ষা কোথায়? সে কথক কোথায়?[১৫১] (নজরটান আমার)

ইংরেজি শিক্ষিত নব্য যুবকের লোকশিক্ষার প্রতি অনীহার বিপরীতে কথকের সামাজিক ভূমিকাকে বঙ্কিম ব্যাখ্যা করেছেন। সংস্কৃতির যোজক হলেন কথক; তাঁর যোজনার ফলে সমাজে মূল্যবোধের সৃষ্টি হয়, চিত্তবৃত্তির প্রসার ঘটে।

মূল্যবাধের আবৃত্তি নিঃসন্দেহে কথকের কাজ। কিন্তু সেটা এক বিশেষ প্রকারের মুল্যোবোধ। তাঁর আলোচনায় দীনেশচন্দ্র সেন বলেছেন যে লোকগাথার প্রেমকাহিনীকে ব্রাহ্মণরা বাতিল করলেন এবং কথকদের মাধ্যমে দেবলীলার কথা চালু করলেন।[১৫২] এক হাতে নিলেন, আর এক হাতে দিলেন। মনোরঞ্জনের ক্ষেত্রটি 'নিম্নশ্রেণীর' হাত থেকে চলে গেল পৈতা ঝোলানো কথক ঠাকুরের খপ্পরে। ভাল মন্দের তর্ক-বিচার দীনেশচন্দ্র সেন স্পষ্টত এড়িয়ে গেলেও এই পরিবর্তনের কথা বলেছেন।

ঐতিহাসিক কালক্রম, নৃতাত্ত্বিক তত্ত্ব, এই সবের ফিকিরে দীনেশচন্দ্র সেনের বক্তব্যে ফাঁক পাওয়া যেতে পারে। কিন্তু কথকদের বর্ণিত পালার খুঁটি ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতিতে প্রোথিত ছিল। কথকরা সমাজরক্ষণে ব্রতী ছিলেন, সমাজ পরিবর্তনে নয়।

প্রয়াত দার্শনিক দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় চার্বাক দর্শনের অবলুপ্তির পিছনে কথকদের ভূমিকাকে বেশ বড় করে দেখিয়েছেন।[১৫৩] *মহাভারতে*-র শান্তিপর্বের একটি আখ্যানে ইন্দ্ররূপী শেয়াল নাস্তিক্যধর্মে বিশ্বাসের ভয়াবহ পরিণতি হাতেনাতে দেখিয়েছে, তর্কবিদ্যার প্রতি অনুরক্তির কর্মফল নিজমুখে বলেছে। কর্মফল কী? আগের জন্মে বামুন কিন্তু পরের জন্মে শেয়াল। আর এই গল্পটি নিপুণভাবে কথকঠাকুর 'নিরক্ষর' চাষাভূষোদের কাছে বলে কী মারাত্মক 'প্রোপাগান্ডা'ই না করেছেন। কথকরা এইরকম প্রচারক, সাবেক কালের শাসকশ্রেণীর হাতের প্রচারমাধ্যম; অক্ষরজ্ঞানহীন 'চাষাভূষোদের' চেতনায় 'নাস্তিক্যবুদ্ধির বিভীষিকাটা' 'কথকঠাকুর মারফৎ' শাসকরা গেঁথে দিতেন। গল্পকারদের ও কথকদের প্রসঙ্গে দেবীপ্রসাদের শেষ প্রাসঙ্গিক মন্তব্য হল 'আজকের দিনে এরকম কুশলী প্রোপাগান্ডিস্ট-এর খবর পেলে শাসক সম্প্রদায় পুরস্কারের ঝুড়ি উপুড় করে দেবেন।'

দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়ের যে কোনও মন্তব্য অনুধাবনযোগ্য। উনিশ শতকে বঙ্কিমী মূল্যায়নের সঙ্গে তাঁর বিবৃতির অনেক ফারাক, এমনকি দীনেশ সেনের লেখার মেজাজের সঙ্গেও তাঁর চিন্তা স্বভাবত খাপ খায় না। বঙ্কিমের কাছে যা লোকশিক্ষা, দেবীবাবুর কাছে সেটা শাসকশ্রেণীর প্রোপাগান্ডা। বঙ্কিমের ধারণা যে, নদের ফটিকচাঁদদের দাপটে কথকদের ভবিষ্যৎ অন্ধকার। হালকাভাবে হলেও দেবীবাবুর মনে হয়েছে যে জানা নেই, তাই, নতুবা কথকদের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল, খবর পাওয়া মাত্র শাসকদের দয়া তাদের উপর ঝরে পড়বে।

দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়ের বিচারের সঙ্গে বৈমত্যের সুযোগ আছে। ঐতিহাসিক-গত ভাবে কথকরা লোকায়তিকদের বিরুদ্ধে কতটা লড়েছিলেন বা ব্যবহৃত হয়েছিলেন, সেটা আলোচ্য নয়। *মহাভারত* বা *রামায়ণে*-এর সব আখ্যান কথকরা ব্যবহার করতেন না, সংগ্রহের মাধ্যম দিয়ে কিছু আখ্যানমাত্র নির্বাচিত করতেন, সেই ভিত্তিতে পুথি নিজেদের মতো করে লিখতেন। কোনও কথকতার পুথিতে শান্তিপর্বে লেখা ইন্দ্ররূপী শেয়ালের আখ্যান উল্লিখিত করার কোনও ঐতিহাসিক নিদর্শন আছে কিনা, সেই তথ্য বিচারও গৌণ। আপত্তি আছে অন্যখানে, সমস্যাটাকে যেভাবে সাজানো হয়েছে— সেইখানে।

যে কোনও যুগে শাসক শ্রেণীর চিন্তাধারা সামগ্রিকভাবে সমাজে নিয়ন্ত্রকের ভূমিকা পালন করে, মার্কসের এই উক্তি মান্য। আমাদের আজকের সমাজেও ডাক্তার, আইনজীবী, বিজ্ঞানী ও কবিরা বুর্জোয়াদের বেতনভুক, এই দামি কথাটাও মার্কস বলে গেছেন। বেশির ভাগ ব্রাহ্মণ ব্রহ্মোত্তর, দেবোত্তর জমি ভোগ করেন। জমিদার বাড়ির ডাকা আসরে তাঁরা কথক। পালার অন্যতম উৎস ব্রাহ্মণদের লেখা পৌরাণিক আখ্যান। বৌদ্ধিক ও অর্থনৈতিক স্বার্থের নিগড় কোথায় বাঁধা, সেইটা বুঝতে কোনও অসুবিধা নেই।

অথচ সীমা অতিক্রান্ত হয়, অন্তত হবার সম্ভাবনা থাকে। কথা বলার আর্ট হল কথকতা। আসর সামাজিক অনুষ্ঠান, বক্তা ও নানা রকমের শ্রোতা উভয়ে উপস্থিত থাকে। শ্রোতারা মান্য বামুন, 'নিরক্ষর চাষাভূষা' 'গোলা মেয়েমানুষ' সবরকম হতে পারে। কিন্তু আসরে রসভোগের প্রক্রিয়ায় তাদের সাধ্যানুযায়ী শ্রোতারাও সক্রিয়ভাবে অংশ নেয়। নানা শ্রোতার সংবেদনশীলতাকে কথক তার পাঠক্রমে মোকাবিলা করেন, তা না হলে আসর মাটি হবে। এই মোকাবিলার নানা সাক্ষ্য প্রভুপাদ প্রাণকিশোর গোস্বামীর আত্মজৈবনিক রচনায় লব্ধ।

ফলে ইচ্ছানুসারে বক্তব্যকে চেতনায় গেঁথে দেওয়া যায় না; তেমন তেমন শ্রোতার চোখে পাঠরত কথকের দাড়ি মরা পোষা ছাগলের দাড়ির কথা মনে করিয়ে দেয়, তার শোক উছলে ওঠে, এই কথাও গল্পে শোনা যায়।[১৫৪] সব মতের কথক থাকতে পারে। নাস্তিক বৌদ্ধ ও জৈনদেরও 'কথা' ছিল, তাই কথকও ছিল। কিন্তু 'রক্ষণশীল আস্তিক' কথকরাও মজলিশ চাহিদার তাগিদে, শিল্পের নীতিতে, এমনকি পেশার খাতিরে সবসময় বাঁধাধরা পথে চলবেন, তা নিশ্চিত করে বলা যায় না। অভিযোজন চলছে, তাৎক্ষণিকতা বয়ানের অভিমুখ বদলাচ্ছে, এই সবের কিছু কিছু উদাহরণ প্রসঙ্গান্তরে আলোচিত হয়েছে। পুরুষ শাসিত সমাজের ভ্রূকুটি অবহেলা করে কুমুদবন্ধু তাঁর পালা 'রিঙ্গনলীলার' মধ্যে মহিলা শিক্ষার পক্ষে জোর সওয়াল শুরু করেন, এইরকম নজিরও আছে।

স্বার্থ যাই থাকুক না কেন, অভীষ্ট যে ভাবে ছকা হোক না কেন, কথকদের সত্তা আছে, শ্রোতাদের বোধ আছে, আছে সামাজিক অভিজ্ঞতা। যোজক ও যোজিতের পারস্পরিক সংঘাত (দ্বিবিধ অর্থে) রসভোগের ক্ষেত্র তৈরি হয়, সেই ক্ষেত্রে টানাপোড়েন আছে, প্রতিসরণ হয় আখ্যানবিন্যাসে ও ভাববোধে। শাসকশ্রেণীর হাতে কথকদের ক্রীড়নক— তাদের আদর্শ প্রচারের 'মাধ্যম' মাত্র মনে করা, অন্যদিকে 'নিরক্ষর' (দেবীবাবু বার-বার

কেন জানি না এই বিশেষণটা গ্রামবাসী ও চাষীদের আগে ব্যবহার করেছেন; যেন অক্ষর জ্ঞানটা বুদ্ধি-বিবেচনা ও বুদ্ধিবোধের সমার্থক) চাষীদের চৈতন্যকে আঁক টানার স্লেট হিসাবে দেখানোর মধ্যে আদর্শ ও মূল্যবোধ গড়ে ওঠার পথে বৈপরীত্যের নানা মুহূর্তকে অবহেলা করা হয়, যোজনার আদান-প্রদানের প্রক্রিয়াকে বাদ দেওয়া হয়। আসরে পাঠের ও শোনার নানা স্তরে যে ভিন্ন বয়ান তৈরি হতে পারে, মূল্যবোধের রঙে তারতম্য ঘটতে পারে—এইরকম কোনও সম্ভাবনা এই জাতীয় আলোচনায় আমল পায় না।

কথক ঠাকুর ও সামূহিক চৈতন্য

এই মূল্যবোধ নিমার্ণ-প্রক্রিয়া সমূহের স্থান কোথায়? কী করে বা যোজিতের অবস্থান পরিবর্তন যোজকের ঘটকালি রীতিতে পরিবর্তন আনে, উভয়ের টানাপোড়েন আখ্যানের বিন্যাস, রসভোগকে করে তোলে ভিন্নতর? তুলনা, প্রতি তুলনার মাধ্যমে সমস্যা বিচারে প্রবৃত্ত হওয়া যেতে পারে? সমূহেব উপস্থিতি কথকতার আসরের পরিমণ্ডল্ল কীভাবে নির্ধারিত করে, সেই বিষয়ে যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধির প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা ছিল। তাঁর সাক্ষ্য থেকে বিস্তৃত উদ্ধৃতি দেওয়া আবশ্যক:

> আশী বৎসর পূর্বে মাতাঠাকুরাণী রামায়ণ পাঠ করাইয়াছিলেন। তখন ইস্কুলে পড়ি। *সমুদয় ঘটনা এখনও প্রত্যক্ষ প্রতীয়মান হইতেছে।* তিনি গৃহদেবতা রঘুনাথজীউর সম্মুখে সঙ্কল্প করিলেন, তিনি সমস্ত বৈশাখমাস রামায়ণ পাঠ করাইবেন। আটচালায় বেদী নির্মিত হইল, গ্রামস্থ সকলকে রামায়ণ পাঠ শ্রবণ করিতে আহ্বান করা হইল। মা পাঠক ঠাকুরকে ধুতি, উড়ানী আর কি কি দিয়া বরণ করিলেন। অপরাহ্নে পাঠক বেদীতে বসিয়া রামায়ণের পুথি খুলিলেন। গ্রাম ছোটো, ইতোমধ্যে পঞ্চাশ ষাটজন পুরুষ এবং ত্রিশ চল্লিশ জন নারী যথাস্থানে উপবিষ্ট হইয়াছিলেন। পাঠক রামায়ণ হইতে দুইটি, তিনটি, চারটি শ্লোক পাঠ করিলেন, তারপরে ব্যাখ্যা করিতে লাগিলেন। কত প্রকারে তাৎপর্য বুঝাইতে লাগিলেন, কখন তিনি অভিনয় করেন, কখন পুরুষোচিত ভাষা ব্যবহার করেন, কখন নারীসুলভ কণ্ঠে খেদ করেন ইত্যাদি প্রায় দেড় ঘণ্টা এইরূপ চলিতে থাকে। শ্রোতৃবর্গ নিবিষ্ট চিত্তে শুনিতে থাকে। প্রতিদিন যে একই লোক আসিত তাহাও নয়। রাঢ়ের গ্রামে বর্ষীয়সী *বিশেষতঃ গ্রামের ঝিউড়ি,* এ পাড়ায় সে পাড়ায় স্বচ্ছন্দে আসে। শ্রোতাদিগের মধ্যে অনেকেই অত্যল্প লেখাপড়া জানিতেন, তাহাও পাঠশালায় সমাপ্ত। কিন্তু পাঠকের ভাষা সংস্কৃত শব্দ বহুল হইলেও *ভাবার্থ গ্রহণ করিতে পারিতেন।* এইরূপ বৈশাখ মাস অতিবাহিত হইল। সমাপ্তি দিবসে *ব্রত উদযাপিত হইল,* পাঠক দক্ষিণান্ত হইলেন।...পরদিন *ব্রাহ্মণ ভোজন।* মায়ের সঙ্কল্প সিদ্ধ হইল। শ্রোতারা দুই কারণে আসিত — রামায়ণ পাঠ শ্রবণ করিলে *পুণ্য হয়,* তাহারা পুণ্য অর্জন করিতে আসিত। আর দ্বিতীয় কারণ, তাহারা না আসিলে মায়ের সঙ্কল্প ভঙ্গ হইত। তাঁহার *পাপ হইত।* তাঁহারা তাঁকে *পাপের ভাগী করিতে পারিত না।* এই কারণেও তাঁহারা না আসিয়া পারিত না। *তাহাদের আসাতে মা কৃতার্থ বোধ করিতেন।* রামায়ণ শ্রবণ করিলে পুণ্য হয়, *ইহা*

> *কি অন্ধ বিশ্বাস?* যিনি একথা বলেন তিনি রামায়ণ পড়েন নাই, শ্রদ্ধা সহকারে পড়েন নাই,। রামাদির চরিত ধ্যান করেন নাই। আর তিনি পুণ্য শব্দের অর্থও জানেন না।[১৫৫]
> (নজরটান আমার)

কথকতা ইতিহাসে, সমাজে বিবর্তিত। আসরে উদ্যোক্তা ও শ্রোতারা পাপ ও পুণ্যে বিশ্বাসী। পাপ-পুণ্য একার নয়, তার ছোঁয়াচ সবার লাগে, সবার তাতে অংশ আছে। সঙ্কল্প করেন একজন, ডাকেন একজন কিন্তু আসতে হয় সবাইকে, আসরে হাজির থাকা হল সামাজিক দায়। যোগেশচন্দ্র রায়ের ধমকানিটা তাৎপর্যপূর্ণ্য। রস উপভোগ-এর শর্ত আছে, শ্রদ্ধা থাকতে হবে, পুণ্যে আস্থা রাখতে হবে। শ্রদ্ধার আভিধানিক অর্থ তো বিশ্বাস, প্রত্যয়, স্পৃহা, আকাঙ্ক্ষা ইত্যাদি। পুণ্য অর্থ শুভকর্ম, পবিত্র ধর্ম। এই সব গুণের শর্তাধীনে যোজক-যোজিতের মোকাবিলা হয়, তা না হলে রসভোগের সম্ভাবনাই নাকচ হয়ে যায়। 'কাশীরাম দাস ভনে, শুনে পুণ্যবান।' শ্রোতারা পুণ্যবান, তাই তো তাঁরা কথা শুনছেন।

যখন সমুহ বদলে যায়। শর্ত পালটে যায়, তখন কথকও বাতিল হয়ে যান। যোগেশচন্দ্রের সমসাময়িক কলকাতার এক বাসিন্দা লিখছেন,

> বৃদ্ধ ও বৃদ্ধারা তাহাদের কথকতা ও পালাগান শুনিতে যাইতেন। অন্যান্য ভদ্র লোকেরা কখনো যাইতেন না। কথাবার্তার প্রচলিত মাত্রাই ছিল—এ যেন 'কথকের কথা', অর্থাৎ বিশ্বাসযোগ্য নয়।[১৫৬]

প্রতিতুলনা আনা যেতে পারে। 'কথার' একটি রূপ কথকতা। আরও অনেক প্রজাতি আছে—রূপকথা, গীতকথা, কিস্যা, ইত্যাদি সেইগুলিও বাচ্য। এই বাচনীয় প্রজাতি ছাপার অক্ষরে এল, বঙ্গ শিশুসাহিত্যে শোরগোল পড়ে গেল।

বিংশ শতকের গোড়ায় ডিকটাফোন নিয়ে দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার একশ বছরেব বৃদ্ধার কাছ থেকে গীতকথা সংগ্রহ করেছেন, যেমন শুনেছেন তেমন লিখেছেন, সেইমত ছাপিয়েছেন। পরে সমালোচকদের চাপে, 'গল্পভুক সামান্য শিক্ষিত পাঠকবর্গের' চাহিদা মেটাতে *ঠাকুরদাদার ঝুলির* প্রথম সংস্করণ (১৯০৮) পুনর্লিখিত হল, সেই মার্জিত সংস্করণেরই বাজারে কাটতি হল। পুনর্লিখনে মূল গল্প বদলায়নি।[১৫৭] কিন্তু অপ্রচলিত শব্দ পালটানো বা ভাষার মার্জিতকরণে দক্ষিণারঞ্জনের কলম সীমাবদ্ধ থাকেনি। কথ্য গল্পের সংহত লেখ্য রূপ দেওয়া হয়েছে, রকমফের ঘটে গেছে গল্প আস্বাদনের তারে।

মনে রাখতে হবে ঠাকুরদাদার ঝুলির গল্প গীতিকথার সংকলন। বিশেষ আয়োজন ও সমাবেশে সমূহের সামনে কথাগুলি বলা হত। আঁতুড়ঘর গল্প বলার অন্যতম জায়গা। আসন্নপ্রসবা জননী যেদিন থেকে আঁতুড়ে যান সেই দিন থেকে গীতকথা-অভিজ্ঞরা প্রতি রাত্রে মজলিশ বসাতেন।

রাত্রি দ্বিপ্রহরে আসর শেষ হত। কথকদের মধ্যে কেউ সম্ভ্রান্ত বিধবা, অনেকে কৃষক। 'রোজের রাত যোগান' তারা কড়ায়-গণ্ডায় বুঝে নিত। ষষ্ঠীর দিন ঘটা বেশি হত, সারারাত ধরে পালা বলা চলত। অন্য গায়ক-গায়িকা 'মূল কথকের' সঙ্গে যোগ দিত, কথার সঙ্গে সঙ্গে গান চলত। ছেলে, মেয়ে, বুড়ো, আসরে সবাইয়ের আবাধ

প্রবেশাধিকার।[১১৮]

বৈলক্ষণগুলিও স্পষ্ট। কথকতা মার্গ থেকে জন-অভিমুখী, ব্রাহ্মণের পুথি থেকে প্রাকৃতজনের আসরে তার যাত্রা। লোককথার কথ্য রূপকে দক্ষিণারঞ্জন মার্জনা করেছেন, আঁতুড়ঘর থেকে গল্পকে তুলে আনছেন ব্যক্তি পাঠকদের শহুরে বৈঠকখানায়; কথকতার আখ্যানের যোজনার অভিমুখের বিপরীতে ঠাকুদাদার ঝুলির গল্পের যাত্রা, কথার রওয়ানি হয়ে ওঠে অন্যরকম।

কথকতার নানা গল্প

বর্তমান প্রসঙ্গে একটি উদাহরণ যথেষ্ট। দীনেশচন্দ্র সেনের সাক্ষ্যানুযায়ী, প্রথম সংস্করণে 'মালঞ্চমালা' গল্পটি শুনে হুবহু লেখা হয়েছিল, তাই ওই গল্পটি থেকে একটি অনুচ্ছেদ উদ্ধৃত করা হল:

প্রথম পাঠ : ১৯০৮

'কোটালিনী ছিল ঘরে, কোটালিনী আসিয়া কয়,—কি বারোদিনের আয়ু তারি কাছে দিব কন্যা আমার,—যুগ জন্ম হবিষ্যি।—মা গেলেও না, ছা গেলেও না! কপাল আমার,—বারোবছরের তিনবছর গেল রোগে, চারবছর গেল শোকে,—আরও যে বচ্ছর আছে তা যদি না যায় ভোগে, তো মেয়ের জন্ম কি? হাঁড়ীর মাছ হাঁড়ীতে জিয়াই, শাখা সিঁদুরের বড়ি খোয়াইতে একবেলা খাই একবেলা না খাই—এক কোলের কন্যা—তাই দিব শিশুপুত্রের কাছে।—সেও পুত্র বাঁচে কি না বাঁচে?—'কুঁড়ে বাঁধি, কুঁড়েয় থাকি তার তলেও রাজার হাঁচি!' রাজাকে গিয়া কও, কন্যা যে আমি দিব না 'আহা, কিবা আমার পাড়লেন গিয়া ফল, তারি জন্য দেখি আমি কন্যার চক্ষের জল!' কোটালিনী পোঁটলা পুঁটলী বাঁধিয়া কন্যাকে ডাকে—'মালঞ্চ লো মালঞ্চ! আয় মা, আমরা এ জনমের মত রাজ্য ছেড়ে যাই।'[১৫৯]

মার্জিত পাঠ : ১৯০৯

কোটালিনী বলে,—কুঁড়ে বাঁধি কুঁড়েয় আছি। তার তলেও রাজার হাঁছি।: বারো দিনের আয়ু শিশুর কাছে কন্যা দিব? রাজাকে গিয়া বল কন্যা আমি দিব না।[১৬০]

দুইটিতেই কোটালিনীর আপত্তির কথা অক্ষুণ্ণ আছে, বদলে গেছে শুধু ঢঙ; ব্যঞ্জনের তার হয়ে গেছে পানসে। প্রথম বয়ানে আছে আশা ও আশঙ্কা, বঞ্চনা ও সাধ, রাজার প্রতি ছুঁড়ে দেওয়া ব্যঙ্গ, সংসারে দৈনন্দিন লড়াই, অত্যাচার থেকে মেয়েকে বাঁচাবার জন্য পথে বেরিয়ে পড়বার তাগিদ। রাজার অন্যায় আবদারের বিরুদ্ধে, জোর-জবরদস্তির বিরুদ্ধে এইসব অনুভূতির মিশ্রণে গড়ে উঠেছে কোটালিনীর আপত্তি। মার্জিত পাঠে শব্দ বদলায়, গান বাদ দেওয়া হয়, বলার রওয়ানিকে সংক্ষিপ্ত করা হয় সরাসরি নেতিবাচক বাক্যে; লৌকিক স্বাদের আভাস দেবার জন্য বজায় রাখা হয় একটা প্রবাদ। ফলে কোটালিনীর আপত্তি একমাত্রিক ঘোষণার মতো শোনায়। বাগর্থ যে সম্পৃক্ত, আলাদা করা মুশকিল।

নতুন গড়ে ওঠা 'শিশু সাহিত্যের' অন্যতম রূপকার দক্ষিণারঞ্জন। জোর তর্ক চলছে,

কোনটা পাঠ্য কোনটা অপাঠ্য, কোনটা বোধগম্য, কোনটা বা দুর্বোধ্য। এই গোষ্ঠীতে দক্ষিণারঞ্জনও আছেন, লিখছেন দেশগঠনের বই, *চারু ও হারু, লাস্টবয়, ফার্স্টবয়।*

তার চেয়ে বড় কথা বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ উদ্যোগ নিয়েছে, খাঁটি দেশজ বস্তুর উদ্ধার করতে হবে, স্বদেশী ব্রতে নিজস্ব অনুসন্ধানে লিপ্ত হতে হবে, 'ভারতীয় প্রাণধারা', 'বাঙালীর জাতীয় চিত্তরসের' সঙ্গে শিক্ষিতের পরিচয় করানো কর্তব্য। এই প্রকল্পের তিনি পুরোপুরি শরিক, এই কথা দক্ষিণারঞ্জন ভূমিকায় বার-বার স্বীকার করেছেন। 'আমার দেশ', 'বাঙ্গালীর আপন প্রাণ', '*বাঙ্গালা ভাষার প্রকৃত আকৃতি*' (নজরটান মিত্র মহাশয়ের) সব কিছু ঠাকুরদাদার ঝুলিতে পাওয়া যাবে, এই বিশ্বাসে তিনি কাহিনী সংগ্রহ করে প্রকাশ করেছেন।

এর অর্থ এই নয় যে দাবিগুলি যথার্থ নয়, মিত্র মহাশয়ের বানানো। কিন্তু মনে রাখা দরকার যে 'কথার' বৈশিষ্ট্য চিহ্নিত করা হচ্ছে নতুনভাবে। বোধের এই রূপান্তর স্মর্তব্য। সমালোচনা দরকার। 'পাশ্চাত্য শিক্ষা', 'পাশ্চাত্য আদর্শ' ও 'উপন্যাস' জাঁকিয়ে বসেছে, তার তুলনীয় কিছু 'আমার দেশ' দিয়েছিল, যেমন 'শিশুসাহিত্য (রূপকথা)' মেয়েলি সাহিত্য (ব্রতকথা) ইত্যাদি। জিনিস খাঁটি হওয়া চাই, মেকি হলে চলবে না। জড়িত আছে 'জাতির বেদনা উল্লাসের মর্ম্মমর্যাদা', 'দেশে ও বিশ্বে' প্রতিষ্ঠা কামনা, প্রমাণ করার উদগ্র ইচ্ছা 'ভারতেরই মধুচক্রের মোম, অপর দেশ হইতে ক্যান্ডেলরূপে আসিয়া, আলো জ্বালাইতেছিল।' ফলে জিনিস আমাদের, কিন্তু প্রতি পদক্ষেপে তুলনা দিতে হবে বিদেশের, তা না হলে স্বদেশ প্রতিষ্ঠিত হবে কী করে?[১৬১]

এই আদিকল্প যে রাজনৈতিক ও সামাজিক বাতাবরণে গড়ে উঠেছে, তা সুপরিচিত। ফলে যোজনার ক্ষেত্রে প্রতিসরণ ঘটেছে। সমসাময়িক অনেকের মতো দক্ষিণাবাবুও মনে করছেন খাঁটি আছে পল্লীতে, বঙ্গজননী হচ্ছেন পল্লী নিবাসী। পল্লী ও শহরের ব্যবধান-এর ধারণা প্রধান হয়ে উঠছে। পল্লী 'খাঁটি স্বদেশী', শহর মেকি বিদেশি। পল্লীর আতুঁড়ঘর গল্পের উৎস, ভূমিকার এবং পাদটীকায় আঁতুড়ঘরকে জায়গাও দেওয়া হচ্ছে। কিন্তু উদ্দিষ্ট হচ্ছেন শহরের আধুনিক পাঠকরা। দক্ষিণাবাবুও 'ঘটকালি' করছেন, শহুরে পাঠকদের পড়াচ্ছেন 'পল্লীর শ্রুতিসাহিত্য।' রবীন্দ্রনাথ প্রস্তাব দিচ্ছেন যে 'আধুনিক দিদিমাদের জন্য অবিলম্বে স্কুল খোলা হউক'। সেইখানে দক্ষিণাবাবুর বই হবে পাঠ্য।[১৬২]

কথকের উদ্দেশ্য একেবারে আলাদা। শহর বা পল্লীর দ্বৈধতা তাঁর পালার কেন্দ্রীয় ভাব নয়, মথুরা ও বৃন্দাবন, রাখাল রাজা ও দ্বারকার রাজা এক লীলাময়ের প্রকার মাত্র। আসরে শ্রোতার পরিচয় বাঙালি নয়, ভক্ত; বিপরীতাচারীরা হল পাষণ্ড। আজও পাঠের শেষে দ্বিজবাবু ভক্তমণ্ডলীর নামে জোকার দেন, পাঠের প্রারম্ভে বাসন্তী দেবী উপস্থিত ও অনুপস্থিত, গত ও বর্তমান ভক্তবৃন্দের চরণে কোটি কোটি প্রণাম জানান। গোস্বামী কবিরাজের অনুসরণে সপ্তদশ শতকে যদুনন্দন তো বলে দিয়েছেন পাঠের সার্থকতা, পাঠকের কামনার কথা :

মোর মুখ মরুস্থল, বাণীখিন্নরূপচর গোকুলা উন্মুখা বাক্যগণ।
বৈষ্ণবের কর্ণ নদী, প্রবেশ করয়ে যদি, পুষ্ট স্নিগ্ধ হইবে তখন ॥[১৬৩]

বাচ্য থেকে পঠনীয়, কথ্য লেখ্য, শ্রুতি থেকে মুদ্রণ। তাই *যোজিতের পড়ার* সুবিধের

জন্য সংস্করণকে মার্জিত করা হল। পল্লী '*গীতকথা*' হয়ে যাচ্ছে। তাকে হতে হচ্ছে '*বঙ্গোপন্যাস*'। আধুনিক শিশু সাহিত্যের তালিকায় সেইটা অবশ্য পাঠ্য, ১৯৮৬ সালে প্রকাশিত হল 'বঙ্গোপন্যাস'-এর ষোড়শ সংস্করণ। আর কথকতার আখ্যান খুঁজে পাওয়া যাবে শুধু পুথিতে। ওইগুলির অমার্জিত পাঠ তো এককের নয়, পাপ-পুণ্যে বিশ্বাসী ভক্তসমূহের, যে সমূহ আজ 'জাতিতে' পর্যবসিত, যার সত্তা আজ 'এককে' বিভক্ত, স্বগত পাঠে যে অভ্যস্ত।

... ...

আসরে ঝাঁপ পড়ে গেছে, ধীরে ধীরে পুথি পাতড়া গুটিয়ে ফেলছেন, লাল বনাত গায়ে চাঁই বুড়ো, উঠে যাবার সময় হল তাঁর, কোনওদিন আর ডাক আসবে কিনা, কে জানে। সেই কবে খবর পেয়েছি কাশীতে মারা গেছেন হরু ঠাকুর, নিশ্চিন্দিপুরের হরিহর রায়। আর কে পালা বাঁধবে তাঁর মতো? মনটা কি একটু আনচান করে? জানি 'দুর্ভাবনাময় জটিল সাম্প্রতিকের'[১৬৪] মুখোমুখি আমরা, লোকে ধমক দেবে। এইসব ক্ষেত্রে বিষণ্ণতাকে প্রশ্রয় দেওয়া কাজের কথা নয়, সেইটা রোমান্টিকতা, অলস 'নস্টালজিয়া'। ইতিহাসের আধুনিকতার, অনিবার্যতার বিরোধিতা। যা অবস্থা আজকাল, এই অতীতবিলাস বিপদজনকও হতে পারে, ব্রাহ্মণ্যবাদকে প্রশ্রয় দেবে, হয়তো বা দুর্বল করে তুলবে ধর্মনিরপেক্ষতার লড়াইকে। কিন্তু এও তো মনে হয় যে সমূহের রসভুক্তির ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতাকে যথাযথ সামাজিক ও নান্দনিক মর্যাদা না দেওয়াটা কৃতঘ্নতা। আরও শুনেছি যে অপু আজও স্বপ্ন দেখে, এই দরিদ্র, নিষ্পেষিত দেশে, নিষ্ক্রিয় সময়ে প্রতিদিন তার কানে ভেসে আসে তার বাবার, কথক হরিহরের, আশীর্ব্বচনের রেশ :

কালে বর্ষতু পর্জ্জন্যং পৃথিবী শস্যশালিনী...'
লোকাঃ সন্তু নিরাময়াঃ...

টীকা

সংকেত সূচী:—বিশ্ব— পুথিশালা, বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়।
ক. বি.— পুথি সংগ্রহ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়
পাঠবাড়ি—শ্রীগৌরাঙ্গ গ্রন্থমন্দির, পাঠবাড়ি, বরাহনগর।
এশিয়া— পুথি সংগ্রহ, এশিয়াটিক সোসাইটি, কলিকাতা।
তালিকার ক্রমিক সংখ্যা ও ফোলিও সংখ্যা দ্বারা নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

১ দীনবন্ধু মিত্র, *রচনা সংগ্রহ*, সাক্ষরতা প্রকাশন (কলিকাতা ১৯৭৩), পৃ. ৪৮৪, ৪৯০

২ '*ব্রজবিলাস*', দ্বিতীয় সংস্করণের বিজ্ঞাপন, *বিদ্যাসাগর রচনা সংগ্রহ*, সাক্ষরতা প্রকাশন, দ্বিতীয় খণ্ড (কলিকাতা, ১৯৭২), পৃ. ৪৫৪-৪৫৫।

৩ রাধাগোবিন্দ বসাক সম্পাদিত ও অনূদিত, *কৌটিলীয় অর্থশাস্ত্র*, ২/২৭ (কলিকাতা ১৯৬৪), ১ম খণ্ড, পৃ. ১৯০-১৯১। প্রাচীনকালে কথকদের প্রসঙ্গে দ্রষ্টব্য, সুকুমার সেনের নিবন্ধ, 'কথকতা', *ভারতকোষ*, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ ১৫০-১৫১।

৪ 'কথকতা', *বিশ্বকোষ*, তৃতীয় ভাগ, নগেন্দ্রনাথ বসু, ১৮৮৬, পৃ. ১৯১ (পুনর্মুদ্রণ, দিল্লী, ১৯৮৮)।

৫ William Ward *Views of the History, Literature, Religion of the Hindus* 2nd ed., Vol II Serampore 1815, 244-290।

৬ হরিপদ চক্রবর্তী, 'কথকতার পুঁথি', *সুবর্ণলেখা*, আশুতোষ ভট্টাচার্য ও অসিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত (কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৭৪), পৃ. ৫৮০-৫৯২।

৭ ভোলানাথ চক্রবর্তী, *সেই একদিন আর এই একদিন*, অর্থাৎ বঙ্গের পূর্ব্ব ও বর্ত্তমান অবস্থা, সুরাপান নিবারণীসভায় বক্তৃতা, ৯ই শ্রাবণ, আদি ব্রাহ্ম-সমাজ যন্ত্রে মুদ্রিত, ১৮৭৫ সন, পৃ ১৩ ১৪। রাজ নারায়ণ বসু দ্বার অভিব্যক্ত, *বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ক বক্তৃতা*, সারদাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক বাঙ্গালা যন্ত্রে মুদ্রিত, শোভাবাজার গ্রে ষ্ট্রিট, ১৮০০ শকাব্দ (১৮৭৮) পৃ. ৬২-৬৪। কথক ঠাকুরের নাম পুস্তিকাটিতে ভ্রমবশত লেখা হয়েছে গঙ্গাধর শিরোমণি।

৮ দুর্গাদাস লাহিড়ী *বাঙ্গালীর গান* (কলিকাতা, ১৩১২), পৃ ২৭৭-২৭৯।

৯ বিপিনবিহারী চক্রবর্তী, *খাঁটুরা ইতিহাস ও কুশদ্বীপের কাহিনী*, (কলিকাতা, ১৩০৮), পৃ ১৬৪-২০৭।

১০ 'বঙ্কিমচন্দ্র কাঁটাল পাড়ায়', *হরপ্রসাদ রচনা সংগ্রহ*, দ্বিতীয় খণ্ড, সত্যজিৎ চৌধুরী ও অন্যান্য সম্পাদিত (কলিকাতা, ১৯৮১), পৃ. ১৫।

১১ হরিহর শেঠ, 'চন্দননগরের কথক, কবিওয়ালা ও যাত্রা', *প্রবাসী*, মাঘ, ১৩৩১, ২৪শ ভাগ, ২য় খণ্ড, ৪র্থ সংখ্যা, পৃ. ৫০৬-৫০৭।

১২ শশিভূষণ বিদ্যালঙ্কার, *জীবনীকোষ, ভারতীয় ঐতিহাসিক*, ২য় খণ্ড, (কলিকাতা, ১৩৪৫), পৃ ৫১ ১৫১ ১৫২। কিশোরীভজন সম্প্রদায়ের জন্য দ্রষ্টব্য, অক্ষয়কুমার দত্ত, *ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়*, বিনয় ঘোষ সম্পাদিত, (কলিকাতা, ১৩৭৬), পৃ. ৩২৪-৩২৬।

১৩ 'আমাদের গৃহে অন্তঃপুর শিক্ষা ও সংস্কার', *প্রদীপ*, ভাদ্র, ১৩০৫, উদ্ধৃত *সাহিত্য সাধক চরিতমালা*, ২য় খণ্ড, ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, পৃ ৬।

১৪ বিপিনচন্দ্র পাল, *সত্তর বৎসর। আত্মজীবনী*, (কলিকাতা ১৩৬২), পৃ. ৩২-৩৩। গোপালচন্দ্র রায়, *জীবনস্মৃতি* (কলিকাতা, ১৯৯২), পৃ. ৬। রামধনের কন্যা বিদুষী ছিলেন, পুথিও লিখতেন। কিন্তু কথকতা করতেন তার কোনও প্রমাণ নেই।

১৫ Dinesh Chandra Sen, *History of Bengali Language & Literature* (Calcutta, 1911) p 590

১৬ ঈশানচন্দ্র বসু সম্পাদিত, *গোবিন্দমঙ্গল*, দুঃখী শ্যামদাস বিরচিত দ্বিতীয় সংস্করণ, *বঙ্গবাসী*, (কলিকাতা ১৩১৭)। কালিদাস রায়, *প্রাচীন বঙ্গসাহিত্য* ১ম খণ্ড, নিউ প্রেস, তারিখ অনুল্লেখিত, পৃ. ৩১৩-৩১৪, ৩৩১। অধিকারী বংশ মেদিনীপুরে আজও কথকতা করেন। তমলুকের অনাথবন্ধু দাস অধিকারী নামজাদা কথক। শ্রীমতী বিদ্যুৎলতা সামন্তের নামও এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য। আমরা এই কথক-কথকীদের সঙ্গে এখনও যোগাযোগ করতে পারিনি।

১৭ অবনী অধিকারীর সহিত সাক্ষাৎকার, রতনপল্লী, ২৬ ফেব্রুয়ারি, ১৯৯৩।

১৮ বসনতকুমার পাল, *স্মৃতির অর্ঘ্য* (শিবপুর, ১৩৪৬), পৃ. ২৩৫- ২৩৬।

১৯ *সটীক হুতোম প্যাঁচার নকশা*, সম্পাদনা অরুণ নাগ, (কলিকাতা ১৩৯৮), পৃ. ৮১।

২০ উনিশ শতকের শেষ প্রান্তে ও বিংশ শতকের গোড়ায় বৈষ্ণবসমাজে প্রভুপাদ অতুলকৃষ্ণ গোস্বামীর দোর্দণ্ডপ্রতাপ ও ভূমিকার কথা আজও অনালোচিত। অতুলকৃষ্ণ জবানির উপরে ভিত্তি করে প্রাণকিশোর রচিত অতুলকৃষ্ণের জীবনী একটি প্রাসঙ্গিক উৎস। হরিসভা আন্দোলনের ইতিহাসও অনালোচিত রয়েছে। উদ্দেশ্য ও কার্যক্রমের জন্য দ্রষ্টব্য, প্রভুপাদ শ্রীপ্রাণকিশোর গোস্বামী, 'গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্মিলনী' (১৩৩৭ সন, পৌষ, ঢাকায় প্রদত্ত ভাষণ), *আদর জানাই*, সম্পাদনা শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় (কলিকাতা, প্রকাশ তারিখ অনুল্লেখিত), পৃ. ১৩৪। বিমানবিহারী মজুমদারের ভূমিকার জন্য দ্রষ্টব্য, *শ্রীচৈতন্যচরিতের উপাদান* (কলিকাতা, ১৯৫৯), পৃ. ৫০৮।

২১ দীনেশ চন্দ্র সেন, 'বাঙালার *বিলুপ্ত সম্পদ কথকতা*', *প্রবর্তক*, ২২ বর্ষ, ১ম খণ্ড, ৪র্থ সংখ্যা শ্রাবণ, ১৩৪৪।

২২ প্রভুপাদ প্রাণকিশোরের জীবনী ও কার্যাবলীর জন্য দ্রষ্টব্য, *আদর জানাই*, প্রাগুক্ত; গুরুরাজকিশোর গোস্বামী সম্পাদিত *আচার্য প্রভু প্রাণকিশোর* (কলিকাতা, ১৩৮৮)।

২৩ প্রাণকিশোর গোস্বামী, *প্রভু অতুলকৃষ্ণ* (কলিকাতা, ১৩৫৮), পৃ. ৪৬-৪৭। পাঠক ও ব্যাখ্যাকার অতুলকৃষ্ণ সম্পর্কিত তথ্যাদি এই পুস্তক থেকে সংগৃহীত।

২৪ ঐ, পৃ. ১০৮-১০৯

২৫ প্রাণকিশোর গোস্বামী, *কথকতার কথা* (কলিকাতা, ১৩৭৫), পৃ. ১৩৪।

২৬ অসিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, 'বাংলা গদ্যে শ্রীযুক্ত প্রাণকিশোর গোস্বামী', *আদর জানাই*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪৯-২৫২।

২৭ দ্বাদশ ভাষণ, সঙ্কলয়িতা, বাসন্তী চৌধুরী ও কথাসেবিকা (কোন্নগর, ১৩৯০), পৃ. ১০০।

২৮ বিপিনবিহারী চক্রবর্তী, প্রাগুক্ত, পৃ ১৭০-১৭২।

২৯ সুধীররঞ্জন দাস, *যা দেখেছি, যা পেয়েছি*, (কলিকাতা, ১৯৬৯), পৃ ১২৩। নির্মল কুমার রায়, *শ্রীশ্রী রামকৃষ্ণ তীর্থপরিক্রমা*, প্রথম খণ্ড, (কলিকাতা, ১৯৮৫), পৃ. ১৭০। কথক ঠাকুরদার উল্লেখ আছে, *শ্রীশ্রী রামকৃষ্ণকথামৃত*, চতুর্থ ভাগ, (কথামৃত ভবন, ১৩৭৭), দ্বাদশ খণ্ডের দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে, পৃ ৮২।

৩০ দেবপ্রসাদ সর্বাধিকারী, *স্মৃতিরেখা* (কলিকাতা, ১৩৪০), ৩০ ৩২, ৫১।

৩১ দীনেশচন্দ্র সেন, *বৃহৎ বঙ্গ*, ১ম খণ্ড (১৯৩৫, পুনর্মুদ্রণ, ১৯৯৩), পৃ ৩৮ ৬।

৩২ রাজ্যেশ্বর মিত্র, 'নিধুবাবুর গানের উৎস', *প্রসঙ্গ বাংলা গান* (কলিকাতা, ১৯৮৯), পৃ ২৩।

৩৩ 'বঙ্গের শ্রেষ্ঠ পুরাণবক্তা (কথক) মদীয় পিতৃদেব কৃষ্ণমোহন শিরোমণির কথা', (১) *বামাবোধিনী পত্রিকা*, জ্যৈষ্ঠ, ১৩১৭, জুন ১৯১০, ৪৫। প্রবন্ধটি অসমাপ্ত। বৈবাহিক সূত্রে দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের আত্মীয় ছিলেন কৃষ্ণমোহন শিরোমণি। এঁর কথাই ঠাট্টা করে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর লিখেছেন। তারাকুমার কবিরত্ন হয়ত প্রবন্ধটির লেখক। প্রবন্ধটির হদিস দিয়েছেন মৃদুলকান্তি বসু।

৩৪ পঞ্চানন মণ্ডল সম্পাদিত, *চিঠিপত্রে সমাজচিত্র*, দ্বিতীয় খণ্ড (কলিকাতা, ১৯৫৩), নং ১৪৩, ৯৯।

৩৫ বিপিনবিহারী চক্রবর্তী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬৬।

৩৬ তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, *আমার কালের কথা*, (কলিকাতা, ১৩৫৮), পৃ. ১০।

৩৭ দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয়ের ভূমিকাসহ, নিত্যগোপাল গোস্বামী সঙ্কলিত, *কৃষ্ণকমল গীতিকাব্য*, (কলিকাতা, ১৩১৭)। তথ্যগুলি পুত্র রচিত কৃষ্ণকমলের জীবনী থেকে আহৃত হয়েছে।

৩৮ গৌরমোহন দাস দে, *পিছনে তাকাই*, (কলিকাতা, ১৯৯১), পৃ ৪২।

৩৯ গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য, *অপুর পাঁচালী*, (কলিকাতা, ১৩৮১), পৃ ৪৮।

৪০ বিভিন্ন সময়ের কার্যবিবরণী ও সাম্বৎসরিক প্রতিবেদন, হরিভক্তি প্রদায়িনী সভা, বেহালা। এই সূত্র ব্যবহারের জন্য সন্দীপ বন্দ্যোপাধ্যায় ও হরিসভার কর্তৃপক্ষের কাছে আমি কৃতজ্ঞ।

৪১ হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় 'শ্রীধর কথক', *উজ্জীবন*, আশ্বিন, ১৩৭৯, ১১শ বর্ষ, ৬ষ্ঠ সংখ্যা, ৩০২। এই প্রবন্ধটির হদিস দেবার জন্য দেবাশিস বসুর কাছে আমি ঋণী।

৪২ যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি, 'গল্প', *কি লিখি?*-তে সঙ্কলিত, (কলিকাতা, ১৩৬৩), পৃ. ১২৯।

৪৩ *চিঠিপত্রে সমাজচিত্র*, ২য় খণ্ড, প্রাগুক্ত, ১২৯ নং, পৃ. ৮৯।

৪৪ James Long, 'Returns Relating to Publication in Bengali Language in 1859', Selection from the Records of Bengal Govt, No XXXII, Calcutta, para 17.

৪৫ 'অপ্রকাশিত আত্মচরিত', দিন যাত্রা, *আনন্দবাজার*, 6 March 1983।

৪৬ পাঁচুগোপাল ভট্টাচার্য, *শ্রীমদ্ হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ স্মরণে* (কলিকাতা, ১৩৮৩), পৃ. ৩৬-৩৭।

৪৭ প্যারীমোহন মুখোপাধ্যায়, *আমার দেখা কলকাতা*, (কলিকাতা, ১৩৮০), পৃ ১৩৫-১৩৬।

৪৮ দীনেন্দ্রকুমার রায়, *সেকালের স্মৃতি*, আনন্দ সংস্করণ, (কলিকাতা, ১৩৯৫), পৃ. ৪০।

৪৯ প্রাণকিশোর গোস্বামী, *কথকতার কথা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৩-৩৪।

৫০ রাজকৃষ্ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের সঙ্গে সাক্ষাৎকার, সোনামুখী, ১৩ জুন ১৯৯৩।

৫১ Y.B Damle, 'Harikatha—A study in Communication', *Bulletin of Deccan College Research Institute*, S.K. De Felicitation Volume, Ed. by N G Kalelkar (Poona, 1960), p. 63-107. Philip Lutgendorf, 'Rama's Story in Shiva's City Public Arenas and Private Patronage', in Sandria Freitag ed *Benaras : Power, Community and Culture* (Delhi, Oxford Univercity Press, 1991), বিশেষ ভাবে দ্রষ্টব্য পৃ. ৩৪-৬০, ৩৯-৪২, ৫৬-৬১।

৫২ Lutgendorf, ঐ, পৃ. ৪০ ৪১।

৫৩ *সেকালের স্মৃতি*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৩।

৫৪ 'আমার জীবন' *নবীনচন্দ্র রচনাবলী*, শান্তিকুমার দাস সম্পাদিত প্রথম খণ্ড, (কলিকাতা, ১৩৮১), পৃ ১৬৪।

৫৫ শ্রী রামগতি ন্যায়রত্ন, *বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব*, হুগলী বুধোদয় যন্ত্রে কাশীনাথ ভট্টাচার্য দ্বারা মুদ্রিত, ১৮৭২-১৮৭৩, পৃ. ১৩৫।

৫৬ *সত্তর বৎসর* প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৬।

৫৭ কৃষ্ণকুমার মিত্র, *আত্মচরিত*, (কলিকাতা, ১৩৮০), পৃ ৪১-৪২।

৫৮ দীনেন্দ্রকুমার রায়, *সেকালের স্মৃতি*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪২।

৫৯ *কথকতার কথা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯-১০, ১২।

৬০ 'বঙ্কিমচন্দ্র কাঁটাল পাড়ায়', *হরপ্রসাদ শাস্ত্রী রচনা সংগ্রহ*, দ্বিতীয় খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪।

৬১ দীনেন্দ্রকুমার রায়, প্রাগুক্ত।

৬২ কথক ও শ্রোতার শাস্ত্রীয় লক্ষণ ও গুণের বিবৃতির জন্য দ্রষ্টব্য জিতেন্দ্রনাথ গোস্বামী সম্পাদিত, *রাসলীলা*, (নবদ্বীপ, ১৩৬২), পুস্তিকায় হরিদাস দাসের ভূমিকা।

৬৩ *কথকতার কথা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮।

৬৪ জসীমউদ্দীন, *ঠাকুরবাড়ীর আঙিনায়*, (কলিকাতা, ১৩৭৬), পৃ. ৪৮-৪৯।

৬৫ অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও রাণী চন্দ, *জোড়াসাঁকোর ধারে*, (কলিকাতা, ১৩৫১), পৃ. ৪৩, ৪৮।

৬৬ *চিঠিপত্রে সমাজচিত্র*, প্রথম খণ্ড অপরার্ধ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৯১-৪০৪। এই পুষ্পিকা সঙ্কলন থেকে উদ্ধৃতিগুলি নির্বাচিত করা হয়েছে। লিপিকার প্রসঙ্গে দ্রষ্টব্য, অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ সম্পাদিত, *বাঙ্গালা প্রাচীন পুথির বিবরণ*, পরিষৎ পুথিশালায় সংগৃহীত, তৃতীয় খণ্ড, দ্বিতীয় সংখ্যা, (কলিকাতা, ১৩৩৩), পৃ. ৯।

৬৭ *কথকতার কথা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২০।

৬৮ *চিঠিপত্রে সমাজচিত্র*, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৯৮।

৬৯ ঐ, পৃ. ৯৩।

৭০ ঐ, পৃ. ১০০-১০১।

৭১ H. P. Sastri, *A Descriptive Catalogue of Sanskrit Manuscripts in the Collections of the Asiatic Society of Bengal*, Vol. V, Purana Manuscripts, (Calcutta, 1928), পৃ. XXVII, CXXVII, 36-39, 363-364.

৭২ গণেশ বিদ্যাবিনোদ, *আদিকাণ্ড কথা*, এশিয়াটিক ৩৩১০, পৃ. ৪০ক, ৮-১১ক।

৭৩ রামায়ণ কথা, ঐ, ৬৬০১, পৃ. ২৩ক-২৪ক।

৭৪ রামায়ণ কথা সংগ্রহ, ঐ, ৩৭৮৭। ১৭৩৮ শকাব্দ (১৮১৬ খ্রিস্টাব্দে) পুথিটি রচিত হয়।

৭৫ *কথকতার কথা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২০-২১।

৭৬ দ্বিজরাজ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথকতা, গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্মিলনী, চালতাবাগান, ১৯/১২/৯২।

৭৭ *কথকতার পালা* (শ্রীকৃষ্ণের জন্ম), তারিখবিহীন, পাঠবাড়ী, ২৭৮৪/১৪, পৃ. ২৬ক-৩০ক।

৭৮ *কথকতার পালা* (রামরাজা), খণ্ডিত, তারিখবিহীন, পাঠবাড়ী, ২৭৮৯/১৭, পৃ. ১৯ক-২০ক।

৭৯ ঐ, পৃ. ২৭ক-২৭খ।

৮০ *কথকতার পালা* (শ্রীকৃষ্ণের জন্ম), প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৬ক-৩৭ক।

৮১ *কথকতার পুথি* (ভাগবত), খণ্ডিত, তারিখবিহীন, ক. বি. ৫০০৭, পৃ. ২ক।

৮২ *কথকতার পুথি* (সভাপর্ব), খণ্ডিত, রামগোপাল শর্মা লিখিত, বিশ্ব, ৬২৩১, পৃ. ১ ক, পুথিতে সংস্কৃত শ্লোক যেমন আছে, তেমন উদ্ধৃত হল।

৮৩ 'বাঙ্গালা ভাষা', (রামগতি ন্যায়রত্ন লিখিত *বাঙ্গালা ভাষা ও বাঙ্গালা সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব* নামক পুস্তকের সমালোচনা), *বঙ্গদর্শন*, কার্তিক ১২৭৯, পৃ. ৪৫৩-৪৫৪। কথকতা, পালাগান ইত্যাদিতে বঙ্কিমের সংস্কার ও শিক্ষা পরিবারগত, পিতৃদত্ত। বাল্যকালে যিনি কথকতার গান বাঁধতেন, প্রাপ্ত বয়সে তিনি দেশজ গান, পালার বিশাল সংগ্রহ গড়ে তুলেছেন। নানা সাক্ষ্যের মধ্যে একটি স্মৃতিচারণের উল্লেখ করা যেতে পারে। অক্ষয়চন্দ্র সরকারের 'বঙ্কিমচন্দ্র', *অক্ষয় সাহিত্য সম্ভার*, কালিদাস নাগ সম্পাদিত (কলিকাতা, ১৯৬৫), পৃ. ১৩৮-১৪৯।

৮৪ *কথকতার পালা* (মহাভারত—নানা আখ্যান), ১২৯০-১৩০৬ (১৮৮৩-১৮৯৯)-এর মধ্যে লিখিত। মথুরাবাটির রামপদ ভট্টাচার্য ছাত্র রামচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের সাহায্যে পালাগুলো লিখেছেন। *শিবের বিবাহবর্ণন*, পৃ. ২৬ক-২৬খ। খণ্ডিত, ২৭৮৭/ ১৫ক, পাঠবাড়ি।

৮৫ *কথকতার পালা* (রাস) তারিখ বিহীন, ২৭৮৫/১৫, পাঠবাড়ি, পৃ. ৩২খ।

৮৬ ঐ, পৃ. ২০ক-২৩খ।

৮৭ ঐ, পৃ. ৯১খ।

৮৮ ঐ, পৃ. ৯২ক, ৯৫খ।

৮৯ ঐ, পৃ. ৯৩ক।

৯০ কথকতা : বিভিন্ন পালার অংশ বিশেষ; কালিয়দমন পালা, ৭ক, ২৭৮৬/১৫ক, পাঠবাড়ি, আদিনিবাস কৃষ্ণনগর, হাল নিবাস ফরাসডাঙ্গার হাটখোলা, শ্রীরামপদ ভট্টাচার্য লিখিত। ১২৯২ (১৮৮৫) সাল নাগাদ পালাটির লেখার কাল বলে অনুমিত হয়।

৯১ The Akhyayika and The Katha in Classical Sanskrit in S. K. De, *Some Problems of Sanskrit Poetics*, (Calcutta, 1981) pp. 65-79.

৯২ তুলনীয়, S. N. Dasgupta and S. K. De, *A History of Samskrit Literature*, Classical Period, Vol. I (Calcutta, 1977), pp. 636-639.

৯৩ 'ভাবিকা' বা 'ভাবিকত্ব' সংস্কৃত অলঙ্কার শাস্ত্রের মূল্যবান ধারণা। ভামহ পরবর্তী আলঙ্কারিকরা নানাভাবে এই ধারণাকে আলোচনা করেন। প্রাসঙ্গিক শ্লোক, কাব্যালঙ্কার, ৩নং পরিচ্ছেদ, পৃ. ৫২-৫৩। উদ্ধৃত অংশ নিয়ে বিস্তৃত আলোচনার জন্য দ্রষ্টব্য V Raghavan, *Studies on Some Concepts of the Alamkara Sastra*, (Madras, 1973) pp 132-146 এই প্রসঙ্গে রাঘবনের ব্যাখ্যার উপর আমি নির্ভরশীল।

৯৪ বিশ্বনাথ কবিরাজ, *সাহিত্য দর্পণঃ*, ৬/৩৩৩, বিমলাকান্ত মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত, (কলিকাতা, ১৩৮৬), পৃ ৪৭৯।

৯৫ অনুরূপা দেবী, *মন্ত্রশক্তি*, (কলিকাতা, ১৩২২), পৃ ৬৪। রমাকান্ত চক্রবর্তী উপন্যাসটির কথা আমাকে মনে করিয়ে দিয়েছেন।

৯৬ ঐ, পৃ. ৭৫।

৯৭ *ভরত নাট্যশাস্ত্র*, সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ও ছন্দা চক্রবর্তী সম্পাদিত ও অনূদিত, ৩/১৯। ৪৩-৬২, (কলিকাতা, ১৯৮২), পৃ. ৮-১৫। অভিনবগুপ্তের প্রাসঙ্গিক টীকা, *নাট্যশাস্ত্রম্*, Ed M R Kavi, (Baroda 1934), Vol II, সপ্তদশোনুধ্যায়ঃ, পৃ. ৩৯৯।

৯৮ নাট্যশাস্ত্রে স্বর ও সুর নিয়ে বিশদ ব্যাখ্যামূলক আলোচনা, রাজ্যেশ্বর মিত্র, 'নাট্যশাস্ত্রে সঙ্গীতচিন্তা', প্রাগুক্ত, তৃতীয় খণ্ড, পৃ. ২৯৮-৩৫২।

৯৯ আচার্যপ্রদত্ত উদাহরণ এইরূপ 'কিং! গচ্ছ। মা বিশ। সুদুর্জন। বারিতোহসি কার্যং ত্বয়া ন মম। সর্বদনোপভুক্ত।' ছন্দ অনুসারে বিরাম নয়, অর্থানুসারে থামতে হচ্ছে। ফলে পাঠকালে এক, দুই, তিন বা চার অক্ষরের পরও বিরামের প্রয়োজন হতে পারে। *ভরত নাট্যশাস্ত্র*, তৃতীয় খণ্ড, পৃ ১৪-১৫। ৬১ন শ্লোক।

১০০ তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, *আমার কালের কথা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯৭।

১০১ রাখালচন্দ্র গোস্বামী পুত্রবধূ শান্তিরানি গোস্বামীর সাক্ষ্য, নিত্যগোপাল গোস্বামীর সৌজন্যে প্রাপ্ত, ২৯/৯/৯৩।

১০২ কথকতার পালা (শ্রীমদ্ভাগবত), পাঠবাড়ি, ২৭৮৩/১৩, রামপদ ভট্টাচার্যের পুথি (১৮৮৩ সালে লিখিত)।

১০৩ *কথকতার পুথি* (বনপর্ব), খণ্ডিত, তারিখ অজ্ঞাত, বিশ্ব, ১৫২৫, পৃ. ৮৬ক-৮৬খ।

১০৪ 'জীবনস্মৃতি' *রবীন্দ্র রচনাবলী*, বিশ্বভারতী সংস্করণ, সপ্তদশ খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০৮-৩০৯।

১০৫ যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি, 'গল্প', কি লিখি? প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৮।

১০৬ *কথকতার পালা* (শ্রীমদ্ভাগবত) প্রাগুক্ত, পাঠবাড়ি, ২৭৮৩/১৩। আলাদা পাতায় গানটি লিখিত।

১০৭ *কথকতার পালা* (প্রভাসতীর্থ যাত্রা), ২৭৮৬/১৬, পাঠবাড়ি, পৃ ৮ক।

১০৮ 'রামের অযোধ্যা প্রত্যাবর্তন', সীতারামকুটীর, টালিগঞ্জ ১৫ই ফেব্রুয়ারি, ১৯৯৩।

১০৯ ঐ, ১৬ ফেব্রুয়ারি, ১৯৯৩। এইরকম গান আরও আছে। যেমন, ' রামায়ণ দেহতত্ত্ব', রামায়ণাচার্য ফেলারাম বন্দ্যোপাধ্যায়, বিরচিত, *শ্রীরামনামাবলী*, বাঁকুড়া, ১৩৮৩, ২২ নং গান।

১১০ এই পত্রিকায় 'কথকতার গানে' সম্পূর্ণ গানটি আছে। রচয়িতা ফেলারাম বন্দ্যোপাধ্যায়ের গীতগুলি উপর্যুক্ত পুস্তিকা থেকে গৃহীত হয়েছে।

১১১ সাধক নবব্রত ব্রহ্মচারীর ভাগবতপাঠ, (কথা ও সঙ্গীতে) ৩৭-এর পল্লী হরিনাম সংকীর্তন সম্প্রদায়ের উদ্যোগে শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দ জীউ-এর মন্দিরপ্রাঙ্গন, বৈঠকখানা, কলকাতা, ২৭ ফেব্রুয়ারি, ১৯৯৩।

১১২ *কথকতার কথা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৫-৯৬।

১১৩ *কথকতার পাতড়া*, ৫০৬৫ ও ৫০৬৭, বিশ্ব।

১১৪ পূর্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, 'সেকালের দুর্গোৎসবের প্রারম্ভে পল্লীচিত্র', আশ্বিন, ১৩২২, *মর্মবাণী*, ১ম বর্ষ, ১ম খণ্ড, পৃ ২৫৫।

১১৫ *মন্ত্রশক্তি*, প্রাগুক্ত, পৃ ৭৬-৭৭।

১১৬ *চিঠিপত্রে সমাজচিত্র*, ২য় খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৩।

১১৭ *সেকালের স্মৃতি*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪২।

১১৮ Dinesh Chandra Sen, *History of Bengali Language and Literature*, প্রাগুক্ত, pp 589-90.

১১৯ দ্বিজরাজ বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রদত্ত সাক্ষাৎকার, ২০ নভেম্বর, ১৯৯২। চালতাবাগান, কলকাতা।

১২০ *কথকতার কথা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৭।

১২১ ঐ, পৃ. ৭৩-৭৪।

১২২ প্রতিমাদেবী, *স্মৃতিচিত্র*, (কলকাতা, ১৩৫৯), পৃ. ৮৫-৮৬।

১২৩ *কথকতার কথা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩২-৩৩।

১২৪ হরিপদ চক্রবর্তী, *কথকতার পুঁথি*, সংস্কৃতি বৃত্ত, *সুবর্ণলেখা*, প্রাগুক্ত, পৃ ৫৯২।

১২৫ তরণীসেন বধ পালা, দ্বিজরাজ বন্দ্যোপাধ্যায়, গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্মিলনী, চালতা বাগান, কলিকাতা, ৫/১২/৯২। অন্যান্য পালাতেও মঙ্গলাচরণের ছক এক থাকে। ক্যাসেটে সংরক্ষিত।

১২৬ সেতুবন্ধ পালা, ঐ, ৩/১২/৯২। অনুলিখন।

১২৭ শবরীর প্রতীক্ষা পালা, ২৭/১১/৯২, ঐ, অনুলিখন।

১২৮ তরণীসেন বধ পালা, প্রাগুক্ত।

১২৯ তরণীসেনের যুদ্ধ ও পতন, *কৃত্তিবাস বিরচিত রামায়ণ*, সাক্ষরতা প্রকাশন, পৃ ২৯৫ ২৯৬।

১৩০ বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, *পথের পাঁচালী*, কলিকাতা, ১৩৭২, পৃ ২৯৩।

১৩১ অবনী অধিকারীর কথকতা, অহল্যার শাপমোচন, ২৬ ফেব্রুয়ারি, ১৯৯৩, শান্তিনিকেতন। ক্যাসেটে রক্ষিত।

১৩২ অনেক চেষ্টা করেও এখনও *জগৎরামী রামায়ণের* কোনও সংস্করণ পড়তে সক্ষম হইনি। তথ্যাদির জন্য দ্রষ্টব্য, D. C. Sen, *The Bengali Ramayanas* (Calcutta, 1920), সুকুমার সেন, *বাঙলা সাহিত্যের ইতিহাস*, দ্বিতীয় খণ্ড, (আনন্দ সংস্করণ, ১৩৯৮), পৃ ৩৬৩-৩৬৪।

১৩৩ শান্তিলতা দেবী, কুন্তীস্তব (ভগবতী), বছর দশেক আগে শ্যামাপূজার দিনে আয়োজিত পাঠ, ক্যাসেটে রক্ষিত, শ্রীযুক্ত করুণকান্তির সৌজন্যে প্রাপ্ত।

১৩৪ বাসন্তী চৌধুরী, বাসলীলা, সপ্তম পর্ব, নিঃসম্বলানন্দ কলেজ, ভদ্রেশ্বর, ৫ জুলাই, ১৯৯৩। ক্যাসেটে রক্ষিত।

১৩৫ 'মানি কাকা', *জীবনকথা*, সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় লিখিত (কলিকাতা, ১৯৭৯), পৃ. ১৪২-১৫০।

১৩৬ *রামায়ণ কথা সংগ্রহঃ*, নং ৩৭৮৭, এশিয়া, ১ক-১খ।

১৩৭ চন্দননগরের ফটকগোড়ায় কথক কুমুদবন্ধুর প্রথম সাক্ষাৎকার ১৫ জুলাই, ১৯৯৩। উল্লেখ্য এই যে, এই জাতীয় ধারণা শ্রুতির মাধ্যমে শিল্পীরা তাঁদের চেতনায় গেঁথে রাখেন। ১৯২৫ সালে কলকাতায় কালকা বিন্দাজি ঘরাণার চৌধুরান বাইজি নৃত্যের নানা অঙ্গভঙ্গিকে *নাট্যশাস্ত্র* মতে ব্যাখ্যা করে অমিয়নাথ সান্যালকে হকচকিয়ে দিয়েছেন। অমিয়বাবু তখনও *নাট্যশাস্ত্র* গ্রন্থটি চোখেই দেখেননি আর বাইজি জানেনই না, ভরত লোকটি কে। দ্র 'নৃত্যের বস্তুতত্ত্ব', *সমকালীন*, আষাঢ়, ১৩৬৮, পুনর্মুদ্রিত। *ভরত নাট্যশাস্ত্র*, সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত, ২য় খণ্ড, (কলকাতা, ১৯৮২), পৃ.। ২৮০-২৮১।

১৩৮ *ধ্বন্যালোক*, অনুবাদক সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত ও কালীপদ ভট্টাচার্য (কলকাতা, ১৯৮৬), পৃ. ১৫, ৪৪, ৪৬। প্রথমোদ্দ্যোতঃ।

১৩৯ ঐ, পৃ. ২৫-২৬, ৪০-৪১। পঞ্চম কারিকার বৃত্তি ও ভাষ্য প্রথমোদ্দ্যোতঃ।

১৪০ ভট্টনায়কের 'ভুক্তিবাদ' ও অভিনবগুপ্তের 'অভিব্যক্তিবাদ' সম্পর্কিত তুলনামূলক আলোচনার জন্য দ্রষ্টব্য—বিষ্ণুপদ ভট্টাচার্য, *সাহিত্য মীমাংসা*, বিশ্বভারতী, ১৯৭৫, পৃ. ৭৬-১০৬।

১৪১ বিশ্বনাথ কবিরাজ, *সাহিত্যদর্পণঃ*, সম্পাদনা ও বঙ্গানুবাদ, বিমলাকান্ত মুখোপাধ্যায়, প্রাগুক্ত, ৩/৯, ৯৫-৯৬।

১৪২ দীনেশচন্দ্র সেন, *ঘরের কথা ও যুগসাহিত্য*, (কলকাতা, ১৯৬৯), পৃ. ১৮১-১৮২।

১৪৩ *মন্ত্রশক্তি*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৫-৭৬।

১৪৪ বেহালা হরিভক্তি প্রদায়িনী সভা, (স্থাপিত ১২৫৯ সাল/সন ১৮৫২)। দ্রষ্টব্য— *৬৫ তম সাম্বৎসরিক পত্রিকা* (১৩২৪) ও ৬৬তম *সাম্বৎসরিক পত্রিকা*, ১৩২৫, পৃ. ১৭ ১৫।

১৪৫ অনুচ্ছেদটি ৪/১১/৯২ সালে চালতাবাগানে দ্বিজরাজবাবুর কথকতার আসরে সমাগত শ্রোতাদের কথোপকথন-ভিত্তিক।

১৪৬ বিশ্বনাথ কবিরাজ, পূর্বোল্লিখিত, ৩/৮, পৃ. ৯৪-৯৫। *নাট্যশাস্ত্রে*র পরিভাষায় শ্রোতার সমাবেশরূপে সমাজ কথাটি প্রাচীনকাল থেকে ব্যবহৃত, অশোকের শিলালিপিতে শব্দের এই জাতীয় প্রয়োগ দেখা যায়। দ্রষ্টব্য, দেবদত্ত ভাণ্ডারকর ও ননীগোপাল মজুমদারের আলোচনা, *Indian Antiquary*, *1913*, pp 255 258 ও *Indian Antiquary*, *1918*, pp 221-223

১৪৭ *কথকতার কথা*, প্রাগুক্ত, পৃ ৭৩।

১৪৮ Victor Turner, *Dramas, Fields and Metaphors*, (Ithaca, 1974) Partha Chatterjee, 'More on Modes of Powers and the Peasantry', *Subaltern Studies*, Vol. II, edited by Ranajit Guha, (Delhi, 1983), pp 338-339

১৪৯ ভরত *নাট্যশাস্ত্র*, প্রথম খণ্ড, প্রাগুক্ত, সপ্তম অধ্যায়, ৭ নং শ্লোক, পৃ ১৫৪। *সাহিত্য দর্পণঃ*, তৃতীয় পরিচ্ছেদঃ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৬। একজন আধুনিক গবেষকের মতে 'চমৎকার' ধারণাটি উৎপন্ন হয়েছে ভাল খাবার পর জিভ দিয়ে টাক্‌রায় যে তৃপ্তিবিধায়ক আওয়াজ করা হয়, তার থেকে। 'রামায়ণ চম্পুর' টীকাতেও আছে। "চমদিত্যনুকরণ শব্দঃ।" পরে শব্দের অর্থ বিস্তার হয়েছে, রসাস্বাদনে চিত্তবৃত্তির বিস্তার অর্থে প্রযুক্ত হয়েছে। Raghavan, প্রাগুক্ত, পৃ ২৯৪।

১৫০ *রাজানক কুন্তকাচার্যের বক্রোক্তিজীবিত*, রবিশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত, ১/৫ প্রাগুক্ত, পৃ ৬০। Sushil Kumar De *Vakroktijivita of Kuntaka*, প্রথমোন্মেষঃ, শ্লোক নং ৫, প্রাগুক্ত, পৃ ২।

১৫১ 'লোকশিক্ষা', *বঙ্কিম রচনাবলী*, ২য় খণ্ড, যোগেশচন্দ্র বাগল সম্পাদিত, সংসদ সংস্করণ, ১৩৭১, পৃ ৩৭৬ ৩৭৭।

১৫২ দীনেশচন্দ্র সেন, *বৃহৎ বঙ্গ*, প্রথম খণ্ড, দে'জ সংস্করণ ১৯৯৩, পৃ ২৮৬।

১৫৩ দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, 'ভারতে বস্তুবাদ প্রসঙ্গে', অনুষ্টুপ, (কলকাতা, ১৯৮৭), পৃ ১৯২ ১৯৫।

১৫৪ রমাকান্ত চক্রবর্তী, 'কথকতা পাঠকত', *যোগসূত্র*।

১৫৫ যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি, *পৌরাণিক উপাখ্যান*, (কলকাতা, ১৩৯০), পৃ ৮৮-৮৯।

১৫৬ মহেন্দ্রনাথ দত্ত, *শ্রীশ্রী রামকৃষ্ণের অনুধ্যান*, সম্পাদনা ধীরেন্দ্রনাথ বসু, (কলিকাতা, ১৩৫০), পৃ ১২।

১৫৭ দীনেশচন্দ্র সেন, *বঙ্গভাষা ও সাহিত্য* (অষ্টম সংস্করণের পুনর্মুদ্রণ, রাজ্য পুস্তক পর্যদ প্রকাশন) অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত, ১ম খণ্ড, (কলকাতা, ১৯৯১), পৃ ৭৯ ৮০।

১৫৮ দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার, ভূমিকা, (১৩১৫), *ঠাকুরদাদার ঝুলি*, (কলকাতা, ষোড়শ সংস্করণ, ১৩৯৩), পৃ ৯৪।

১৫৯ *ঠাকুরদাদার ঝুলি*, প্রথম সংস্করণ, ১৩১৫, পৃ ১৩৮-১৩৯।

১৬০ ঐ, দ্বিতীয়, সংস্করণ, ১৩১৬, পৃ. ৯৬।

১৬১ অনুচ্ছেদের অধিকাংশ শব্দাবলী *ঠাকুরদাদার ঝুলি-র* ভূমিকা (১৩১৫) থেকে উদ্ধৃত; প্রচ্ছদের পেছনের কাগজে ছাপা সমসাময়িক সমালোচকদের নানা মন্তব্য ও দক্ষিণারঞ্জন লিখিত অন্যান্য বইয়ের বিজ্ঞাপনও কৌতূহলোদ্দীপক। বইয়ের আখ্যাপত্রে পুরোনাম—ওপরে ছোট অক্ষরে 'মাতৃগ্রন্থাবলী চতুর্থ সংখ্যা', দক্ষিণে কোণায় 'বাংলার কথা সাহিত্য', মাঝে বড় অক্ষরে 'বাংলার উপন্যাস ঠাকুরদাদার ঝুলি'। মলাটে কিন্তু '*বঙ্গোপন্যাস*' লেখা আছে। প্রাগুক্ত সংস্করণ।

১৬২ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ভূমিকা (১৩১৪), *ঠাকুমার ঝুলি*, দ্বাত্রিংশতি সংস্করণ, ১৩৯১, পৃ ১২।

১৬৩ যদুনন্দন দাস, *গোবিন্দলীলামৃত*, কৃষ্ণদাস কবিরাজ কর্তৃক সংস্কৃতে প্রণীত, (কলিকাতা, ১২৭৪), পৃ ২।

১৬৪ শঙ্খ ঘোষ, *কল্পনার হিস্টিরিয়া*, (কলকাতা, ১৯৮৪), পৃ. ৫০।

ভগ্নাংশের সমর্থনে: দাঙ্গা নিয়ে কী লেখা যায়?

জ্ঞানেন্দ্র পাণ্ডে

১

এটা গবেষণা প্রবন্ধ নয়। হিংসার ইতিহাস লিখতে গিয়ে, বিশেষ করে ভারতবর্ষে সাম্প্রদায়িক হানাহানির ইতিহাস লিখতে গিয়ে যেসব সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়, এ তারই একটা প্রাথমিক বিবরণ। আধুনিক ভারতের ইতিহাস নিয়ে লেখাপত্র পড়লে মনে হয়, এখানে হিংসার ঘটনা যেন নেহাতই একটা ব্যতিক্রম। একটা কিছুর অভাবও বটে। ব্যতিক্রম এই অর্থে যে ভারতের ইতিহাসের মূল যে ধারা, তাতে যেন হিংসাত্মক ঘটনার কোনও ভূমিকা নেই। তা যেন অনেক দূরের কিছু, বিচ্ছিন্ন। ভারতের 'আসল' ইতিহাসে যেন ওসব ঘটনা পাওয়া যাবে না। কারণ ওগুলো ইতিহাসের বিকার।[১] আর অভাব, কারণ ঐতিহাসিক উপাদান ঘেঁটে হিংসার মুহূর্তটিকে পুনর্বার গড়ে নিয়ে ভাষায় উপস্থিত করার ক্ষেত্রে ইতিহাসবিদ্যার একটা মৌলিক সীমাবদ্ধতা রয়েছে—শুধু ভারতবর্ষের ইতিহাসের কথাই বলছি না, এ-সমস্যা সব ইতিহাসের বেলাতেই আছে। হিংসার ইতিহাস লিখতে গেলেই তাই লিখতে হয় শুধু পটভূমির কথা, পরিপ্রেক্ষিতের কথা—হিংসাকে ঘিরে থাকে আর যেসব জিনিস, তাদের কথা। হিংসা নিয়ে কিছুই লেখা হয় না। হিংসার নিজস্ব রূপরেখা যেন আগে থেকেই আমাদের জানা, তা নিয়ে নতুন করে অনুসন্ধানের যেন কোনও প্রয়োজন নেই।

নিম্নলিখিত বিবরণটি উপস্থিত করতে গিয়ে অনেক জায়গাতেই আমি আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার কথা বলেছি, সমাজবিজ্ঞান বা ইতিহাস-রচনার ক্ষেত্রে যা হয়তো খুব একটা স্বাভাবিক নয়। বিবরণের শেষদিকের অংশটা অনেকটাই ১৯৮৯-এর ভাগলপুরের দাঙ্গা নিয়ে লেখা। দিল্লির পিপল্স ইউনিয়ন ফর ডেমোক্রেটিক রাইট্স (পি. ইউ. ডি. আর.) প্রেরিত দশ সদস্যের এক তদন্তকারী দলের সদস্য হিসাবে ভাগলপুরের দাঙ্গাগ্রস্ত এলাকায় ঘোরার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা আমি ওই অংশে প্রচুর ব্যবহার করেছি। এরকম 'ব্যক্তিগত' বিচার বা অনুভূতির অংশবিশেষকে সমাজবিজ্ঞানের আলোচনসূত্র হিসেবে ব্যবহার করা অবশ্য ইদানীং কালে অনেকটা চালু হয়েছে। কিন্তু বিশেষ করে নারীবাদী রচনায় এর উল্লেখযোগ্য প্রয়োগ সত্ত্বেও ইতিহাস-রচনায় লেখকের ব্যক্তিসত্তার এ-জাতীয় অনুপ্রবেশ নিয়ে অনেকের মতো আমারও বেশ খানিকটা অস্বস্তি রয়ে গেছে।

অস্বস্তির আরও একটা কারণ এই যে ভারতের সাম্প্রতিক সামাজিক-রাজনৈতিক

সংঘাত নিয়ে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যে-সব লেখা, তা নিয়ে আমার আলোচনা হয়তো কিছুটা অসঙ্গত এবং অনুদার মনে হতে পারে। বিশেষ করে যেখানে এই লেখকেরা অনেকেই সামাজিক ও রাজনৈতিক অবিচার ও নিপীড়নের বিরুদ্ধে অত্যন্ত সাহসের সঙ্গে সক্রিয় হয়েছেন। এ প্রসঙ্গে আমার বলে নেওয়া কর্তব্য যে আসগর আলি এঞ্জিনিয়ারের মতো ব্যক্তি বা পিপল্স ইউনিয়ন ফর সিভিল লিবার্টিস এবং পিপল্স ইউনিয়ন ফর ডেমোক্রেটিক রাইট্স-এর মতো সংগঠন দাঙ্গার বিষয়ে অনুসন্ধানে পথপ্রদর্শকের কাজ না করলে আমার পক্ষে এই লেখায় হাত দেওয়া সম্ভব বা প্রয়োজন হত না।" তাঁদের লেখা নিয়ে আমার সমালোচনা হয়তো নেহাতই পণ্ডিতি কুটকচাল বলে মনে হতে পারে। মনে হতে পারে, এর কোনও প্রাসঙ্গিকতা নেই। আমি কিন্তু বিশ্বাস করি যে অ্যাকাডেমিক চিন্তাভাবনা আর রাজনৈতিক কাজকর্মের মধ্যে একটা আদানপ্রদান সম্ভব। খুব সামান্য হলেও এই লেখার বক্তব্য হয়তো আজকের রাজনৈতিক বিতর্ককে কিছুটা এগিয়ে নিয়ে যেতে সাহায্য করবে।

এই রচনার বিষয় সাম্প্রদায়িক হানাহানি নিয়ে ঐতিহাসিক লেখাপত্র। এই সব লেখাপত্রের কেন্দ্রে রয়েছে জাতীয়তাবাদ, জাতীয়তাবাদী চিন্তাভাবনা, ভাষা, আবেগ, অলঙ্কার। সম্প্রতিকালে, বিশেষ করে গত বিশ বছরে, এই ভাষায় একটা উগ্র স্বর যুক্ত হয়েছে। এই সময়ে ভারতে রাষ্ট্রক্ষমতা যতই কেন্দ্রীভূত হয়েছে, ততই সেই রাষ্ট্র জাতীয়তার নামে আসলে এক নতুন-বড়লোক বিলাসদ্রব্যলোভী শহুরে মধ্যবিত্ত শ্রেণী আর তাদের সহযোগী গ্রামীণ ধনী কৃষক শ্রেণীর পক্ষে খোলাখুলি ওকালতি করেছে। এই ক্ষুদ্রস্বার্থের উচ্চাশা চরিতার্থ করতে ভারতীয় রাষ্ট্র সবরকম বিরোধিতাকেই 'জাতীয়তা-বিরোধী' বলে চিহ্নিত করার চেষ্টা করেছে, সে বিরোধিতা শ্রমিক শ্রেণীরই হোক, গ্রামের দরিদ্রদেরই হোক অথবা কোনও আঞ্চলিক আন্দোলনের পক্ষ থেকেই তা আসুক।

ভারতীয় সমাজের ভগ্নাংশগুলিকে তথাকথিত জাতীয় সংস্কৃতির মূলধারায় মিশিয়ে দেওয়ার জন্য এই ভাবে প্রবল চাপ সৃষ্টি করা হয়েছে। এই ভগ্নাংশ কখনও সংখ্যালঘু ধর্মীয় কিংবা জাতি-উপজাতি গোষ্ঠী, আবার কখনও সংগঠিত শ্রমিকশ্রেণী, কখনো নারী আন্দোলনের কর্মী—যারাই কোনও না কোনও অর্থে সংখ্যালঘু সংস্কৃতি বা আচার ব্যবহারের প্রতিনিধি হিসেবে চিহ্নিত হতে পারে, তাদের সকলেরই বিরোধিতা 'জাতীয়তা-বিরোধী' বলে রাষ্ট্রের দমননীতির কবলে পড়তে পারে। অন্যদিকে জাতীয় সংস্কৃতির মূল ধারা বলতে কিন্তু সবসময়ই তুলে ধরা হয়েছে হিন্দু ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির অত্যাধুনিক বিলাসদ্রব্যভোগী চেহারাটি। এই মূলধারা আসলে সমাজের অত্যন্ত ক্ষুদ্র একটি অংশের জীবনযাত্রা ধ্যানধারণার প্রতিফলন। অথচ তাকেই ঢাক পিটিয়ে জাহির করা হয়েছে জাতীয় সংস্কৃতি হিসেবে। 'বিবিধের মাঝে মিলন' আজকের এই রাষ্ট্রীয় জাতীয়তাবাদের শ্লোগান নয়। বরং শাসক শ্রেণী ছাড়া অন্য যে-কোনও সংখ্যালঘুর পরিচয়—যা ভিন্ন, ক্ষুদ্র, আঞ্চলিক, স্থানীয়—বস্তুত, সবরকমের প্রভেদই রাষ্ট্রীয় জাতীয়তাবাদের কাছে হয়ে দাঁড়িয়েছে বিপজ্জনক, বিজাতীয়।

ভারতের রাজনীতি নিয়ে লিখতে গেলে রাষ্ট্রচালিত এই সাংস্কৃতিক সমীকরণের

চেষ্টাটাকে সামনে আনা দরকার। সেই সঙ্গে সামনে আনা দরকার জাতীয়তাবাদ নিয়ে গভীর সামাজিক বিরোধের প্রক্রিয়াটিকে। ভগ্নাংশের সমর্থনে কথা বলার একটা উদ্দেশ্য এই অগভীর সমীকরণ প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে দাঁড়ানো, জাতীয়তার এবং ভবিষ্যৎ রাষ্ট্রীয় সমাজের আরও বৈচিত্র্যপূর্ণ রূপরেখা নির্মাণে অগ্রসর হওয়া।

এ-কথা বলতে চাইছি না যে 'সংখ্যালঘু'—যেসব সংখ্যালঘুর কথা ওপরে বললাম—তাদের প্রতিরোধ সবক্ষেত্রেই, এমনকি বহুলাংশে সচেতনভাবে এই উদ্দেশ্যে পরিচালিত হয়েছে। কিন্তু ভারতীয় সমাজ নিয়ে যে-ঐতিহাসিক, সমাজবিজ্ঞানী বা রাজনৈতিক কর্মী একটু বিস্তৃতভাবে ভাবার চেষ্টা করেন, তিনিই নিশ্চয় একমত হবেন যে আজ আমাদের দেশে যা ঘটে চলেছে তার একটা গুরুত্বপূর্ণ অংশ এই প্রক্রিয়ায় ধরা পড়ে। ইতিহাস লেখা নিয়েও এখানে বিরোধ আছে। জাতীয়তাবাদের যে সংকীর্ণ সংস্করণের কথা ওপরে বললাম, তা শুধু বিশ্বরাজনীতির সাম্প্রতিক হাওয়াবদল থেকেই যে জোর পাচ্ছে, কিংবা শুধু প্রাচীন ভারতের গৌরব নিয়ে আস্ফালন করাতেই যে তা সীমাবদ্ধ , এমন মোটেই নয়। অত্যন্ত আধুনিক এবং ধর্মনিরপেক্ষ এক জাতীয়তাবাদী ইতিহাস রচনার ধারাও ভারতবর্ষের তথাকথিত স্বাভাবিক ঐক্য এবং শাশ্বত জাতীয়তার এই ধারণাকে পরিপুষ্ট করেছে।

শুধু তাই নয়, ইতিহাস-রচনার এই ধারা রাষ্ট্রকে—যে-রাষ্ট্র আজকের ভারতবর্ষে উপস্থিত, সেই বিশেষ রাষ্ট্রকেই—উন্নীত করেছে ইতিহাসের অন্তিম লক্ষ্যে। তাই দেখি, ভারতের স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে 'ইতিহাস' বিষয়টা প্রায় সবসময়ই শেষ হয়ে যায় ১৯৪৭ সালে এসে, যেন স্বাধীন রাষ্ট্র স্থাপিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই ভারতের ইতিহাসের সার্থক পরিসমাপ্তি। তাছাড়া যেসব নিখুঁত দ্বিপদ বিভাজনগুলি আমরা সবাই ব্যবহার করি, তাও আমরা পেয়েছি এই ইতিহাস থেকেই—ধর্মনিরপেক্ষ/ সাম্প্রদায়িক/ জাতীয়/ আঞ্চলিক, প্রগতিশীল/প্রতিক্রিয়াশীল। ঐতিহাসিকরা এই বিভাজনগুলির যথার্থতা নিয়ে অতি সম্প্রতিকালেই প্রথম প্রশ্ন তুলতে শুরু করেছেন।[৬]

বামপন্থী, জাতীয়তাবাদী এবং উদারপন্থী ঐতিহাসিকদের বেশ কয়েক দশকের শক্তিশালী ও বিদগ্ধ লেখাপত্র সত্ত্বেও ভারতীয় ইতিহাস-রচনার এই 'কেন্দ্রীয়' দৃষ্টিকোণই এখনও পর্যন্ত সবচেয়ে ব্যাপকভাবে স্বীকৃত দৃষ্টিকোণ থেকে গেছে। আর সরকারি দপ্তর এবং আদালতের নথিপত্রের মহাফেজখানাই রয়ে গেছে তার সর্বপ্রধান প্রাথমিক তথ্যসূত্র। যে ধারণাগুলি আমাদের ঐতিহাসিক বিশ্লেষণের লক্ষ্যবস্তু—যেমন, ভারত, পাকিস্তান অথবা অন্ধ্রপ্রদেশ, অযোধ্যা অথবা হিন্দু বা মুসলিম সম্প্রদায় অথবা জাতীয়তা, জাতীয়তাবাদ, সাম্প্রদায়িকতা—এগুলি যে সবই সাময়িক এবং পরিবর্তনসাপেক্ষ, তা কিন্তু এই ইতিহাস রচনার ধারায় মোটেই স্বীকৃত নয়।

'ভারত' নামক একটি সাময়িক এবং বিশেষ সমষ্টির উপর স্বাভাবিক ও শাশ্বত ঐক্যের মহিমা আরোপ করার ফলে এবং সরকারি মহাফেজকে ইতিহাসের তথ্যের প্রাথমিক আকর বলে মেনে নিয়ে ঐতিহাসিকেরা কিন্তু প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্রের দৃষ্টিভঙ্গিকেই স্বীকার করে নিয়েছেন। এটা বিশেষ করে ঘটেছে আধুনিক ভারতের ইতিহাসের বেলায়। ভারতের ঐক্য এবং সেই ঐক্যবদ্ধ ভারতের স্বাধীনতার সংগ্রামই যেহেতু এই ইতিহাসের মূল

উপজীব্য, উনিশ শতকের গোড়া থেকেই এর কাহিনী তাই পর্যবসিত হয়েছে ভারতীয় জাতি-রাষ্ট্রের জীবনকাহিনীতে। একই কারণে এই ইতিহাসে দেশভাগের কাহিনী, আর সেইসঙ্গে ১৯৪৬-৪৭ সালের হিন্দু-মুসলিম এবং মুসলিম-শিখ দাঙ্গার কাহিনী, এক রকম প্রায় এড়িয়েই যাওয়া হয়েছে।

এই ছকের ভেতর সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা এবং সাম্প্রদায়িকতার ইতিহাস একটা গৌণ কাহিনী। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের নাটকের সুবিশাল প্রেক্ষাপটে হিন্দু 'রাজনীতি', 'মুসলিম' রাজনীতি এবং হিন্দু-মুসলিম সংঘাত নেহাতই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘটনা হিসেবে রূপায়িত হয়েছে। সেখানেও আবার আসল কর্ণধার সাম্রাজ্যবাদী শাসকেরা, যারা কলকাঠি নেড়ে সাম্প্রদায়িক সংঘাত জিইয়ে রাখত। সেই রকম দেশভাগের ইতিহাসও লেখা হয়েছে শুধুই 'সাম্প্রদায়িকতা'-র ইতিহাস হিসেবে। বলা বাহুল্য, দেশভাগের ইতিহাস কোনও মহৎ সংগ্রামের ইতিহাস নয়। কিন্তু আমাদের লেখাপত্রে তা এমনকী অনির্দিষ্ট, খাপছাড়া, দিশাহীন সংগ্রামের চেহারা নিয়েও হাজির হয় না। তাতে কোনও আত্মত্যাগ বা ক্ষতির কাহিনী নেই, নেই কোনও নতুন পরিচয় কিংবা নতুন সংঘবদ্ধতা গড়ে তোলার প্রচেষ্টা, নেই লক্ষ লক্ষ ছিন্নমূল হতভাগ্যের মনে নতুন আকাঙ্ক্ষা, নতুন সংকল্পের উন্মোচন। এ-সব ইতিহাসে শুধুই দেশভাগের 'সূত্র' বা 'কারণ' খোঁজার রিপোর্ট—কোন কোন অপ্রত্যাশিত ঘটনার ফলে, রাজনীতির কোন কোন ভুল চালে কিংবা কোন অপ্রতিরোধ্য সামাজিক-রাজনৈতিক চাপে ওই শোচনীয় ঘটনাটি ঘটল, তারই খতিয়ান। অথচ দেশভাগ নামে মর্মান্তিক ট্রাজেডি ঘটা সত্ত্বেও ভারত-ইতিহাসের মূল পথরেখাটি কিন্তু আশ্চর্যজনকভাবে অপরিবর্তিত থেকে গেল। দেশভাগের ফলে দুটি, পরে তিনটি, জাতি-রাষ্ট্রের জন্ম হয়েছে। অথচ ইতিহাসের লেখা পড়লে মনে হয় ভারতবর্ষ যেন চিরদিনই তার একান্ত স্বাভাবিক বৈশিষ্ট্যের জোরে সেই ধর্মনিরপেক্ষ, গণতান্ত্রিক, অহিংসা সহনশীল পথে অগ্রসর হয়ে চলেছে।

ঔপনিবেশিক ভারত সম্পর্কে মাধ্যমিক-উচ্চমাধ্যমিক স্তরের উপযোগী বইগুলির মধ্যে যেটি সম্ভবত শ্রেষ্ঠ, সেই বিপন চন্দ্রের *মডার্ন ইন্ডিয়া*[8] থেকে এর চমৎকার উদাহরণ পাওয়া যাবে।

> ১৫ অগাস্ট ১৯৪৭ ভারতবর্ষ তার মুক্তির প্রথম দিনটির আনন্দ উপভোগ করল। অসংখ্য দেশভক্তের আত্মত্যাগ, শহিদের আত্মবিসর্জন আজ সার্থক হল।...কিন্তু তাও আনন্দের সঙ্গে মিশে ছিল বেদনা আর দুঃখ।...স্বাধীনতার সেই মুহূর্তটিতেই ভারত আর পাকিস্তানে বয়ে চলেছিল সাম্প্রদায়িক মত্ততার প্রবাহ, অবর্ণনীয় বীভৎসতায় শেষ হয়ে যাচ্ছিল হাজার হাজার মানুষের জীবন। (পৃ. ৩০৫-৬)

প্রবল শক্তিশালী এক মহৎ সংগ্রাম যেন বিপথগামী হয়ে গেল। তাই 'বেদনা আর দুঃখ'।

জাতীয় সাফল্যের চরম মুহূর্তের এই যে ট্রাজেডি, গান্ধীজির নিঃসঙ্গ মূর্তিটাই তার প্রতীক। সেই গান্ধীজি যিনি ভারতবর্ষের মানুষকে শুনিয়েছিলেন অহিংসা, সততা,

ভালবাসা, সাহস আর পৌরুষের বাণী।...বাকি দেশে যখন উৎসব, গান্ধীজি তখন ঘুরে বেড়াচ্ছেন হিংসায় বিষিয়ে যাওয়া বাংলায়। অর্থহীন সাম্প্রদায়িক হানাহানির শিকার হয়ে তখনও যারা স্বাধীনতার মূল্য চুকিয়ে যাচ্ছিল, তিনি চেষ্টা করেছিলেন তাদের কিছুটা সান্ত্বনা দেওয়ার। (পৃ. ৩০৬)

মহৎ সংগ্রামটিকে কারা বিপথগামী করল, এখানে অবশ্য তা বলা হয়নি। কিন্তু বই-এর অন্য জায়গা থেকে পরিষ্কার জানা যায় যে এটা হিন্দু আর মুসলিম সাম্প্রদায়িক, প্রতিক্রিয়াশীল রাজনীতিক আর বলা বাহুল্য ব্রিটিশদের কাজ। (পৃ. ২৯৬-৭ এবং অন্যত্র) এর ফলেই ঘটল অর্থহীন হানাহানি আর 'স্বাধীনতার মূল্য' হিসেবে হাজার হাজার মানুষের মৃত্যু। কিন্তু একটা কথা এড়িয়ে যাওয়া হল এখানে। কারা দিল মূল্য? কাদের স্বাধীনতার জন্য? এই প্রশ্ন না করে বিপন চন্দ্রের পাঠ্যপুস্তকে বলা হচ্ছে জানুয়ারি ১৯৪৮-এ গান্ধীর মৃত্যুর কথা। 'ঐক্যের সংগ্রামে শহিদ' হলেন গান্ধীজি। আর জনগণ 'নিজেদের সামর্থ্য আর মনোবলের ওপর পরিপূর্ণ আস্থা রেখে সমাজে ন্যায় আর কল্যাণ প্রতিষ্ঠার কাজে উদ্যোগী হল।' (পৃ. ৩০৬-৭)

এখানে 'গান্ধী' আর 'জনগণ' হয়ে গিয়েছে জাতির অন্তরাত্মার প্রতীক। 'গান্ধী' আর 'জনগণ' একে অপরের বিকল্প। সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী আন্দোলনে গান্ধীই জনগণের প্রতীক। আবার গান্ধী যখন আর নেই, তখন জনগণই যেন তাঁর অসম্পূর্ণ কাজ ঘাড়ে তুলে নিল। দেশভাগ, দাঙ্গা, উদ্বাস্তু ইত্যাদি বাধা উপেক্ষা করে তারা 'ন্যায় আর কল্যাণ' প্রতিষ্ঠার কাজে নেমে পড়ল।

সুমিত সরকারের পাঠ্যপুস্তকটি[৫] আরও উন্নত, স্নাতক আর স্নাতকোত্তর শ্রেণীর উদ্দেশ্য লেখা, তার বিশ্লেষণেও সমালোচনার সুর অনেক বেশি। কিন্তু ভারতীয় জনগণের 'ধর্ম নিরপেক্ষ' পথে অগ্রগতি নিয়ে তাঁর সিদ্ধান্তও শেষ পর্যন্ত এক। ১৯৪৬ থেকে ১৯৪৮-এর জানুয়ারি পর্যন্ত 'মহাত্মার জীবনের শ্রেষ্ঠ পর্ব' নিয়ে সুমিত সরকারের বর্ণনা মর্মস্পর্শী। উত্তর ভারতের সর্বত্র যখন সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার ঝড় বয়ে চলেছে, গান্ধী প্রায় একা হাতে চেষ্টা করেছিলেন সে উন্মত্ততা প্রশমন করতে। তবুও সুমিত সরকারের মন্তব্য, এই 'বিচ্ছিন্ন ব্যক্তিগত প্রচেষ্টা' ব্যর্থ হতে বাধ্য। 'অবশ্য এমন কথা বলা যায়', তিনি বলছেন, 'যে সাম্রাজ্যবাদ আর তার ভারতীয় সাঙ্গপাঙ্গদের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ জঙ্গি গণআন্দোলনই একমাত্র যথার্থ বিকল্প পথ।' [পৃ. ৪৩৮] এ-পথ যে তখনও খোলা ছিল, তাই নিয়ে তিনি নিঃসংশয়।

দাঙ্গার বিপর্যয় সত্ত্বেও ১৯৪৬-৪৭-এর শীতেও কিন্তু এই সম্ভাবনা নষ্ট হয়ে যায়নি। অগাস্ট দাঙ্গার পাঁচ মাস পরে ফরাসি বিমান বাহিনীর দমদম বিমানবন্দর ব্যবহার করার বিরুদ্ধে কলকাতার ছাত্ররা ২১ জানুয়ারি ১৯৪৭-এ 'ভিয়েতনাম থেকে হাত ওঠাও' শ্লোগান দিয়ে রাস্তায় নামে। একই দিনে শুরু হয় কম্যুনিস্ট নেতৃত্বে ট্রামকর্মীদের ধর্মঘট যা বামপন্থীদের ভেতরকার সব দলাদলির ঊর্ধ্বে উঠে ৮৫ দিন পর সফল হয়। [পৃ. ৪৩৮-৩৯]

এখানে সুমিত সরকার ১৯৪৭-এর জানুয়ারির 'ধর্মঘটের ঢেউ'-এর কথা বলেছেন, যা তখন কলকাতা, কানপুর, করাচি, কোয়েম্বাটোর ইত্যাদি শহরের ওপর দিয়ে বয়ে গিয়েছিল। কিন্তু তার পরেই তাঁর সিদ্ধান্ত: 'কিন্তু এই ধর্মঘটগুলো সবই ছিল কেবল অর্থনীতির দাবিতে সীমাবদ্ধ। যথেষ্ট প্রভাবশালী এবং দৃঢ় রাজনৈতিক নেতৃত্বের অভাব ছিল প্রকট।' [পৃ. ৪৩৯]

ঔপনিবেশিক ভারতের এবং ভারতের জাতীয় আন্দোলনের ইতিহাসের দুটি শ্রেষ্ঠ পাঠ্যবই থেকে উদ্ধৃতি দিলাম এখানে। দুটি বই ই মার্কসীয় ঐতিহ্য অনুসরণ করে লেখা। দেশভাগ এবং স্বাধীনতার ইতিহাস রচনায় জাতীয়তাবাদী আদিকল্পটি কতটা আধিপত্য বিস্তার করে রয়েছে, এই উদ্ধৃতি থেকে সেটাই আরও স্পষ্ট করে দেখানো গেল। ইতিহাস-লেখার এই ধারা বৃহত্তর এক জাতীয়তাবাদী চিন্তাধারার অংশ যা সিনেমা, সাংবাদিকতা এবং সাহিত্যের মাধ্যমেও প্রকাশিত হয়। উত্তর ভারত, পাকিস্তান আর বাংলাদেশের অধিকাংশ মানুষের জীবনে বিংশ শতাব্দীর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাই হয়তো দেশভাগ। ব্রিটেনের কাছে যেমন প্রথম বিশ্বযুদ্ধ কিংবা ফ্রান্স বা জাপানের কাছে যেমন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, আমাদের কাছে দেশভাগের অভিজ্ঞতা ঠিক তেমনই ভয়াবহ এবং যুগান্তকারী। অথচ পশ্চিম ইউরোপে এবং জাপানে প্রথম আর দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের স্মারকচিহ্ন সর্বত্র রয়েছে। ভারতবর্ষে দেশভাগের কোনও স্মারকচিহ্ন প্রতিষ্ঠা করা হয়নি। হয়তো এটা তেমন আশ্চর্যের কিছু নয়। কিন্তু বিস্মরণ শুধু এতেই সীমিত নয়।[৬]

ইতিহাসের মতো সাহিত্য বা চলচ্চিত্রেও ভারতীয় শিল্পীরা স্বাধীনতা সংগ্রামের জয়গান যত করেছেন, সে তুলনায় দেশভাগের বেদনা আদৌ মনে করিয়ে দেননি। অল্প কিছু ব্যতিক্রম অবশ্যই আছে। পঞ্জাবি, উর্দু আর হিন্দিতে ১৯৪৬-৪৭-এর দেশ ভাগ আর সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা নিয়ে লেখাপত্র আছে ঠিকই। কিন্তু প্রথমদিকের 'পার্টিশান সাহিত্য'—সাদাত হাসান মন্টো-র মর্মান্তিক গল্পগুলি যার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন—প্রায় সবই পঞ্জাবের দাঙ্গাবিধ্বস্ত কয়েকটি জেলায় সীমিত।[৭] পরবর্তীকালে উত্তর ভারতে এ-বিষয়ে যা লেখা হয়েছে, তা ওই ধর্মনিরপেক্ষ জাতীয়তাবাদী আলোচনার গণ্ডির ভেতরেই পড়ে, যেখানে দেশভাগ হল ইতিহাসের বিভ্রান্তি, অদ্ভুত এক ঘটনা, যার কোনও ব্যাখ্যা নেই। এর শ্রেষ্ঠ নিদর্শন বোধহয় রাহী মাসুম রাজা-র *আধা গাঁও* (১৯৬৬)।

দেশভাগের পরবর্তীকালের বাংলা সাহিত্যে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা কোনওভাবেই কেন্দ্রীয় বিষয় হয়ে দেখা দেয়নি। সাম্প্রতিক একটা গবেষণায় বলা হয়েছে যে ১৯৪৩-এর দুর্ভিক্ষ যেভাবে বাঙালি সাহিত্যিককে নাড়া দিয়েছিল, ১৯৪৭-এর দেশভাগ গোটা সমাজকে ওলটপালট করে দেওয়া সত্ত্বেও কিন্তু মোটেই ১৯৫০-এর দশক বা তার পরবর্তীকালের সাহিত্যে সেভাবে রেখাপাত করেনি।[৮]

সর্বস্বান্ত উদ্বাস্তুদের বেদনা, হতাশা, স্বপ্ন নিয়ে ঋত্বিক ঘটক একাধিক ছবি করেছেন—*কোমল গান্ধার* (১৯৫৯), *মেঘে ঢাকা তারা* (১৯৬০), *সুবর্ণরেখা* (১৯৬২)। কিন্তু ঋত্বিক নিতান্তই ব্যতিক্রম শিল্পী হিসেবে তাঁর আশ্চর্য ক্ষমতার জন্যই শুধু নয়—ছবির বিষয়ের দিক থেকেও বাংলা কিংবা হিন্দি-উর্দু ছবির বিশাল বাণিজ্যিক জগতে, এমনকী ফিলম্‌স ডিভিসনের সরকারি ডকুমেন্টারিতেও, দেশভাগের ইতিহাস কিংবা পরিণাম নিয়ে

ঋত্বিকের মতো আর কেউই প্রায় কোনও নজর দেননি বললে চলে।

হিন্দি-উর্দু চলচ্চিত্রের ক্ষেত্রে যে উদাহরণটি আলাদা করে উল্লেখ করা প্রয়োজন সেটি হল এম. এস. সথ্যু-র *গরম হাওয়া* । ১৯৭০-এর দশকে তৈরি এই আশ্চর্য ছবিটিতে নিপুণভাবে দেখানো হয়েছে সামগ্রিক মত্ততা, ছিন্নমূল মানুষের জীবনের অর্থটাই হারিয়ে যাওয়া, 'অন্য কোথাও' হয়তো সে-অর্থ খুঁজে পাওয়া যাবে এই ভেবে বিপন্ন শরণার্থীদের যাত্রা। আরও সম্প্রতিকালে দূরদর্শনে প্রচারিত *তমস* ধারাবাহিকটির বিশেষ তাৎপর্য এই যে বহু লোকের কাছে তা পৌঁছেছিল। কিন্তু ভীষ্ম সাহানির ১৯৭২ সালে প্রকাশিত উপন্যাসের এই চিত্ররূপটি আসলে পুরনো মোটাদাগের জাতীয়তাবাদী ছকেই ফিরে যায়- -এখানে নির্দোষ, বিভ্রান্ত অথচ সাহসী জনগণকে আড়াল থেকে কলকাঠি নেড়ে বিপথে চালিত করে কিছু রহস্যময় চক্রান্তকারী। দেশভাগ এখানে একটা প্রাকৃতিক বিপর্যয়। মানুষের দৈনন্দিন কাজকর্ম চিন্তাভাবনার সেখানে কোনও ভূমিকাই নেই। আমরা আগেই দেখেছি, বিদগ্ধ ইতিহাস-রচনার যে জাতীয়তাবাদী ধারা, তাতেও এই একই কাহিনী বলা হয়ে এসেছে।

দেশভাগের ইতিহাস চাপা থাকে কেন, সে-কারণ বের করাও খুব কঠিন নয়। হিন্দু-মুসলিম বিরোধ আজও বাস্তব ঘটনা। বিরোধের ইতিহাস বলতে গিয়ে পুরনো ক্ষত খুঁচিয়ে তোলার বিপদটা তাই অবহেলা করা চলে না। তার ওপর দেশভাগের চরিত্র নিয়ে আমাদের মধ্যে মতৈক্য নেই। একে কীভাবে উপস্থিত করব, কী করে এর দায়িত্ব নেব, তা আমরা জানি না। এই কারণেই জাতীয়তাবাদী ইতিহাসে, সাংবাদিকতায় অথবা চলচ্চিত্রে দেশভাগ নিয়ে একটা সামগ্রিক বিস্মৃতি তৈরি হয়েছে। সচেতনভাবে হোক বা না-হোক, দেশভাগ একটা ব্যতিক্রমী ঘটনা হিসেবেই রূপায়িত হয়েছে। ১৯৪৭-এর ১৪ অগাস্ট যেদিন পাকিস্তানের জন্ম হল—সেটি একটি অঘটন, 'ভুল', যার জন্য দায়ী আমরা নই, অন্য কেউ।

স্বাধীনতা-উত্তর ভারতে সাম্প্রদায়িক রাজনীতি নিয়ে আলোচনাও মোটামুটি একই ধারায় বয়ে চলেছে। সাম্প্রতিক ঘটনা নিয়ে কিছু লেখাপত্র থেকে এর উদাহরণ দেব। এই আলোচনায় একটা বাড়তি সুবিধা হবে। সাম্প্রতিক ঘটনা নিয়ে লেখার মধ্যে যে অনির্দিষ্টতা রয়েছে, তথ্য প্রমাণ নিয়ে যে-সব অনিশ্চয়তা সেখানে দেখা দেয়, পুরনো ঘটনার ইতিহাস যাঁরা লেখেন তাঁরা অনেক সময় মনে করেন যে তাঁদের কাজ সে-সব বিপদ থেকে মুক্ত। তা যে সত্যি নয়, সে-কথাটি এই আলোচনার মধ্যে নিয়ে দেখানো যাবে।

সম্প্রতিকালের দাঙ্গার ঘটনা, বিশেষ করে ১৯৮৯-এ ভাগলপুরের ঘটনা নিয়ে এই লেখার পাশাপাশি আমি দেখাতে চেষ্টা করব যে পঞ্চাশ কিংবা একশো বছর আগের ঘটনার সাক্ষ্য প্রমাণ আমরা যে-ভাবে ব্যবহার করে থাকি, একই ঘটনার ওপর একাধিক পরস্পরবিরোধী সাক্ষ্যকে তুলনা করে তার মধ্যে থেকে একটা নিরপেক্ষ বিবরণ খাড়া করার চেষ্টা করি, সে পদ্ধতি আসলে কতটা গোলমেলে। সাম্প্রতিক ঘটনার প্রত্যক্ষ বিবরণী কীভাবে সরকারি 'সাক্ষ্যপ্রমাণে' পরিণত হয়, সেই প্রক্রিয়াটাও আমরা খানিকটা দেখতে পাব।

২

সাম্প্রতিক কালের যে কোনও রচনাতে একের পর এক দাঙ্গাকে ১৯৪৭-এর সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে।

'চরম বীভৎস' এই তকমাটা প্রত্যেকটার গায়েই সেঁটে দেওয়া হয়েছে। ১৯৮০-র দশকে সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষের মাত্রার গভীরতা তাই সহজে অনুমেয়। ১৯৮৯ সালের ভাগলপুরের দাঙ্গা সমগোত্রীয় ভয়ঙ্কর সংঘাত। ১৯৮৯ সালে অক্টোবরের শেষ সপ্তাহে এবারকার সংঘর্ষ আরম্ভ হয়। লুঠতরাজ, আগুন লাগানো, খুন-জখম—সবই শহরে আরম্ভ হয়; এবং চারপাশের গ্রামাঞ্চলে কয়েকদিন ধরে বস্তুত বিনাবাধায় ছড়িয়ে পড়ে। পরে সামরিক ও অসামরিক বাহিনী অবস্থা কিছুটা নিয়ন্ত্রণে আনে। কিন্তু পরবর্তী অনেক দিন ধরে ভয় ও সন্ত্রাসে বহু লোক দিন গুনছিল।

'দাঙ্গার' মাত্রার পরিপ্রেক্ষিতে এবং তারই সঙ্গে সংঘর্ষ বাঁধাতে ও সাক্ষ্যপ্রমাণ বিলুপ্ত করাতে স্থানীয় শাসকদলের নষ্টামির শেষ ছিল না। ফলে এই ঘটনার 'তথ্যপঞ্জী' সাজানো মুশকিল। ঐতিহাসিকের চোখে যেগুলি গল্পের 'নাটবল্টু' হতে পারত, সেইগুলি খুঁজে পাওয়া ভার হয়ে ওঠে। নিদেনপক্ষে এক হাজার লোক এই ঘটনায় খুন হয়েছিল। এঁদের মধ্যে বেশির ভাগই মুসলমান। কিন্তু হতাহতের সংখ্যা নিয়ে মতভেদের শেষ নেই। 'দাঙ্গার' প্রথম দিনগুলিতে ভাগলপুর ও তার সন্নিহিত এলাকায় নানা জায়গায় বার বার ট্রেন থামানো হয়। এইসব ট্রেন থেকে মুসলমান যাত্রীদের টেনে নামিয়ে শেষ করে দেওয়া হয়। কিন্তু কেউ ঠিকমতো জানে না যে এইভাবে কতজনকে মারা হয়। এমনকী হিন্দু সহযাত্রীরা এই রকম ঘটনা প্রত্যক্ষ করলেও তাদের কামরা থেকে ঠিক কতজনকে টেনে নামানো হয়েছে, তার কোনও হিসাব দিতে পারে না। শহর ও গ্রামাঞ্চলে বড় বড় হামলায় বৃদ্ধ, শিশু বা মেয়েরা কেউই রেহাই পায়নি। নারী লুণ্ঠন ও ধর্ষণ যে ব্যাপক হারে হয়েছে এই কথাও অনেকে বলেছেন। কিন্তু বেঁচে থাকা হতভাগ্যরা কেউই ধর্ষণ সম্পর্কে কিছু বলতে চায়নি। ১৯৯০ সালের জানুয়ারি মাসে ভাগলপুরে প্রেরিত পি. ইউ. ডি. আর-এর একটি তদন্তকারী দল ধর্ষণ সম্পর্কিত যে পাঁচটি ঘটনার উল্লেখ করেছে, সেইগুলির সূত্র মুসলমান মহিলা সংবাদদাতাদের শোনা কথা মাত্র।

প্রশ্নাতীতভাবে এইটুকু বলা যায় যে ১৯৬৪ সালের 'দাঙ্গা' বা আরও অনেক পূর্বতন 'দাঙ্গার' লীলাক্ষেত্র ভাগলপুরের মতো জেলাতেও হামলার এইরকম বিস্তৃতি ও হিংস্র রূপ নজিরহীন। ১৯৮৯ সালের অক্টোবর-নভেম্বর মাসে হিংসার ভয়ঙ্কর দিনগুলিতে প্রায় ৪০,০০০ মতো লোক ঘরবাড়ি ছেড়ে তড়িঘড়ি করে বানিয়ে তোলা রিলিফ ক্যাম্পে আশ্রয় নিতে বাধ্য হন। কয়েক সপ্তাহ ধরে ব্যাপকভাবে সম্পত্তিহানি ও লুঠতরাজ চলতেই থাকে। সংখ্যালঘু মুসলমানরা এতটাই আতঙ্কিত হয়ে পড়েছিলেন যে সংঘর্ষের তিন মাস পরেও তারা ঘরে ফিরতে গররাজি ছিলেন। ১৯৯০-এর জানুয়ারির শেষেও প্রায় দশ হাজার মানুষ 'রিলিফ ক্যাম্পগুলিতে' থাকছিলেন। তাছাড়াও ভাগলপুর জেলার মধ্যে ও বাইরে আত্মীয় ও বন্ধুবান্ধবদের 'নিরাপদ' আশ্রয়ে অনেক মানুষ বাস করছিলেন। এই সময়ে অনেক মুসলিম চাইছিলেন যে সামরিক বা আধা-সামরিক বাহিনী তাদের গ্রামে ও মহল্লায় পাকাপাকিভাবে মোতায়েন থাকুক। তাঁদের কাছে নিরাপত্তার

নির্ভরযোগ্য উপায় ছিল ওইরকম কোনও বাহিনী। এই জন্য কেউ কেউ সরকারের কাছ থেকে অস্ত্রও দাবি করছিলেন। গুজবের সীমা ছিল না, লুঠতরাজ ও হামলাও বিক্ষিপ্তভাবে ঘটছিল। মার্চ ১৯৯০ সালেও এরকম কথা শোনা যায়।

এই রকম একটা ঘটনার ইতিহাস আমরা কীভাবে লিখব? বহু প্রজন্ম ধরে, ঐতিহাসিক ও সমাজবিজ্ঞানীরা যে সব সরকারি বর্ণনাকে অনেক বেশি 'নির্ভরযোগ্য' ও মূল্যবান সূত্র বলে মনে করেন, সেইসব বিবরণের অধিকাংশই ভাগলপুরের সরকারি দপ্তরগুলো থেকে বেপাত্তা হয়ে গেছে। ভাগলপুরে তদন্তকার্যে নিয়োজিত নানা স্বতন্ত্র অনুসন্ধানকারী দলগুলিও ঠিক একইভাবে সরকারি বিবরণ পেতে আগ্রহী ছিল কারণ তাহলে আশা থাকে যে নানা বিভ্রান্তিকর আখ্যানের মধ্যে থেকেও 'একটা সামগ্রিক ছবি' গড়ে তোলা যাবে।[১১] কিন্তু এইরকম কেন্দ্রাভিমুখী বয়ান অধিকাংশই নষ্ট করে দেওয়া হয়। 'দাঙ্গার' প্রথম পর্যায়ে, চরম সংকটের দিনগুলির ক্ষেত্রে, এই নীতি আরও বেশি করে প্রযোজ্য হয়েছিল। দু-সপ্তাহ ধরে অনুসন্ধান চালানোর পরে ভাগলপুরের ধ্বংসলীলা ও তার ফলাফল সম্পর্কে ১১ ফেব্রুয়ারি ১৯৯০-এর *সানডে মেল*-এ লেখা হয়েছে:

> ওই সময়ের গুরুত্বপূর্ণ নথিপত্র, বিশেষত যেগুলি জেলাশাসক (ডি. এম.) ও পুলিশ অধিকর্তার (এস. পি.) হেফাজতে ছিল, নিখোঁজ...
>
> ...সাক্ষ্য প্রমাণাদি থেকে এইরকম ধারণাই জোরদার হয়ে ওঠে যে (ডি. এম.) কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণ-এ রক্ষিত লগবুকটি সম্ভবত নষ্ট করে দিয়েছেন, অথচ সেটাতে সেই ভয়ঙ্কর সপ্তাহে জরুরি সাহায্যের জন্য অসংখ্য আর্তি লিপিবদ্ধ ছিল। আশ্চর্যের কথা যে অফিসে রাখা নতুন লগবুকটিতে ওই সব ঘটনার কোনও উল্লেখই নেই...
>
> ...তদীনন্তন এস. পি. ইতিমধ্যেই কুখ্যাত হয়ে উঠেছেন এবং পরবর্তী বদলি অফিসারের কাজে লাগবার মতো কোনও সূত্রই রেখে যাননি...পাটনা হাইকোর্ট নোটিশ দিয়েছিল বলেই তাঁর নথিতে চান্দেরি হত্যাকাণ্ডের (গ্রামাঞ্চলের মর্মান্তিক ঘটনাগুলির অন্যতম) একটি মাত্র যৌথ প্রতিবেদন আছে। এমন কি ২৪ অক্টোবর (ভাগলপুর শহরে) তাতারপুর চৌকের ঘটনাটি পলতেয় আগুন ধরায় অথচ তার ওপর ডি. এম. বা এস. পি.-র যৌথ প্রতিবেদনটিরও কোনও হদিশ পাওয়া যায়নি।
>
> অবিশ্বাস্য শোনালেও এটাই সত্যি যে, ঘটনাবলি সম্পর্কে ডি. এম. এবং এস. পি. র কোথাওই কোনও বিবৃতি বা এজাহার পাওয়া যায়নি।

নথি সরিয়ে ফেলা বা নষ্ট করার মতো ঘটনা অবশ্য নজিরবিহীন নয়। ১৯৩৭ সালের পরে ইংরেজ শাসকরা ব্যাপকভাবে এই ধরনের কাজ করেছিল। এ ব্যাপারেও সন্দেহ নেই যে এই রকমের অসংখ্য উদাহরণ স্বাধীনতা-উত্তর সময়ের ভারতে পাওয়া যাবে। কিন্তু যেটা কমই দেখা গেছে তা হল এই রকম ঘটনা ঘটলে 'তথ্য' নষ্ট করার পাশাপাশি যেন সুসংগঠিত ভাবে, সরকারি ও বেসরকারি সব দিক থেকে নতুন প্রমাণপঞ্জী তৈরি করা। হিংসাত্মক ঘটনার প্রেক্ষিতে 'প্রমাণ' সংগ্রহ আবশ্যক হয়ে ওঠে; যে সব প্রক্রিয়া বা দ্বন্দ্ব লুকিয়ে থাকে, যেগুলিকে আমরা সাধারণত এড়িয়ে চলি, সেই সবগুলি

খোলাখুলিভাবে সামনে আসে। আবার হিংসা 'প্রমাণপঞ্জী'কে নষ্টও করে দেয়। বিশেষত নষ্ট করার পদ্ধতিটা এতটাই ব্যাপক যে আধুনিক সমাজবিজ্ঞানে 'তথ্য' হিসাবে সংগৃহীত ও গ্রাহ্য হবার কৃৎ-কৌশলটা যেন বানচাল হয়ে পড়ে। ভাগলপুরে পি. ইউ. ডি. আর.-এর কাজের প্রসঙ্গে বিষয়টা আলোচনা করা যেতে পারে।

দলটি নেহাৎ ছোট ছিল না। এবং আর্টাদিনের সফরে ঘণ্টার পর ঘণ্টা তথ্য সংগ্রহের পেছনে সময় দেওয়া হয়েছিল। তবুও নানা ধরনের প্রতিবন্ধকতা দেখা দেয়। যে সব লোকেদের সঙ্গে আমরা ভাগলপুরে কথা বলেছি তাঁরা অধিকাংশই মুসলমান। 'দাঙ্গার' প্রথম ভুক্তভোগী তাঁরাই, তাঁরাই রিলিফ ক্যাম্পের বাসিন্দা। তাঁরা কথা বলছিলেন, হয়তো বলবার তাগিদও অনুভব করেছিলেন। যে সব এলাকার অবস্থা খারাপ ছিল, সেই সব অঞ্চলের হিন্দুরা সব সময় সরাসবি বিরোধিতা না করলেও আমাদের প্রসঙ্গে ঠাণ্ডা ও চুপচাপ ছিলেন। যে সব হিন্দুদের সঙ্গে আমরা কথা বলেছি তারা একটি ছোট গোষ্ঠী: কিছু মধ্যবিত্ত, বুদ্ধিজীবী, রাষ্ট্রনৈতিক কর্মী, পেশাদার ও সরকারি কর্মচারী। ঘটনা সম্পর্কে কোনও না কোনও নির্দিষ্ট মতামত বা 'তত্ত্বে' এরা বিশ্বাসী ছিলেন।

আরও সমস্যা ছিল। ভুক্তভোগী ও প্রত্যক্ষদর্শীদের কি কি প্রশ্ন কীভাবে করব? আমাদের প্রশ্নের ধরনগুলি এমন ছিল যে, তার মধ্যে যেন একটা বিশেষ উত্তরের প্রত্যাশা লুকিয়ে আছে। আর আমরা সেই ধরনের বিশেষ উত্তরই পেয়েছি, যা আমরা শুনতে চাইছিলাম। আমি এ বিষয়ে পরে আবার আলোচনা করব। কিন্তু কাজে নেমে প্রথম অসুবিধা হল, বর্বরতার শিকার মানুষগুলিকে কীভাবে প্রশ্ন করা যায়? হয়তো 'দাঙ্গার' কোনও পরিবারের কেবল বাবা ও ছেলে, অথবা মা ও ছোট ছোট চারটি শিশু বেঁচে গিয়েছিল। একজন ছিটকে পড়েছিল বা কোনওভাবে মাঠে লুকিয়ে পড়ে, সেখান থেকে তারা দেখেছে যে বয়স্ক ও যুবকদের, স্ত্রী ও পুরুষদের—যাকেই গ্রামের মুসলিম বসতিতে পাওয়া গেছে তাকে হত্যা করা হয়েছে। এই রকম সন্ত্রাসের ভুক্তভোগী মানুষের কাছে তাঁরা কি দেখেছেন, তার বিস্তারিত বর্ণনা শুনতে চাইব কীভাবে?

তবুও 'অনুসন্ধানকারীরা' প্রশ্ন করতে বাধ্য। কোনও কোনও সময় দাঙ্গার ভুক্তভোগীরা অথবা বেঁচে ফিরে আসা মানুষেরা বা আশেপাশে দাড়িয়ে থাকা লোকেরা, জিজ্ঞাসা করার আগেই কথা বলতে শুরু করতেন। কারণ তাদের হয়তো এর মধ্যেই অনেকবার জিজ্ঞাসা করা হয়েছে; অথবা তাঁরা তাঁদের দুর্ভোগের প্রকাশ্য বিবরণ দেবার প্রয়োজন বোধ করেছিলেন। কিন্তু এই বিবরণগুলিও ছকে বাঁধা। মনে হত বিবৃতিগুলো প্রথাসিদ্ধ, 'মুসলিম', 'যাদব' বা 'হিন্দু', যে কোনও গোটা একটি গোষ্ঠীর তরফে তুলে ধরা একটি সমষ্টিগত স্মৃতি বা প্রতিবেদন। ক্ষতিগ্রস্ত মহল্লা বা গ্রামের কোনও একটি প্রধান জায়গায় আমাদের নিয়ে যাওয়া হত, অনেক লোক সেখানে জড়ো হত এবং 'বয়স্ক' ও 'শিক্ষিত' ব্যক্তিরা আমাদের স্থানীয় ঘটনাবলীর বিবরণ দিতেন। সেটা নির্ভরযোগ্য বলে মনে করা হত। এটাই ছিল সাধারণ পদ্ধতি।

এমন কী যে সব ক্ষেত্রে মেয়েরা, তরুণরা অথবা এমন কি শিশুরা আলাদাভাবে কথা বলেছে এবং তাদের বিভিন্ন বিবৃতিতে গুরুত্ব ও ঝোঁকের তারতম্য ধরা পড়েছে, সেই সব বিবরণও যৌথ বয়ানের অঙ্গে পরিণত হয়েছে। ঘটনার সাধারণ রূপরেখা যেন প্রত্যেকের

কাছে একইরকম ছিল, তাদের আগ্রহগুলিও ছিল এক জাতীয়। নিজেদের গোষ্ঠীর দুর্ভোগের কাহিনী, নিরাপত্তা ও ক্ষতিপূরণের সমস্যা, দুর্দিনে বন্ধুদের চিনে নেবার তাগিদ, বিশেষত এই প্রসঙ্গে নানা ধর্মীয় সংগঠন এবং জায়গা বিশেষে, বামপন্থীদের প্রভাব সাপেক্ষে, বামপন্থী সংগঠন ও কর্মীদের কথা, বার বার শোনা গেছে।

হিংসাত্মক ঘটনা শুরু হবার তিন মাস পরে পি. ইউ. ডি. আর.-এর দলটি ভাগলপুরে গিয়েছিল। এটা খুবই সম্ভব যে সমষ্টিগত বিববরণগুলি এই সময়ের মধ্যে প্রথানুগ হয়ে পড়েছিল। আমি অবশ্য নিঃসন্দেহে বলতে পারি যে, বিবৃত ঘটনা ঘটার অল্প কিছু দিনের মধ্যেই স্মৃতি একটি গতে বাঁধা হয়ে যায়। এর পেছনে কাজ করেছে স্থানীয় গোষ্ঠীর জীবনচর্চা, অতীত সংঘর্ষের ইতিহাস এবং রাষ্ট্রের সঙ্গে জটিল সম্পর্ক। অবশ্য আর একটি উপাদানও সক্রিয় ছিল। এই জাতীয় প্রকাশ্য বয়ানের অন্যতর উদ্দেশ্য, রাষ্ট্র ও তার প্রতিনিধিদের সম্পর্কে একটি বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গি পেশ করা।

এই জাতীয় ব্যাপক হিংস্র কার্যকলাপ সমাজে সুবিধাভোগী শ্রেণী ও সাধারণ মানুষের মধ্যে বিরাজমান বিভাজনকে আরও তীক্ষ্ণ করে তোলে। আবার এর ফলে গোষ্ঠীগুলো নিজেদের মধ্যে সংহত হয়; সন্দেহভাজন সমূহগুলি 'সাধারণের' অংশে পরিণত হয়। গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত গ্রামের মানুষ, সদ্য তৈরি রিলিফ ক্যাম্পগুলির অজানা লোক, এমন কী ডাক্তার ও বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকদের মতো উচ্চবর্গের ব্যক্তিরা অর্থাৎ খবর নেবার সব রকমের লোকেরা কোনও না কোনও সমূহের অন্তর্ভুক্ত হয়ে পড়েন। ভুক্তভোগীদের চোখে, 'তদন্তকারী' একজন 'প্রভাবশালী ব্যক্তি', তার কাছে ত্রাণ, অনুগ্রহ বা বিচারের জন্য আবেদন জানানো যায়।

ফলে, ভাগলপুরের লোকেদের সঙ্গে আমাদের কথোপকথন অন্য খাতে বয়। সম্পত্তিহানি, আঘাত ও মৃত্যুর খুঁটিনাটি বর্ণনায় বেশি সময় যায় অথচ এইগুলি আমাদের তদন্তের প্রধান উপজীব্য বলে মনে করা হয়নি। আমাদের বার বার আগ বাড়িয়ে অনুরোধ করা হয়েছে স্বচক্ষে দেখে আসতে কীভাবে একটি বাড়ি ধ্বংস করা হয়েছে, বাড়ির সব বাসিন্দাদের নামগুলি লিখে নিতে বলা হয়েছে। আমাদের বলা হয়েছে এফ. আই. আর. নথিবদ্ধ করতে কারণ পুলিশ সেইগুলি লিপিবদ্ধ করেনি বা করতে চায়নি। তাদের আশা এই যে আমরা এইগুলো নথিভুক্ত করতে সাহায্য করব। বেশ কিছু সাক্ষী জানিয়েছেন, 'আমরা সব সময় ভয়ে দিন কাটাচ্ছি। কেউ সাক্ষ্য নিতে আসার আগেই হয়তো খুন হয়ে যেতে পারি।' কোনও কোনও জায়গায় আবার এই রকম ছোট্ট জবাব শোনা গেছে, 'আমরা কিছু জানি না, আমরা এখানে ছিলাম না।'

প্রায়শই আমরা যে বিবরণী সংগ্রহ করেছি সেইগুলি যেন আগেভাগে কোনও কিছুকে বাতিল করার জন্য সাজানো কাহিনী। কোনও না কোনও বিশেষ 'তত্ত্ব' বা ঘটনার কোনও না কোনও ব্যাখ্যাকে নাকচ করার জন্য যেন এই বিবৃতিগুলিকে বানিয়ে তোলা হয়েছিল। 'হিন্দুদের' বিরুদ্ধে অভিযোগ ছিল যে তারা ভাগলপুর শহরে সশস্ত্র মিছিল বের করেছিল এবং অত্যন্ত প্ররোচনামূলক কৌশল অবলম্বন করেছিল। ২৪ অক্টোবরে হিংসার সূচনা এর থেকেই হয়। অথচ তাঁদের মতে, মিছিলটি অন্যান্য সাধারণ ধর্মীয় শোভাযাত্রার মতোই ছিল এবং মিছিল যাবার পথে অসংখ্য মহিলা ও শিশু বাজনা বাজিয়ে ধর্মীয় সংগীত

গাইতে গাইতে যোগ দিয়েছিল। ২৪ অক্টোবরের অনেক আগে থেকে একটা 'দাঙ্গা' বাঁধাবার প্রস্তুতি 'মুসলিমরা' নিচ্ছিল, এইরকম একটা অভিযোগ স্থানীয় 'প্রশাসন' ও অন্যান্যরা করে থাকে। অথচ গোটা জেলা জুড়ে মুসলিমরা প্রায় একবাক্যে বলেছে যে তাদের সঙ্গে হিন্দুদের কখনও কোনও বিবাদ ছিল না, দাঙ্গা হবার কোনও আশঙ্কা দেখা দেয়নি। জেলায় হিন্দু এবং মুসলিমদের মধ্যে বরাবর সম্প্রীতি ছিল। এমনকি '১৯৪৭-৪৮' সালেও যখন সারা উত্তর ভারত জ্বলছিল, তখন ভাগলপুরে বড় জোর নামমাত্র ঝামেলা হয়েছিল।

এমন কি যে সব ক্ষেত্রে গোষ্ঠী বা সমষ্টির কাছে আশু আত্মরক্ষা করা সমস্যা ছিল না, সেইসব ক্ষেত্রেও কোনও একটা আদর্শ বা মূল্যবোধ বাঁচানোর তাগিদ অনুভূত হয়েছিল। উদাহরণস্বরূপ নগরবাসী পেশাদার বা বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে নিজেদের বা শহর অঞ্চলের সুনাম বজায় রাখার তাগিদ বা ভবিষ্যতে হিন্দু ও মুসলিমদের মিলে মিশে বসবাস করার সম্ভাবনা জিইয়ে রাখার ইচ্ছার কথা বলা যেতে পারে। এর ফলে 'গতস্য শোচনা নাস্তি'-র মতো চিন্তাকে অনেকে সঠিক মনে করেছিলেন। হয়তো সংঘর্ষের দায় 'বহিরাগতদের' উপর চাপিয়ে দেবার সোচ্চার চেষ্টার পেছনে এইরকম কোনও ভাবনা কাজ করে থাকবে। দায়ী বহিরাগত অনেক ধরনের হতে পারে, কোথাও বা পাটনার বা দিল্লির রাজনৈতিক নেতা, কোথাও বা 'সমাজ বিরোধীদের দল' বা মেরুদণ্ডহীন দুর্নীতিপরায়ণ প্রশাসন। 'দাঙ্গা' বাঁধানোর পেছনে সমাজবিরোধীদের উশ্‌কানি ও ভূমিকার তত্ত্ব বেশ চালু। এইটে বলা হয়েছে যে ভাগলপুর শহরের উত্তরে ও জেলার পশ্চিম থেকে পুবে প্রবাহিত গঙ্গা নদীর ওপার থেকে দলে দলে 'অপরাধপ্রবণ জাতেরা' শহরে ও 'দাঙ্গা' অধ্যুষিত অঞ্চলে ঢুকে পড়ে। ঔপনিবেশিক আমলে এইসব জাতদের গায়ে 'অপরাধীর' তকমা সেঁটে দেওয়া হয়েছিল। স্বাভাবিক সময়েও আবার এরাই ভাগলপুরে আইন শৃঙ্খলা ভঙ্গ করে থাকে। তাই ১৯৮৯ সালে 'সমাজবিরোধীরা' এইসব 'বহিরাগতদের' খুশিমতো ব্যবহার করে সংঘর্ষ শুরু করে দেয়।

এই ধরনের ঘটনার ইতিহাস পুনর্গঠনের ক্ষেত্রে সাক্ষ্য-প্রমাণ সংগ্রহের অসুবিধা একটি মাত্র দিক। কীভাবে এই অভিজ্ঞতাকে লিপিবদ্ধ করতে হবে, সেটাও কম সমস্যাসঙ্কুল নয়, একথা আগে একবার বলা হয়েছে। লিখতে বসলে রোমাঞ্চকর বর্ণনা লেখার ঝোঁক চলে আসে। অতি নাটকীয় হয়ে যাবার স্বাভাবিক সম্ভাবনা থেকে যায়। ফলে এই ধরনের সংঘর্ষ ও তার ফলাফলকে অস্বাভাবিক, কোনও না কোনও বিকৃতি বলে মনে করার একটি স্বাভাবিক প্রবণতা কার্যকর হয়ে ওঠে। অপরপক্ষে আরেকটি বিপদের আশঙ্কা থাকে। কেতাবি আলোচনার তাপে অত্যন্ত জঘন্য বিচ্যুতিও স্বাভাবিক ভদ্রতার রূপ পেতে পারে এবং যথারীতি বৈশিষ্ট্যবিহীন হয়ে ওঠে। এটাও দেখানো যায়, কী করে কেতাবি আলোচনা হিংসার ক্ষণগুলোকে 'অস্বাভাবিক' ও 'বিকৃতির' উদাহরণ হিসেবে দেখানোর চেষ্টা করে।

ভারতে সাম্প্রদায়িক সংঘাতের আলোচনায় 'হিন্দুদের' অত্যাচারের বিবৃতির পাশাপাশি 'মুসলিম' বা 'শিখদের' অত্যাচারের বর্ণনাও রাখা হয়; ভারসাম্য রাখাটা যে জরুরি। আমাদের ভাগলপুর যাত্রার কয়েক সপ্তাহ পরে বিহারের মুখ্যমন্ত্রী ঘোষণা

করেছিলেন যে স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়ে আনার জন্য ধ্বংসপ্রাপ্ত বহু মুসলিম ধর্মীয় স্থানগুলির সঙ্গে কতকগুলি হিন্দু মন্দিরকেও পুনর্গঠিত করা হবে। ভাগলপুরের সংঘর্ষ প্রসঙ্গে মার্চ ১৯৯০ সালে জাতীয় দূরদর্শনে প্রদর্শিত ও নলিনী সিং-এর মতো উদ্যোগী ও স্বাধীনচেতা পরিচালককৃত তথ্যচিত্রটিতে জামালপুরের পাশাপাশি লোগাঁই গ্রামটিকে একসঙ্গে দেখানো হয়। প্রথমটি 'দাঙ্গায়' আক্রান্ত হিন্দুগ্রাম, দ্বিতীয়টিতে মুসলিমদের জঘন্যভাবে হত্যা করা হয়। বোঝানো হয় যে, আক্রমণের তীব্রতা ও হতাহতের সংখ্যা যেন দুটি ক্ষেত্রে সমগোত্রীয়। অথচ বিশ্বস্ততম সূত্র অনুযায়ী, জামালপুরে সাতজন মারা যায় ও ৭০টি বাড়িতে আংশিকভাবে আগুন ধরানো হয় ও লুঠ করা হয়। আর লোগাঁইতে ১১৫ জন নিহত হন এবং গোটা মুসলিম বস্তি লুঠ করে, পুড়িয়ে ধ্বংস করে দেওয়া হয়।[১২]

'দুই পক্ষকেই' তুলে ধরা, দুই পক্ষের কার্যকলাপকে লিপিবদ্ধ করার আপাত উদারনৈতিক প্রচেষ্টার সঙ্গে প্রায়শই তাল মিলিয়ে চলে 'বহিরাগত' শক্তি ও 'ব্যতিক্রমী পরিস্থিতি' খুঁজে বার করার জন্য সমাজবিজ্ঞানীদের প্রচেষ্টা। এই জাতীয় অস্বাভাবিক হিংস্র কার্যকলাপের নেপথ্যে তাদেরকেই খোঁজা হয়। ভাগলপুরের ক্ষেত্রেও সাংবাদিক ও অন্যান্য তদন্তকারী দলেরা দায়ী করেছেন 'সমাজ বিরোধী', স্থানীয় প্রশাসন, বিশ্ব হিন্দু পরিষদ ও অন্যান্য জঙ্গি হিন্দু সংগঠনগুলির বিদ্বেষপূর্ণ প্রচারকে। ১৯ নভেম্বরের একটি সংবাদপত্রের প্রতিবেদনে দেখেছি,

> সেখানে মানুষেরা একসঙ্গে চিরকাল থেকেছেন ও থাকছেন, একে অপরের সুখ দুঃখ ভাগাভাগি করে নিচ্ছেন—সে আহার বিহারের ব্যাপারই হোক, মেয়ের বিয়েই হোক কিংবা নির্বাচনের রাজনীতিই হোক। এটা কি করে সম্ভব যে তাঁরা রাতারাতি একে অপরের শত্রু হয়ে দাঁড়াবেন? বাবরি মসজিদ-রাম জন্মভুমি বিতর্কে তাঁদের কিই বা এসে যায়? কিন্তু সুযোগ বুঝে দুই সম্প্রদায়ের বদমাইসরা খুব তাড়াতাড়ি এই সব লোকেদের মনে পাগলামির বিষাক্ত বীজ বুনে দিতে পেরেছিল।

দ্রুত মানুষের মন বিষাক্ত করার বিশেষ কাজটি কিন্তু কোনও সমস্যা রূপে বিবেচিত হল না, তার তাৎপর্য নিয়ে কোনও আলোচনা থাকল না। বরং আমাদের বলা হল, 'ভাগলপুরের দাঙ্গা ততটা সাম্প্রদায়িক মনোভাবের ফল নয়, বরং বদমাইসদের সৃষ্ট একটি দুর্বিপাক।'[১৩]

প্রাক-স্বাধীনতা আমলের জাতীয়তাবাদী বিবরণগুলির ধরতাই এই সব কাহিনীগুলোতে শোনা যায়। 'জনগণ' আদতে ধর্মনিরপেক্ষ। ওই একই সংবাদপত্রের প্রতিবেদনে লক্ষ করা যায়,

> রাইফেল, বন্দুক, টাঙ্গি, কাটারি ও বর্শা দ্বারা সশস্ত্র বদমাইসদের দল শক্তিশালী (রাজনৈতিক) নেতাদের আশীর্বাদপুষ্ট। জনগণ কিই-বা করতে পারত? শান্তি ও সৌহার্দপূর্ণ পরিবেশে হিন্দু ও মুসলিম উভয় সম্প্রদায়ের মানুষরা বসবাস করতে চেয়েছিল কিন্তু শেষ পর্যন্ত বদমাইসরা তাদের মনে বিষ ছড়াতে সক্ষম হয়।

আপাতদৃষ্টিতে অন্যরকম মনে হলেও, 'বৃহত্তর ঐতিহাসিক প্রক্রিয়ার' ধাঁচে হিংসার বিশেষণও এই জাতীয় ব্যাখ্যা থেকে খুব একটা কিছু আলাদা নয়। সেই বিশ্লেষণে বিশ্বহিন্দু পরিষদ বা বদমাইসদের কার্যকলাপ বা স্থানীয় প্রশাসকদের কর্তব্যে অবহেলা ততটা গুরুত্ব পায় না। সেই বিশ্লেষণে আলোচিত হয় অন্য নানা বিষয়, রাজনীতি কীভাবে 'অপরাধদুষ্ট' হচ্ছে, প্রশাসনসহ ভারতীয় জনজীবনের সাম্প্রদায়িক হবার প্রবণতা, অথবা 'পিছিয়ে পড়া জাতগুলোর উত্থান', নতুন ব্যবসায়ীগোষ্ঠীর অভ্যুদয়, ইউনিয়নবাজি, শ্রমিক অসন্তোষ ইত্যাদির মতো নানা দীর্ঘস্থায়ী অর্থনৈতিক পরিবর্তনের ধারা। ভাগলপুরের দাঙ্গা প্রসঙ্গে পি. ইউ. ডি. আর.-এর সতর্ক ও বিস্তৃত প্রতিবেদনের উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে। হিংসার সূত্রপাতের পারিপার্শ্বিক জটিলতা প্রসঙ্গে প্রতিবেদনের বিস্তৃত অথচ কিছুটা বিভ্রান্তিকর বয়ান হল,

> দাঙ্গার দায় বদমাইসদের ওপর চাপিয়ে দেওয়া সাধারণ একটি সরলীকরণ। আমরা মনে করি যে বদমাইস, পুলিশ, প্রশাসন, রাজনীতিবিদ, প্রভুত্বকামী উচ্চবর্গ ও অর্থনীতির সম্পর্কের যোগফলকে দায়ী করাটা অনেক বেশি সঠিক। একটি বিশেষ ক্ষণে এই উপাদানগুলির একটি বা সব কটিই এমনকি কিছু কিছু স্থানীয় সাধারণ মানুষও দাঙ্গার অনুঘটক রূপে কাজ করে থাকে।[১১]

প্রায়শ দীর্ঘস্থায়ী জটিল ঐতিহাসিক প্রক্রিয়া সংক্রান্ত বক্তব্যগুলিতে সাধারণ মানুষ ও তার দায়দায়িত্বের কথা বাদ পড়ে যায়। সেইগুলি পর্যবসিত হয় আলোচ্য জনগণের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশের অপরিহার্য এবং অপরিবর্তনীয় (ধর্মনিরপেক্ষ) চরিত্র সম্পর্কিত মন্তব্য সমূহে। 'অর্থনৈতিক মাত্রাই' এইসব ক্ষেত্রে সবকিছুর মূলসূত্র হিসাবে প্রাধান্য পায়। সাম্প্রতিক সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষের কারণ বিশ্লেষণে অগ্রণী গবেষক আসগার আলি ইঞ্জিনিয়ারের রচনার দুটি উদ্ধৃতি বিষয়টিকে আরও প্রাঞ্জল করতে সাহায্য করবে,

> জব্বলপুর ১৯৬১: একটি হিন্দু মেয়েকে ফুসলিয়ে নিয়ে মুসলিম যুবকের বিয়ে করাটা *আপাত কারণ* ছিল। এর ফলে দুই সম্প্রদায়ের প্রভাবশালী ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক সংস্কারগুলো জোরদার হলেও *প্রকৃত কারণ* অন্যত্র *নিহিত ছিল।* মুসলিম যুবকটি স্থানীয় একজন বিশেষ সম্পন্ন বিড়ি ব্যবসায়ীর ছেলে এবং ব্যবসায়ীটি ধীরে ধীরে স্থানীয় বিড়ি শিল্পের উপর নিয়ন্ত্রণ কায়েম করছিলেন। এই উন্নতির দরুন তাঁর প্রতিযোগীদের তাঁর উপর বিদ্বেষ ছিল। এই বিষয় খুব তাৎপর্যপূর্ণ যে, ওই দাঙ্গায় মুসলিম মালিকানার অধীন বিড়ি শিল্পগুলি বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হয়।
>
> ভিওয়াণ্ডি ১৯৭০: বিদ্যুৎচালিত তাঁত শিল্পের বর্ধিষ্ণু কেন্দ্র হল (ভিওয়াণ্ডি)। বেশ কিছু মুসলিম পরিবার কিছু তাঁতের মালিক এবং বাদ বাকিরা এই শিল্পে তাঁতি হিসাবে নিয়োজিত।...আবার, বম্বে-আগ্রা জাতীয় সড়কের উপর অবস্থিত বলে চলাচলকারী ট্রাকগুলি থেকে বড় পরিমাণ রাজস্ব আদায় হিসাবে ভিওয়াণ্ডিতে সংগৃহীত হয়। এই পৌরসভার উপার্জনের অঙ্ক তাই বেশ বলার মতো। ফলে স্থানীয় পৌর রাজনীতি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। পৌরসভায় নিয়ন্ত্রণ রাখবার জন্য বিভিন্ন দল

ও রাজনৈতিক গোষ্ঠীগুলির মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা লেগে আছে। তাঁত শিল্পের সঙ্গে জড়িত বর্ধিষ্ণু মুসলিমদের একটি গোষ্ঠী রাজনৈতিক উচ্চাশা পোষণ করতে থাকে এবং কায়েমী নেতৃত্বের প্রতিস্পর্ধী হয়ে ওঠে। এলাকায় সাম্প্রদায়িক অসন্তোষ বেড়ে যায়।[১১]

এই গোত্রের কিছু কিছু কট্টর ব্যাখায়, অর্থনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি ইতিহাসকে জমি ও মুনাফার লড়াইয়ের গণ্ডিতে আবদ্ধ করে ফেলেছে। ভাগলপুরে 'সাম্প্রদায়িকতার অর্থনীতি' প্রসঙ্গে একজন সাংবাদিক মন্তব্য করেছেন:

আমাদের সভ্য সমাজের কুৎসিত রূপের প্রকাশ হিসাবে ভাগলপুরের দাঙ্গাকে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করাটা অতি সরলীকরণ হবে। বরং আমাদের নজর দিতে হবে অন্য দিকেও—যেমন ধ্বসে যাওয়া অর্থনীতি, মুমূর্ষু শিল্প, অথবা এই ঘটনার ইন্ধনস্বরূপ এলাকার ক্ষয়িষ্ণু সামন্ততান্ত্রিক কৃষি কাঠামো।

আরও দেখুন:

[আগ্নেয়াস্ত্রের] ক্রেতা এবং বিক্রেতার মধ্যে কোনও স্থান নেই। মুনাফা একমাত্র বিবেচ্য। সাম্প্রদায়িক অসন্তাষকে জিইয়ে রাখার জন্য তাদের কায়েমী স্বার্থ আছে।...জিইয়ে রাখার অপর স্বার্থ হল রিলিফ ক্যাম্প পরিচালনা থেকে সংগৃহীত মুনাফা।[১৬]

এটা মনে করার কোনও যৌক্তিকতা নেই যে অর্থনৈতিক স্বার্থ ও দ্বন্দ্বগুলি গুরুত্বহীন। কিন্তু আমাদের সমসাময়িক ইতিহাসে সংকীর্ণ বস্তুময় স্বার্থের বাইরেও অতিরিক্ত অনেক কিছু রয়েছে। অথচ সমাজবিজ্ঞানের বেশ কিছু পরিশীলিত রচনাতেও নরনারীর জীবনগুলিকে বস্তুস্বার্থের ক্রীড়নকরূপে এখনও দেখানো হয়। কোনও কোনও সময় এদের নিজস্ব জীবন বৃহত্তর নৈর্ব্যক্তিক অর্থনৈতিক বা সামাজিক আন্দোলনের অঙ্কে পর্যবসিত হয়। সেইগুলির উপর ব্যক্তিমানুষেব কোনও নিয়ন্ত্রণ স্বীকার করা হয় না। এই নিবন্ধের আপত্তির মূল ঝোঁক এইখানেই। এইটা বলা হচ্ছে যে 'আসল' লড়াইটা যেখানে হচ্ছে বলে মনে হয়—বস্তুত লড়াইয়ের ক্ষেত্র সেটা নয়। জোর পড়ে না ইতিবৃত্তের অংশে অথবা ইজ্জতের ধারণায়, ধর্মের মৌলিক ভূমিকা স্বীকৃতি পায় না, অবহেলিত হয় বিশেষ সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় প্রতীকগুলির প্রতি জনগণের আসক্তি। বরং গুরুত্ব দেওয়া হয় তাৎক্ষণিক বস্তু স্বার্থগুলির উপর। এই স্তরের বিরোধের আলোচনায় সবচেয়ে বেশি জায়গা জুড়ে থাকে উচ্চবর্গ। পি. ইউ. ডি. আর.-এর রিপোর্ট থেকে উল্লেখ করা যেতে পারে। 'বর্তমান দাঙ্গা থেকে গ্রামের উচ্চবর্গের স্থায়ী ও প্রধান লাভ হল জমি।' আবার গ্রামের হিন্দু-মুসলিমদের মধ্যে টিঁকে থাকা অসন্তোষ প্রসঙ্গে বলা হয়,

এই অবস্থা সৃষ্টির কারণ হল সম্পত্তি, বিশেষত ঘরবাড়ি ছেড়ে যাওয়া লোকেদের পরিত্যক্ত জমি। জবরদখল করতে বা সস্তায় কিনে নিতে ইচ্ছুক লোকেরা ক্রমাগত

হুমকি দিতে থাকে। (কেবল কি তারাই হুমকি দেয়?)

বাহুল্য হলেও এই কথা আবার বলা উচিত যে, সাম্প্রদায়িক সংঘাত সৃষ্টির পেছনে জমি বা সম্পত্তির ভূমিকার গুরুত্বকে অস্বীকার করা কিন্তু আমার বক্তব্যের উদ্দেশ্য নয়। শুধু এইটুকু বলা যে ওইসব উপাদানগুলির উপর গুরুত্ব দিতে গিয়ে সাধারণ মানুষের আবেগ, অনুভূতি ও বোধের জায়গাগুলো হারিয়ে যায়, এক কথায়, তাদের সক্রিয়তাকে উপেক্ষা করা হয়।

জনগণের সক্রিয়তা সম্পর্কিত একটি বিশেষ দিককে ব্যাখ্যা করা প্রয়োজন। 'দাঙ্গা' প্রসঙ্গে আমাদের বহু আলোচনায় 'জন'সমষ্টি নিষ্ক্রিয় ভূমিকা পালন করে। অর্থনৈতিক স্বার্থ, জমির লড়াই, বাজার দখলের খেলা এবং উচ্চবর্গের কলকাঠি নাড়া—এই সবই ঘটনাকে বেগবান করে তোলে। 'জনগণ' যেন আবার ইতিহাসের বাইরে থেকে যায়। এইভাবে বোধহয় তাদের আদিম 'শুদ্ধতা' রক্ষা করা হয়। আধুনিক ভারতের সাম্প্রদায়িক হিংসার উপরে অধিকাংশ সাম্প্রতিক লেখার বক্তব্য প্রাক-স্বাধীনতা যুগের জাতীয়তাবাদী ইতিহাসের অভিমতের অনুসারী মাত্র। সেখানে এই কথা বলতে চাওয়া হয় যে ১৯৮৯-এর ভাগলপুরের সংঘর্ষের তুল্য ঘটনাগুলি ভারতীয় ইতিহাসের প্রবাহে স্বাভাবিক নয়। সেইগুলি ব্যতিক্রমী, কতকগুলি অস্বাভাবিক সঙ্কটের ফল। এমন একটা ভান করা হয় যে, ১৯৮০-র দশকে দেখা এই ঘটনাসমূহের সংখ্যা যতই বাড়ুক না কেন ও মাত্রা যাই হোক না কেন, প্রকৃতপক্ষে তা জনগণের আদত 'ধর্মনিরপেক্ষতার' কোনও মৌলিক পরিবর্তন ঘটায় না;[১৮] ফলে আমাদের সযত্নে লালিত জাতীয় ঐতিহ্যগুলি—'ধর্মনিরপেক্ষতা', 'অহিংসা' এবং 'শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান'—অটুট থাকে।

৩

আমার কাছে এই ইতিহাস গ্রহণীয় নয়। তার কারণ শুধু এই নয় যে এই রকম ইতিহাসচর্চায় সবকিছু একটি ছাঁচে সঙ্কুচিত হয়ে পড়ে বা জাতীয়তাবাদের এক ঘেয়ে ধারাপাতের আবৃত্তি হয়। এই ইতিহাসচর্চাকে বর্জন করার অন্য কারণও আছে।

স্বেচ্ছায় বা অনিচ্ছায় এই ধরনের ইতিহাসচর্চায় 'সাম্প্রদায়িকতা' এবং 'সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষ' কোনও এক নির্ভেজাল মৌলে পর্যবসিত হয়। মৌলের গুণাবলী অপরিবর্তনীয় ও সহজবোধ্য। যা বদলায় তা হল শুধু প্রসঙ্গ। এই অংশে এই রকম ইতিহাস-চর্চার অসম্পূর্ণতার দিকগুলি আলোচনা করব।

আগে বলা হলেও যে কথার পুনরুক্তি করতে চাই তা হল যে ঐতিহাসিক বা রাষ্ট্রনীতি বিশারদ বা সমাজতান্ত্রিক হিসাবে আমরা যে সব নিটোল পূর্ণাঙ্গ বয়ান তৈরি করি ও ভবিষ্যতেও করে যেতে থাকব, তার নির্দিষ্ট একটি প্রবণতা আছে। সেই বয়ানের উপজীব্য হল 'প্রসঙ্গ' বিশ্লেষণ মাত্র অথবা উপর্যুক্ত সংঘর্ষগুলির সংঘটক হিসাবে ইতিহাসের বৃহত্তম শক্তির ব্যাখ্যা। এইরকম বিশ্লেষণের একটা সুবিধা বা ফল এই যে আমরা যন্ত্রণাকে তুলে ধরার সমস্যা এড়িয়ে যাই। এ যেন একটি অনাময় ইতিকথা যেটা পড়তে আমরা অপেক্ষাকৃত স্বচ্ছন্দ বোধ করি। এই ইতিবৃত্তে হিংসা, দুর্দশা ও অতীতের

রেখে যাওয়া অনেক ক্ষতচিহ্ন চাপা পড়ে যায়।

কিন্তু এটা খুবই জরুরি যে হিংসার প্রকাশের মুহূর্তগুলি যেন বেশি বেশি করে ঐতিহাসিক ও সমাজবিজ্ঞানীদের নজর কাড়ে এবং তাদের রচনায় সেগুলি যেন নতুন করে উপস্থাপিত হয়। নিদেনপক্ষে এর সমর্থনে দুটি কারণ দেখানো যেতে পারে। প্রথমত, হিংসা ও দুর্দশার মুহূর্তগুলিতে আমাদের বর্তমান অবস্থার কথা অনেক বিশদভাবে ধরা পড়ে।[১৯] দ্বিতীয়ত, নানা গুরুত্বপূর্ণ অর্থে হিংসার অভিজ্ঞতা আমাদের 'ঐতিহ্যের' গড়ে ওঠার উপাদান, সেই অভিজ্ঞতায় আমাদের কৌমের বোধ, গোষ্ঠীচেতনা ও তার ইতিহাস তৈরি হয়েছে।

আমাদের দৈনন্দিন জীবনের সঙ্গে সম্পৃক্ত যে ইতিহাস, যে ইতিবৃত্ত লোকমুখে গড়ে ওঠে, সেখানে হিংসার অভিজ্ঞতা কোনও না কোনওভাবে দাগ কেটে যায়। সেইভাবে বানিয়ে তোলা হয় বর্বর বা সাধু চরিত্রগুলি, তকমা দেওয়া হয় 'হিন্দু', 'মুসলিম' বা 'শিখ'। এইসবের পরিণতিও প্রায়শই ভয়ঙ্কর আকার নেয়। এই সংক্ষিপ্ত নিবন্ধে কীভাবে বিভিন্ন ধর্মীয় গোষ্ঠী তাদের আত্ম-প্রতিকৃতি গড়ে তোলে এবং তাদের প্রতিপক্ষদের চিহ্নিত করে, তার বিশদ বিশ্লেষণে যাব না। সাম্প্রতিককালকে হিন্দুয়ানির প্রচারপত্র থেকে 'হিন্দু' বা 'মুসলিম' প্রতিকৃতি গঠনের কয়েকটি সূত্রমাত্র নির্দেশ করে আমরা বিষয়টির গুরুত্ব বোঝবার চেষ্টা করব।

কয়েক বছর ধরে জঙ্গি হিন্দুয়ানি ও তার প্রচারের মাত্রা সম্পর্কে অনেকেই বলেছেন। স্পষ্টত বিশ্ব হিন্দু পরিষদ সবচেয়ে বেশি ধুয়ো তুলেছে; ১৯৮০-র দশকে ক্রমবর্ধমান হিন্দু-মুসলিম সংঘাতগুলির সঙ্গে এই রকম প্রচারের যোগও বেশ পরিষ্কার। কিন্তু যে বিষয়টিকে গুরুত্ব দিয়ে খেয়াল করা হয়নি তা হল বিশ্ব হিন্দু পরিষদের মতো সংগঠনগুলির দাবি, তাদের তোলা বিদ্বেষের জিগির এবং তার থেকে উদ্ভূত 'দাঙ্গার' ফুলকি জনসাধারণের মনকে শুধু একটা মুহূর্তের জন্য বিষিয়ে তোলে না। বরং ঠিক তার উলটোটাই ঘটে। আমাদের ইতিহাস, দেশে 'ধর্মনিরপেক্ষ' ও 'সাম্প্রদায়িক শক্তিগুলির' নিজেদের সম্বল, অধিকাংশ প্রধান রাজনৈতিক দলগুলির সুবিধাবাদী নীতি এবং বার বার সাম্প্রদায়িক হিংসার বিস্ফোরণ ইত্যাদির প্রেক্ষিতে অন্য গোষ্ঠী বা গোষ্ঠীদের সম্পর্কে 'দুষ্টু', 'বিপজ্জনক', 'ভয়ানক' ইত্যাদি চরিত্রায়ন লোকগ্রাহ্য হচ্ছে, এমন কি লোকমান্য অন্ধ বিশ্বাসের রূপ নিচ্ছে।

কেবল লোকগ্রাহ্য হবার ক্ষেত্রবিচারে সাম্প্রতিক সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষে অনুষ্ঠিত নৃশংস ক্রিয়াকলাপগুলির ব্যাখ্যা করা যেতে পারে। পুরুষ, মহিলা, শিশু নির্বিশেষে সব মুসলিমকে শেষ করতে হবে—এই জিগির ভাগলপুরের বিভিন্ন জায়গায় কার্যকর করা হয়েছিল। সাধারণভাবে 'দাঙ্গা' প্রশমিত হবার আড়াই সপ্তাহ পরেও হিন্দু টেম্পো চালক-সহ ১৮ জন মুসলিম যাত্রীকে গ্রামাঞ্চলের একটি প্রধান সড়কে থামিয়ে খুন করা হয়। পরে তাদের দেহ ক্ষেতে পুঁতে রেখে রসুন গাছের বীজ বুনে দেওয়া হয়। মহিলাদের স্তন কেটে ফেলা হয়, বাচ্চাদের বর্শায় গেঁথে মারা, সেইসব গাঁথা বাচ্চাদের দেহ বাতাসে আন্দোলিত করে হাস্যোল্লাসে মত্ত হওয়ার মতো ঘটনার কথাও শোনা গেছে।[২০]

আমার মনে হয় যে, এইসব উন্মত্ততা ও অবিশ্বাস্য বর্বরতার পেছনে একটি বিশ্বাস কাজ করেছে। ভুক্তভোগীরা সবাই যেন এক একটি ভয়ঙ্কর দানব বিশেষ। কেউ হয়তো এখন জেগে আছে, কেউ হয়তো ভবিষ্যতে চাগিয়ে উঠবে। 'আমাদের' প্রতি 'তারা' সমতুল্য বা তার চেয়েও জঘন্য ব্যবহার করেছে বা সামান্য সুযোগ পেলেই 'তারা' সেইরকম আচরণ করতে পারে। বহু ক্ষেত্রেই 'আমাদের' বর্বর ব্যবহারকে 'বদলা' হিসাবে মনে করা হয়েছিল। বিশ্বাস ছিল এই যে আদি বীভৎস ঘটনাগুলো যেন 'গতকাল ঘটেছে' বা 'সেদিন হয়েছে', 'শহরে' বা 'পাশের জেলায়' বা আরও দূরে কোথাও সংঘটিত হবার খবর পাওয়া গেছে। ভাগলপুরে গ্রামের দিকে যে গুজবের জন্য হিন্দুরা সংঘর্ষে লিপ্ত হয়েছিল, তা হল ভাগলপুর শহরের একাংশে, বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছে মুসলিম মালিকদের বোর্ডিংনিবাসী সমস্ত হিন্দু ছাত্রদের 'দাঙ্গার' প্রথম দুদিনেই সাবাড় করা হয়েছে।[২১] এইসব হিন্দু ছাত্রদের অধিকাংশই ভাগলপুরের গ্রাম থেকে পড়তে এসেছিল। অন্যান্য ক্ষেত্রেও বলা হয়েছে, অতীতে 'তারা' 'আমাদের' উপর সাধারণত যেসব অত্যাচার করেছে, এইবারের দাঙ্গায় সেইসব কুকীর্তির প্রতিহিংসা নেওয়া হল। এখানে যা প্রাসঙ্গিক তা হল এই যে আমাদের কাছে যা কিছু উন্মত্ত হিন্দু প্রলাপ, সেই সবকিছুই ব্যাপক মানুষের কাছে বিশ্বাসযোগ্য।

এই ধরনের বিশ্বাসের একটা ভদ্ররূপ হল: 'ভারতের মুসলিমরা পাকিস্তানি'। প্রমাণস্বরূপ বলা হয়, ভারত-পাকিস্তানের যে কোনও ক্রিকেট ম্যাচে ওদের ব্যবহার লক্ষ কর। এর থেকে যুক্তি খাড়া হয় যে স্থানীয় মুসলিমরা একটার পর একটা পাকিস্তান বানাবে—ভাগলপুরে, মোরাদাবাদ, তামিলনাড়ুর মীনাক্ষীপুরমে। এইভাবে আমরা এমন এক জায়গায় এসে দাঁড়াই যেখানে মুসলিমকে মনে হয় ধাতুগতভাবে হিংস্র, ধর্মোন্মাদ ও অবাধ্য।

আক্রমণ, ধর্মান্তরীকরণ, সীমাহীন রিরংসা, এই সমস্ত দিয়ে নাকি ইসলাম প্রসারের ইতিহাস বিধৃত করা যায়। হিন্দুয়ানির ঐতিহাসিক ও প্রচারকদের অভিমত সেটাই। 'যেখানে মুসলিম গোষ্ঠীরা বাস করে, সেখানেই ইসলামের নামে হত্যার তাণ্ডবলীলা অবশ্যম্ভাবী।'[২] 'প্রত্যেক মুসলিমের ধর্মীয় কর্তব্য' হল 'অমুসলিম রমণীদের অপহরণ করে তাদের ধর্মে দীক্ষিত করা'। হালে যেসব এলাকায় সংঘাত হয়েছে, সেইসব জায়গাতে জঙ্গি হিন্দু সংগঠনগুলি নানা প্রচারপুস্তিকা ও প্রচারপত্র বিলি করেছিল। এইগুলিতে 'হিন্দু' দম্পতির সঙ্গে দুইটি সন্তানের ছবি ছিল, সঙ্গে ছিল শ্লোগান 'হম দো, হমারা দো'। ঠিক তার পাশেই ছাপা হয়েছিল একটি 'মুসলিম' পরিবারের চিত্র। একজন পুরুষের চারটি স্ত্রী এবং অসংখ্য সন্তান, সঙ্গে যুৎসই শ্লোগান, 'হম পাঁচ, হমারে পচ্চিশ'। এর ফলে তৈরি হল 'মুসলিমদের' প্রসঙ্গে লোকগ্রাহ্য একটি নতুন 'সাধারণ' চেতনা। অন্যান্য অনেক বিষয়ের মতো এই ক্ষেত্রেও বিবাহ ও যৌনাচার সম্বন্ধে কেবলমাত্র মুসলমান পুরুষদের বিকৃতির কথাই বলা হয়। তাদের বদমেজাজ সম্পর্কে কিছু ধারণাও চালু করে দেওয়া গেল।

মুসলমানদের সম্পর্কে হালের হিন্দুয়ানির প্রচারের সুরটি একটি প্রচারপত্রের মাধ্যমে ধরা যেতে পারে। ১৯৮৯-এর শেষ দিকে অথবা ১৯৯০-এর গোড়ায় এই প্রচারপত্রটি

ভাগলপুরে বিলি করা হয়েছিল। এর শিরোনাম ছিল 'হিন্দু ভাইরা ভাবো ও সাবধান হও'।[১১] প্রচারপত্রের প্রশ্ন ছিল,

১। এটা কি সত্য নয় মুসলিম জনসংখ্যা বেড়েই চলেছে আর হিন্দু জনসংখ্যা কমছে?

২। এটা কি ঠিক নয় যে, মুসলিমরা পুরোপুরি প্রস্তুত ও সংগঠিত, এবং হিন্দুরা পুরেপুরি অসংগঠিত, ছড়ানো ছিটানো অবস্থায় আছে?

৩। এটা কি সত্য নয় যে মুসলিমদের অস্ত্রের যোগান অফুরন্ত আর হিন্দুরা পুরোপুরি নিরস্ত্র...

৫। এটা কি যথার্থ নয় যে গত ৪০ বছরে কংগ্রেস মাত্র ৩০ শতাংশ ভোট পেয়ে ক্ষমতায় এসেছে; বা অন্যভাবে বললে যেদিন মুসলিমরা মোট জনসংখ্যার ৩০ শতাংশ হয়ে যাবে, সেদিন তারা ক্ষমতা পাবে?

৬। এটা কি সঠিক নয় যে ১২ থেকে ১৫ বছরের মধ্যে মুসলিমরা জনসংখ্যার ৩০ শতাংশ হয়ে যাবে: অন্যভাবে বললে ১২ থেকে ১৫ বছরের মধ্যে মুসলিমরা সহজেই দেশের শাসক হয়ে যাবে?

৭। এটা কি সত্য নয়, যেই তারা ক্ষমতা পাবে, অমনি পাকিস্তানের মতো (এখানকার) হিন্দুদের তারা ঝাড়েবংশে উজাড় করে দেবে?

৮। এটা কি সত্য নয় যে হিন্দুদের নির্মূল করার সময় তারা ভেবে দেখবে না কেই বা লোকদলের, কেই বা সোস্যালিস্ট ও কেই বা কংগ্রেসের পুরুষ বা মহিলা সদস্য এবং কোন হিন্দু 'উচুঁজাত' বা 'পিছিয়ে পড়া' বর্গের লোক, কেই বা হরিজন?

৯। এটা কি যথার্থ নয় যে, যে সব লোক হাল আমলের রাজনৈতিক দুর্নীতি থেকে কালো টাকা আয় করছে ও সম্পদ বাড়াচ্ছে, মুসলিম শাসনে সেইসব লোকদেরও জীবন ও সম্পত্তি ধ্বংস হবে?...

১১। এটা কি সত্য নয় যে পাকিস্তান ছেড়ে দেবার পরে যে ভূখণ্ড রয়ে গেছে, তা স্পষ্টতই হিন্দুদের?...

১৩। এটা কি ঠিক নয় যে কাশ্মীরে জমি কিনতে, স্থায়ীভাবে বসবাস করতে হিন্দুদের মানা আছে অথচ কাশ্মীরি মুসলিমরা অবাধে দেশের যে কোনও অংশে জমি কিনতে পারে।...

১৬। এটা কি সত্য নয় যে খ্রিস্টানদের 'হোমল্যান্ড' বা নিজেদের দেশ আছে, মুসলিমদের 'হোমল্যান্ড' বা নিজের দেশ আছে, সেখানে তারা সর্বতো নিরাপদ বোধ করে অথচ হিন্দুরা তাদের দেশ রাখতে পারেনি কারণ ধর্মনিরপেক্ষতার পতাকাতলে সেটা একটা 'ধর্মশালা' হয়ে গেছে?

১৭। এটা কি সত্য নয় যে হিন্দুরা ক্ষমতাসীন থাকলে মুসলিমরা নিরাপদে বাস করতে পারে কিন্তু যখনই মুসলিমরা ক্ষমতায় আসবে, হিন্দুদের জীবন বিপন্ন হবে অর্থাৎ তাদের নির্মূল করে ফেলা হবে?

১৮। এটা কি ঠিক নয় যে দল নির্বিশেষে লোকসভার মুসলিম সদস্যরা

মুসলিমদের উন্নতির জন্য দিবারাত্র চেষ্টা করে কিন্তু দিল্লিতে এমন কোনও হিন্দু জনপ্রতিনিধি নেই যে নিজের সুবিধা ব্যতিরেকে হিন্দুদের স্বার্থের জন্য আত্মনিয়োগ করেছে?...

২২। এটা কি সত্য নয় যে, যে সব মুসলিম রমণীদের বিবাহ বিচ্ছেদ হয়েছে, তাদের ভরণ-পোষণ সরকারি ওয়াকফ কমিটি থেকে করা হয় এবং সরকারি কোষাগার থেকেই খরচার যোগান হয়? এর অর্থ কি এই নয় যে মুসলিমদের আনন্দ উপভোগ ও লালসা চরিতার্থ করার জন্য সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দু সম্প্রদায়কে অতিরিক্ত করের বোঝা বহন করতে হচ্ছে?

যদি এইগুলি সঠিক হয় তাহলে হিন্দুভাইদের এক্ষুনি সজাগ হতে হবে সময় থাকতে থাকতে জেগে উঠতে হবে। সম্পদ, শরীর, সবকিছু উৎসর্গ করার বিনিময়ে হিন্দু জনগণ ও জাতিকে রক্ষা করার শপথ নিন এবং দেশকে হিন্দু রাষ্ট্ররূপে ঘোষণা করার প্রতিজ্ঞা করুন।

এই সমস্ত থেকে অবশ্যই 'মুসলিম' সম্পর্কে আতঙ্ক তৈরি হয়, দাবি ওঠে তাকে নিরস্ত্র করবার। তার ভোটাধিকার কেড়ে নাও, তার সংস্কৃতি হরণ করো; 'আমাদের' নাম নাও, 'আমাদের' ভাষা নাও, 'আমাদের' পোষাক নাও। এই দাবিই উচ্চকিত হয়ে ওঠে যে যদি মুসলিমরা এই দেশে থাকতে চায়, তাহলে 'আমাদের' মতো করে থাকতে হবে। আমরা কারা? এটা কখনওই পরিষ্কার করে বলা হয় না, কিন্তু এই পরিস্থিতিতে যেন আদৌ সেটাতে কিছু এসে যায় না।

'হিন্দুস্তান মেঁ রহনা হ্যায়,
তো হমসে মিলকর রহনা হোগা।'
'হিন্দুস্তান মেঁ রহনা হ্যায়,
তো বন্দে মাতরম্ কহনা হোগা।'

এর সঙ্গে সঙ্গে অন্য এক বিপরীত যুক্তিও সময় সময় শোনা যায়। 'আমরা' অবশ্যই মুসলিমদের মতো সংখ্যালঘুদের প্রতি ন্যায়পরায়ণ হব, কারণ তারা তো বেশিরভাগই ধর্মান্তরিত স্থানীয় বাসিন্দা। 'তাদের শিরায় তো হিন্দু রক্তই বইছে।'[২৩] কিন্তু মূল ধুয়াটা রয়েই যায়: 'আমাদের মতো করে থাকো' নতুবা ভবিষ্যৎ রক্তাক্ত; কোতল হওয়া ছাড়া গত্যন্তর নেই। 'বাবর কি সন্তান, যাও পাকিস্তান ইয়া কবরিস্তান'। এই জিগিরকে ভাগলপুর ও অন্যান্য কিছু অঞ্চলের পুলিশ ও স্থানীয় হিন্দু জনগোষ্ঠীর বড় অংশ আক্ষরিক অর্থে মেনে নিয়েছিল।

'মুসলিম'-এর দুশ্চরিত্রায়নের বিপ্রতীপে তুলে ধরা হয়েছে হিন্দুর এক 'প্রতিকৃতি'। প্রাক-স্বাধীনতা যুগ থেকে হাল আমল পর্যন্ত বিজ্ঞাপিত ছবির তুলনায় এই প্রতিকৃতিটি কিছুটা আলাদা। এই জঙ্গি হিন্দুয়ানির প্রচারে সেই অহিংস, শান্তিপ্রিয়, সহনশীল 'হিন্দুর' চরিত্র ততটা জোর পায় না। আবার আশ্চর্যের কথা, সেটাকে একেবারে বাতিলও করা হয় না। বরং এখন বলা হয় যে 'হিন্দুরা' কীভাবে অনেক বেশি সময় ধরে সহনশীল থেকে

গেছে, এখনও তারা 'বড় বেশি নিস্তেজ'। কিন্তু সময়ের দাবি হল সাহস দেখানো, সহ্য করা নয়। ন্যায্য পাওনা নিয়ে হিন্দুদের এখনই দাবি তোলা উচিত। শেষ অবধি সেই দাবি উঠছেও। যদি 'খ্রিস্টানরা' একটা জাতি হতে পারে এবং 'মুসলিমদের' একটা জাতি থাকতে পারে, তবে হিন্দুরাও কেন একটা জাতি নয়? যে ভুখণ্ডে তারা সংখ্যাগুরু ও হাজার বছর ধরে বাস করেছে, সেই এলাকা কেন তাদের নিজেদের দেশ হবে না, সেখানে কেন তাদের নিজেদের রাষ্ট্র থাকবে না? বহু দিন ধরে 'সহনশীলতা' ও 'ধর্মনিরপেক্ষতার' অজুহাতে 'হিন্দু'দের অনেক কিছু ছাড়তে হয়েছে। তাদের আর ভয় দেখানো চলবে না, তাদের আর কোনও কিছু ছেড়ে দেওয়া উচিত নয়। কয়েক বছর ধরেই তো দিল্লি ও উত্তরপ্রদেশের অন্যান্য শহরে জোর কদমে দেওয়াল-লিখন চলছে 'গর্ব সে কহো হম হিন্দু হ্যায়' এবং 'হিন্দু জাগা, দেশ জগেগা'।

বিশেষ বিশেষ সম্প্রদায়ের ঐতিহ্য, মূল্যবোধ, তথা প্রতিকৃতি বা আত্মপ্রতিকৃতি অনড় বা অপরিবর্তনীয় নয়। উনবিংশ শতকের শেষভাগ থেকে আর্য সমাজ সমেত অন্যান্য হিন্দু সংগঠনগুলির শুদ্ধি আন্দোলনের ইতিহাস এই বিষয়কে পরিষ্কার করে তোলে। ১৯১৪ সালে প্রকাশিত *History of the Arya Samaj* গ্রন্থে লালা লাজপত রায় বলেছিলেন 'আর্য সমাজ হল *একটা বৈদিক চার্চ*। অতএব হিন্দু সংগঠনরূপে *হিন্দু ধর্মের খোঁয়াড়* থেকে বেরিয়ে যাওয়া যে কোনও ভ্রাম্যমান শাবককে ফিরিয়ে আনা এবং যে কাউকে হিন্দু ধর্মে পুনর্দীক্ষিত করা তার কর্তব্য।[২৪] হিন্দুধর্মের উপর খ্রিস্টান মিশনারিদের আক্রমণ ও উনবিংশ শতকে নিচু জাতের এবং কিছুটা উচ্চবর্ণের হিন্দুদের ধর্মান্তরীকরণের চেষ্টার বিরুদ্ধে সরাসরি প্রতিক্রিয়া রূপে শুদ্ধি আন্দোলনের জন্ম হয়। লালা লাজপত রায়ের ভাষাতেই আর্য সমাজ গড়ে ওঠার পেছনে খ্রিস্টানদের প্রভাব লক্ষণীয়। 'চার্চের' তুলনা বা মেষ পালক কর্তৃক 'ভ্রাম্যমান' মেষ শাবকদের ফিরিয়ে আনার উপমাটি প্রণিধানযোগ্য।

লাজপত রায় এটা লক্ষ করেছিলেন যে 'শুদ্ধির' বাচ্যার্থ হল 'পরিশোধন' মাত্র। কিন্তু উনিশ শতকের শেষ পদে ও বিংশ শতকের গোড়ায় জঙ্গি হিন্দুয়ানি শব্দটির অর্থ বদলে দিয়েছিল। নানা ধরনের ক্রিয়াকলাপের প্রতি শব্দটি প্রযুক্ত হতে লাগল। (ক) 'বিদেশী' ধর্মাবলম্বী ব্যক্তিদের হিন্দু ধর্মে *ধর্মান্তরিত* করা; (খ) যারা দুর অতীতে অথবা কিছু দিন আগে 'বিদেশী' ধর্ম গ্রহণ করেছিল তাদের *পুনর্বার ধর্মান্তরিত* করা; (গ) নতুন করে *পুনরুদ্ধারে* ব্রতী হওয়া অর্থাৎ অন্ত্যজদের জাতে তুলে পুরোপুরি হিন্দু করা।[২৫]

ঔপনিবেশিক ভারতের শেষ পর্যায়ে শাসনতন্ত্রের হিসাবনিকাশের সংখ্যায়নের সঙ্গে হিন্দু সমাজের এই জাতীয় নবতর সংজ্ঞা নিরূপণ অথবা হিন্দু আচারের গ্রাহ্য রূপ নির্ধারণ ও ধর্মান্তরের মতো খ্রিস্টীয় 'কৌশল' গ্রহণের চেষ্টা কোনও না কোনওভাবে সম্পৃক্ত।[২৬] বিভিন্ন স্তরে গোষ্ঠীচেতনা দ্রুত দানা বেঁধে উঠেছিল, যেমন হিন্দু, মুসলিম, শিখ, আহির, পাটিদার, নাদার, বিহারি, উড়িয়া বা তেলগু। অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা নতুন নতুন মাত্রা পাচ্ছিল। এমতাবস্থায় জঙ্গি হিন্দু নেতা ও সংগঠনরা হিন্দুদের নানা 'বিকৃত' ধর্মীয় আচার ও ধারণা পরিত্যাগ করতে ডাক দিলেন। জাতপাতের বিভেদ, একসঙ্গে পঙ্ক্তিভোজন ও সমুদ্রযাত্রা নিয়ে নিষেধাজ্ঞা,

শুচিবাই-এর 'অদ্ভুত' ধারণা এবং তার ফলে ধর্মান্তর করবার বিধি নিষেধ ইত্যাদি 'বোকাটে', 'জাতীয়তাবিরোধী' চিন্তার জন্যই, বলপূর্বক ধর্মান্তরিত লক্ষ লক্ষ হিন্দু আজ পর্যন্ত মুসলিম হয়ে বাস করছে।[২৭] ১৯২০ সাল নাগাদ আর্যসমাজীরা ও আরও গোঁড়া হিন্দু নেতারা *দেবলস্মৃতি* করলেন। আরবদের সিন্ধুজয়ের একশ বছর বাদে লেখা এই স্মৃতিগ্রন্থে জোর করে ইসলামে দীক্ষিত হিন্দুদের হিন্দুধর্ম ফিরিয়ে আনার বিস্তৃত বিধি লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। ১৯৩০ সালে একইভাবে খুঁজে পাওয়া গেল *অথর্ববেদ* ও ব্রাহ্মণের কথিত 'ব্রাত্যস্তাত্র' আচার, যার ফলে আর্য সমাজ চ্যুত বলে বিবেচিত ব্যক্তিদের পুনর্গ্রহণের বন্দোবস্ত করা যায়।[২৮] নতুন এক ঐতিহ্যের পক্ষে শাস্ত্রীয় নির্দেশ সংগৃহীত করা হল।

হিন্দু সম্প্রদায়ের আত্মপ্রকৃতি ও 'ঐতিহ্য' নির্মাণের রীতিসমূহ অন্যান্য সম্প্রদায়ের ক্ষেত্রেও সমভাবে প্রযোজ্য। এই কথাও বলা প্রয়োজন যে সত্তর বছর ধরে নানা পরিবর্তন ও অভিযোজন সত্ত্বেও কতকগুলি ভিন্ন ঘটনাকে 'সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার' সরলীকৃত আখ্যায় ভূষিত করা হচ্ছে। খুব কম সময়ের ব্যবধানে ও সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষের চরিত্র ও পদ্ধতিগুলি যেভাবে পরিবর্তিত হচ্ছে, তা অনুধাবনযোগ্য। এটাও গুরুত্বপূর্ণ যে 'দাঙ্গার' এমন কোনও অপরিবর্তনীয় মৌল রূপ নেই, যার চারপাশের প্রসঙ্গগুলিই শুধু বদলে যায়।

১৯৮০-এর দশকের সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষ নানা নতুন রূপ নিয়েছে। বিভিন্ন ধর্মীয় সম্প্রদায়গুলির মধ্যকার সংঘর্ষ পূর্বতন দাঙ্গার পরিচিত রূপের মধ্যে আর আবদ্ধ নেই; যেমন রাস্তায় দুই দলের মুখোমুখি মারামারি অথবা অলিগলিতে চোরাগোপ্তা খুন। সম্প্রতি ১৯৮৯-এর ভাগলপুর, ১৯৮৭-এর মীরাট, ১৯৮৪-তে শিখ বিরোধী 'দাঙ্গা', ১৯৮৩-তে শ্রীলঙ্কার তামিল বিরোধী 'দাঙ্গা', ১৯৮০-তে মোরাদাবাদে হিন্দু-মুসলিম দাঙ্গা ইত্যাদি হিংসার নানা ভয়ংকর নিদর্শনগুলি যেন সুসংগঠিত গোষ্ঠী নির্যাতন, আম কোতলের পরিকল্পনা।[২৯] এই সব ক্ষেত্রে শয়ে, হাজারে এমন কি দশ হাজার লোকের জমায়েত ক্ষুদ্র, বিচ্ছিন্ন ও পূর্বচিহ্নিত 'অপর' সম্প্রদায়ের ঘরবাড়ি, সম্পত্তি ও জীবনের উপর আঘাত হেনেছে।

ভাগলপুরে মার্কসবাদী কম্যুনিস্ট পার্টির এক স্থানীয় নেতা বলছিলেন যে এখন কোথাও দু-একটা খুন হলে সেটাকে 'দাঙ্গা' বলে গণ্য করা হয় না।[৩০] আজকের 'সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাব' চেহারাটা হয়েছে অন্যরকম, তার চিহ্নগুলো হল: 'শত্রুকে' ঝাড়েবংশে শেষ করার উদ্দেশ্যে ছেলে, বুড়ো, অন্ধ, পঙ্গু, মেয়ে, বাচ্চা সবাইকে খতম করা, ক্ষেতের শস্য, সম্পত্তি, যন্ত্রপাতি সমেত ধনেপ্রাণে সবকিছু ব্যাপকভাবে ধ্বংস করা। এই ক্রিয়াকাণ্ডে পুলিশ নির্লজ্জভাবে অংশ নেয়, সংঘর্ষপ্রবণ এলাকায় চলাচলকারী ট্রেন ও বাসের যাত্রীদের হত্যাও দাঙ্গার নৈমিত্তিক ঘটনা।

১৯৪৭ সালে প্রথম রেলযাত্রীদের সদলে খুন করা হয়েছিল। তখন বলা হয় যে দেশ সবেমাত্র ভাগ হয়েছে, দুটি নতুন রাষ্ট্রের জন্ম হয়েছে, গুছিয়ে নিতে তাদের কিছুটা সময় লাগবে। সৈন্যবাহিনী ও পুলিশও দুইভাগে বিভক্ত। ফলে বিভ্রান্তি হবেই, মারাত্মক অপরাধ ও হিংসা প্রায় অবশ্যম্ভাবী। ১৯৮৪ সালে যখন একই ঘটনা ঘটল তখন বলা হল

যে, একজন অত্যন্ত জনপ্রিয় প্রধানমন্ত্রী ও বিশ্বনেত্রীকে খুন করা হয়েছে, মহীরূহ উপড়ে গেলে উথাল-পাথাল হওয়া বিচিত্র নয়, অস্বাভাবিক প্রতিক্রিয়াটাই তো স্বাভাবিক। অবস্থা এখন এইরকম যে সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষে লোককে জীবন্ত পুড়িয়ে মারলে কোনও রকম 'অস্বাভাবিক' পরিস্থিতির কৈফিয়ৎ খাড়া করাও যেন অপ্রয়োজনীয় বলে মনে হয়। সংবাদপত্রগুলি কখনও কখনও বিনা মন্তব্যে ভেতরের পতায় এই জাতীয় খবর ছাপায়।

হিংসাকে ঘিরে এই জাতীয় আলোচনা 'ঘটনাগুলিকে' অসাধারণ বলে চিহ্নিত করে কিন্তু প্রকৃতপক্ষে একেবারে সাধারণের পর্যায়ে নামিয়ে আনে, নজরে পড়ার অযোগ্য, নিতান্ত তুচ্ছ বিষয় বলে সরিয়ে রাখে। এই প্রসঙ্গে আমি ভাগলপুর থেকে তুলে আনা এক 'খণ্ড' বয়ানের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। এই 'খণ্ড' বয়ানটি হিংসার প্রেক্ষিতকে কিছুটা বদলে দেয়, আজকের দিনের 'সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষের' ভিন্ন অর্থ তুলে ধরে। শুধু আর-এক ধরনের 'সাক্ষ্যপ্রমাণ' হিসাবে এই খণ্ড বা ভগ্নাংশটিকে পেশ করা আমার উদ্দেশ্য নয়। বরঞ্চ সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষের বিশেষ অভিজ্ঞতায় ও উপলব্ধিতে বিধৃত অন্য এক বিষয়ীর নিজস্ব অবস্থানগত বোধের প্রকাশ হিসেবে খণ্ডটিকে বিচার করা যেতে পারে। এতে আমাদের নিজেদের বিষয়গত অবস্থান ও উপলব্ধির মাপকাঠিও পরিষ্কার হতে পারে। এ ছাড়া আমাদের ইতিহাসচর্চায় সর্বজ্ঞ হবার প্রচেষ্টার সীমাবদ্ধতাও বোধের এই প্রকাশে ধরা পড়ে।

আলোচ্য এই ভগ্নাংশটি ভাগলরপুরের কলেজের এক শিক্ষকের লেখা একটি কাব্য সংকলন।[৩১] শিক্ষক নিম্ন মধ্যবিত্ত শ্রেণী অধ্যুষিত, হিন্দু-মুসলিম একটি মিশ্র এলাকার বাসিন্দা। খুব বড় রকমের হত্যাকাণ্ড এখানে হয়নি। কিন্তু এলাকাটি বারবার আক্রান্ত হয়েছে। ফলে অঞ্চলটি চিরতরে মানসিকভাবে বিপর্যস্ত, ক্ষতবিক্ষত থেকে যাবে। সংঘর্ষ হবার প্রথম পাঁচদিনের মধ্যে মনাশির আশিক হরগাঁভি বেশির ভাগ কবিতা লিখেছিলেন। এই কবিতাগুলিতে সেই সময়ে ভাগলপুরের অনেক বাসিন্দাদের আতঙ্ক ও বিচ্ছিন্নতার অনুভূতির আভাস পাওয়া যায়। কবিতায় আছে অন্ধকারের কথা, দীর্ঘ নিশিযাপনের অভিজ্ঞতা এবং সেই সব দিন ও রাতের কাহিনী, যাদের আবর্তন যেন নিরর্থক ও অন্তহীন। কবিতায় ধরা পড়েছে সময়ের উন্মত্ত বিফল আর্তনাদ, শোনা গেছে লুটেরাদের চিৎকার। অট্টহাসির তলায় ডুবে গেছে সাহায্য পাবার আকুল আর্তি।

জান লেভা হঁসি	প্রাণ হিম করে দেওয়া হাসি
ভয়ানক কহ্‌কহে	ভয়ানক অট্টরোল
বচাও কি আঁওয়াজে	(আমাদের) বাঁচাবার আর্তিগুলি
ফাঁসে রহ্ গঁয়ে।	দাঙ্গাবাজদের মধ্যে হারিয়ে গেল।

মাঠভর্তি পড়ে থাকা লাশের চিত্রকল্প আছে, লাশগুলিকে গোনাও অসম্ভব।

এক...তিন...সত্তর	এক-তিন-সত্তর
সই-দোসও-ঢাইসও	শ-দুশ-আড়াইশ

যহ গিনতি পার নহী লগেগী	এই গুনতি আর শেষ হবার নয়
ইনহে গিনানে সে পহলে হী	কারণ শেষ হবার আগেই
তুম আ জাতে হো	তুমি আবার আসবে
বম্ আউর গোলি লেকর	বোমা আর গুলি নিয়ে
গিনতি কি তাদাদ বঢ়ানে	গুনতির সংখ্যা বাড়াতে;
লম্‌হে কি রূপহলী তসবীর,	কেউ এসে দেখুক
কোই দেখে আকর।	কি রূপালি এই মুহূর্ত।

'জেগে ওঠার' রূপকল্প থাকে, অন্ধকারের অবসানের পব আলোর আভাস পাবার প্রতীক্ষা থাকে। কিন্তু তারই সঙ্গে থাকে ভয়াবহ আতঙ্ক, লুটেরাদের ফিরে আসার আশঙ্কা।

দাঙ্গাই ফির আয়েঙ্গে	দাঙ্গাবাজরা আবার আসবে
অ্যায়সা হ্যায় ইন্তেজার।	তারই জন্য অপেক্ষা।

এই কাব্য সংকলনে অনেক ধর্ষণের কথা আছে। একটা সম্প্রদায়ের অবমাননার রূপকও হতে পারে, অথবা কোনও সত্য ঘটনার আক্ষরিক বর্ণনাও হওয়া সম্ভব।

মর গয়ে বেটে মেরে	আমার ছেলেরা মরেছে
বিবি মেরী	বৌটাও
ঔর য়হ বেটি জিসে তুম সাধ	আর পাশে বসে থাকা এই মেয়েটি
মেরে কনখিয়ো সে দেখতে হো	যাকে তুমি চোখের কোণ দিয়ে দেখছ
বেশুমার হাঁথোনে লুটা হ্যায় ইসে।	কত শত হাত একে লুটেছে।

এইরকম কাব্যাংশেব মতো অসংখ্য টুকরো পংক্তি আছে যার উদ্দিষ্ট প্রতিবেশি বা বন্ধু বা সেই সব লোক যারা একদিন পড়শি বা মিত্র ছিল। পড়শিরা আজ খুনেতে রূপান্তরিত, চেনা অচেনা মানুষেরা একে অপরের থেকে দূরে পালাচ্ছে, লোকে বা 'আমরা সবাই' আরশিতে মুখ দেখতে পচ্ছি, না জানি কি দেখব। কবিতাগুলিতে শোনা আবেদন আর অভিযোগ, আঁকা হয় নিঃসীম শূন্যতার ছবি।

কুছ ভী নহী রহা গয়া হ্যায় কহী
(কোথাও কিছু অবশিষ্ট নেই)
আদমী বহুৎ হী বওনা হো চুকা হ্যায়
আপনী লম্বাই কা ঝুঠা এহসাস ভী
বাকী নহি বচা
(মানুষ বামনের মত খর্ব হয়ে গেছে,
নিজের উচ্চতা সম্পর্কে মিছে বিশ্বাসও

আর শেষ অবধি রইল না)
হম বেহদ খোখলে হো গয়ে হ্যায়।
(আমরা একেবারে ফোঁপরা হয়ে গেছি)
আধে আধুরে লোক
(অর্ধেক অসমাপ্ত মানুষ)

আমাদের নিজেদের, প্রিয়-জনদের ও বন্ধুদের খুঁজে বার করার ব্যাকুলতা থেকে যায়:

খুদ অপনে আপকো ঢ়ুণ্ডতে হুয়ে	নিজেকে খুঁজতে খুঁজতে
অর তুম উস্ কিনারে পর খড়ে হো	তুমি এখন সেই কিনারায় দাঁড়িয়ে
জঁহা সে কোই নহী লৌটতা	যেখান থেকে কেউ ফেরে না
কোই নহী লৌটতা দোস্ত	কেউ ফেরে না বন্ধু
অব তুম্ভী নেহি লৌট পাওগে	এখন তুমিও ফিরতে পারবে না
য়াদ কি সির্ফ এক শর্ত রহে জায়েগী	স্মৃতির একটি মাত্র শর্ত থেকে যাবে
কে জব ভি কঁহী	যখনি কোথাও
ফসাদ হোগা	দাঙ্গা হবে
তুম্ বহুৎ ইয়াদ আওগে।	খুব মনে পড়বে তোমার কথা।

এই ভগ্নাংশটি ১৯৮৯-এর ভাগলপুরের 'দাঙ্গার' কথা নানাভাবে তুলে ধরে আর মনে করিয়ে দেয় যে এর ইতিহাস রচনায় আমরা কতটাই অপারগ।

৪

উনিশ শতক থেকে প্রচলিত ইতিহাসবিদ্যার পদ্ধতিতে রাষ্ট্র গঠন বা জাতীয় রাষ্ট্র গোছের কোনও কেন্দ্রের বিকাশ হত দিগদর্শী। 'পূর্ণাঙ্গ' সাধারণ ইতিবৃত্ত নিমার্ণে প্রাথমিক আকর-এর জায়গা পেত সরকারি মহাফেজখানা। আধুনিক ভারতীয় ইতিহাস রচনায় ক্ষেত্রে এই প্রতিকল্পের ক্ষমতা সহজে ধরা যায়।

এই পদ্ধতিকে অনায়াসে বাতিল করা যায় না। কারণ মানব সমাজ গঠিত হবার প্রধান নীতি রূপে রাষ্ট্র ও জাতিসমূহকে আমরা মেনে নিয়েছি। তদুপরি, ঐতিহাসিকদের উপজীব্য বিষয় হল যুগ, এলাকা, সামাজিক গোষ্ঠী বা রাজনৈতিক বিন্যাস । এই সবই কোনও না কোনও একক বা নিটোল ছাঁচে দানা বাঁধে। কিন্তু ঐতিহাসিক বা ইতিহাসের প্রক্রিয়ায় এবং ঐতিহাসিকদের রচনায় যে নির্মিতির কাজ চলে, সেই নির্মিতির পদ্ধতি মনে রাখা আবশ্যক। ঐতিহাসিক বিশ্লেষণের বস্তু হিসাবে এই এককগুলির আপতিক ও দ্বন্দ্বসঙ্কুল চরিত্র—এর প্রতি নিঃসন্দেহে নজর দেওয়া উচিত।

আমার বক্তব্য হল, আপাতভাবে দৃঢ়-সংবদ্ধ ও পূর্ণাঙ্গীন দেখালেও সরকারি সূত্র সমূহ আদতে ইতিহাসের একটি ভগ্নাংশই আমাদের কাছে হাজির করে। তার বাইরে আরও অনেক কিছু থাকে যাকে ঐতিহাসিকরা 'ভগ্নাংশ' বলে অভিহিত করেন; যেমন, কোনও

এক তাঁতির দিনলিপি, অজানা কবির লেখা কাব্য সংকলন। এইগুলির সঙ্গে যোগ করা যেতে পারে সেকালে নিন্দিত সেইসব ভারতীয় সাহিত্য যেমন সৃষ্টি সংক্রান্ত নানা অতিকথা, মহিলাদের গান, বংশচরিত বা স্থানীয় কিংবদন্তী। রাষ্ট্রভিত্তিক ইতিহাস রচনার বিরোধী প্রকল্পে এদের গুরুত্ব অপরিসীম। এরা অন্য সব ইতিহাস ভাবতে শেখায়। এদের মাধ্যমে সেই সমস্ত লড়াইগুলোকে চেনা যায় যার ভিতর দিয়ে কিছু একক নির্মিত হয় এবং অন্যরা ভেঙে গুড়িয়ে যায়।

আমাদের বিশ্লেষণের এককগুলির সাপেক্ষতা স্বীকার করলে, আমাদের ব্যাখ্যা ও তত্ত্ব সম্পর্কে আত্মগরিমাও অনপেক্ষ থাকবে না। 'সামগ্রিক' ও 'নিরপেক্ষ' জ্ঞানের দাপট আজকের ইতিহাস রচনায় আগেকার মতো নেই। কিন্তু সর্বাতিশয়ী কোনও এক 'বহুস' নির্মাণ করার প্রলোভন বড় জোরদার। আজও আমরা 'পূর্ণাঙ্গ' বয়ানের জন্য ব্যাকুল যে বয়ানে দরকারি কোনও কিছুই বাদ যাবে না।

ইতিহাস চর্চার প্রয়োজনীয় ও স্বাভাবিক অঙ্গরূপে এই আকুতি থাকা বিচিত্র নয়। এর সঙ্গে সঙ্গে আমরা যেন আমাদের বয়ানের সাপেক্ষতা মেনে নিই, বিশেষ রাজনৈতিক প্রেক্ষিতে বয়ানগুলির নিজস্ব ঐতিহাসিকত্ব ও স্থান নির্দেশ করি। তাহলে দেখানো যাবে জ্ঞানাঙ্গনে ঐ বয়ানগুলি কোন কোন সম্পর্ক ও ক্ষমতার সুবাদে বিশিষ্ট হয়ে উঠেছে, অন্যগুলি বাদ পড়ে গেছে। বর্তমান ভারতে জোড়বিহীন জাতীয়তাবাদের সর্বাতিশয়ী যে রূপকে আমাদের মতো বহু সমাজবিজ্ঞানী ও ঐতিহাসিক মেনে নিয়েছেন, তা আদৌ যথাযথ নয়।

বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গিতে বিশ্বাসী, প্রভুত্বকামী জাতীয়তাবাদী ইতিহাসচর্চাকে বার বার প্রশ্ন করা উচিত। কারণ এই ধরনের লেখায় 'জাতীয়' 'ধর্মনিরপেক্ষ' ইত্যাদি বর্গগুলি একপেশে অর্থে ব্যবহৃত হয়। অধিকন্তু, এই রচনাসমূহে সমস্ত ভারত, এমনকি দক্ষিণ এশিয়াকে, দিল্লি থেকে দেখা হয়। আলোচনায় তথাকথিত সাধারণের মধ্যে বিশেষ হারিয়ে যায়, বৃহৎ ক্ষুদ্রকে আচ্ছন্ন করে ফেলে, 'মূলস্রোতে'ই নজর কাড়ে, 'প্রান্তিক' একপাশে পড়ে থাকে।

যে পি. ইউ. ডি. আর. দলের আমি সদস্য ছিলাম, ঘটনাক্রমে ১৯৯০-এর ২৬ জানুয়ারির প্রজাতন্ত্র দিবসে দলটি ভাগলপুরে ছিল। ২৫ তারিখ সন্ধ্যায় দূরদর্শনের রাষ্ট্রীয় কার্যক্রমে ভারতীয় সংবিধানের অংশবিশেষের পাঠ কানে এল 'আমরা, ভারতের জনগণ দৃঢ় সংকল্প যে ভারত একটি স্বাধীন সার্বভৌম ধর্মনিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক সাধারণতন্ত্র রূপে গঠিত হবে ও প্রত্যেকটি নাগরিক সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ন্যায়বিচার-এর অধিকার পাবে: চিন্তা, মত, বিশ্বাস ও ধর্মাচরণের স্বাধীনতা (প্রাপ্য)'...লেখায় বোঝানো মুশকিল সেই মুহূর্তে দিল্লি যে কতটা দূর, সেটাকে কীভাবে আমরা বুঝতে পারলাম।

ঠিক তার একদিন আগেই আমরা দেখেছি, কোনও নিরাপদ আশ্রয়ের সন্ধানে অনেক এলাকার পুরুষ, মহিলা ও বাচ্চারা পৌটলাপুটলি নিয়ে গ্রাম ছেড়ে পালাচ্ছেন। ভয় যদি ২৬ জানুয়ারি কিছু ঘটে৷ জোর গুজব ছিল, জাতীয় উৎসবের দিনে চির বিশ্বাসঘাতক মুসলিমরা তাদের ধর্মস্থানে কালো পতাকা ওড়াবে ও আরেকটি দাঙ্গা বাঁধবে। মুসলিম

গ্রামবাসীদের সঙ্গে শহরের বাসিন্দাদের উত্তপ্ত বাদানুবাদ আমরা শুনেছি। একদল বলছিল যে এইরকম পালিয়ে আসা গুজব ও বিপদকে বাড়িয়ে তুলবে; অপরদল পাল্টা অভিযোগ তুলছিল যে আত্মসন্তুষ্টিতে ভোগাটা বোকামি, 'আগে তো এইরকমই ঘটেছিল।'

একটা ত্রাণশিবিরে আমাদের এফ. আই. আর. ও সাক্ষ্যপ্রমাণাদি লিখে নেবার জন্য অনুরোধ করা হয়েছিল। পুলিশের এই কাজ করার কথা। কিন্তু তারাই তো অপরাধী। বহুক্ষেত্রে তারা তখনও তাদের পদ নিশ্চিন্তে দখল করে আছে। সেই সময় 'ন্যায়বিচার' ও 'স্বাধীনতার' মতো শব্দগুলি উচ্চারণ করতে গিয়ে যেন গলায় আটকে যায়।

দিল্লির যে ব্যবধানের কথা আমি বলছি সেটা কেবল ভৌগোলিক দূরত্বে নিহিত নেই। আমি নিঃসন্দেহ যে কোটা এবং জয়পুরে, মেহম, মীরাটের মালিয়ানাতে, দিল্লির পাশে যমুনার অপর পারের তিলকনগরে, এমন কি খোদ পুরোনো দিল্লির অনেক বাসিন্দাও দিল্লির সঙ্গে এইরকম দূরত্ব অনুভব করেছিলেন, সেই সব জায়গাতেও 'ন্যায়বিচার' ও 'স্বাধীনতার' মতো শব্দগুলি বেশ বোকা বোকা শুনিয়েছিল। দিল্লির সঙ্গে এই ব্যবধানের কথাও যেন আমাদের লেখা ইতিহাসে ধরা পড়ে।

অনুবাদ: পার্থ চট্টোপাধ্যায় ও গৌতম ভদ্র

টীকা

১ *Subaltern Studies* ও রণজিৎ গুহের *Elementary Aspects of Peasant Insurgency in Colonial India* (Delhi, 1983) গ্রন্থের সমালোচনায় অনেক সময় বলা হয়েছে যে এই গবেষণায় প্রকাশ্য বিদ্রোহ ও হিংসাত্মক ঘটনা বড় বেশি গুরুত্ব পেয়েছে। এই ধরনের সমালোচনার আর এক প্রকাশ দেখা যায় কৃষক জীবন এবং প্রতিরোধের 'প্রাত্যহিক' রূপ নিয়ে লেখাগুলিতে। যেমন J. C. Scott, *Weapons of the Weak: Everyday Forms of Peasant Resistance* (New Haven, 1985.)

২ ইতিহাস আর সমাজবিজ্ঞানের যে সব লেখা আমার এই লেখায় আলোচিত হয়েছে, সেগুলি সম্বন্ধেও একই কথা প্রযোজ্য। আমি সচেতনভাবেই আজকের বামপন্থী এবং উদারপন্থী লেখকদের শ্রেষ্ঠ রচনাগুলিকে উদাহরণ হিসেবে বেছে নিয়েছি। তার কারণ হিন্দু, মুসলিম বা শিখ মৌলবাদী লেখকদের মধ্যে নয়, অগ্রগণ্য বামপন্থী এবং উদারপন্থী লেখকদের ভেতরেই ধর্মনিরপেক্ষকতা , সাম্প্রদায়িকতা এবং সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ নিয়ে সবচেয়ে চিন্তাশীল আলোচনা পাওয়া যায়। তাঁদের লেখার সমালোচনা করা শুধু যে অপেক্ষাকৃত কঠিন, তাই নয়, উগ্র জাতীয়তাবাদী ভাবধারার বিকল্প গড়ে তোলার ক্ষেত্রে অনেক বেশি জরুরিও বটে।

৩ উদাহরণরূপে দ্রষ্টব্য, Ashis Nandy, 'An Anti-Secularist Manifesto', *Seminar*, no 314; T. N. Madan, 'Secularism in its Place'. *Journal of Asian Studies*, 46, 4, (1987); Partha Chatterjee. *Bengal 1920-47 : The Land Question* (Calcutta, 1984), Preface; Dipesh Chakrabarty, 'Invitation to a Dialogue'; in Ranajit Guha ed. *Subaltern Studies, IV*, (Delhi, 1985); G. Pandey, *The Construction of Communalism in Colonial North India* (Delhi , 1990).

৪ Bipan Chandra, *Modern India* (New Delhi, 1971)

৫ Sumit Sarkar, *Modern India: 1885-1947*, (New Delhi, 1983).

৬ জার্মানিতে নাজিবাদ ও ইহুদি নিধনের তাৎপর্য নিয়ে যে আলোচনা আছে, তুলনীয় কোনও আলোচনা ভারতে নেই। জার্মানির ঐতিহাসিক ও দার্শনিকরা প্রশ্ন করেছেন: এটা কি শুধু সাময়িক বিভ্রান্তি বা বিকার, নাকি জার্মানির 'জাতীয়' ইতিহাসের অঙ্গ? দ্রষ্টব্য, Theodore Adorno, *Minima Moralia* (1951; English edition. London, 1974); Karl Jaspers, *The Future of Germany* (Chicago, 1967).

৭ দ্রষ্টব্য—Muhammad Umar Memon. 'Partition Literature. A Study of Intizar Husain', *Modern Asian Studies*, 14, 3, (1980), Aijaz Ahmad, 'Urdu Literature in India', *Seminar*, No 359, (July, 1989); Alok Rai, 'The Trauma of Independence. Some Aspects of Progressive Hindi Literature of the 1940s', and S. S Hans, 'The Partition Novels of Nanak Singh', in A. K. Gupta ed. *Myth and Reality, the Struggle for Freedom in India, 1945-47*, (Delhi, 1987)

৮ Tapati Chakrabarty, 'The Freedom Struggle and Bengali Literature of the 1940s' ঐ, পৃ. ৩২৯।

৯ পরবর্তী দুইটি অনুচ্ছেদের সূত্র পি ইউ. ডি. আর.-এর প্রতিবেদন ও সেই সংক্রান্ত নানা টুকরো বিবরণ।

১০ স্থানীয় লোকেদের মতে, কম করে দুই হাজার লোক নিহত হয়েছে। সরকারি খতিয়ান অনুযায়ী ১৯৯০-এর এপ্রিল মাস পর্যন্ত সংঘর্ষে ৪১৪ জন মারা গেছে। সবচেয়ে দেখে-শুনে করা বেসরকারি হিসেব অনুযায়ী, সম্ভবত এক হাজার লোক নিহত হয়েছিল। নিহতদের ৯০ শতাংশ হল মুসলিম। ঐ, পৃ. ১।

১১ তদন্তকারী দলরূপে আমাদের নিজস্ব প্রচেষ্টার কথা উল্লেখ করেছি। সাম্প্রতিক সংঘর্ষের সরকারি ব্যাখ্যার উপর প্রচারযন্ত্রের নির্ভরশীলতা নিয়ে সতীশ সবরওয়াল ও মুশিরুল হাসানের মন্তব্য তুলনীয়। 'Moradabad Riots, 1980 Causes and Meanings', in Asghar Ali Engineer ed, *Communal Riots in Post-Independence India*, (Delhi, 1984), p 208.

১২ PUDR, *Bhagalpur Riots*, p 7

১৩ বেদপ্রকাশ বাজপেয়ি, *নবভারত টাইমস* (হিন্দি), ১৯ নভেম্বর ১৯৮৯।

১৪ *Bhagalpur Riots*, p. 6.

১৫ Engineer, 'Causes of Communal Riots', in Engineer ed , *Communal Riots in Post-Independence India*, pp. 36-7

১৬ Sumitra Kumar Jain, 'Economy of Communalism', *Times of India, India*; *Pakistan Times*-এ পুর্নমুদ্রিত, May 1990.

১৭ *Bhagalpur Riots*, pp. 32, 37

১৮ আমার আরও মনে হয় যে ভারতীয় জনগণের নানা অংশের সামাজিক ও রাজনৈতিক চেতনা বোঝাবার জন্য 'ধর্মনিরপেক্ষতা' ও 'সাম্প্রদায়িকতা' এই শব্দ দুটি যথেষ্ট নয়। অনেকেই অনুরূপ বক্তব্য রেখেছেন। আমার মতের বিস্তৃত ব্যাখ্যার জন্য দ্রষ্টব্য আমার *Construction of Communalism*.

১৯ উত্তরপ্রদেশে গুজরৌলার কনভেন্টের শিক্ষিকা দুজন খ্রিস্টান সন্ন্যাসিনীকে ধর্ষণ করার বিস্তারিত সাংবাদিক প্রতিবেদনে দেখা যায় যে বন্দুক দেখিয়ে এঁদের বাধ্য করানোর সময় কেবল জাঙ্গিয়া পরা তিনজন ধর্ষণকারী পরস্পরকে 'গুরু' ও 'ওস্তাদ' বলে সম্বোধন করেছিল। মুম্বই ফিল্মে অথবা দিল্লির বাসে মেয়ে ও ভদ্রমহিলাদের পেছনে লাগা বখাটে যুবকরা এই জাতীয় বড়াই করতে অভ্যস্ত। মহিলাদের প্রতি এই রকম অশালীন ব্যবহারের সঙ্গে ধর্ষণের মতো হিংসাত্মক কাজের ফারাক কতটা, সেটা ভাবার বিষয়!

২০ ভাগলপুরের অভিজ্ঞতা থেকে এই সব উদাহরণ সংগৃহীত হয়েছে। দ্রষ্টব্য, *Bhagalpur Riots*। অন্য অঞ্চল থেকেও সমতুল্য বহু উদাহরণ পাওয়া যাবে।

২১ এই গুজবটি বিদ্বেষ প্রণোদিত ও একেবারে ভিত্তিহীন। সংঘর্ষ শুরু হবার আগে থেকে অথবা শুরু হবার সঙ্গে সঙ্গে হিন্দু ছাত্ররা ছাত্রাবাস ছেড়ে চলে যায়। মুসলিম বাড়িওয়ালারা নিজেরা অনেককে চলে যেতে সাহায্য করে। ছয় জনের বেশি ছাত্র নিহত বা নিখোঁজ হয়নি। মাত্র দুইজনের লাশ পাওয়া গেছে। দ্রষ্টব্য—*Bhagalpur Riots*, p. 12. কিন্তু ভাগলপুর শহর ও জেলা উপদ্রুত থাকার দরুণ সংঘর্ষের প্রথম কয়েকদিন অনেক ছাত্র হয়তো সরাসরি বাড়ি পৌঁছতে পারেনি। এই সময় ও তারপরেও বেশ কিছুদিন ধরে, ছাত্রদের হত্যার গল্পটি নিয়ে জেলা বা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ কোনও অনুসন্ধান করেনি, গল্পটিকে অসত্যও বলেনি। সংবাদপত্রে গল্পটি প্রচার করা হয়, এমন কি স্থানীয় রেডিও ও বি. বি. সি-ও বাদ যায় না। ফলে কাহিনীটি অনেকের কাছে সহজে বিশ্বাসযোগ্য হয়ে ওঠে। ১৯৯০-এর জানুয়ারি মাসের শেষে আমাদের ভাগলপুর পরিদর্শনের সময়ও অনেকে গল্পটিকে সত্য মনে করত।

২২ 'হিন্দু বন্ধুয়োঁ, সোচো আউর সমভালো', *রাজ্যেশ্বর*, অখিল ভারত হিন্দু মহাসভা।

২৩ তুলনীয় এ. শঙ্কর, *চেতাবনী? দো দেশকা খতরা*, বিশ্ব হিন্দু পরিষদ, প্রকাশন তারিখ অনুল্লেখিত।

২৪ Lajpat Rai, *A History of the Arya Samaj*, (1915, New Delhi, 1967), p. 100.

২৫ ঐ, পৃ. 1207।

২৬ ১৯১১-এর আদমশুমারিতে 'বিতর্কিত হিন্দুদের' জন্য পৃথক সারণী প্রস্তুতকল্পে Gait-এর নির্দেশনামার প্রভাব প্রসঙ্গে দ্রষ্টব্য, ঐ, পৃ. ১২৪-৫ এবং Kenneth W. Jones, 'Religious Identity and Indian Census' in N. G. Barrier, ed. *The Census in British India* (Delhi, 1981), pp. 91-2.

২৭ V. D. Savarkar, *'Hindu Pad Paddhati' or a Review of the Hindu Empire of Maharashtra*, (Madras, 1925).

২৮ J. T. F. Jordens, *Dayanand Sarasvati, His life and Ideas* (Delhi, 1978), pp. 170 & 322.

২৯ এই জাতীয় কিছু প্রতিবেদনের জন্য দ্রষ্টব্য, Engineer, ed. *Communal Riots in Post-Independence India*, এবং Engineer and Shakir, ed. *Communalism in India*, PUCL and PUDR, *Who are The Guilty? Report of Joint Inquiry into the Cause and Impact of the Riots in Delhi from October 31 to November 10* (Delhi, 1984), Uma Chakravarti and Nandita Haksar, *Three Days in the Life of a Nation*, (Delhi, 1987), S. J. Tambiah, *Sri Lankan Ethnic Fratricide and the Dismantling of Democracy*, (London, 1986); and Veena Das, ed., *Mirrors of Violence; Communities, Riots, Survivors in South Asia*, (Delhi, 1990).

৩০ শ্রীঅরুণের সঙ্গে সাক্ষাৎকার, ২৩ জানুয়ারি ১৯৯০, ভাগলপুর।

৩১ মনাশির আশিক হরগাঁভি, *আখোঁ দেখি, ভাগলপুরকে ভয়ানক ফসাদ কো দেখনে কে বাদ* (মকতবা কোহসর, ভাগলপুর, ১৯৮৯)।